ভূমিকা

বছর দুয়েক আগে একদিন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সিংহ কিছু মুদ্রিত কাগজপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সে কাগজগুলি পড়ে দেখতে অনুরোধ করেন। দু-চার পৃষ্ঠা শিথিলভাবে পড়ার পরই নতুন জিনিসের সন্ধান পেয়ে মন সচেতন ও কৌতূহলী হয়ে উঠল। আগন্তুক একজন অসাধারণ গবেষক তার পরিচয় পেতে আমার বিলম্ব হল না। অধুনা-প্রচলিত কবিগান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে, কিন্তু কলকাতার সংস্কৃতির মন্ডপে মাজাঘষা আধুনিক কবিগানের আসরে মন তৃপ্তি পায় না। তাকে ভদ্রজনের বৈঠকখানায় পেশ করতে গিয়ে তার গ্রাম্য ধূলিধূসর পোষাকের উপর ভব্য রুচির ধোপদুরস্ত আধুনিক আবরণ চাপিয়ে দিলে রুচির মুখ রক্ষা হয় বটে, কিন্তু মূলের রস তাতে বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

শ'খানেক বছর আগে কলকাতার নাগরিক কবিগান আধুনিক জীবনের জলতরঙ্গে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গ্রামের দিকে ধাবমান হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, সমাজ, নীতিবোধ, ধর্মান্দোলন প্রভৃতি আধুনিক ব্যাপার নব্য শিক্ষিত তরুণদের এতই মোহিত করে ফেলল যে, কবি, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, দাঁড়াকবি, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালী, তর্জা প্রভৃতি লোকাশ্রয়ী নাগরিক গীতিসাহিত্য তাঁদের মনে শুধু প্রতিকূলতাই জাগিয়ে তুলল। এই সমস্ত গানের মধ্যে এক ধরণের অনাবৃত অ-নাগরিক উন্মত্ততা ছিল, যেখানে রুচির শুচিতা আবশ্যক বিবেচিত হয়নি। কিন্তু ইংরাজী পাঠশালায় পড়া বিদ্যা, ব্রাহ্মসমাজের অতিরিক্ত শুচিবাতিক যা খানিকটা prudery-র ছদ্মরূপ এবং মধ্য-ভিক্টোরিয় রুচি-শাসিত বঙ্কিম গোষ্ঠীর প্রবল দাপটের ফলে হুতোমি অশিষ্টতা লজ্জা পেল এবং কবিগান দাঁড়াকবির উচ্চ কলরব, সুরের কারদানি ও তৎসহ গ্রাম্য গালিগালাজ কলকাতা থেকে পাত্তাড়ি গোটাতে বাধ্য হল। গ্যাসের আলোকের নাগরিক পরিবেশ ত্যাগ করে কবিগান, তর্জা ও পাঁচালীর লড়াই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ঝিল্লি-ঝঙ্কৃত ও স্বল্পালোকিত গ্রাম্য আসরে অবতীর্ণ হল। কলকাতার সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক ছিঁড়ে গেলেও এ নগরীর নব নব আন্দোলনের ঢেউ গ্রামীণ পরিবেশকেও মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যেত, কবিগানেও তার ছোঁয়া লাগত। বিধবাবিবাহ—বহুবিবাহ, ইংরেজী সভ্যতার বাড়াবাড়ি, স্বদেশ, সমাজ ও ধর্মের

নানা সমস্যা, যা কলকাতাবাসীদের মনে প্রবল উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল, তার দুটি-একটি তরঙ্গ গ্রাম্য কবিগানকেও স্পর্শ করেছিল। যাই হোক গ্রাম-বাংলায় কবিগানের নতুন জীবন আরম্ভ হলেও এতদিন তার কোন সংগ্রহ ও ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে সংগৃহীত হয়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি 'মাসপয়লা সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত কবিগানের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিবশতঃ (তিনি নিজেও কবিওয়ালা ছিলেন) প্রায়-লুপ্ত কবিগানের অনেকটা উদ্ধার করেন, কবিওয়ালাদের কিছু কিছু পরিচয়ও সংগ্রহ করেন। তাঁর পরেও ছোটবড়ো অনেকগুলি কবিগান-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে—এসবই উনিশ শতকের ব্যাপার। বিশ-শতকের গোড়ার দিকেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ও গবেষকরা পুরাতন কবিগানের হারানো স্বরূপ অনেকটা খুঁজে বার করেন। কিন্তু গ্রামীণ কবিগানের কোন তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা বা যত্নকৃত সংগ্রহ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত সিংহের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর প্রচুর সংগ্রহ দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। তিনি বহুদিন ধরে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করে বাংলার পল্লী অঞ্চল, বিশেষতঃ পূর্ববাংলার গ্রাম থেকে একালের অসংখ্য কবিগান সংগ্রহ করেছেন এবং বহু গ্রামীণ কবিওয়ালার জীবনীও তথ্যগতভাবে সাজিয়েছেন। আমরা গবেষণায় তথ্যগত methodology অনুসরণের কথা বলি। সাহিত্যের গবেষণায় methodology-টি যে কী বস্তু তা এক কথায় বলা শক্ত, এবং সাহিত্য বিচার ও বিশ্লেষণে এ রীতির প্রয়োগ কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়েও তর্ক চলতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, একথা তো স্বীকার করতে হবে, বিশুদ্ধ রসবিচার ও গবেষণা এক ব্যাপার নয়। রসবিচারের জন্য ক্রান্তদর্শী দৃষ্টি এবং স্বাভাবিক সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু গবেষণার জন্য প্রয়োজন তথ্যগত বাস্তব উপাদান, তাকে বিন্যস্ত করবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং পরস্পর সম্পর্কহীন তথ্যস্তূপের থেকে সত্যকে উদ্ধার। আমি শ্রীযুক্ত সিংহ সংগৃহীত বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখলাম, একটি দুরূহ গবেষণার নতুন পথ নির্মাণের পূর্ণ-শক্তি তাঁর আছে। সুতরাং একাজে তাঁকে উৎসাহ দিলাম এবং তাঁর গবেষণার পরিদর্শক হবার সম্মতি দিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি একালের কবিগান সম্বন্ধে এমন সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন যেগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান হিসেবে গৃহীত হবে। কলকাতা ও তার চারপাশে-আবির্ভূত কবিগান শতাব্দীকাল পূর্বেই লুপ্ত হয়ে গেছে। ঈশ্বর গুপ্ত বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করে প্রায়-লুপ্ত কবিগানের অনেকটা উদ্ধার করেন, কিন্তু সবটা পারেন নি,

কারণ উনিশ শতকের মধ্যপথেই অনেক কবিগান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কোন কোন গান বিকৃত হয়েছিল, একের গান অপরের নামে চলেছিল ; অনেক সময় বেতনভুক বাঁধনদারদের গান প্রায়-মূর্খ কবিওয়ালাদের নামেই চলেছে। পরববর্তীকালে অবশ্য গবেষকদের দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁরা বহু পরিশ্রম করে অনেক লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কবিগানের যে বিপুল প্রচলন ছিল, যার ধারা বঙ্গবিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তার বিচিত্র ইতিহাসটি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সিংহের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ('কবিয়াল ঃ কবিগান') সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের বহু কবিওয়ালা ও কবিগানের যে পরিচয় এই আলোচনা-গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে, তার জন্য লেখকের পরিশ্রম, প্রীতি ও বিচক্ষণতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বলতে গেলে এটি কবিগানের বিশ্বকোষ বিশেষ। ঐ অঞ্চলের অসংখ্য কবিওয়ালার ('সরকার') জীবনী ও নানা তথ্য সংগ্রহ করে শ্রীযুক্ত সিংহ বাংলা সাহিত্যের একটা বড়ো অভাব দূর করলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁকে অনুরোধ করব, পশ্চিমবঙ্গের শহর ও মফঃস্বলে কবিগানের ও তর্জার যে ধারা এখনও কোনও প্রকারে বহমান, তিনি যেন তারও সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁর প্রস্তাবিত বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করে তোলেন।

'কবিয়াল ঃ কবিগান' গ্রন্থটি নীরস তথ্যবিবৃতি নয়, বা ভয়াবহ গবেষণাও নয়। সরস, স্বচ্ছ ও আখ্যানবিবৃতির ঢঙে এটি লেখা হয়েছে ; কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন তথ্যই বাদ পড়েনি। এই সমস্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, লেখক কী অমানুষিক পরিশ্রম করে, নানা অঞ্চল থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছেন। কোন গান ভক্তি-বিষয়ক, কোনটি সমসাময়িক জীবনের ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত, কোনটিতে বা পুরাতন খেউড় ধরণের কিছু রংতামাসা ও কৌতুকরস আছে। বিশেষতঃ কবিয়ালদের লহরগুলি এখনও আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। আজকাল বাংলা সাহিত্যে গবেষণা বিপুল আকার ধারণ করেছে, তার অনেকটাই সুখপাঠ্য নয়—যদিও তাতে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। কিন্তু আলোচ্য সংগ্রহ ও জীবনকথা তথ্যসমৃদ্ধ হয়েছে, কোথাও বিরস হয়ে পড়েনি। এজন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সিংহকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"...রস সঞ্চয় ও রস আহরণের পূর্বতন আয়োজনগুলি সবই বিপর্যস্ত হইয়াছে। এখন জনতার শতমুখে যাহা নিঃসৃত হয় তাহা রাজনৈতিক উত্তেজনার উগ্র সুরা, ভক্তিরসমধুর কাব্যসুধা নহে। তথাপি সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবিগানের একটি চিরন্তন তাৎপর্য আছে।"

—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

এই বই সম্পর্কে বেশী কিছু বলা অবান্তর। গ্রন্থের পাতায় পাতায় তার পরিচয় লিপিবন্ধ রয়েছে। পূর্ববঙ্গে কবিগানের নবরূপদাতা কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য। তাঁরই ঐতিহ্যের ধারক বাহক কবি শ্রীনকুলেশ্বর সরকার (নকুল দত্ত)। নকুলেশ্বরের সত্তর বৎসরব্যাপী বৈচিত্র্যময় কবি-জীবনের পট-ভূমিকায় রচিত এই কবিয়াল ঃ কবিগান। ১৩১৬ বঙ্গাব্দ থেকে অদ্যাবধি যে সব 'সরকার'-এর সঙ্গে তিনি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন এখানে তারই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ। এই বিস্তীর্ণ কালের কবিয়াল ও কবিগানের মাল্য রচনায় নকুলেশ্বরের সঙ্গে অন্যান্য কবি-কুসুমেরও সৌরভ এবং সৌন্দর্য সমভাবে স্বীকৃত। সে প্রসঙ্গে এসেছে হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, মানুষ-প্রকৃতি, পূজা প্রাঙ্গণ, কবির আসর, গানের উদ্যোক্তা, গায়ক গায়িকা ও ঢুলীদের কথা। সেসব লোক আজ লোকান্তরিত, দেশান্তরিত, পূজাঙ্গণ, কবির আসর নিশ্চিহ্ন।

বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের পরেই সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় বোধ হয় কবিগান। একই সঙ্গে এমন নিন্দিত ও নন্দিত হতে কোন সাহিত্য-শাখা পারেনি। স্বয়ং কবিগুরু থেকে অনেক লঘুগুরু সমালোচক সমালোচনায় সামিল হয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের কবিগান ও কবির 'সরকারগণ' তাঁদের আলোচনা-গবেষণার গণ্ডীর বাইরে থেকে গেছে।

দেড়শত বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। মৃত কবিগানের আলোচনা-গবেষণায় প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে পূর্ব-বঙ্গের কবিগান যে শুধু অজ্ঞাত ও অনালোচ্য রয়ে গেছে তাই নয়, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও সন্দিহান।

অথচ পূর্ববঙ্গের রসিক মানুষ কবিগানকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত লালন-পালন করেছে। ঐদিন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজ জীবনের উপর যে অভিশাপ নেমে এসেছিল তার বিশেষ বলি বাংলার নিজস্ব সম্পদ এই কবিগান। বর্তমানে খুলনা, যশোহর, ফরিদপুরের কোন কোন এলাকায় ক্ষীণ কবি-কণ্ঠ শোনা গেলেও পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা—ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম জিলায় ঢোল কাঁসীর শব্দ চিরতরে নিস্তব্ধ। পূর্ব-বঙ্গের অজ্ঞাতকুলশীল, মাটি ও মানুষের কাছাকাছি কবিদের গুণ গরিমার কিঞ্চিৎ পরিচয় দানই এই গ্রন্থের বিশেষ উদ্দেশ্য।

বরিশাল জিলা অবিভক্ত বাংলাদেশকে বালাম চাল, মুকুন্দ দাস ও ক্ষীরোদ

নটকে উপহার দিয়ে গর্বিত। তার আরো একটি গর্বের বস্তু কবিশ্রেষ্ঠ নকুলেশ্বর— যিনি চুরাশি বৎসর বয়সেও সারা পূর্ববঙ্গের কবিগানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী, একটি অপূর্ব বিস্ময়, এক অনন্য ঈর্ষণীয় প্রতিভা। প্রচলিত ধারণায় কবিগানের সাহিত্যমূল্য কোন দিন স্বীকৃত হয়নি। এর মুখ্য কারণ সম্ভবতঃ এই সাংস্কৃতিক ধারাটির প্রতি গুণীজনের উপেক্ষা। কিন্তু এই উপেক্ষা এবং ভেদাভেদের বেড়া পার হতে পারলে গ্রন্থোক্ত গান ও কবিতা পাঠে প্রায় অশিক্ষিত লোককবিদের রচিত পল্লী সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণে পাঠক সক্ষম হবেন।

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম দরদী ও প্রবক্তা ৺দীনেশচন্দ্র সেন কৃত 'রামায়ণী কথা'-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজা মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন।" বর্তমান গ্রন্থখানা কবিকুলগৌরব নকুলেশ্বরের আজীবন ধ্যান জ্ঞান ও প্রাণাধিক প্রিয় কবিগানের প্রতি জীবনসন্ধ্যার পুষ্পাঞ্জলি—সেখানে আমার কাজ শুধু ফুল বেলপাতা এগিয়ে দেওয়া।

চৌদ্দ বৎসর পূর্বে অধুনালুপ্ত "রঞ্জন" পত্রিকায় এই রচনার সূচনা। এবং বিগত নয় বৎসর ধরে আমার সম্পাদিত "কৃশানু" পত্রিকায় এবং অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় এ লেখা খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

"পূর্ববঙ্গের কবিয়াল ও কবিগান" সম্পর্কে আমার গবেষিতব্য বিষয়ের পরিদর্শক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে যে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, তজ্জন্য প্রচলিত ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর স্নেহানুকূল্য খর্ব করতে চাই না। 'লিপিকা'র স্বত্বাধিকারী শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং শান্তিনাথ প্রেসের মালিক ও শ্রমিক বন্ধুদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ভুল ত্রুটি যথেষ্ট আছে। নিয়মমাফিক ক্ষমা চেয়ে বা মুদ্রাকরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব এড়াতে বা দোষ ঢাকতে ইচ্ছুক নই।

কবিগানের রসজ্ঞ শ্রোতাগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত এই গ্রন্থখানি পাঠে পাঠকগণ সামান্য তৃপ্তি পেলেও চৌদ্দ বৎসরের শ্রম সার্থক মনে করবো।

রেজিস্ট্রারস্ ডিপার্টমেণ্ট
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
মহালয়া, তেরশো চুরাশি

বিনীত
দীনেশচন্দ্র সিংহ

বিষয়পঞ্জী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

কবিয়াল
কবিগান

প্রথম খণ্ড

প্রভাত পাখির গান

প্রায় সত্তর বছর আগের কথা। বরিশাল জিলায় কালীজিরা নদীর পরপারে আমিরাবাদ বন্দর। সেখানে জ্যৈষ্ঠমাসের একরাতে বারোয়ারী ৺কালী-পূজা উপলক্ষে কবিগানের ব্যবস্থা হয়েছে। বায়না হয়েছে দু'টি দলের। রাত দশটা বাজতেই গানের আসরে প্রথম পক্ষের 'সরকার' (কবিয়ালগণ পূর্ববঙ্গে সরকার নামে অভিহিত) নিবারণ বসু'র দলের ঢোল বেজে উঠলো।

দলটি তাঁর সখের দল। দলের দোহার সব পুরুষ। তাঁর দলে কোন গায়িকা ছিল না। প্রথমেই তাঁরা ৺হরি আচার্য্যের রচিত একখানা আসর-বন্দনা গান ধরলেন। গানটির বিষয়বস্তু—পারিশ্রমিকের ব্যাপারে খোদ 'সরকার' এর চেয়ে মেয়ে দোহারদের প্রতি কবিগানের উদ্যোক্তাদের পক্ষপাত—

ওমা কালী গো! তোমার কেমন লীলা
কবির খেলা করবি কি অন্ত।
দেখি সরকারদিগের মাইনা, ত্রিশ টাকাও হয়না,
মেয়ের মাইনা হল ষাট পর্যন্ত ॥
স্বর্ণমণি পরশমণি বিধুকামিনী আদরমণি—
তাদের গান শুনে লোকে কাঁদতো।
ছিল বারো তের বেতন গাইত মনের মতন
তাদের গানে প্রাণ ধরে টান তো ॥
(অন্তরা)—এখন ষাট টাকা সত্তর টাকা মেয়ের মাইনা দাবী,
কি দিয়ে মা কবি গাই মনে মনে ভাবি।
আছে ত্রিশ টাকা 'সরকারের' দলে, ষাট টাকার বৈষ্ণবী ॥
একটায় দেয় কপালে টিপ, আরেকটায় দেয় মাজায় চিপ,
আর একটা মড়া পোড়া ছবি।
দাদা বসন্ত কয়, হরিয়ারে তুই, ছাড়িয়া দে রে কবি ॥

এই গান শেষ করে নিবারণ সরকার মশাই নিজে উঠে বিপক্ষ সরকারকে লক্ষ্য করে এক প্রশ্নের অবতারণা করলেন।

বিপক্ষে ছিলেন ঝালকাঠির প্রাচীন কবিয়াল বিধু সরকারের কন্যা শ্রীমতী

কুসুমকুমারী। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃগুণের অধিকারী হয়েছিলেন। নিবারণ সরকার কুসুমকুমারীকে আক্রমণ করে বলেন—

বল কুসুমকুমারী—
মেয়ে হয়ে কোন্ সাহসে, করতে এলি 'সরকারী'।
লোকে কথার কথা কয়—
চৌদ্দ হাত কাপড়ে নারীর কাঁধে কাছা রয়।
এসব রান্নাঘরের কান্না তো নয়— শাস্ত্র জানা দরকারী॥
কবিগান ছেলেখেলা নয়—
কেবল কাজল পরে চোখ ঠারিলে সে কি কবি হয়;
ও তোর শাস্ত্রের সঙ্গে নাই পরিচয়—
রাঁধতে জানো তরকারী॥

এই বলে নিবারণ বাবু এক চাপান দিয়ে দল নিয়ে বের হয়ে গেলেন। কুসুমকুমারী সদলে সভায় উপস্থিত হ'য়ে আসর-বন্দনা আরম্ভ করলেন; এবং কৌশলে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার চেষ্টা ক'রে গাইলেন—

সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠা হল নারী।
ভেবে তারণ-কারণ নারী চরণ, বক্ষে ধরেন ত্রিপুরারী।
পাগল শিব তালে নাচে, গঙ্গা তার শিরে আছে,
গঙ্গাধর নাম পেয়েছে শিরে গঙ্গা ধরি।
আবার রাধার পদে স্বনাম লিখে—
খাতক হলেন বংশীধারী॥

ইত্যাদি বলে পুনরায় আর এক গান ধরলেন—

নারীকে নিন্দা করা কি খাটে।
নারী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড উদরী, তন্ত্রসারে তাই রটে॥
অসাধ্য কর্ম সাধিতে—
জানি বিশ্বস্রষ্টা নারী সৃষ্টি করেন জগতে।
নিজে আদ্যাশক্তি খড়্গ হাতে, অসুরের মাথা কাটে॥
সুন্দ আর সেই উপসুন্দ—
দেবতার বিরুদ্ধে যেদিন করিল দ্বন্দ্ব,
সেদিন দায় ঠেকে দেবতাবৃন্দ, তিলোত্তমার পায় লোটে॥

সিতা অসিতা সাজিল—
শত স্কন্ধ রাবণেরে বধ করেছিল,
নারী বিশ্ব-প্রসব করে দিল,
বুঝি তোর জন্ম বাপের পেটে ॥

এইভাবে কুসুমকুমারী নিবারণ বাবুর চাপানের উত্তর দিলেন।

সেদিনের সে আসরে কাগজ কলম নিয়ে বসেছিল এক বালক। উদ্দেশ্য, গান টুকে নেওয়া। নাম তার নকুলেশ্বর। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসেন। আর বাড়ীর অনতিদূরেই এই গানের আসর বসে। পূর্ববঙ্গের বহুল প্রচলিত চলতি-বুলি—

যদি শুনি কবির কথা,
ঠেইল্যা ফেলি গায়ের কাঁথা।

সুতরাং কবির পাগল নকুলেশ্বরও খবর পেয়ে আসরে ছুটে যান গান শুনতে। যতক্ষণ গান চলে ততক্ষণ তিনি উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, এঁরা এভাবে উপস্থিত মতে কেমন করে এমন ছন্দ রচনা করেন!

উপরোক্ত গানগুলি নকুলেশ্বর লিখে নিলেন। গান শেষ হয়ে গেল বটে, কিন্তু নকুলেশ্বরের অন্তরের তরঙ্গ শেষ হলো না। বরং তা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে তাঁর ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান—কি করে ঐভাবে উপস্থিত ছন্দ রচনা করা যায়! প্রথমত তিনি 'মিল' সংগ্রহ সুরু করলেন। 'নষ্ট' বললেই তার সঙ্গে কষ্ট, দুষ্ট, মিষ্ট, রুষ্ট ইত্যাদি মিল যাতে সহজে আনা যায় সেই অনুশীলন সুরু হলো। অর্থাৎ কোন শব্দ কানে শুনলেই তিনি মনে মনে তার মিল শব্দ বলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হলো। গ্রামবাসীদের বাড়ীতে হরি সংকীর্তনের আসরে তিনি তাঁর উপস্থিত ছন্দে রচিত গান শুনিয়ে লোকজনকে আনন্দ দিতে লাগলেন।

বরিশাল জিলার অন্তর্গত সদর থানার অধীন চণ্ডীপুর নামক এক পল্লীগ্রামে কবি নকুলেশ্বর ১৩০১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা পাঠশালায় পড়বার সময় থেকেই তাঁর কবিতা লেখার উপর আগ্রহ ছিল খুব বেশী। হাতের লেখা খাতার উপরে সময় সময় দু'চারটি ছোট কবিতা লিখে

রাখতেন। শিক্ষক মহাশয় কখনো কখনো ধমক দিতেন, বলতেন,—'তোর লেখাপড়া কিছু হবে না। এখন বাজে কাজে মন দেওয়া বন্ধ কর।' আবার কোন সময় আদর করে বলতেন—'সুন্দর কবিতা হয়েছে রে; ভবিষ্যতে তুই কবি হবি।' সেই পণ্ডিত মশাই-এর কথাই কালে কালে সত্যে পরিণত হলো।

ছ'আনি প্রাঙ্গনে : কুঞ্জ দত্ত বনাম শরৎ বৈরাগী

সতের বছর বয়সে নকুলেশ্বর ব্রজমোহন কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার জন্য বরিশাল গেলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যে, সেদিনই রাত দশটার সময় ছ'আনির কাছারীতে কবিগান হবে। ঝালকাঠির প্রসিদ্ধ কবিয়াল শরৎচন্দ্র বৈরাগী ও কুঞ্জবিহারী দত্ত এই দু'দলের বায়না হয়েছে।

এ খবর শুনে নকুলেশ্বরের তখনকার অবস্থা বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ার মত। কারণ তিনি কবির পাগল; সে অবস্থায় সামনেই এমন প্রসিদ্ধ কবিয়ালদের কবিগান শোনার সৌভাগ্য—এর চেয়ে আর আনন্দ কি আছে!

সন্ধ্যার পরেই নকুলেশ্বর ঐ ছ'আনির কাছারী প্রাঙ্গণে গিয়ে অধীর আগ্রহে বসে রইলেন। আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এই দুইজন কবিয়ালের মধ্যে কুঞ্জ দত্ত মশাই কায়স্থ, আর শরৎচন্দ্র বৈরাগী মশাই বৈষ্ণব। আমিও কায়স্থ। অতএব আমি কুঞ্জ দত্ত মশাইকে গুরুপদে বরণ করে তাঁর চরণেই আত্ম-সমর্পণ করবো। আমার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই উপেক্ষা করতে পারবেন না।

রাত দশটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরৎ বৈরাগীর দল আসরে এলো। দলে হারমোনিয়াম, বেহালা, একটি সানাই, একটি ঢোল এবং কাঁসী। চারটি মেয়ে ও দু'টি পুরুষ ধরতা সামনে এবং পেছনে চারজন পুরুষ গায়ক।

মেয়েদের গায় বাইজীদের মত সাচ্চা জরির পোষাক, মাথায় টুপী। আর পুরুষদের উকিলদের মত কালো পোষাক—প্রত্যেকের পোষাকের উপরে লেখা "আদর্শ কবি।" বাদকেরা প্রথমে সুমধুর সুরে কন্‌সার্ট বাজাল। তারপর সামনের মেয়েরা সুললিত মিলিত কণ্ঠে গান ধরলো—

মন তোর গুরুদত্ত নিত্য সেবার গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া—
এমন হিয়ার ঠাকুর কার হাতে দিয়া, রয়েছ বিদেশে!
ম'জে কামিনী কাঞ্চনে কাচের আকিঞ্চনে
মন তুই কতকাল র'বি প্রবাসে ॥
আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দাসী নিকুঞ্জ সেবিকা,
গুরুদত্ত নাম পেয়ে কাদম্বিকা,
মায়ার পুত্তলিকা দেখে প্রহেলিকা;
পথ ভুলে গেলি শেষে।
রেখে গুরু বাক্যে শ্রুতি, স্মরি পূর্ব স্মৃতি
দেশের মানুষ চল দেশে ॥
(অন্তরা)—মন তোর যা গেছে তা গেছে ভাই—
যা আছে সামাল তাই;
এখনো ভজনানন্দে ম'জ।
মন তোর কুসঙ্গ ভঙ্গ দিয়া, শচীমার অঙ্গনে গিয়া,
শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া ভজ ॥
গুরু হরি বলে কথা রাখ, গৌর ভক্ত সঙ্গে থাক,
অঙ্গে মাখ ভক্ত-পদরজ।
মন তোর এখনো সময় আছে, গিয়ে শ্রীমায়ের কাছে,
নদীয়া নাগরী সাজে সাজ ॥

এই গৌর-ভজন বন্দনা গানখানি দ্বারা আসর বন্দনা করে শরৎ বৈরাগীর দল পরে মালসী গান আরম্ভ করলেন—

চিতান—তোরে দেখব বলে দুঃখহরা তারা মা—যাত্রা করলেম কৈলাসে।
পারণ—পথে পড়ে কুমতির ভুলে; এসেছি রাস্তা ভুলে,
কামরূপা কামিনীর দেশে ॥
ফুকার—আমার আশা পূর্ণ হ'ল কি,
যাত্রাকালে ছিল কি, যাত্রাভঙ্গ যোগ;
তাইতে সু-যোগে দুর্যোগ—মাগো
দেখলেম দেশের যত প্রণালী, কাতরে মা তোরে বলি,
আছে সে দেশে কামিনী-কালী, নিত্য হয় তার নিশাভোগ ॥

ছাড়—নিশাভোগ দেখিতে এলাম কুমতির মন্ত্রণায়,
ছয় বেটা জোর করে আমায়, দিতে আনল নরবলি।
মুখ—ভব ভয়হারিণী, কালী কালবারিণী, এখন কোথায় র'লি॥

এরকম আরো বহু পদ যোজনা করে মনোশিক্ষার মালসী গানটি গেয়ে শরৎ বৈরাগীর দল আসর থেকে বের হয়ে গেলেন।

নকুলেশ্বর উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথপানে চেয়েছিলেন, কতক্ষণে তার আকাঙ্ক্ষিত ধন, কল্পনার গুরু কুঞ্জ দত্ত মশাই আসরে আসবেন। মেঘ না চাইতেই জল! শরৎবাবুর দল বের হয়ে যাবার সাথে-সাথে কুঞ্জ দত্ত মশাই সদলে আসরে এলেন। দলের সাজ-সজ্জা সব পূর্ববর্তী দলের অনুরূপ। তবে গায়ক গায়িকাদের পোষাকে লেখা ছিল "বীণাপাণি কবি পার্টি"—এই মাত্র পার্থক্য।

কুঞ্জবাবুর দলও মনোরম কনসার্ট বা সমবেত যন্ত্র-সংগীতের পর গায়ক-গায়িকারা সমস্বরে আসর-বন্দনা আরম্ভ করলেন—

মন তোর দেহ-রেলগাড়ী,
সাধন-লাইন ছাড়ি, পড়ি হয়েছে অচল।
উহার জ্ঞান-লোহাতে জং ধরেছে—
তাইতে ভেঙ্গে গেছে, ভক্তি-ইঞ্জিনের কল॥
ইঞ্জিনে আর জোর ধরে না, দম দিলে নড়ে না—
ক্রমে কমে গেছে আগুন জল।
বুঝি দমের ঘরে বোম পড়ে —
গাড়ীর ফুরায়ে গিয়েছে আয়ু-বায়ুর বল॥

(অন্তরা)—ধর ত্বরিতে গাড়ীতে গুরু ইঞ্জিনীয়ার
উহার সকল কল অবিকল হবে, নূতন আবিষ্কার॥
গুরু হরি বলে কথা ধরবি, দমে নামের হুইসাল ছাড়বি,
সাধু সঙ্গ করবি প্যাসেঞ্জার।
তবে এক দমেতে পাবি অম্বিকা, অম্বিকার বাজার॥

এই বন্দনা গানখানি শেষ করে সকলে আবার ভবানী বিষয়ক গান আরম্ভ করলেন নিম্নোক্ত রূপে—

তুমি জগন্মাতৃ জগদ্ধাত্রী জগৎকর্ত্রী, পুরাণে প্রচার।
তারিণী, তুমি দুঃখহারিণী কালনিবারিণী—
জননী তোর একি অবিচার॥

মা তুই কারো জন্য সুধা রেখে—
কারো জন্যে রাখলি হলাহল।
কারো শুকনা বৃক্ষে ফল—মা মা গো,
কারো শুকায় পূর্ণ কুম্ভের জল।
কারো জন্যে বালাখানা, কেহ পায়না ধূলায় বিছানা,
কারো জন্যে মিছরির পানা, কারো ভাগ্যে জ্বলন্ত অনল॥

কারো দোষে কু-কলঙ্ক কারো গুণের কীর্ত্তি—
কেহ করে বেশ্যাবৃত্তি, কেহ পায় সমাজের পূজা।

মা হয়ে মা কারে পক্ষে, তাকাস মা কৃপা কটাক্ষে
কারো বক্ষে দুঃখ দাও দক্ষজা॥

কেহ থাকে শ্মশান খোলা, কারো বাসা বৃক্ষতলা,
কারো বাড়ী চকমেলা দালান;
কেহ অনশনে প্রাণে মরে, কারো ঘরে গোলা ভরা ধান।
কেহ করে জমিদারী, কেহ বা কড়ার ভিখারী,
কেহ দৌড়ায় জুড়ির গাড়ী; কেহ টানে পাল্কীর বোঝা॥
রঙ্গিনী তোর রঙ্গক্ষেত্রে রঙ্গ যায় না বুঝা॥

ইত্যাদি আরো অনেক তুলনামূলক ও রসাল পদযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্রী জগন্মাতার সৃষ্টি-বৈষম্য সম্পর্কীয় গানখানা গেয়ে কুঞ্জবাবু দল নিয়ে বের হয়ে গেলেন।

শরৎ বৈরাগী মশাই দল নিয়ে দ্বিতীয় বার আসরে এসে একখানা মাথুর গানের অবতারণা করে কুঞ্জবাবুর উপর চাপান দিলেন—

কংসের ধনুর্ম্ময় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়ে কংসকে ধ্বংস করে নিজে রাজা সেজে কংসের দাসী কুব্জাকে রানী করে রাজ-সিংহাসনে বসেছেন—এমন সময় শ্রীরাধার দাসী বৃন্দাদূতী দাসখত নিয়ে মথুরায় এসে শ্রীকৃষ্ণের বামে কুব্জাকে দর্শন করে বিদ্রুপচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলছেন—

১। দেখি চামচিকায় ধরেছে পেখম,
কুব্জা হল বাদশার বেগম।

কুব্জীর কি জোরের কপাল,
তুমি রাজা হলে গো রাখাল ॥

২। হ'ল কংসের দাসী পাটেশ্বরী,
রাই-কিশোরী রাসেশ্বরী,
আজ দেখি তার মান্য যায় ;—
তুমি কুব্জীরে বসালে বাঁয় ॥

৩। তুমি পেয়ে সে পরের নৈবেদ্য,
তুলসী দিয়ে করে শুদ্ধ ;
নিজের রাজভোগে লাগাও ॥

এই ভাবে তিনটি ফুকারে বিদ্রুপাত্মক প্রশ্ন করে শরৎবাবু বের হয়ে গেলেন। সুদীর্ঘ তিন চার ঘণ্টা যাবত দুই দলের বন্দনা, ভবানী বিষয়ক ইত্যাদি গানে কেটে গেল ; অথচ আসল কবিগানের কোন দেখা নেই। নকুলেশ্বর মনে মনে খুব বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কেননা তিনি ত এসব গানের রসের রসিক নন। তিনি বহু কষ্টে শিখেছেন একটু মিল দেওয়া পদ যোজনা করা। এসব গানের মর্ম উপলব্ধি করার মত তখন তার বয়স হয়নি এবং শক্তিও ছিল না। তাঁর কথায়—কুমীরের মুখে রসগোল্লা মিষ্টি লাগবে কেন !

হঠাৎ শরৎবাবুর ঐ মাথুর গানে বৃন্দার ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করে নকুলেশ্বরের মনে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন—দেখি কুঞ্জবাবু এর কি উত্তর করেন।

কুঞ্জবাবুর দল আসরে এসে একটা কনসার্ট বাজাবার পরেই মেয়ে দোহারগণ উঠে সম্মুখে দাঁড়াল। কুঞ্জবাবু তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে পদ-যোজনা করে বলছেন আর গায়িকাদের কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে। এক নম্বর ফুকারের পদ ধরে তিনি জবাব আরম্ভ করলেন—

ও তুই বৃন্দা হয়ে নিন্দা ক'রে গেলি অকারণ।
ও তুই না চিনে কৃষ্ণ চিদ্রূপ,
করেছিস ঠাট্টা বিদ্রুপ,
অপরূপ সেই রসের কথা শোন ॥

১। বললি, কুব্জা হ'ল বাদশার বেগম,
চামচিকায় ধরেছে পেখম,

কুব্জার জোরের কপাল ;
হল সে রানী আমি ভূপাল।
কালে কালে কিনা ঘটে,
গঙ্গাস্নান পাতকুয়ার ঘাটে,
দূতী ! ভেকের নৃত্য সাপের পিঠে,
ছাগে চাটে বাঘের গাল ॥

২। বললি, দাসী হল পাটেশ্বরী,
রাই কিশোরী রাসেশ্বরী,
আজ নাকি তার মান্য যায়,
আমি রাধার কোটাল শ্যামরায়।
কোঁটাল পতি পেয়ে কুব্জী,
কত আর সম্মানের পুঁজি,
দূতী ! জোনাকীর আলোকে বুঝি—
পুর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায় ॥

৩। বললি, পাই যদি পরের নৈবেদ্য,
তুলসী দিয়ে করি শুদ্ধ,
বল্‌লি কিগো বৃন্দে সই ;
আমি পরের বস্তুর প্রিয় নই।
ভক্তি চন্দনে কুবুজা, করে আমার চরণ পূজা,
তাইতো কুজারে বানায়ে সোজা—
ভোগের যোগ্য করে লই ॥

এই ভাবে শরৎ বৈরাগীর গানের জবাব দিয়ে কুঞ্জবাবু গানের আসরে খুব বাহ্‌বা নিলেন। অরসিক নকুলেশ্বরও যেন এক নূতন রসের সন্ধান পেলেন।

মাথুর গানের জবাব দিয়েই কুঞ্জ দত্ত মশাই কোন্ ভাব অবলম্বন করে টপ্পা সুরু হবে সে সম্পর্কে আসরে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। আসরে কর্তৃপক্ষ আদেশ করলেন—"আপনি এখন টপ্পা পাঁচালী আরম্ভ করুন। আমরা আপনাদের কাছে শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য এবং জগবন্ধু লীলা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে চাই।"

দত্ত মশাই অমনি ছুটি মেয়ে গায়িকা সম্মুখে ও পিছনে দাঁড় করিয়ে টপ্পার

লহর গান আরম্ভ করলেন। তিনি একটি পদ বলে দিচ্ছেন; দোহারদের কণ্ঠে তা সুরে ছন্দে ফুটে উঠছে:—

আমি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী "হরি শর্মা" নাম।
ভেবে বিষয় বিদ্যা অনিত্য, পড়েছি বৈষ্ণব সাহিত্য,
জানতে ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রীক্ষেত্রে এলাম ॥
আমি লোকের মুখে শুনলেম যেমন—
প্রত্যক্ষ স্বচক্ষেও দেখলাম তাই;
"জগবন্ধু" আজ তোমার এক বিন্দু করুণা চাই।
শুনি নন্দের নন্দন যেই, শচীসুত হল সেই,
বলরাম হয়েছেন নিতাই।
তবে শ্রীক্ষেত্রের এই শ্রীমন্দিরে
কে তোমরা বিরাজ কর দুটি ভাই?
আছে সুভদ্রা সতী, অর্জুন ছিল তার পতি—
এখন সে প্রাণে বেঁচে নাই।
তবে কি কারণে বল শুনি—
সুভদ্রার শঙ্খ সিন্দুর দেখিতে পাই?

টপ্পার লহর শেষ করে কুঞ্জবাবু পাঁচালী আরম্ভ করলেন। পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের পাঁচালী তরজাওয়ালাদের মত বা একঘেঁয়ে গাজীর পটের মত নয়। এ গান অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথমে একখানা যে কোন সুরে তালে ধুয়া দিতে হয়। ধুয়াখানা দোহারপত্রে চার পাঁচ বার গাওয়ার পর ধুয়া বন্ধ করে মূল কবিয়াল অর্থাৎ খোদ "সরকার" উঠে ত্রিপদী ছন্দে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন। সেই বক্তৃতা শেষ হলে আর একখানা ধুয়া দিয়ে তার সঙ্গে সুরে তালে ছন্দ রচনা করে সঙ্গীতাকারে বক্তৃতা দিতে থাকেন। অজানা লোকে সে রচনা শুনলে মনে করবে যে এগুলি হয়তো মুখস্থ করে বলছেন। নতুবা উপস্থিতমতে এভাবে ছন্দে তালে-সুরে ঐক্য করে কিভাবে পদ রচনা করে!

প্রাচীন ঋষি-কবি ব্যাস বাল্মীকি থেকে সুরু করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যত সব লেখক কবি ছিলেন, তাঁরা সকলে নির্জনে বসে দীর্ঘ সময় চিন্তা করে মনের ভাব ছন্দাকারে কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পূর্ববঙ্গের

অর্ধশিক্ষিত এমন কি নিরক্ষর কবিয়ালদের মত প্রকাশ্য সভায় হাজার হাজার শ্রোতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে কোন বিষয়বস্তুকে তালে ছন্দে, ভাবে সুরে ঐক্য এনে উপস্থিত বক্তৃতা দিতে তাঁরাও পারেন না। এটা তাদের অহংকারের কথা নয়; পূর্বজন্মার্জিত সাধনার ফল বলেই তারা মনে করেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত কবিয়াল যিনি তিনিও আসরে যাবার সময় জানেন না যে আসরে তিনি কি বলবেন। আসরে উঠে দাঁড়ালেই তাদের অন্তরে যেন এক দৈবী শক্তির আবির্ভাব হয়ে ভূতাবিষ্ট রোগীর মত তাদের মুখ দিয়ে যে কোন ছন্দে যে কোন তালে ভাবে রসে বর্ণনার বর্ণ জুগিয়ে শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। এর মধ্যে ভাব বা বিষয়বস্তু ছাড়া সুর তাল ভাষা ছন্দ সবই কবিয়ালের নিজস্ব সৃষ্টি। আসর ছেড়ে বাইরে এলে সে আর বলতে পারেনা যে এতক্ষণ কি বলে এসেছে। এসব অতিরঞ্জিত কথা নয়, ভুক্তভোগী রসিক মাত্রই তা বুঝতে পারেন।

যা হোক, টপ্পার লহর শেষ করেই কুঞ্জবাবু উঠে প্রথম ডাক-পুয়া দিলেন :—

=ভাঙন নদীর কূলে রে মন, ঘর বাঁধলি কি সাহসে=

দোহারপত্রে চার পাঁচ বার ঐ পদটি গান করে ছেড়ে দিল এবং যন্ত্র-সঙ্গীতও বন্ধ হল। দত্ত বাবু অমনি ডাক-ছড়া আরম্ভ করলেন :

বন্দ মাতা সরস্বতী শ্বেত পদ্মে অবস্থিতি
রজত পর্বত জিনি আভা
শ্বেত হংস আনন্দে স্থিতি প্রফুল্ল বদন জ্যোতি
অরুণ চন্দ্রের যেন শোভা ॥
গলে গজমোতি হার নীলোৎপল মণি যার—
বেশ ভূষা বিবিধ প্রকার।
মৃদু মন্দ স্বরে বীণা যন্ত্র ধরি করে
গীত বাদ্যে মোহিলে সংসার ॥
বাক্যরূপে কণ্ঠে স্থিতি তোমা বিনে নাহি গতি
বিদ্যার আধার ভগবতী।
সেবিয়ে তোমার তরে প্রকাশিল মুনিবরে
বেদাগম পুরাণ প্রভৃতি ॥
লেখা পড়া নানা তন্ত্র শিক্ষা দীক্ষা যত মন্ত্র
সকলি প্রভাব তোমা হতে।

বেদ বিধি আদি যত ছয় রাগ অনুগত
তাল মান রাগিণী সহিতে ॥
কৃপা দৃষ্টি কর যার জ্ঞান বুদ্ধি হয় তার—
সুজন পণ্ডিত গুণ ধীর।
তোমার মহিমা যত কি জানিব জ্ঞান হত
শ্রীচরণে নত করি শির ॥
দয়া করে মূর্খজনে বিদ্যা দিলে নিজগুণে
কালিদাস পণ্ডিত প্রভৃতি।
ব্রহ্মময়ী সরস্বতী আমি অতি মূঢ়মতি
দয়া কর অধমের প্রতি ॥

এই বলে মা বাগ্বাদিনীর বন্দনা শেষ করে কুঞ্জবাবু টপ্পার বিষয়বস্তু আলোচনা আরম্ভ করলেন—

আমি "হরি শর্মা" নামটি ধরি কারো নইকো মন্দকারী
ক্ষেত্র পুরী করলেম আগমন।
তুমি "ঠাকুর জগবন্ধু" দান কর কৃপা বিন্দু
শ্রীচরণে করি নিবেদন ॥
নন্দের নন্দন যিনি শচী সুত হয়ে তিনি
গৌররূপে গেলেন নদীয়ায়।
যিনি ছিলেন বলরাম নিত্যানন্দ ধরে নাম
হরিনাম জীবেরে বিলায় ॥
তোমরা হেথা ক্ষেত্রধাম জগবন্ধু বলরাম
নাম ধরে রয়েছে দু'জন।
কোন অংশ নদীয়ায় গেল কোন অংশ উড়িষ্যায় এলো
বল শুনি কৃষ্ণ কয়জন ॥
আর সুভদ্রা তোমার ভগ্নী রূপেতে জ্বলন্ত অগ্নি
অর্জুন তারে করে পরিণয়।
মরল তোমার ভগ্নীপতি তোমার ভগ্নী কেমন সতী
কেন তিনি শঙ্খ সিন্দুর লয় ॥

শুনতে মনে করে আশা তোমায় করলেম জিজ্ঞাসা
সত্য বল জগন্নাথ গোসাই।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করে এখন এক খান ধুয়া ধরে
আরও কিছু সভাতে জানাই।

দোহার ও বাদকগণ যারা এতক্ষণ এদিক ওদিক বিশ্রাম করছিল তারা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ জায়গায় এসে ঢোল, কাঁসী, হারমোনিয়াম, বেহালা, দোতারা ইত্যাদি নিয়ে তৈরী হয়ে বসল এবং প্রত্যেক পদের শেষে ধুয়ার পদটি পুনরাবৃত্তি করে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে সহায়তা করতে লাগল।

ধুয়া

=ব্রজের ভাব জাগিল আমার মনে=
সত্য করে তত্ত্ব কথা বল শুনি জগন্নাথ
কিসের তরে ক্ষেত্রপুরে বাজারে বিকায় ভাত।
যত ব্রাহ্মণ চণ্ডালে
তারা একত্রে মিলে
জাতিয়তা গিয়ে ভুলে—
অন্ন খায় প্রসাদ জ্ঞানে॥ ভাব জাগিল···
ইন্দ্রদ্যুম্ন তোমার শ্বশুর আঠার নালার ঘাটে,
বল শুনি কি কারণে আঠার পুত্র কাটে।
তোমার শ্বশুরের বংশ,
কেন করিলে ধ্বংস,
ছিল তার কি পাপের অংশ—
বংশ যায় কি কারণে॥ ভাব জাগিল···
কথার কথা লোকে বলে প্রবাদ আছে এই দেশে,
ঘর জামাইয়া শ্বশুর বাড়ী থাকে অধম পুরুষে।
তুমি হও পুরুষোত্তম,
কেন কার্যে ব্যতিক্রম,
তুমি প্রকৃত উত্তম না অধম—
সন্দেহ জাগে মনে॥ ভাব জাগিল···

এই ভাবে অন্ততঃ দেড় দুই ঘণ্টা ঐ ধুয়ার সঙ্গে নূতন নূতন পদ যোজনা

করলেন ; সে সব স্বকর্ণে না শুনলে লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। তারপরে ধুয়া শেষ করে পয়ার ছন্দে বলতে লাগলেন—

বেশী কথা বলে আমার নাহি প্রয়োজন।
পয়ার ছন্দে পাঁচার কথা করতেছি বর্ণন॥
জগবন্ধু বলে তোমায় বলে সর্বলোকে।
তোমার শ্বাশুড়ী তোমাকে কি বলিয়ে ডাকে॥
ভগ্নী বলে কয়না তোমায় বন্ধু বলে কয়।
তোমার সে শ্বাশুড়ী তো আর জগৎ ছাড়া নয়॥
দুই ভাইয়ের মাঝারে তোমার সুভদ্রা বোন থাকে।
নামের অর্থ মত কি সে বন্ধু বলে ডাকে॥
বিচার মত উচিত তোমায় বন্ধু বলে ডাকা।
নইলে রাঁড়ী বোনের হাতে কেন থাকে শাঁখা।
রাঁড়ীকে পরালে শাড়ী জগন্নাথ গোসাঁই!
এ কারণে বলবে তোমায় ভগ্নী ভাতারীর ভাই।
এই পর্যন্ত বলে আমার ভাব সাঙ্গ করি।
মনানন্দে সবে মিলে বল হরি হরি।

এই বলে পাঁচালী শেষ করে কুঞ্জবাবু দল নিয়ে বের হয়ে গেলেন।

কুঞ্জবাবুর মুখে ঐ সব ছন্দোবদ্ধ রসাল বক্তৃতা শুনে নকুলেশ্বরের আনন্দ ধরে না। কুঞ্জবাবুর পায়ে আত্মসমর্পণ করবার জন্য নকুলেশ্বর মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিলেন। এখন তাঁর মধুনিস্যন্দিত কাব্য সুধাস্বাদন করে কুঞ্জবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য তাঁর মনপ্রাণ নিতান্ত অধীর হয়ে উঠলো। কতক্ষণে তার সেই ধ্যানের মূর্তি জ্ঞানের ছবি কল্পনার গুরু শ্রীশ্রীকুঞ্জবাবুর পদতলে নিজেকে চিরতরে বিকিয়ে দিয়ে কৃতকৃতার্থ হতে পারবেন সেই সুযোগের অপেক্ষায় তৃষিত চাতকের মতো আসরে বসে রইলেন।

শরৎ বৈরাগীর দল আসরে এসে কনসার্ট দিতেই নকুলেশ্বরের সম্বিৎ ফিরে এলো। শরৎ বাবু উঠেই দুটি গায়িকা দাঁড় করিয়ে কুঞ্জবাবুর লহর টপ্পার জবাব দিতে লাগলেন। যথারীতি ঢোল, কাঁসী, হারমোনিয়াম, সানাই ইত্যাদি যোগে যন্ত্রসংগীতও চলতে লাগল :—

তুমি কৃতকর্ম "হরিশর্মা" করলে প্রণিপাত।

আমি জাতির কর্তা "জগন্নাথ"
আমার বাজারে বিকায় ভাত,
জাত কুলীনের মেরে জাত, করি আত্মসাৎ ॥
ব্রজের নন্দনন্দন মাধুর্যের ধন—
নদীয়ায় হয়েছেন শচীর নিমাই ;
যুগধর্ম হরিনাম দিতেছেন অবধূত নিতাই।
রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের তপস্যায়, ঠেকে ভক্তি সমস্যায়,
উড়িষ্যায় এসে কাল কাটাই।
আমি ঐশ্বর্যের ধন লক্ষ্মীকান্ত—
নারায়ণ হলেম জগন্নাথ গোঁসাই ॥
আর অর্জুন হয় নর নারায়ণ, নর দেহের হল মরণ,
নারায়ণ অংশের মরণ নাই।
তাইতে সুভদ্রা সধবা সাজে,
দুই পার্শ্বে আছি আমরা দুটি ভাই ॥

এই বলে টপ্পার লহরের জবাব শেষ করে শরৎ বৈরাগী ডাক-ধুয়া দিলেন :—

শর্মার বেটা বড্ড ঠেটা খোঁটা দিলি অকারণ।
আমি ভক্তের ভাবে স্বরূপ ধরি ভাবগ্রাহী জনার্দন ॥

দোহারপত্রে ঐ ধুয়াখানা চার পাঁচ বার গান করে শেষ করতেই শরৎবাবু ডাক ছড়ায় শক্তি বন্দনা আরম্ভ করলেন—সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গত থেমে গেল :—

ওমা কিঞ্চিৎ কর কৃপা ত্বং কালী কালোরূপা
কংকালী কপালী মালিকে।
কৈবল্য বিধায়িনী কৌমারী হে কল্যাণী
কল্যাণ দেহি মে কালীকে ॥
চণ্ডমুণ্ড দমনী চন্দ্রচূড় রমণী
চণ্ড নায়িকা চণ্ডীকে।
ভ্রমরী ভ্রমহরা অসিতে অসি ধরা
অমর আপদ খণ্ডকে ॥
হরি হীন দুর্গতি হের গো মা হৈমবতী
হিরম্বা হেরম্বা জননী।

অপর্ণা অন্নপূর্ণা তুমি হে হেমবর্ণা
হের মা হরিভক্তিদায়িনী ॥
কপু বপু নাশে বান্ধে মোহ পাশে
শক্র হাসে দশা দেখে।
ঠকেতে ঠকায় না দেখি উপায়
গেছি মা সঙ্কটে ঠেকে ॥
কি হবে তারিণী কলুষবারিণী
যন্ত্রণায় যায় প্রাণ।
ওমা দশভুজা দাসে করে পূজা
হৃদে হও অধিষ্ঠান ॥

মায়ের বন্দনা শেষ করে মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন শরৎবাবু—

"হরিশর্মা" নামটি ধরে এসেছ উড়িষ্যাপুরে
করজোড়ে করলে নিবেদন।
আমি নাকি "জগবন্ধু" দান করিয়ে কৃপাবিন্দু
করব তোমার বাসনা পূরণ ॥
নন্দ নন্দন কৃষ্ণ যিনি রাধাকান্তরূপে তিনি
খেলা করেন মধুর বৃন্দাবনে।
ব্রজলীলা পরিহরি গৌররূপে অবতরি
তিনি গেলেন নদীয়া ভুবনে ॥
বসুদেবের পুত্র যিনি বাসুদেব রূপে তিনি
লীলা করেছিলেন দ্বারকায়।
সেই লীলা করে শেষ নিম্ববৃক্ষে ক'রে প্রবেশ
বিষ্ণু আমি এলেম উড়িষ্যায় ॥
আঠার নালার ঘাটে আঠারটি পুত্র কেটে
ইন্দ্রদ্যুম্ন করিল সাধন।
তার সেই সাধনার তরে বিমলারে বিয়ে করে
জামাই হলেম আমি নারায়ণ ॥
জাতিয়তা নাশের জন্য বাজারেতে বিকায় অন্ন
প্রসাদজ্ঞানে যদি কেহ খায়।

দূরে যাবে শুচিস্পর্শ মুক্ত হবে ভারতবর্ষ
সেই আদর্শ দেখাই উড়িষ্যায় ॥
যে কয়টি প্রশ্ন ছিল তাহার জবাব হয়ে গেল
বেশী বলে নাহি প্রয়োজন।
এই পর্যন্ত করে ক্ষান্ত ধুয়ার ছন্দে মূল বৃত্তান্ত
আরও কিছু করতেছি বর্ণন ॥

কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে সঙ্গত এবং সহায়তা করার জন্য দোহারগণ এবং বাদকগণ প্রস্তুত হলো। শরৎবাবু ধুয়া দিলেন—

জাতকুলের কি গৌরব আছে—
জাতির কর্তা জগবন্ধু, সকল জাতের জাত মেরেছে ॥
একই মাটি একই জলে মানুষরূপে এই ভূতলে—
সবাই জন্মেছে।
মিছে জাতিয়তায় হয়ে অন্ধ
যত হিন্দুরা দ্বন্দ্ব করতেছে ॥ জাত কুলের কি...
তাইতে আমার ক্ষেত্রপুরে অন্ন বিকায় এই বাজারে—
বিচার না আছে।
ক্ষুদ্র চণ্ডালের দোকানের অন্ন—
ব্রাহ্মণে কিনে খেতেছে ॥ জাতকুলের কি...
উড়িষ্যায় প্রসাদের মান্য নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য—
নাম বিলাইতেছে।
মলিন কলির জীব উদ্ধারের জন্য
দুই প্রকারের বিধি আছে ॥ জাতকুলের কি...
নামে চিত্ত শুদ্ধ করে প্রসাদ খেলে ত্রিতাপ হরে
সর্ব পাপ ঘোচে।
তাইতে প্রসাদ খেয়ে পুরুষ মেয়ে
বোল হরি বোল বলে নাচে ॥ জাত কুলের কি...

বহুক্ষণ ধরে এইভাবে ধুয়ার ছন্দে গেয়ে নিজ বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করে অবশেষে শরৎবাবু পয়ার ছন্দে বলতে লাগলেন—

প্রথম বারে বেশী কথা বলে কার্য নাই।
এই পর্যন্ত এই পাঁচালী ক্ষান্ত করে যাই ॥

শর্মার বেটা দিয়ে খোঁটা আবার কিবা বলে।
পর আসরে উত্তর দিব শুনিবেন সকলে ॥
এই জগতের বন্ধু আমি জগৎবন্ধু নাম।
শাশুড়ী বন্ধু ডাকিলে হবে না দুর্নাম ॥
পিতার কাছে পুত্র বন্ধু ভগ্নীর বন্ধু ভাই।
বন্ধু শব্দে সুহৃদ বটে তাতে খোঁটা নাই ॥
নারায়ণ হয় আত্মারূপী অজ নিত্য ভবে।
সুভদ্রা সধবা আছে সেই আত্মার প্রভাবে ॥
ভাই-ভাতারী বলে তারে মিছে দিলি খোঁটা।
তোর কপালে লাগে যেন কুবরা জোলার ঝাঁটা ॥
এই পর্যন্ত আমি আমার ভাব সাঙ্গ করি।
মুসলমানে বলুন আল্লা, হিন্দু বলুন হরি ॥

এই প্রকার দীর্ঘ বারো ঘণ্টাব্যাপী তর্কবিতর্ক এবং মুখে মুখে বোল কাটাকাটি শুনে নকুলেশ্বর মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। সখী-সংবাদ, বিরহ, লহর কবি, জোটের পাল্লা ইত্যাদি কত গান, কত জবাব, কত রং ফুকার, কত উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। কত শ্লোক, কত শ্লেষ, কত প্রবাদ, কত ছড়া ও হেঁয়ালী যে ঐ বারো ঘণ্টা ধরে আলোচিত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। স্বয়ং আসরে উপস্থিত থেকে স্বকর্ণে না শুনলে কবিয়ালদের বাক্-পটুতা অনুধাবন অসম্ভব।

গুরু সন্নিধানে

বেলা বারোটার সময় গানের পাল্লা শেষ করে 'সরকার' (কবিয়াল) দুইজন দলবল সহ নিজ নিজ নৌকায় চলে গেলেন। নৌকা তো নয় যেন বিরাট এক একখানা ঘর। চব্বিশ পঁচিশ হাত লম্বা এবং সাত আট হাত চওড়া দুখানা 'বোট' নৌকা। প্রতি নৌকায় চার পাঁচ জন মাঝি, রান্নার ঠাকুর, চাকর, দোহার, বাদক ইত্যাদি সমেত কুড়ি বাইশ জন লোক। নৌকার দিকে তাকালে মনে হয় যেন কোন রাজা জমিদারের পান্‌সী বোট।

বালক নকুলেশ্বর নদীর ঘাটে গিয়ে ঐ সব কাণ্ডকারখানা দেখে তো হতবাক্। কোথায় রইল তার লেখাপড়া, কোথায় রইল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়া। সারা রাত এবং পর দিন বেলা বারোটা পর্যন্ত ঠায় বসে কবিগান

শোনার পর অনেকক্ষণ নদীর তীরে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কত লোক এলো গেলো, কত নৌকা ছাড়ল, কত নৌকা ভিড়ল, কত পাল উঠল, দাঁড় ছুটল, কত হাঁকাহাঁকি কত ডাকাডাকিতে নদীর তীর সরগরম। কিন্তু নকুলেশ্বরের কোন দিকে খেয়াল নেই। সারা রাত গানের আসরে বসে যে কুঞ্জ দত্ত মশাইকে কল্পনায় গুরুপদে বরণ করে মানস পটে অঙ্কিত করেছিলেন এখন তাঁর নিকটে যেতে যেন আতঙ্কে তার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। নদীর পারে প্রখর রৌদ্র মাথায় করে কুঞ্জবাবুর নৌকার দিকে তাকিয়ে তিনি বসে ছিলেন।

এমন সময় কুঞ্জ বাবুর দলের একটি বর্ষিয়সী গায়িকা—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে—নাম তার অধরমণি, নকুলেশ্বরকে ঐভাবে রোদে নৌকার সামনে বসে থাকতে দেখে মনে হয় তার দয়া ও ঔৎসুক্যের উদ্রেক হল। তিনি নৌকা থেকে নেমে কাছে এসে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—কে বাবা তুমি, কি চাও? এই রোদে এখানে বসে আছ কেন?

অধরমণির স্নেহঢালা কণ্ঠে এই প্রশ্ন শুনে নকুলেশ্বরের ভীত ও হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হলো। তিনি কাতর ও সানুনয় কণ্ঠে বললেন—মা! আমি আপনাদের দলপতি দত্ত বাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। আপনি কি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন?

বলা মাত্রই অধরমণি বললেন—'এসো বাবা এসো। এই জন্য এই রোদে বসে আছ। এসো আমার সঙ্গে, তোমার কোন ভয় নেই।' এই বলে তিনি নকুলেশ্বরকে হাত ধরে নৌকায় তুলে নিলেন।

কুঞ্জবাবু বারো ঘণ্টা শারীরিক ও মানসিক খাটুনির পর নৌকায় এসে বিশ্রাম করছিলেন। অধরমণি নকুলেশ্বরকে নিয়ে দত্ত মশাইর খাস কামরায় যেতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে অধর, কাকে নিয়ে এলি; কে এ ছেলেটি?

অধরমণি বললেন—ছেলেটি কে তা জানিনা, তবে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নদীর তীরে বসেছিল। নৌকায় আসতে সাহস পায়নি। তাই আমি নিয়ে এসেছি।

লোকে বলে ক্ষণে লগ্নে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা সাক্ষাৎ হয়। কুঞ্জ বাবুর সঙ্গে নকুলেশ্বরের দেখা বোধ হয় মাহেন্দ্র ক্ষণেই হয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি আজো তাই ভাবেন। যা হোক নকুলেশ্বরকে সস্নেহে কাছে

ডেকে হাসি মুখে দত্ত বাবু বললেন—এসো বাবা! ভয় কি! কি নাম তোমার? কি চাও?

নকুলেশ্বর বিনীত ভাবে ভয়ে ভয়ে বললেন—আমার নাম নকুলেশ্বর। আমি আপনার কাছে কবির সরকারী শিক্ষা করব। দয়া করে আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন কি? আমি কায়স্থের ছেলে; শুনেছি আপনিও কায়স্থ। তাই আপনার কাছে এসেছি।

একটি অপরিণতবুদ্ধি বালকের মুখে এ রকম কথা শুনে কুঞ্জ দত্ত মশাই একটু অবাক হলেন। তবু উষ্মা ও কৌতূহল দমন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা বাবা আছেন কি? তাদের মত নিয়ে এসেছ?

নকুলেশ্বর বললেন—হ্যাঁ আছে, তাদের মত নিয়ে আমি আসি নি। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনাদের কবিগান শুনে আমি লেখাপড়ার কথা ভুলে গেছি। কবি গান শিখবার জন্য মনে মনে আপনাকে গুরুপদে বরণ করেছি। আমাকে নিরাশ করবেন না।

যে মেয়েটি নকুলেশ্বরকে নৌকায় নিয়ে এসেছিলেন সেই অধরমণি নকুলেশ্বরের সরল প্রাণের কাতর প্রার্থনা শুনে দত্ত বাবুকে বললো—'বেশ তো! রাখুন না এ ছেলেটিকে। আপনার ত কোন ছেলে মেয়ে নেই। এই ছেলেটিও কায়স্থ, শিষ্য-পুত্র হিসেবে আপনি একে পালন করুন। আমার মনে হয় ছেলেটি আপনার নাম রাখতে পারবে। বিশেষতঃ স্বজাতির ছেলে অসুখে বিসুখে মুখে একটু জলও দিতে পারবে' ইত্যাদি অনেক কথা বলে দত্ত বাবুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে লাগলেন।

অধরমণির কথা শুনে দত্ত বাবু যেন কি চিন্তা করলেন এবং ক্ষণেক পরে বললেন—'কবিগানের উপর তোমার এমন নেশা কেন? কবি গান সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে কি?

নকুলেশ্বর বললেন—না, তেমন ধারণা আমার কিছু নেই; তবে আপনাদের উপস্থিত বক্তৃতার ঐ মিল গুলি আমার বেশ ভালো লাগে।

কুঞ্জ দত্ত মশাই তখন জিজ্ঞা[illegible] করলেন—[illegible] কথার পৃষ্ঠে কথার মিল দিতে পারো?

নকুলেশ্বর বললেন—হ্যাঁ, [illegible]টা দিতে পারি। কি[illegible]ন পূর্বে অন্য দুই কবিয়ালের (নিবারণ সরকা[illegible] ও কুসুমকুমারী) গান [illegible]ছিলাম। তাদের
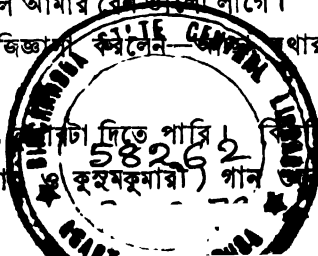
মুখে কথার পৃষ্ঠে কথার মিল শুনে আমি সেদিন থেকে চেষ্টা করে করে মিলযুক্ত পদ রচনা করতে শিখেছি।

দত্ত বাবু পরীক্ষাচ্ছলে বললেন—আমি যদি বলি 'নষ্ট' তুমি কি বলবে? নকুলেশ্বর বললেন—দুষ্ট, মিষ্ট, ইষ্ট, কষ্ট।

দত্ত বাবু—যদি বলি 'বঙ্গ' তুমি কি কি বলবে?

নকুলেশ্বর—সঙ্গ, রঙ্গ, অঙ্গ, ভঙ্গ।

এই ভাবে কুঞ্জ দত্ত মশাই কিছু সময় প্রশ্ন করে নকুলেশ্বরের নির্ভিক মনের সরল উত্তর পেয়ে খুব খুসী হয়ে বললেন—এখান থেকে তোমার বাড়ী কত দূর?

—পাঁচ মাইল পশ্চিমে আমাদের বাড়ী নৌকায় যাওয়া যায়।

—আমি তোমাদের বাড়ী যাব। তোমার মা বাবার অনুমতি না নিয়ে তোমাকে আমি নিতে পারিনা।

—তাঁরা কিছুতেই আমাকে আসতে দেবেন না। তাঁদের কাছে গেলে সকল আশা বিফল হবে। আমি ঘরে যাব না; আপনার সঙ্গেই এখানে থেকে যাব।

দত্তবাবু নকুলেশ্বরের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—তুমি কোন চিন্তা করোনা। আমি তোমাকে কথা দিলাম, যে ভাবে হোক আমি তোমার মা বাবাকে বলে তাঁদের মত করিয়ে তোমাকে আমার দলে নিয়ে যাব।

এই বলে তিনি রান্নার ঠাকুরকে ডেকে বললেন—এই ছেলেটির স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দাও; যেন কোন অসুবিধা না হয়।

স্নানাহার শেষ করে নকুলেশ্বর বিশ্রাম করলেন। অপরাহ্ণ চারটার সময় কুঞ্জদত্ত মশাই দলের ম্যানেজার কেশবলাল দত্তকে বললেন—তুমি দল নিয়েঝাল-কাঠি চলে যাও। আমি এই ছেলেটিকে নিয়ে আগামী দিন বাসায় পৌঁছব।

মাতার আশীর্বাদ

দত্তমশাই একখানি ছোট ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া করে নকুলেশ্বরকে নিয়ে রওনা হয়ে সন্ধ্যার পরে চণ্ডীপুর গ্রামে নকুলেশ্বরের বাড়ী গিয়ে পৌঁছালেন। নকুলেশ্বর বাড়ী গিয়েই পরমোৎসাহে তাঁর মাকে বললেন—মা দেখ আমি কাকে নিয়ে এসেছি।

মাতাঠাকুরানী দত্তবাবুকে দেখে নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ইনি কে বাবা ?

—তুমি জান না। ইনি একজন বিখ্যাত কবির সরকার। কি সুন্দর গান করেন, পাঁচালি বলেন তা তুমি না শুনলে বিশ্বাস করবে না। আমি এঁর সঙ্গে কবির দলে যাব। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি কবি হতে পারি। বাধা দিওনা ; আর দিলেও আমি শুনবনা। আজই যাব, তোমার পায়ে পড়ি মা অনুমতি দাও।

নকুলেশ্বর একদমে এই ভাবে প্রলাপ রোগীর মত অনর্গল কথা বলতে লাগলেন। একে তো মা ছেলেকে বাড়ী থেকে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য যাত্রা করে যাবার দুদিন পরেই একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়েছিলেন। তার উপর তার মুখে এইসব কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তিনি ছেলেকে সস্নেহে তিরস্কার করে বললেন—বলিস্ কি হতভাগা! বড় স্কুলে ভর্তি হবি ; লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি—তা তোর ভাল লাগলনা ; তুই যাবি কবির দলে ? ছিঃ ছিঃ বাবা! ও কথা কি বলতে আছে, না ভাবতে আছে ?

নকুলেশ্বর নাছোড়বান্দা, দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য। মরিয়া হয়ে মাকে বলতে লাগলেন—তুমি মনে করেছ লেখাপড়া শিখলেই বুঝি মানুষ হওয়া যায়! আর মানুষ হবার বুঝি কোন উপায় নেই! তুমি দেখে নিও মা! আমি যে বিদ্যা শিক্ষা করতে যাচ্ছি, তোমার আশীর্বাদ থাকলে এ বিদ্যার দ্বারা মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারব। তুমি শীঘ্র আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে দাও। আমরা এখনই রওনা হব।

মা কত রকম কত কথা বললেন, কত বোঝালেন, কত উপদেশ দিলেন। কিন্তু সবই বৃথা। কিছুতেই নকুলেশ্বরের মন ফেরাতে পারলেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে এবং ছেলের প্রাথমিক ঝোঁক কাটাতে বললেন—কোন শুভ কাজে যেতে হলে একটা ভাল দিন দেখে যাত্রা করতে হয়। যদি একান্তই যেতে চাস, তবে আজ নয়, একটা ভাল দিন ক্ষণ দেখে যাবি।

নকুলেশ্বরের, যাকে বলে বরিশাইল্যা গোঁ। কিছুতেই তাঁর মত এবং পথ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়। তাঁর সাহস বেড়ে গেছে, মুখ খুলে গেছে। কারণ তিনি জানেন আজ কুঞ্জবাবুর সঙ্গে বেরুতে না পারলে আর কোন দিন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। একটার পর একটা বাগড়া দিয়ে তাঁর কবি-জীবন

অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবে। তাই মায়ের মন জয় করতে, তাঁর যুক্তিজাল ছিন্ন করতে তিনি শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন—মা, দিন-ক্ষণ শুভ-অশুভ মানুষের মনেই সব, পঞ্জিকার পাতায় নয়। যেখানে তুমি আমার গর্ভদাত্রী মূর্তিমতী দেবীপ্রতিমা বর্তমান; যেখানে আমার ধ্যানের জ্ঞানের ও কল্পনার গুরু উপস্থিত, সেখানে আমার আর কোন শুভ দিনের জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। এই আমার মাহেন্দ্র সুযোগ।

জননী দেখলেন কোন উপদেশেই যখন ফল হলো না, তিনি তাঁদের খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আহারান্তে মাতাঠাকুরানী দত্তবাবুর হাতে হাতে নকুলেশ্বরকে সঁপে দিয়ে বললেন—এই ছেলে আজ হতে আর আমার নয়। আপনার ছেলে মনে করে একে প্রতিপালন করবেন। আমি মঙ্গলময় ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি ও যেন মানুষের মত মানুষ হয়ে আপনার নাম রক্ষা করতে পারে। আজ হতে আপনিই ওর পিতা।

দত্তবাবু বললেন—আপনি এ ছেলের জন্য চিন্তা করবেন না। আমি নিঃসন্তান। আপনার এই ছেলেকে আমি পুত্র নির্বিশেষে পালন করব। আশা করি এই ছেলে পিতৃ বংশের মুখোজ্জ্বল করবে।

নকুলেশ্বর মাকে প্রণাম করলেন। মাতা তার মস্তকে মুখামৃত দিলেন। বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দন্তে কেটে বললেন—দীর্ঘজীবি হও, যশস্বী হও, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক।

গৃহদেবতা ৺শ্রীশ্রীকালীমাতাকে প্রণাম করে দত্তবাবুর সঙ্গে নকুলেশ্বর যখন এসে নৌকায় উঠলেন রাত তখন একটা। সেদিন কি তিথি, কোন্ নক্ষত্র, কোন্ পক্ষ নকুলেশ্বর সেদিকে লক্ষ্য না করে উন্মাদের মত কোন এক অজানা পথের সন্ধানে যাত্রা করলেন।

কবি-কেন্দ্র ঝালকাঠি

চণ্ডীপুর থেকে নৌকা খুলে ঝালকাঠি পৌছতে রাত ভোর হয়ে গেল। নবীন উষার অরুণ আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত, এমন সময় ঝালকাঠি ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে নৌকা ভিড়ল। চার পাঁচ ঘণ্টা রাতে নৌকায় অতিবাহিত হয়েছে বটে, নকুলেশ্বরের চোখে কিন্তু বিন্দুমাত্র ঘুম ছিল না। সারারাত পথে পথে তাঁর মনটা যেন কি এক আশা নিরাশার দোলনায় দুলছিল। নৌকা ঘাটে ভিড়তেই তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো। সতের বছর পর্যন্ত কত প্রভাত সে চোখে দেখেছে

কিন্তু সেদিনের সেই প্রভাত তার কাছে যেন প্রকৃতই সুপ্রভাত বলে মনে হলো।

নকুলেশ্বর আর কোন দিন ঝালকাঠি আসেন নি। এই বন্দরে এই তাঁর প্রথম আসা। তাঁর কাছে সবই যেন নূতন; রাস্তা ঘাট লোক জন কারো সঙ্গেই তার পরিচয় নেই। পরিচয়ের মধ্যে আছে তার ধ্যানের মূরতি, জ্ঞানের গুরু এই কুঞ্জবাবু। তাঁর সঙ্গে নকুলেশ্বর তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্র সেই পূর্ব-পরিচিতা জননীসমা অধরমণির সঙ্গে দেখা। হাসিমুখে তিনি নকুলেশ্বরকে আদর করে বললেন—'এসেছ বাবা! বেশ। বেশ! ভালই হলো। তুমি আমাদের দলে থাকবে। দত্তবাবুকে বাবা বলে ডেকো। তিনি তোমাকে খুব ভালবাসবেন; ভাল করে শিক্ষা দেবেন। তুমি ভাল কবি হবে, মানুষের মত মানুষ হবে' ইত্যাদি বহু কথা বলে তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

দুই দিন পরে দত্তবাবু একখানা গানের বই দিয়ে নকুলেশ্বরকে বললেন—এই গানগুলি সব মুখস্থ করো। গানের আসরে যেন বই না দেখে দোহারদের বলে দিতে পার।

গুরুর চরণে প্রণাম করে নকুলেশ্বর ভক্তি সহকারে বইখানি গ্রহণ করলেন বটে; কিন্তু ছন্দ ঠিক করে পড়তে তাঁর খুব অসুবিধা হল। কারণ কবিগানের কয়েকটি কলি বা ভাগ আছে, যথা—প্রথম চিতান, পারণ, ফুকার, মিল, মুখ, ডাইনা, খোঁচ, অন্তরা, পরচিতান, পারণ ও শেষ ফুকার, মিল ইত্যাদি এই বারো ভাগে গানগুলি বিভক্ত। কোন্ অংশের পর কোন্ অংশ পড়তে হয় এবং কোন্ অংশের সুর কি প্রকার তা বুঝতে এবং জানতে দু'তিন দিন কেটে গেল। যা হোক কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করে নকুলেশ্বর গানগুলি মুখস্থ করলেন।

সে বছর আশ্বিন মাসের শেষভাগে দুর্গাপূজা। নোয়াখালী জিলার দালাল বাজার নামক গ্রামে যদুবাবুর বাড়ীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে কুঞ্জবাবুর দলের বায়না হয়েছে। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন ঝালকাঠির সব কবির দলের পত্তন হতো। কার দলে কোন্ কোন্ গায়ক গায়িকা থাকবে, পুরাতন দল ছেড়ে কে গেলো, নূতন দলে কে এলো—সব স্থির করে ঐ দিন বায়নাপত্র করা হতো। অনেকটা বর্তমানে কলকাতা গড়ের মাঠে ফুটবল খেলোয়াড়দের বা চিৎপুরের যাত্রা পাড়ায় দল ছাড়াছাড়ি বা ক্লাব পরিবর্তনের মত আর কি!

বরিশাল জেলার ঝালকাঠি বন্দরটাই ছিল গান বাজনার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। সাত আটটি কবির দল, যথা—কুঞ্জ দত্ত, শরৎ বৈরাগী, উমেশ শীল, যামিনী

সরকার, বড় মনোমোহিনী, ভারত শীল, বিধু দে, কুসুমকুমারী, অম্বিকা পাটুনী, ষষ্ঠী সরকার প্রমুখ নামজাদা কবিয়ালগণ সকলেই রথযাত্রার দিন দল গঠন করতেন। অগ্রিম দাদন দিয়ে দুর্গাপূজার ষষ্ঠী থেকে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চুক্তিপত্র রেজেষ্ট্রী হতো। কবির দল ছাড়াও চার পাঁচটি বড় বড় যাত্রার দল, আলাম-আকুব্বরের জারির দল, রামায়ণ গানের দল, কীর্তনের দল, ভাসান যাত্রা, গাজীর দল ইত্যাদি বিভিন্ন সঙ্গীতের দল মিলে ঐ সময় ঝালকাঠি বন্দরটা যেন এক গন্ধর্ব পুরীতে পরিণত হতো!

নোয়াখালীর পথে

পূজার আট দশদিন পূর্বে সব দল একত্র হয়ে ঢাকা অভিমুখে রওনা হতো। পথে পথে চলতো নূতন নূতন গানের তালিম দেওয়া নেওয়া। এ বছর কুঞ্জবাবুর দল ঢাকা যাবে ; কারণ পূজায় তাঁর দলের বায়না হয়েছে নোয়াখালী জেলায়। পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে তিনি নোয়াখালীর পথ ধরবেন। পদ্মার পাড়ে গঙ্গানগর বাজার থেকে মা পদ্মার জন্য নূতন কাপড়, শাঁখা, সিন্দুর, নারকেল, মিষ্টি, ধূপধুনা ইত্যাদি সহ দত্তবাবুর নৌকা পদ্মার কূলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝি মাল্লারা মাস্তুল, বাদাম, বৈঠা সব ঠিকঠাক করে পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত। নকুলেশ্বর নদীর বিশাল ব্যাপ্তি ও ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে ভয়ে কাঁদতে সুরু করলেন। কারণ ভাদ্র আশ্বিন মাসে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ খরস্রোতা পদ্মা-নদীর যে কি ভীষণ রূপ, প্রত্যক্ষদর্শী বা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে তা উপলব্ধি করতে পারবেনা। দত্তবাবু নকুলেশ্বরকে কোলের কাছে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন—ভয় কি! মা গঙ্গাকে ডাক ; মা কোলে করে পার করে দেবেন।

'গঙ্গা প্রীতে হরি হরি বল' বলে নৌকা খুলে দেওয়া হল। কুঞ্জবাবু দোহারপত্রকে ভবানী বিষয়ক গান করতে বললেন। তাঁর আদেশে নকুলেশ্বর গানের বই দেখে গান বলে দিতে লাগলেন। মাঝিরা বাদাম (পাল) তুলে দিয়ে বদরগাজীর নাম নিয়ে বৈঠা ধরে বসে আছে। তাদের যেন করণীয় আর কিছু নেই, যা করেন ভগবান—এই ভাব। দোহারপত্র মায়ের বন্দনা গান গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সকলেই যেন ভগবানের পা'য় আত্মসমর্পণ করে তন্ময় হয়ে গিয়েছে, তদ্গতচিত্তে গাইছে—

চিতান—এসে কর্মক্রমে কর্মভূমে কত জন্ম লই।
পেয়ে দুর্লভ জনম মনুষ্য দেহ—
মাগো মা মানুষের কর্ম হ'ল কই ॥
ফুকার—আমি শিখলাম এক কবির ব্যবসা,
বারো মাস নৌকাতে বাসা,
গ্রীষ্ম বরষা সবই একভাবে,
এরূপ আর কত কাল যাবে, মাগো—
মেঘনা পদ্মা ধলেশ্বরী,
কত নদী দিলেম পাড়ি,
ভব-সমুদ্রে তুফান ভারি,
এখন শেষ পাড়ির কি হবে ॥
ছাড়—বেয়ে কবির তরী, তরীর কথা পড়েছে মনে,
কিন্তু বঞ্চিত হলেম সঞ্চিত ধনে,
পঞ্চভূতের বেগার খেটে।
ধুয়া—পার কর পার কর তারা ;
কেঁদে হলেম সারা—
সারা ভব সমুদ্রের ঘাটে ॥
ডাইনা—দেহতরী জীর্ণজরা,
তাইতে অসৎ কর্মের বোঝা ভরা,
দাঁড়ি মাঝি সবই আমার বোকা।
যত গুণের পথ ফুরায়ে গিয়েছে—
খাড়ির মুখ ঠেকেছে নৌকা ॥
বসন্তকে বসাও হাইলে,
তাঁর কৃপা বাতাসের বলে,
পার হয়ে যাই এ সঙ্কটে।
খাদ—মা বিনে সন্তানের দুঃখ মা—
আমি জানাই কার নিকটে ॥
ফুকার—নৌকার কাঠ ছিল সব বাহাদুরী,
ঘুচলো কাঠের বাহাদুরী,
অনাচারী লোনা জলে বেয়ে ;

লোনায় কাঠ গিয়েছে খেয়ে, মাগো—
বাইন ছুটে উঠেছে বারি,
এ বারি কিসে নিবারি,
কেমন করে ধরব পাড়ি—
এমন ভগ্ন তরী নিয়ে ॥

ছাড়—এখন পাড়ির কথা মনে পড়ে কাঁদি অবিশ্রাম,
আবার ভাঙ্গা মাস্তল ছিঁড়া বাদাম,
পালগুরার জোর নাই গো মোটে;

অন্তরা—ভব সমুদ্রে তুফান ভারি, আমার জীর্ণ তরী,
পাড়ির বড় ভয় গো মা ॥
একে বেলা অবসান, দখিনা তুফান;
প্রাণ কাঁপে অতিশয় গো মা ॥
যত মহাজনের তরী, গেয়ে নামের সারি,
পাড়ি দিল সুসময় গো মা ॥
আমি বহুদিন প্রবাসে, কাঁদি হা হুতাশে,
দেশে যেতে মন লয় গো মা ॥

পরচিতান—আমি সন্ধ্যা কালে নৌকা খুলে হয়েছি অবাক।
দারুণ ঢেউ দেখে মা ঝরছে আঁখি—
মা গো মা, তাইতো দেখি, ত্রিবেণীর ত্রিবাঁক ॥

ফুকার—আমি বিদেশে বাণিজ্যে এসে,
বিদেশে বিদেশীর বেশে,
এত ক্লেশে আর কত দিন রব,
দুঃখ কার কাছে জানাবো, মাগো—
দাঁড়ায়ে সমুদ্রের কূলে,
ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে,
পার করে দাও মায়ের ছেলে—
আমি মায়ের কোলে যাব ॥

সকাল পাঁচটায় পাড়ি ধরা হয়েছে। বেলা এগারটায় নদীর মাঝখানে নৌকা পৌছতেই গঙ্গা মায়ের পূজার সামগ্রী সব মা গঙ্গার নাম নিয়ে নদীতে ছেড়ে দেওয়া হলো। অপরাহ্ণ চারটায় নৌকা গিয়ে লোহজং বাজার ঘাটে ভিড়তে

যেন সকলের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হলো। সারাটা দিনের মধ্যে কারো যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না। পদ্মার দিকে চেয়ে চেয়ে, ঢেউয়ের পর ঢেউ গুণে, গান গেয়ে গেয়ে সময় কোন্ ফাঁক দিয়ে যে অতিবাহিত হয়েছে সেদিকে কারো খেয়াল ছিলনা।

নৌকা কূলে ভিড়তেই অমনি হাঁড়ি কড়াই নিয়ে রান্নার ঠাকুর চাকর সব নীচে নেমে গেল এবং বাজার করে এনে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল। পদ্মা পাড়ি দিয়ে পদ্মার ইলিশ মাছ কেনার নিয়ম আছে। দামও সস্তা। খুব বড় পাঁচটি ইলিশ মাছ দশ আনায় কেনা হলো। বেশী জেলে ডিঙ্গি ঘাটে ছিল না বলে মাছের দাম একটু চড়াই হয়েছে। রাত দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করে খালের ভিতর নৌকা নিয়ে নোঙ্গর করে সকলে বিশ্রাম করলেন।

ভোর হতে না হতেই মাঝিরা "বদরগাজি বদর বদর" বলে নোঙ্গর তুলে নৌকা খুলে দিল। দ্বিগুন্টি বাদাম তুলে দিয়ে হাল ধরে মাঝিরা ভাটিয়ালী গান ধরল—

হারে ও অজানা দেশের নাইয়া—
উজান গাঙে বেয়ে নাও, কোথায় যাও আজ—
ভাইটালী গান গাইয়া।
ও তোর গানের সুরে আকুল করে—
আসি উন্মাদিনী হইযা॥
শুনে তোমার ভাটিয়ালী গান—
সুরের তানে উদাস করে আমার মনপ্রাণ।
মন-যমুনা বহে উজান, সুরের পরশ পাইয়া—
তাইতে ঘরের বাহির হইয়ে আসি,
কুলমান হারাইয়া॥
একে তো এই অশান্ত নদী,
তার উপরে দ্বিগুণ পবন হয় প্রতিবাদী।
অবশ হইয়ে পড় যদি তরঙ্গ দেখিয়া—
"তখন" কে তোমারে নিবে কোলে
প্রাণে ব্যথা পাইয়া॥
নেয়ে তোমার ধরি দুটি পায়,
তরঙ্গে বেওনা তরী, লাগাও কিনারায়।

ঐ তরীতে তুলে আমায় সঙ্গে যাওনা লইয়া—
আমি তোমার সঙ্গে ঘর বান্ধিব—
অ'চিন দেশে যাইয়া ॥

মাঝিদের গানের সুরে সুরের পাগল চঞ্চলমতি নকুলেশ্বরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নকুলেশ্বর নৌকার ছাদে উঠে মাঝিদের কাছে বসে তাদের মুখে প্রাণখোলা ভাটিয়ালী গান শুনতে শুনতে মনে মনে যেন কোন এক অজানা দেশের চিত্র অঙ্কন করতে লাগলেন। মাঝিমাল্লাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দুর্গাষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পূর্বে কুঞ্জবাবুর পান্‌সী নৌকাখানি গিয়ে দালাল বাজারের ঘাটে ভিড়ল।

দালালবাজার জমিদার বাড়ী

বাজারটি যদিও জমিদার বাবুর দরজায়, কিন্তু বাবুর বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব দেড় মাইল। রাস্তার দুই ধারে আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি রসাল বৃক্ষের সারি। রাস্তার দৃশ্যটি মনোরম বটে, কিন্তু কাঁচা রাস্তা ; বর্ষার শেষ শরতের প্রথম। কাজেই রাস্তার কাদা এখনো শুকায় নি। এমতাবস্থায় দলের লোকজন গায়কগায়িকাগণ কিভাবে বাবুর বাড়ী পৌঁছবে! লোক মারফত জমিদার বাবুর কাছে সংবাদ দেওয়া হল। সংবাদ পেয়ে যদুবাবু সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন।

বাবুর দু'টি হাতী ছিল—মণ্টু ও বীরবল। সেই হাতীর পিঠে করে কবিগানের দলকে নৌকা ঘাট থেকে জমিদার বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য মাহুতকে নির্দেশ দিলেন।

সন্ধ্যার খানিক পরেই 'মণ্টু' আর 'বীরবল'কে নিয়ে মাহুত এসে কুঞ্জবাবুর নৌকার সামনে উপস্থিত হয়ে বললো—আপনারা প্রস্তুত হয়ে আসুন ; এই হাতীর পিঠে যেতে হবে।

মাহুতের কথা শুনে অন্যান্য সকলে একটু জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। —"বাপ্‌রে বাপ্‌ হাতীর পিঠে ত চৌদ্দ পুরুষেও চাপিনি। বাবা! শেষকালে এই জানোয়ারের পিঠে উঠে কি জন্মের মত কবিগানের শ্রাদ্ধ করব ?" কেউ বলেন—"কোন কোন হাতি নাকি পিঠে সওয়ার নিয়ে চিৎ হয়ে ডিগ্‌বাজী খায় ইত্যাদি।" যে যার মত প্রকাশ করছে কিন্তু নকুলেশ্বরের আর তর সইছে না। হাতীর পিঠে চড়ার ভাবী আনন্দে অধীর হয়ে গুরুদেবের কাছে গিয়ে

অনুমতি প্রার্থনা করলেন। দত্তবাবু হাসতে হাসতে বললেন—হাতীর পিঠে উঠতে তোমার ভয় করে না?

নকুলেশ্বর—ভয় যে করে না তা নয়, তবে এই হাতীর পিঠে চড়ার আনন্দ অনুভব করার সুযোগটা তো আর সব সময় পাব না। ভয় পেয়ে যদি আজ না উঠি তবে তো আর জীবনে হাতী চড়া শিক্ষা হবে না।

কুঞ্জবাবু—বেশ, বেশ! সব রকম শিক্ষার প্রতি যেন এরূপ আগ্রহ থাকে।

অন্যান্য গায়কগায়িকা যারা একটু ভয় করছিল, নকুলেশ্বরের আগ্রহ এবং সাহস দেখে সকলেই হাতী চড়ে যেতে রাজী হলো। নকুলেশ্বর তাঁর গুরুর প্রদত্ত সেই গানের বইখানি সঙ্গে নিয়ে হাতীর কাছে গিয়ে মাহুতকে বললেন—কি করে উঠবো। তোমার মই (সিঁড়ি) কোথায়? মাহুত বলল—সিঁড়ি ওর কাছেই আছে, আসুন! এই বলে এক রকম দুর্বোধ্য কথা ও শব্দোচ্চারণ করে হাতীর মাথায় টোকা দিল। গজরাজ বীরবল অমনি সম্মুখের দুই পা ভেঙ্গে বসে পড়ল এবং তার প্রকাণ্ড শুঁড়টাকে থাকে থাকে তিন চার ভাঁজ করে সিঁড়ি প্রস্তুত করল। মাহুতের হাতে ভর করে নকুলেশ্বর সকলের আগে গিয়ে ঐ শুঁড়ের সিঁড়ি বেয়ে হাতীর পিঠে উঠে গদীতে বসে পড়লেন। তা দেখে অন্য সকলে একে একে উঠে বসল।

শারদীয় শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীরাতে চাঁদের আলোতে দুই পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি শোভিত ও তার পাশে জলপূর্ণ ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে। সে পথ ধরে গজরাজদ্বয় ধীরমন্থর গতিতে হেলেদুলে বাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলেছে। কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে এমন দোলা দিচ্ছে যেন সকলে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন দোলায় ঝুলছে। সন্ধ্যা আটটা নাগাদ সকলকে নিয়ে বীরবল ও মণ্টু যদুবাবুর বৈঠকখানায় নামিয়ে দিল।

জমিদার বাবুর বৈঠকখানাটি দালান নয়। শালের খুঁটি ও মুলী বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী একখানা ঘর। তবে সে ঘরখানার বিশেষত্ব এই যে, এবর তৈরীতে জমিদার বাবু যে অর্থ ব্যয় করেছেন সে অর্থের দ্বারা দু'টি দালান করতে পারতেন।

বিরাট বিরাট গোটা শালগাছের খুঁটি। তার উপরে মুলী বাঁশের বেড়া। এক একখানি বেড়া যেন এক একটি থিয়েটারের 'সিন'। কোন সিনে রাম রাবণের যুদ্ধ; কোন সিনে জটায়ুর পক্ষচ্ছেদন। কোন সিনে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ আবার কোন সিনে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন। এ ছাড়াও অসংখ্য ফল

ফুলের, বৃক্ষ ও পশু পাখীর চিত্র অঙ্কিত। তবে এসব চিত্র রঙ, তুলিতে আঁকা নয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রঙ, করা বাঁশের চটা দ্বারা গ্রাম্য কারুশিল্পীর হাতের ও বেতের কাজ। ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামের গ্রাম্য ঘরামী শিল্পীরা বাঁশ, বেত ও হাতের সাহায্যে এমন সব প্রাণবন্ত নিখুঁত ছবি অঙ্কিত করতে পারে যে প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্য কেহ বিশ্বাস করতেই পারবে না। অন্যান্য কবিয়ালদের এসব শিল্প ও চিত্রদর্শন অনেকবার ঘটেছে; কিন্তু সতের বছরের বালক নকুলেশ্বরের চোখে এগুলির এই প্রথম দর্শন। ঘরখানির মধ্যে শত শত নানা রঙের কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন পরিশোভিত। দেখে শুনে নকুলেশ্বরের যেন ইন্দ্রের অমরাপুরী বলে মনে হতে লাগল।

এই ঘরের অন্য কামরায় বিপক্ষদলের কবি ফরিদপুর জিলার ওলপুর নিবাসী মনোহর সরকার মহাশয়ের থাকবার জায়গা হয়েছে। কবিগান উপলক্ষ করে একবাড়ীতে নোয়াখালী, বরিশাল ও ফরিদপুর জিলার কবিপ্রাণ ব্যক্তিদের একত্র সম্মিলন হয়েছে যেন! মনোহর সরকার মহাশয়ের দলের সকলে তাঁকে রাঙ্গাকর্তা বলে ডাকে। রাঙ্গাকর্তাকে দেখবার জন্য নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কুঞ্জবাবু বললেন—'বেশ তো, যাও না! তিনি একজন বিখ্যাত কবিয়াল। ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করে ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলো।'

নকুলেশ্বর সেই ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন যেন বিশ্বামিত্র মুনি যোগাসনে বসে আছেন। মাথায় লম্বা চুল কটি পর্যন্ত বিলম্বিত; মুখভরা দাড়ি, গৌর বর্ণ স্বাস্থ্যবান চেহারা। দেখলেই যেন মুনি-ঋষি বলে মনে হয়। তাঁর শিষ্য সাকরেদরা কেহবা হাওয়া দিচ্ছে, কেহবা পা টিপে দিচ্ছে, আবার কেহ চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। নকুলেশ্বর কাছে গিয়ে শির লুটিয়ে প্রণাম করে পদধূলি গ্রহণ করে নিকটে বসলেন। মনোহর সরকার মহাশয় নকুলেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—দিগ্বিজয়ী হও। তারপর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

নকুলেশ্বর বললেন—আমি শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ কুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এসেছি। আশীর্বাদ করুন যেন গুরুকৃপা লাভ হয়। মনোহর সরকার মহাশয় হঠাৎ কি মনে করে নকুলেশ্বরের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে হস্তরেখা বিচার করে বললেন—নম্রতা রেখো; উন্নতি হবে।

কতক্ষণ পরে কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে ডেকে বললেন—দল নিয়ে যাও; মা দুর্গার কাছে একখানা ষষ্ঠীর গান শুনিয়ে এসো। নকুলেশ্বর অমনি দলের

গায়ক গায়িকাদের নিয়ে মা দুর্গার মণ্ডপের সামনে গিয়ে দুর্গাষষ্ঠীর গান ধরিয়ে দিলেন—

শুভ শরতে ভারতে হল শারদীয় মহোল্লাস।
গিরি উমা আনতে যায় কৈলাসপুরে,
রানী করেন অধিবাস॥
শুভ ষষ্ঠী কল্পারম্ভ বারিপূর্ণ কুম্ভ, আম্রশাখায় সুশোভিত,
করে সিন্দুরে চন্দনে চর্চিত।
তুষ্ট করতে সে চণ্ডিকা, করিতে হয় কুশণ্ডিকা,
বান্ধিলেন নব পত্রিকা, কুল-পুরোহিত॥
হেথায় গিরি গিয়ে কৈলাসে, মনের হরষে—
সকরুণ ভাষে জামাই কৃত্তিবাসে, বলিতেছে সব।
জামাই হে, তিন দিনের নাইয়রের তরে,
উমাচাঁদকে নিয়ে যাব॥
আমার একটি পুত্র মৈনাক ছিল,
সে ত সমুদ্রেতে ডুবে মইল,
কে আছে আর কারে ডাকি।
সম্বৎসরের মাঝে আমি
তিন দিবস উমা নিরখি॥
কার্তিক গণেশ এই উৎসবে,
উমা মায়ের সঙ্গে যাবে,
গিরিপুরে নিয়ে সবে—
চাঁদের বাজার আমি মিলাইব।
জামাই হে, তিনদিনের নাইয়রের তরে,
উমাচাঁদকে নিয়ে যাব॥

মায়ের আগমনী ষষ্ঠী গানখানি শেষ করে দলের সকলে এসে আহারান্তে শয়ন করল।

সপ্তমীর সকাল বেলা ঢাকীদের ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সানাইওয়ালার ভাঁয়রো রাগিণীর সুরের মূর্চ্ছনায় সকলের ঘুম ভেঙে গেল। দলের মালিক কুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় দোহারপত্র সকলকে ডেকে বললেন—তোমরা

হাতমুখ ধুয়ে নূতন গান নিয়ে বস। নকুলেশ্বরকে বললেন—আজ রাতে যে গান গাইতে হবে সেই গান বল ; ওরা গান করুক।

সকলে নূতন গানের তালিম অন্তে দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষ করে নিদ্রা গেল। দিবানিদ্রা যদিও হিতকরী নয়, তথাপি কবিওয়ালাদের দিবানিদ্রার আশ্রয় নিতেই হয়। কারণ সারারাত জেগে থাকতে হবে গান গাইবার জন্য। সন্ধ্যার পর সকলে নিত্যকর্ম সমাধা করে আহারে বসলেন।

আহারান্তে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করে গানের আসরের উপযুক্ত সাজ-সজ্জা করে সকলে প্রস্তুত হতে লাগলেন। কুঞ্জবাবুর দলে চারজন গায়িকা ছিল —তাদের পরনে নাচওয়ালীদের মত ঘাঘ্‌রা, মাথায় কালো রঙের উপর জড়িদার টুপি। পুরুষদের গায়ে মোক্তারী পোষাকের মত পোষাক। প্রত্যেকের পোষাকে লেখা "বীণাপাণি কবি পার্টি।"

দালালবাজারে কবিগান

জমিদার বাবুর হুকুম হল যে মনোহর সরকারের দল আগে আসরে নামবে। তাঁর দলে কোন মেয়ে দোহার বা গায়িকা ছিল না। তাদের ঢোল, কাঁসী ও অন্যান্য যন্ত্রাদি আসরে গেল এবং মহড়া বাজনার পরেই বন্দনা ডাক ও মালসী গান আরম্ভ করলেন :—

ডাক (বন্দনা)

ত্বং কালী কালবারিণী কলুষনাশিনী তারা।
দুর্গমে দুর্গতি হর, ওমা দুর্গে দুঃখহরা॥
হিমালয় নিবাসিনী, শুম্ভ নিশুম্ভ নাশিনী
বিকট অট্টহাসিনী—শব শিব শবারূঢ়া।
দশদিক দমিত করা, দিগ্বসনা দিগম্বরা
বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধরা, বরাভয়দায়িনী হরা॥
(অন্তরা) জাগো মাগো কুণ্ডলিনী খোল খোল দ্বার।
জীবের চরমে পরম গতি সেই সহস্রার॥
জীব থেকে চতুর্দলে, লংবীজে তোরে জাগালে
খুলে যায় গ্রন্থি সুষুম্নার।
তখন অবহেলে যাবে ত্রিবেণীর ওপার॥

ডাক গান শেষ করে আবার মালসী বা ভবানী বিষয়ক গান ধরলেন। সে

বছর দেশে খুব দুর্ভিক্ষ লেগেছিল। তাই মনোহর সরকার মহাশই'র দল একখানা দুর্ভিক্ষের মালসী গান ধরল—

অন্ন দে অন্ন দে করে সবে ডাকে অন্নদা তোরে।
তুই বিনে অন্নদা মাতা, কে আছে আর অন্নদাতা
অন্নদানে কৃপণতা কোন্ মাতা করে।

এবার দুর্ভিক্ষের কাল করাল গ্রাসে
দেশে দেশে উঠল হাহাকার—
হল চাউলের মণ সাড়ে তিন টাকা,
কিনে খাওয়া ভার—হায় গো
এখন চোদ্দ গণ্ডা পয়সা বিনা,
"রেলী" ধুতি যায় না কিনা,
সরষের তেলের সের চার আনা,
কে দেখেছে এমন অনাচার॥

আবার নারকেল তেলের দাম উঠেছে—
ছয় আনার উপরে—
কারণ নারকেলের দামও বাড়ে,
এক টাকায় আঠারো জোড়া।
দুগ্ধ আর পড়বে না পাতে,
দাম বেড়েছে সাথে সাথে,
তিন আনাতে আড়াই সেরী খাড়া॥

ছিল এক আনায় ছয়টা ম্যাচ বাতি,
তাতে অঙ্কিত নবাবের হাতী—
রাতারাতি দাম বেড়ে গিয়েছে;
এখন ছ'টার স্থলে কালে কালে, চারটা আনায় বেচে।
চৌদ্দ পয়সা পেটী চিনি, সাধ্য কি যে চিনি কিনি,
আখের গুড়ের ছিনিমিনি, দশ আনাতে এক পসরা॥

ইত্যাদি অনেক পদ যোজনা করে দুর্ভিক্ষের মালসীখানা শেষ করে তাদের দল আসর থেকে বেরিয়ে গেল।

নকুলেশ্বরের প্রথম আবির্ভাব

সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবাবুর দলের ঢোল কাঁসী আসরে প্রবেশ করে মহড়া বাজনার পরে হারমোনিয়াম, বেহালা ও সানাইয়ের সঙ্গে কনসার্ট আরম্ভ করল। তিন খানা কনসার্টের পর নকুলেশ্বর গুরু কুঞ্জ দত্ত মশাইকে প্রণাম করে—গায়ক-গায়িকাসহ আসরে প্রবেশ করে ডাক গান আরম্ভ করলেন—

জাগো গো মা কুণ্ডলিনী জগতপালিনী শিবে।
তুই জাগিলে ওমা শ্যামা ত্রিভুবন জেগে উঠিবে॥
অচিন্ত্য রূপিনী শিবে, তোর তদন্ত পায় না জীবে,
কি মন্ত্রে ডাকিলে তবে, বল তারা তোর ঘুম ভাঙিবে॥
কেউ বলে মা তুই লংবীজে, সাড়া দিস মন-বীণায় বেজে,
কেউ বলে তুই দ্বিদল মাঝে, ক্লীং বীজে রও ওঁং প্রণবে॥
কং হতে সং ক্ষং পর্যন্ত, তন্ত্রে পায়না তোর তদন্ত,
না পেয়ে তোর আদি অন্ত, উমাকান্ত চরণ সেবে॥

(অন্তরা)—কং কালী কালরূপিনী কৈবল্যদায়িনী,
স্বগুণে করুণা কর হর-মনোমোহিনী।
তুমি অম্বিকা ললাটোদ্ভূতা করালবদনী॥
মুণ্ডমালা বিভূষণা, ভীমা বিকট দশনা
শবাসনা শিব-সিমন্তিনী।
দিও এ নকুলের অন্তকালে চরণ-তরণী॥

মায়ের বন্দনা ডাক গান শেষ হলে পর মালসী গান (সমাজ সমস্যামূলক "ভবানী বিষয়") আরম্ভ হল—

দেখি দেশের দশা দশভুজা
বিষম দশা দশম দশার প্রায়।
দেশে ছিল বা কি, হল বা কি—মা গো মা
কত কি সাক্ষাতে দেখা যায়॥
দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ, হয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত,
কন্যার চিন্তায় মস্তিষ্কের হয় ছন্নতা;
দাঁড়ায় কন্যারূপে মৃত্যু কন্যা, যমরূপেতে জামাতা।

গরীব ভদ্র কন্যার বিয়ের পাত্র,
তালাস করলে বি. এ. পাত্র,
হাতে উঠে ভিক্ষাপাত্র ; শিক্ষা এই ত নব্য সভ্যতা ॥
তুমি ইচ্ছাময়ী বেদে তন্ত্রে কয়,
তোমার ইচ্ছায় সকলি হয়,
তবে কার ইচ্ছাতে এ সব হল।
বিধি বিষ্ণু প্রসবিনী, অবিধির বিধিদায়িনী
বিয়ের বিধি করলে কি তাই বল ॥
সংসারের দুঃখে দুঃখিতা,
গরীব পিতা মাতার স্নেহলতা, স্নেহলতা ছিল ;
আপন বসনে কেরোসিন ঢেলে,
আগুন জেলে, দুঃখাগুন নিভাইল।
পেয়ে স্নেহলতার বার্তা,
পড়েছে মরণের পরতা,
যারা সমাজ সংস্কারের কর্তা, তারা কি আজ অন্ধ হল ?

এই সমাজ মালসী গানে এরকম আরো অনেক পদ আছে। যা হোক এই গান শেষ করে নকুলেশ্বর নিজ দল নিয়ে আসর থেকে বাসা ঘরে ফিরে গেলেন।

মনোহর বাবুর দল সঙ্গে সঙ্গে আসরে উপস্থিত হয়ে একখানা চাপান গান ধরলেন। চাপান গানের অর্থ প্রশ্ন সংযুক্ত গান—যে গানে প্রশ্ন লুকিয়ে থাকে এবং যে গানের জবাব বিপক্ষ সরকারকে করতে হয় গানের মাধ্যমেই। গানটি হল মান গান—অর্থাৎ শ্রীরাধারানীকে বাঁশীর সঙ্কেতে নিকুঞ্জ বনে আসতে বলে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে নিশি যাপন করলেন। ভোরের বেলা রাধারানী কৃষ্ণবিহীন রজনী যাপন জনিত দুঃখে বৃন্দাদূতীর মন্ত্রণায় মান করে বসলেন। প্রভাত কালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে এসে মান ভাঙাবার জন্য খুব সাধাসাধি কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তখন ললিতা সখী রাইকে প্রশ্ন করছেন—এই ভাব নিয়ে গানটি গাওয়া হলো—

প্রথম ফুকার—বল দেখি গো রাই রূপসী,
মান বেশী না কৃষ্ণ বেশী,
সত্য করে বল দেখি—
ও তুই মান করে প্রাণ ছাড়বি কি ?

দ্বিতীয় ফুকার—যার চরণে অক্ষয় স্বর্গ,
নাম নিলে পায় চতুর্বর্গ,
তার উপরে কর্‌লি মান ?

তৃতীয় ফুকার—ক্ষণেক পরে দেখতে পাবে,
মানও যাবে শ্যামও যাবে,
শেষে তোর কি উপায় হবে—
ভেবে তো দেখলি না রাই !

বিপক্ষ দল এই গানটি যখন আরম্ভ করেছে তখন নকুলেশ্বর আসরের বাইরে থেকে ঐ পদ ও ফুকারগুলি শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়ে কুঞ্জবাবুর কাছে বললেন। গানের পদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কুঞ্জবাবু জবাব তৈরী করে নকুলেশ্বরকে বললেন—এই জবাবের পদগুলি মন দিয়ে শোন; মুখস্থ করে আসরে গায়ক গায়িকাদের বলে দিতে হবে। তারা গাইবে। ভুল হলে কিন্তু গায়ক গায়িকারা গাইতে পারবে না, লজ্জা পাবে।

এই বলে কুঞ্জবাবু মুখে মুখে জবাবের পদগুলি বলতে লাগলেন এবং নকুলেশ্বরও একাগ্র মনে দু'তিনবার শুনে সব কথা মুখস্থ করে কুঞ্জবাবুকে শোনালেন। শুনে কুঞ্জবাবু বললেন—বেশ হয়েছে, এখন যাও দল নিয়ে আসরে গিয়ে জবাব গান করাও।

দল নিয়ে নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে সেই মান গানের জবাব আরম্ভ করলেন। চারজন ভাল গায়িকা সম্মুখে, পিছনে চারজন গায়ক ধরতা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে নকুলেশ্বর সদ্যমুখস্থ-করা পদগুলি বলে দিতেই গায়ক গায়িকারা সুর করে গান ধরলেন—যেন ললিতার বাক্য শুনে রাধারানী বলছেন—

১নং ফুকার—বললে, বল দেখি গো রাই রূপসী,
মান বেশী না কৃষ্ণ বেশী,
মানের সমতুল্য কি ?
নারীর নারীত্বের সাফল্য কি ?
মানের মরা যে মরেছে,
মানীর কাছে মান পেয়েছে,
সখী, অপমানে থাকলে বেঁচে—
তার জীবনের মূল্য কি ?

২নং ফুকার—বললি, যার চরণে অক্ষয় স্বর্গ,
নাম নিলে পায় চতুর্বর্গ,
তার কি এমন অপরাধ ?
শুধু অপরাধ নয় অপবাদ।
কোথায় দেখলি চতুর্বর্গ,
ক'রে কামুকার সংসর্গ,
শ্যামের কাম বর্গেরই উপসর্গ
ধর্ম অর্থ মোক্ষ বাদ॥

৩নং ফুকার—বললি, মানও যাবে শ্যামও যাবে,
শেষে তোর কি উপায় হবে ?
কথা শুনে হাসি পায় ;
আমার মান থাকলে শ্যাম যায় কোথায় ?
দেখতে পাবি মানের ফলে,
শ্যামকে পাব চরণ তলে,
দেখবি, মঞ্জময়ী মানং বলে—
সেধে এসে ধরবে পায়॥

প্রথম আবির্ভাবে বিপর্যয়—সরলার তিরস্কার

কয়েক সহস্র লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবির আসরে গানের জবাব বলা নকুলেশ্বরের জীবনে এই প্রথম প্রয়াস। সে সভায় আবার ভদ্র শূদ্র, ধনী গরীব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, হিন্দু মুসলমান সব রকম শ্রোতাই আছে। খুব উদ্যম উৎসাহ নিয়ে নকুলেশ্বর আসরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে খুব আঘাত পেয়ে ফিরে এলেন।

কুঞ্জবাবুর দলে চারজন গায়িকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকার নাম ছিল শেখ সরলা। আঠার উনিশ বছর বয়স। যেমন ছিল তার রূপ তেমন গুণ। সাত বছর বয়স থেকেই সে কুঞ্জবাবুর দলে ভর্তি হয়ে কবিগান শিখতে আরম্ভ করে। দীর্ঘ দিনের সুশিক্ষার গুণে সে সকলের কাছে আদরণীয়া। সেকালেও মাসে একশত টাকা মাসিক বেতন পেত। রূপ গুণের জন্য নিজের মনেও একটু বেশ দেমাক ছিল।

নকুলেশ্বর গুরুর আদেশে সদ্য মুখস্থ করা জবাবের পদগুলি বলে দিচ্ছিলেন।

হঠাৎ প্রথম ফুকারের শেষ পদটি ভুলবশতঃ উল্টাভাবে বলে ফেলেছেন। যেখানে পদটি হবে—

"অপমানে থাকলে বেঁচে তার জীবনের মূল্য কি ?" সেখানে নকুলেশ্বর বলে ফেলেছেন—

"অপমানে থাকলে বেঁচে তার জীবনের কি মূল্য ?" "মূল্য কি" বলার স্থানে "কি মূল্য" বলায় যদিও অর্থের কোন তারতম্য ঘটেনি, কিন্তু পদের অন্ত-মিলে অসামঞ্জস্য হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী 'মিল'-এ আছে "সাফল্য কি" ও "তুল্য কি"। সুতরাং সমাপ্তি-মিল-এ "মূল্য কি" হওয়াই দরকার। সেখানে "কি মূল্য" বলাটাই হল নকুলেশ্বরের অপরাধ।

লোকে বলে 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়'। নকুলেশ্বরের ভাগ্যেও তাই হয়েছে। গর্বিতা গায়িকা শেখ সরলার কাছে ফুকারের জবাব বলার সময়েই এই বিপত্তি ঘটে। ভুল বলার সঙ্গে সঙ্গে শেখ সরলা গান ছেড়ে দিয়ে পেছনে ফিরে নকুলেশ্বরকে একটা ধমক দিয়ে বিরাট সভার মাঝেই বলে ফেলল—পারিস না তবে আসিস কেন ? দলপতিও যেমন হয়েছে। ঘোড়ার কাজ গাধা দিয়ে সারতে চায়।

অসংখ্য লোকের সভায় একটা মেয়ের মুখে এমন গালাগালি খেয়ে নকুলেশ্বরের মনের যে কি অবস্থা, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই তা বুঝতে পারবেন। নকুলেশ্বর কোন প্রতিবাদ না করে কাজ সেরে বাসা ঘরে এসে অধোমুখে বসে রইলেন। তার এই বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করে দলের পরিচালিকা সেই স্নেহময়ী অধরমণি নকুলেশ্বরের গায়ে হাত দিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে বাবা ! মুখ কালো করে বসে আছ কেন ?

নকুলেশ্বর ছলছল চোখে আসরের যাবতীয় ঘটনা বলে পরে বললেন— মা, ও যে আমাকে গালাগালি দিয়েছে তাতে আমার বেশী দুঃখ হয় নি। দুঃখ এই, যে কাজ আমি পারিনা সে কাজে কেন গেলাম। ও তো আমাকে ভাল কথাই বলেছে, আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। না জেনে না শিখে কোন কাজ করতে যাওয়াই মূর্খতা।

নকুলেশ্বরের কথা শুনে অধরমণি অমনি রাগে গরগর করতে করতে কুঞ্জবাবুর কাছে গিয়ে সরলার এই অন্যায়ের বিচার করতে বললেন।

অধরমণি ভাল লেখাপড়া জানতেন। শব্দার্থ জ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট ছিল। তিনি কুঞ্জবাবুকে বললেন—ছেলেটা আপনার দলে নূতন এসেছে। আজই প্রথম নূতন

গানের জবাব মুখস্থ করে আসরে বলতে গিয়েছে। তাতে যদি "মূল্য কি"-র স্থলে "কি মূল্য" বলেই থাকে তাতে এমন কি চণ্ডী অশুদ্ধ হয়েছে যে আপনার আদরিণী শেখ্‌নী আসরের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের ছেলের অপমান করবে?

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে ডেকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত দিয়ে বললেন—খুব রাগ করেছ বুঝি, কেমন! ও তোমাকে ভাল কথাই বলেছে—পার না আস কেন? এ কথায় রাগ না করে মনে রেখ ঐ কথাটা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে দৈববাণী এবং কবি জীবনের শুভ সূচনার দ্যোতক। আঘাত না পেলে মনে ধিক্কার আসে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর—আমায় পারতেই হবে, শিখতেই হবে। মানুষের মত মানুষ হয়ে সকলের কাছে প্রমাণ দিতে হবে যে গাধাও চেষ্টা করলে ঘোড়ার গুণ অর্জন করতে পারে।

কুঞ্জবাবুর উপদেশ ও সান্ত্বনা বাক্য শুনে নকুলেশ্বরের মনের ভাব বদলে গেল। তিনি গুরুদেবের পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করে বললেন—আমি পারব, আমি মানুষ হব, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন। যতদিন আমি মানুষের মত মানুষ হতে না পারি ততদিন যেন শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কোন লোকের নিন্দা মন্দ গালাগালকে আমার কর্তব্য পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে ধৈর্য ধরে চলতে পারি। গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক!

নকুলেশ্বরের মনের দুঃখ যদিও দূর হল কিন্তু অধরমণির রাগ কমল না। তিনি নিজেই গিয়ে শেখ সরলাকে বললেন—খুব বড় গায়িকা হয়েছিস্ বুঝি কেমন? তাই অহঙ্কার আর গায়ে ধরেনা। আজ বারো তের বছর যাবত চেষ্টা করে শিখেছিস তো একটু গান গাইতে। সরকার যা বলে দেয় তাই সুর করে বলতে পারিস্ মাত্র। সেই গৌরবেই মাটিতে পা দিস না। যারে যা ইচ্ছে তাই বলে ফেলিস। একটা নূতন গানের একটা ফুকার মুখস্থ করে গেয়ে শোনা তো? দেখবি কত ধানে কত চাল। মাসিক একশত টাকা পাও—দুইশত টাকা করে দেব; দেখি ক্ষমতা! দুই বছর পরে দেখবি এই বোকা ছেলেটাও মানুষ হবে। তখন তোর মত শেখ্‌নীকে পায়ে তেল মাখাতেও রাখবে না—ইত্যাদি অনেক কিছু বলে শেষে নকুলেশ্বরকে একান্তে নিয়ে বললেন—বাবা! শুধু আসরের সময় ভিন্ন ওদের সঙ্গে কখনো মেলামেশা করবে না। ওরা লোক ভাল না। তোমার আত্মোন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাবে। সর্বদা মনে রাখবে তুমি এসেছ "সরকার" হতে। তোমার অনেক কিছু জানবার ও শিখবার আছে। গুরু হলেন "আলু", শিষ্য হবে

"খোস্তা"। খুঁচে খুঁচে প্রশ্ন করে সব তত্ত্ব আদায় করে নিও। গুরু কৃপায় বাসনা পূর্ণ হবে।

নকুলেশ্বরের প্রাণে যেন দ্বিগুণ উৎসাহের সঞ্চার হলো। অষ্টমী রাতের গান আরম্ভ হবে রাত বারটায়। সেদিন কুঞ্জবাবুর দলের প্রথম আসর। নকুলেশ্বর গুরু আদেশে আবার দল নিয়ে যথাসময়ে আসরে উপস্থিত হয়ে ডাক-মালসী গান করিয়ে দল নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মনোহর বাবুর দল আসরে গিয়ে ডাক মালসী গান আরম্ভ করলো।

নকুলেশ্বর বনাম মনোহর সরকার

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে ডেকে বললেন—এই আসরে গিয়ে তো "টপ্পা-পাঁচালী" বলতে হবে। পারবে তো?

নকুলেশ্বর—আমি ত বিষয়বস্তু কিছু জানি না। কি বলতে হবে আমাকে বলে দিন।

দত্তবাবু টপ্পার একখানা লহর তৈরী করে দিয়ে বললেন—এটি মুখস্থ করে নাও। প্রথমে এই লহরটি দুইজন গায়িকা দ্বারা আগে পাছে গাওয়াবে। তারপর ঐ বিষয় নিয়ে উপস্থিত মিল তৈরী করে পাঁচালী বলবে। সাবধান ভুলে যেওনা কিন্তু!

উপস্থিত পাঁচালী বলা নকুলেশ্বর আগেই কিছু কিছু শিক্ষা করে নিয়েছিলেন। সে সাহসে ভর করে বললেন—আপনার আশীর্বাদে কোন প্রকারে এক আসর বলতে পারব; ভুল হবে না। বিশেষত গতরাত্রে জবাবের ভুলের জন্য শেখ সরলার গালাগালটা যেন উদ্যত চাবুকের মত নকুলেশ্বরের পিঠের উপর উঁচিয়ে আছে। কাজেই আজ যাতে ভুল না হয় সেজন্য তিনি সদা সতর্ক। নকুলেশ্বর টপ্পাখানা মুখস্থ করে গুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করে দল নিয়ে আসরে গিয়ে লহরখানা বলতে লাগলেন—

আমি অগ্রদ্বীপের গোবিন্দ ঘোষ, চিনে সব লোকে।
তুমি সেবার ঠাকুর গোপীনাথ,
চরণে করি প্রণিপাত,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, আমার মস্তকে॥
তুমি গৌর রূপে বাক্য দিলে—
আমার বাড়ী থাকবে গোপীনাথ রূপে,

তোমার কথায় বিবাহ করিয়ে রই অগ্রদ্বীপে।
যখন সেবায় দিলেম মনোযোগ,
হঠাৎ হল স্ত্রী-বিয়োগ,
সেবার কাজ চলে কিরূপে ?
আমার বাৎসল্যের ধন পুত্র ছিল—
বলো সেই পুত্র ম'ল কোন পাপে ?

টপ্পার লহরটা গাইয়ে পাঁচালি আরম্ভ করলেন। পাঁচালী বলার আগে একখানা ধুয়া দিতে হয়। নকুলেশ্বর ধুয়া ধরলেন—

পরম ধন পায় কি সহজ সাধনে।
দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না—
ব্রজগোপীর ভাব বিনে॥

দোহারগণ চার পাঁচবার গেয়ে ধুয়াখানা ছেড়ে দিলে নকুলেশ্বর মুখ পাঁচালী আরম্ভ করলেন—বাজনা বন্ধ হয়ে গেল এবং ছন্দাকারে বক্তৃতা চলতে লাগল—

বন্দ দেব গণপতি মুষিক বাহন গতি
পাদপদ্মে রবির কিরণ।
জগৎ-জননী সুত আসরে হও আবির্ভূত
সিদ্ধিদাতা তুমি গজানন॥
বন্দ দেবী সরস্বতী তুমি মা বাক্য মূরতি
সর্ববাক্য তোমাতে স্ফুরণ।
মূর্খ জনে কর দয়া দাও মাগো পদছায়া
করিবারে কবিতা রচন॥
ব্যাস বাল্মীকি আদি কবি তোমার চরণ সেবি
মহাকাব্য করেছেন রচনা!
নাহি মোর বিদ্যাবুদ্ধি কিসে হবে কার্যসিদ্ধি
নিজগুণে কর মা করুণা॥
পরে বন্দি গুরুর চরণ যে চরণ করিলে স্মরণ
সর্বসিদ্ধি সর্বলভ্য হয়।
অশান্ত আমার চিত্ত এসো গুরু কুঞ্জ দত্ত
সন্তানেরে দাও এসে অভয়॥

বন্দনাতে করি ক্ষান্ত টপ্পার ভাবের যে বৃত্তান্ত
আদি অন্ত করি নিবেদন।
গোবিন্দ ঘোষ নামটি ধরি অগ্রদ্বীপে বসত করি
করি তোমার ভজন পূজন॥
তুমি ঠাকুর গোপীনাথ পদে করি প্রণিপাত
জানাই মোর অন্তরের কথা।
তোমার বাক্যে বিয়ে করি বৈষ্ণব ধর্ম পরিহরি
সংসারী সাজিয়ে আছি হেথা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে তুমি আমায় সঙ্গে করে
নগরেতে করিতে ভ্রমণ!
একদিন ভোজনের পরে মুখশুদ্ধি দিতে মোরে
অনুমতি করিলে যখন॥
নগরে ভিক্ষাতে যাই একটি হরিতকী পাই
অর্ধেক কেটে তোমায় করলেম দান।
অর্ধেক রাখি সঞ্চয় করে আগামী দিবসের তরে
রাগ করিলে তুমি ভগবান॥
বললে ডেকে আমার কাছে সঞ্চয়ের বাসনা আছে
বৈষ্ণবের তো এই ধর্ম নয়।
সঞ্চয়ের বাসনা থাকে গৃহী ব'লে বলে তাকে
ঘরে ফিরে যাও এ সময়॥
গোপীনাথ রূপ ধরে থাকব আমি তোমার ঘরে
কর আমার অর্চন বন্দন।
সংসারে হয়ে সংসারী তোমার বাক্যে বিয়ে করি
জন্মিল এক সুযোগ্য নন্দন॥
সেবায় দিলাম মনোযোগ হল অমার স্ত্রীবিয়োগ
ভার্যাশোকে কাঁদে আমার প্রাণ।
হরিবোলা পুত্র ছিল কোন পাপে আজ সেও ম'ল
সত্য করে বল ভগবান॥
দান করে ধন হরণ করা এটা তোমার কেমন ধারা
মনোচোরা বল শুনি তাই।

এই পর্যন্ত করে ক্ষান্ত আরও কিছু গোপীকান্ত
ধুয়ার সুরে তোমারে জানাই ॥

এই বলে নকুলেশ্বর মুখ-পাঁচালী ছেড়ে দিয়ে আর একখানা ধুয়া দিয়ে বাজনার তালের সাথে সাথে গাইতে লাগলেন; সে সঙ্গে দোহারগণ পদের অন্তে ঠেক্ দিতে লাগল—

ভাঙন নদীর কূলেরে মন, ঘর বাঁধিলি কি সাহসে।
ভোগ বাসনার তুফান উঠি, ভিটার মাটি প'ল খসে ॥

দুই খুঁটীর পর ঘর ছিল খাড়া,
দুই সারি তার রুয়া মাঠাম একখানি আড়া;
বিষয়-বিষের বাঁশের বেড়া ছিল ঘরের চারি পাশে।
পাপের ঘুণে খেয়ে করল সারা
কোন সাহসে আছিস্ বসে ॥

চর্ম-ছনের ছাউনী আঁটি,—
বেতের বাঁধন দিয়েছিলি সাড়ে তিন কোটি;
কাম-ইঁদুরে দিল কাটি বাঁধন এঁটে রাখবি কিসে।
গেল বাঁধন খুলে প'ল ঝুলে—
নদীর কূলে ভাঙন আসে ॥

ঈশাণ কোণে উঠল ভীষণ ঝড়,
কখন জানি উড়ে যায় তোর জরাজীর্ণ ঘর;
বান ডেকে আসিল জোয়ার
সকল কোথায় গেল ভেসে।
অধম নকুল বলে এঘর ফেলে
দেশের মানুষ চল দেশে ॥

মন-শিক্ষায় নাহি প্রয়োজন,
গোপীনাথের শ্রীপাদ-পদ্মে করি নিবেদন;
আমি করতে তোমার বাক্য পালন
মজে ছিলেম বিষয়-রসে।
তুমি ভার্যাপুত্র নিলে হরে
সঞ্চয়ের সাধ মিটবে কিসে?

আশা দিয়ে করে সংসারী,
দাসের প্রতি নিদয় কেন হলে কংসারি ;
ভার্যাপুত্র দিয়ে হরি, হরে নিলে কি মানসে ?
কেবা পুত্র বিনে শেষের দিনে
পুন্নাম নরক তরায় এসে ?
দান করে ধন করিলে হরণ,
দত্ত-অপহারী তারে বলে সর্বজন ;
তোমার মতন নিষ্ঠুর এমন
কে দেখেছে কোন্ বা দেশে।
তোমার ভক্ত-বৎসল দয়াল নামে
আজ হতে কলঙ্ক ঘোষে ॥
আজ তোমাকে চিনেছি নিঠুর,
আমার বংশ ধ্বংস কর নির্বংশ ঠাকুর ;
কারো বাড়াও বংশ প্রচুর—
সদায় রাখ মহোল্লাসে।
বুঝি আমার ঘরে এসেছিলে
শ্রাদ্ধের চিড়া খাবার আসে ? কোন্ সাহসে··

ইত্যাদি অনেক কিছু বলে ধুয়ার ছন্দে বলা শেষ করে পয়ার ছন্দে বলতে লাগলেন—

সত্য করে তত্ত্বকথা বল গোপীনাথ।
কি কারণে আমার শিরে করলে বজ্রাঘাত ॥

হরিতকী সঞ্চয়ের দোষ খণ্ডাইবার তরে।
ছল করে সংসারীর সাজে সাজায়ে আমারে ॥

ভার্যাপুত্র দিয়ে আমায় বেঁধে মায়াজালে।
আবার কেন সর্বস্বান্ত করিলে অকালে ॥

কেমন করে আমার মুক্তি হবে দয়াময়।
ভোগের তৃপ্তি না হলে কি আত্মার মুক্তি হয় ॥

হয়তো আমার পুত্র বাঁচাও নইলে কথা রাখ।
ছেলের মত আজ আমারে বাবা বলে ডাক ॥

আমার কাছে শপথ কর ওহে ভগবান।
আমি মলে বাবা বলে করবে পিণ্ডদান॥
নিরামিশ হবিষ্য খেও গলায় লইও দড়ি।
অন্তকালে কাল-কবলে যেন নাহি পড়ি॥
এই পর্যন্ত বলে আমি ভাব সাঙ্গ করি।
মনানন্দে ভক্তবৃন্দে বলুন হরি হরি॥

আসরের টপ্পা পাঁচালী শেষ করে দল নিয়ে বাসায় এসে নকুলেশ্বর গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। কুঞ্জবাবু এর পূর্বে কোনদিন নকুলেশ্বরের পাঁচালী বলা শোনেননি। প্রথম পরিচয়ের দিন কেবল কয়েকটি মিল-এর পরীক্ষাই নিয়েছিলেন মাত্র। আজ যখন নকুলেশ্বর আসরে নেচে নেচে পাঁচালী বলছিলেন কুঞ্জবাবু আসরের বাইরে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত শুনে মনে মনে খুব আনন্দিত হলেন। নকুলেশ্বরের নির্ভিকতা এবং অতি দ্রুত পাঁচালীর ছন্দ রচনা শুনে হাসিমুখে নকুলেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—দিগ্বিজয়ী হও।

সকলের মুখে নকুলেশ্বরের প্রশংসা শুনে মাতৃসমা অধরমণির আর আনন্দ ধরে না। তিনি বললেন—বেশ বাবা বেশ! তুমি তোমার গুরুদেবের নাম রক্ষা করতে পারবে। গুরুপদে ঐকান্তিক ভক্তি রেখো, তবেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

কিছুক্ষণ পরে কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—প্রশ্ন তো করে এলে, এখন বিপক্ষ সরকার মনোহর বাবু কি উত্তর করেন দেখ। যাও, কাগজ কলম নিয়ে যাও—সব কথাগুলি লিখে আনবে।

কাগজ কলম নিয়ে নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে বসলেন। মনোহর সরকার মশাই টপ্পার জবাবে বললেন—

তুমি মোহে অন্ধ হও গোবিন্দ, ভাবে বুঝতে পাই।
তোমার মরেছে ভার্যাপুত্র, অঝোরে ঝরিছে নেত্র,
ভক্ত রাজ্যের চরিত্র, তোমার জানা নাই॥
তোমায় দিয়েছিলেম ভার্যাপুত্র—
পরীক্ষা করবো বলে তোমার মন।
ভোগ ভাল না ত্যাগ ভাল—
কোন্ পথে তোমার আকর্ষণ?

তুমি পেয়ে ভার্যা নন্দনে, মোহ মায়ার বন্ধনে,
আমাকে হলে বিস্মরণ।
তাইতো ভার্যা পুত্র নিলেম হরে—
দেখে লই, আমার প্রতি টান কেমন ॥

টপ্পার জবাব শেষ করে মনোহর বাবু পাঁচালীর "ডাক ধুয়া" ধরলেন—

অচিন্ত্য এ হরির খেলা, কে বুঝে এই এই মহীতলে।
আপন গড়া খেলনা লয়ে, আপন খেলায় আপনি ভোলে ॥

(মুখ পাঁচালী—বন্দনা)

নমঃ নমঃ মহামায়া নমামি মা হরজায়া
নমামি মা অসুরনাশিনী।
ষড় অসুর মূর্তিমন্ত করতেছে মোর জীবনান্ত
রক্ষা কর শিব সীমন্তিনী ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ দশ ইন্দ্রিয় দম্ভসহ
সদা আমায় করে জ্বালাতন।
কৃপা-খাণ্ডা করে ধরি কেটে খণ্ড খণ্ড করি
কর মাগো বৈরী নির্যাতন ॥
করে ধরি তীক্ষ্ণ অসি শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশি
রক্ষা করেছিলে দেবগণ।
ষড় রিপুর অত্যাচারে কেঁদে মরি হাহাকারে
রক্ষা কর সন্তানের জীবন ॥

* * * *

মায়ের বন্দনা ছেড়ে কবি কাব্যের সূত্র ধরে
এ আসরে করি নিবেদন।
আজ তুমি গোবিন্দ ঘোষ হয়েছ খুব অসন্তোষ
ভার্যা পুত্রের মরণের কারণ ॥
মর-রাজ্যে জন্ম ধরে সকলেই প্রাণে মরে
অমর কেহ তো কভু নয়।
কেহ মরে দু'দিন পরে কেহ বা শত বৎসরে
যার যখন পরমায়ু ক্ষয় ॥

তোমার মন পরীক্ষার তরে ভার্যা পুত্র দেই তোমারে
মুগ্ধ হয়ে তাহাদের মায়ায়।
আমার পুত্র আমার নারী আমার ঘর আমার বাড়ী
এই বলে কাঁদ সর্বদায়॥
আমার পূজা করে বন্ধ তাদেরে নিয়ে আনন্দ
করতে ছিলে সদা সর্বক্ষণ।
তাইতো ভার্যা পুত্র হরে মুক্ত করে দিই তোমারে
কর আমার সাধন ভজন॥
আমি তোমার পুত্র হব তুমি ম'লে পিণ্ড দিব
পুন্নাম নরকে করব ত্রাণ।
চিরদিন তোমার ঘরে তোমার আগুশ্রাদ্ধ করে
করব চিড়া-দধি পিণ্ডদান॥
দধি চিড়ার মহোৎসবে অগ্রদীপ পবিত্র হবে
সবে তোমায় করবে প্রণিপাত।
পৃথিবী ভরিবে যশে রাষ্ট্র হবে দেশে দেশে
গোবিন্দ ঘোষের গোপীনাথ॥
তবে কেন কান্না কর ভোগ-বাসনা সকল ছাড়
কর আমার অর্চন বন্দন।
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাবে নিত্য সেবানন্দ পাবে
কৃপা করবেন লক্ষ্মী নারায়ণ॥
মুক্ত হয়ে অষ্টপাশে মজে নিত্য প্রেমরসে
কর সদা নাম সংকীর্তন।
এই পর্যন্ত করে শেষ ধুয়া ধরে সবিশেষ
আরও কিছু করতেছি বর্ণন॥

(ধুয়া) কোন্ সাহসে ঘর বাঁধিলি মন—
দুকূল ভাঙা নদীর চরে।
দেখি নিশিদিন তরঙ্গ এসে
কূলের মাটি ভেঙ্গে পড়ে॥

চক্ষে দেখে মায়া-বালুর চর—
ভুলের বশে কেন এসে বাঁধলি সুখের ঘর ;
দিবানিশি অন্তরে ডর, কখন এ ঘর ভেঙ্গে পড়ে।
ও মন ভাঙন-নদীর এমনি ধারা—
এ কুল ভাঙ্গে ওই কূল গড়ে ॥

একে জীবন-নদী খরতর—
তার উপরে মোহের-বান ডেকে হল ভয়ঙ্কর ;
না জেনে তুই ঘরের খবর, বসে আছিস্ তার ভিতরে।
ও তুই লাভে মূলে সব হারাবি—
নদী যদি ভাঙন ধরে ॥

ঘরখানা তো করেছিলি বেশ—
তরঙ্গের আতঙ্কে প্রাণে নাইকো সুখের লেশ ;
যা আছে তোর সব হবে শেষ, দেখতে পাবি দু'দিন পরে।
ও তোর ঘরের চালা যাবে উড়ে—
কাল বৈশাখীর প্রলয় ঝড়ে ॥

শোন বলি ওহে গোবিন্দ—
চোখ থাকিতে মায়ার ভুলে হয়েছ অন্ধ ;
সংসারের অসার আনন্দ, বন্ধ করেছে তোমারে।
দিলেম বাঁধন কেটে অকপটে—
ভার্যা পুত্র হরণ করে ॥

করোনা না আর মায়াতে রোদন—
হরি বলে মুছে ফেল অন্তরের বেদন ;
দেখে ভার্যা পুত্রের বদন, যে শান্তি ছিল অন্তরে।
এখন তাই দিয়ে গোবিন্দ ভজ—
মজ প্রেম শান্তির আকরে ॥

তুমি আমার করিলে সেবা—
আমি তোমার পুত্র হব ডাকিব বাবা ;
এমন ছেলের বাবা হবা, কৃতান্ত যারে ভয় করে।
তোমার এই ছেলের হবেনা মরণ—
জন্ম কিবা জন্মান্তরে ॥

—দু'কূল ভাঙা নদীর চরে—

ইত্যাদি ইত্যাদি আরো বহু সুললিত পদ যোজনা করে ধুয়ার ছন্দে গান শেষ করে মনোহর বাবু "পয়ার পাঁচালী" শুরু করলেন—

বেশী কথা বলে আর নাহি প্রয়োজন।
মায়া-কাঁদা কেঁদো না আর করি নিবারণ॥
আমার আমার বল কারে আমার কেহ নয়।
পথিকে পথিকে যেমন পথের পরিচয়॥
অসত্যকে সত্য ভেবে কাঁদে জীব সবে।
অনিত্য এই দেহটা কি কারো সঙ্গে যাবে॥
এই দেহই ত্যজে যখন আত্মা যাবে চলে।
কেউ তোমারে ছোঁবেনা আর মড়া বলে॥
পুত্র বলে নয়ন জলের ধারা বহে বুকে।
তুমি ম'লে সেই পুত্রই আগুন দিবে মুখে॥
প্রাণ-প্রেয়সী বলে যারে এত সোহাগ করা।
চিতায় যেতে পথে পথে দিবে গোময় ছড়া॥
এখন আমার সেবা কর দুঃখ পরিহরি।
অন্তকালে আমি তোমায় দিব চরণ-তরী॥
কৃষ্ণ প্রীতে যদি তুমি কর আত্মদান।
সংসার সাগরে তোমায় করব পরিত্রাণ॥
এই পর্যন্ত আমি আমার ভাব সাঙ্গ করি।
বদন ভরে সবে মিলে বলুন হরি হরি॥

মনোহর সরকার মহাশয় পাঁচালী বলে আজকের মত গান শেষ করে আসর ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেলেন। নকুলেশ্বর তাঁর প্রশ্নের উত্তরে যা যা মনোহর বাবুর মুখে শুনেছিলেন তা নিজের জেরা (উত্তর) লেখার খাতায় লিখে নিয়ে শুরু কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের হাতে দিয়ে বললেন—মনোহর সরকার মহাশয়ের দেওয়া উত্তরগুলি তো লিখে এনেছি ; কিন্তু এই উত্তরের যদি প্রত্যুত্তর দিতে হয় তবে কিভাবে বলতে হবে ?

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরের আগ্রহ দেখে বললেন—তোমার জেরা লেখা ঠিক হয়নি। বিষয়গুলি সবই লিখে এনেছ বটে, কিন্তু নিয়ম মতো লিখতে পারো নি।

নকুলেশ্বর বললেন—তবে কিভাবে লিখতে হবে আমাকে বলে দিন। কুঞ্জবাবু বললেন—তবে শোন, এক একটি প্রশ্ন লিখে নীচে এক লাইন ফাঁক রেখে

দেবে। সেই ফাঁকা জায়গায় আমি উত্তরটি লিখে ব্রাকেট (—) দিয়ে দেব। যেমন মনোহর বাবু বলেছেন—

১। ভার্যা পুত্র সব অনিত্য—

—(তবে রাম অবতারে তোমার বাবা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন কেন ?)

২। মিছে মায়ায় কেঁদনা—

—(লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতনে এবং সীতা হারিয়ে তুমি কাঁদলে কেন ?)

৩। আমি তোমায় বাবা বলে পিণ্ড দেব—

—(তোমার বাবা দশরথ বালির পিণ্ড খায় কেন, তোমার বাবা হয়ে বাসুদেব কারারুদ্ধ কেন ?) ইত্যাদি।

—এইভাবে তুমি এক নম্বর প্রশ্ন লিখে নীচে এক লাইন ফাঁক রেখে দিলে আমি সেই স্থানে উত্তরটা লিখে দেব। তাতে তোমার জেরার বইতে উত্তর প্রত্যুত্তর লেখা থাকলে তোমার শিক্ষার পক্ষে ঐ বইগুলি প্রধান সম্বল হয়ে থাকবে। কারণ এক একটি আসরের পাঁচালীতে যে সব শাস্ত্রের আলোচনা হবে ততগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ নিজের চক্ষে দেখে বা পড়ে শিক্ষালাভ করা দুঃসাধ্য। অতএব তোমার জেরার বইগুলিকেই অমূল্য শাস্ত্র হিসাবে যত্ন করে রাখবে।

গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে সেইদিন থেকে নকুলেশ্বর বড় করে জেরার খাতা তৈরি করে নিয়ে উপরোক্তভাবে প্রশ্নোত্তরে গান ও জবাব লেখা শুরু করলেন।

কবিগানের কড়া কানুন

পরের দিন নবমী পূজা। রাত্রি সাড়ে চারটার সময় যদুবাবুর নহবৎখানা হতে বাদ্যকরদের ঢোল ঢাকের সঙ্গে সানাইদারের সানাইতে ভাঁয়রো রাগিণীতে সুর বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নকুলেশ্বরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে হাত মুখ ধুয়ে শ্রীগুরুর উদ্দেশে প্রণাম করে গানের বইখানা নিয়ে বসলেন নকুলেশ্বর। ভোর হতেই দলে দলে লোক এসে পূজা প্রাঙ্গণে ভীড় জমাতে লাগল।

বাহির বাড়িতে তিন চার বিঘা জমির উপর যদুবাবুর পূজা প্রাঙ্গণ। নানাবিধ দেবদেবীর মন্দির, বিরাট নাটমন্দির, এবং চতুর্দিকে হাতিশালা, অতিথিশালা ইত্যাদি। পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলাও মিলেছে। তারপর আজ নবমী পূজা—জোড়া মহিষ বলিদান করে মা মহিষমর্দিনীকে তুষ্ট করা হবে। এই সব দর্শন মানসেও সকাল হতেই চারিদিক লোকে জমজমাট।

নকুলেশ্বরের মন কিন্তু ঐ সব আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পারল না। তাঁর

শুধু চিন্তা কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে ; কতক্ষণে আবার কবির আসর বসবে ; নূতন নূতন প্রশ্নোত্তর শুনে বা লিখে তার জেরার খাতা পূর্ণ করবে—এই তাঁর ভাবনা। বেলা দ্বিপ্রহরে দলের সকলে আহারাদি শেষ করে শয়ন করল। একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। আবার সারারাত জেগে থাকতে হবে তো। গান আরম্ভ হয়ে গেলে কিন্তু আর কেউ চোখ বুঁজতে পারবে না। গানের মধ্যে বিশ্রামের সময় কেউ ঘুম দিলে তার কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়। এ জন্যে কবির দলে দু'টি বড় কঠোর নিয়ম ছিল--"কামাই" আর "হেমারতি"।

(কামাই)—যেমন তিন পালার গানে দুই পালা গান শেষ হয়েছে ; শেষ পালার গানে কোন দোহার (গায়ক বা গায়িকা) যদি কোন কারণে যোগ দিতে না পারে তবে অন্য গানের বায়নার মধ্যে যে কয়দিন ফাঁক থাকবে সেই কয়দিনের মাহিনা পাবেনা। পুনরায় গানে নূতন করে ভর্তি হতে হবে—এরই নাম কামাই।

(হেমারতি)—গান আরম্ভ হওয়া মাত্র যদি আসরে কোন দোহার উপস্থিত না হয়, অথবা গান আরম্ভের পর বিশ্রামের সময় যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তবে তার হেমারতি (খামখেয়ালি) বাবদ সাতদিনের মাহিনা পাবে না।

আর একটি রহস্য ছিল। গান আরম্ভ হলে যদি কেউ দলপতির আড্ডাতে ঘুমিয়ে পড়ে ও তার কোন দরদী গিয়ে তাকে জাগিয়ে দেয় এবং দলপতি তা জানতে পারেন তবে সেই দরদী বন্ধুটির বিশেষ দণ্ড হিসেবে পনের দিনের বেতন কাটা যেত।

হয়তো কেউ কেউ মনে করতে পারেন এটা খুব অবিচার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা অবিচার নয়। কারণ গানে গানে গায়কের কণ্ঠস্বর গরম থাকে। অতি চড়া "কাক স্বরে" কবিগান গাইতে হয়। গানের মাঝে ঘুম দিলেই শ্লেষ্মা এসে কণ্ঠরোধ করে। ভাল গায়কেরও আসরে দুর্নাম হয়। তাই তাদের যশঃ প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্যই এই কঠিন নিয়ম চালু করা হয়েছিল।

কামাই হেমারতির ভয়েই হোক আর কর্তব্যবোধেই হোক দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সকল গায়ক-গায়িকাই নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হলো। চঞ্চল বালক নকুলেশ্বরের চোখে ঘুম নেই। কারণ কখন সন্ধ্যা হবে, গান আরম্ভ হবে এই তার একমাত্র চিন্তা। দিনটা যেন আজ বড় বেশী লম্বা হয়ে গেছে। সূর্যদেব যেন আর অস্ত যেতে চায় না। এইভাবে ক্ষণ গুণতে গুণতে সূর্যদেব শ্রান্ত দেহে আস্তে আস্তে অস্তাচলে ঢলে পড়লেন। সন্ধ্যাদেবী অবগুণ্ঠনবতী বধূর মত ধীর পদক্ষেপে নবমীর চান্দ্র প্রদীপ হস্তে অগ্রসর হলেন যেন। পূজামণ্ডপে শঙ্খ-ঘণ্টা

ঢাক ঢোল কাঁসীর সঙ্গে সন্ধ্যারতির বাজনা বেজে উঠল। নকুলেশ্বরের আর আনন্দ ধরে না। সে একে একে সকলকে ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙালো।

শয্যা ত্যাগ করে সকলে উঠে যার যার সান্ধ্য-কৃত্যাদি সমাপন করে এসে নকুলেশ্বরকে বললো—কর্তার কাছে (দলপতির) জিজ্ঞাসা করে এসো, আজ কি কি গান গাইতে হবে। নকুলেশ্বর গিয়ে তার গুরুদেবের কাছে আদেশ নিয়ে এসে সেই সব গান দোহারপত্রদের কাছে বলতে লাগলেন।

সকলে মিলে আবার একটু তালিম দিয়ে মুখ মিল করে নিলো। রাত নয়টার সময় রান্নার ঠাকুর এসে সংবাদ দিল—রান্না হয়ে গেছে, খেতে আসুন। অমনি সকলে গিয়ে আহার-পর্ব শেষ করে বাসায় এসে সাজসজ্জা শুরু করলো। রাত এগারটায় গান আরম্ভ হবে।

নোয়াখালী দালাল বাজারে নবমীর গান

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—একবার নাটমন্দিরটা দেখে এসতো লোক সমাবেশ কেমন হ'লো। নকুলেশ্বর গিয়ে দেখে নাটমন্দির তো দূরের কথা, এত বড় মাঠের মতো প্রশস্ত স্থানটায় আর তিলধারণের স্থান নেই। লোকে লোকারণ্য। তাই দেখে নকুলেশ্বর কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। গাঁয়ের ছেলে; তাঁর উপর এত লোকের একত্র সমাবেশ তাঁর জীবনে এই প্রথম দর্শন। আসরের অবস্থা দেখে নকুলেশ্বর ছুটে এসে কুঞ্জবাবুকে বললেন—গুরুদেব! সর্বনাশ হয়েছে! হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে। এত লোকের মধ্যে কি করে গান হবে?

কুঞ্জবাবু হেসে বললেন—সর্বনাশ কিরে! এতো সুখের কথা। আসরে লোক যত বেশী হবে, গান তত ভাল জমবে। তা ছাড়া নোয়াখালীর লোকেরা কবিগান খুব ভাল বোঝে। যারা এসেছে তারা কবিগানের উত্তম শ্রোতা; সব নীরবে বসে গান শুনবে; হৈ-চৈ গোলমাল কিছু হবে না।

নকুলেশ্বর—আমার কিন্তু খুব ভয় লেগেছে। এই ভীষণ জন-সমুদ্রের মাঝে আমি কিন্তু আজ পাঁচালী বলতে পারব না।

কুঞ্জবাবু—ভয় কি? আমি তো আছি। রাত এগারটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হবে। তবে আজ বিপক্ষ দলপতি মনোহর সরকার মহাশয়ের দল আগে আসরে যাবে। তাদের 'ডাক-মালসী' শেষ হয়ে গেলেই তুমি দল নিয়ে আসরে গিয়ে ডাক ও মালসী গান গাওয়াবে।

যথাসময়ে মনোহর সরকারের দল ডাক-মালসী গান শেষ করে আসর ছেড়ে গেলে, নকুলেশ্বর দল নিয়ে আসরে গিয়ে ডাক-গান আরম্ভ করলেন—

তুমি এসো শবাসনা, মুক্ত বসনা, ভক্ত বাসনা পোষিণী।
তারা চণ্ডী চামুণ্ডা, ওমা উগ্রচণ্ডা, মুণ্ড মালেতে ভূষিণী॥
মাগো তুমি জ্ঞানদত্তা, তুমি তত্ত্ববেত্তা, আশুতোষ-মনতোষিণী
ত্রিলোচনা তুমি ত্রিলোক কর্ত্রী, ত্রিতাপহারিণী বিধাতা বিধাত্রী,
তুমি শুভদাত্রী, সাবিত্রী গায়ত্রী, পাশব প্রবৃত্তি নাশিনী॥

(অন্তরা)—এস গো মা হৃদয়-কাশীতে।
আমার অন্তরের তামসী নাশি—জ্ঞান ভক্তি প্রকাশিতে॥
ত্রেতা যুগে ছিলে সিতে, তুমি সাজিয়ে অসিতে,
রাবণেরে বধেছিলে অসিতে।
আমার ষড়রিপু, ষড় অসুর হবে এবার নাশিতে॥

ডাক-গানখানা শেষ করে নকুলেশ্বর মালসী গান আরম্ভ করলেন—
কত কর্ম্মে এই দুর্লভ জনম পেয়ে, মানুষ হলি মন।
এসে দুষ্কৃতি দুর্গতি অতিশয়, তাতে হলনা দুর্গা নাম সাধন॥
মন তোর যে আশায় এ ভবে আসা—
আশার সুসার হল কি ?
পথের সম্বল হল কি ?
চিরদিন পরাধীন বট,
পরের জন্য সদায় খাট,
লাথি খাও আর মাথা কোট—
যেন ধান-ভানা ঢেঁকি॥

মন তোর গলায় দিয়ে মায়া-দড়ি বাঁধিয়ে সন্ধানে,
তোরে দশ জনে দশ দিকে টানে, প্রাণে মানে কিসে ?
আমার মনরে ভাই, চল সকালে যাই দেশে॥
যৌবন কালে হয়ে মত্ত, কয়দিন খাটলি হয়ে ব্রহ্মদৈত্য,
পরে এসে তোর হতরে আশ্রিত।
বলে কেউ বা কর্ত্তা, কেউ রসরাজ—
রসের আশে রসে তোকে ডুবায়ে দিত।
এখন স্বার্থ নাই তোর হস্তে, ফল দেখরে হস্তে হস্তে,
ভাইরে বুড়া বলদ কোন গৃহস্থে, কয় দিন ভালবাসে।
দুর্গা নামে হয় না রুচি, অশুচি বাতাসে॥

জবাবে হাতখড়ি

মালসী গান শেষ করে দলবল নিয়ে বাসায় এলে কুঞ্জবাবু বললেন—তোমার এখন বিশ্রাম করা হবে না। আসরে যাও ; বিপক্ষ দল এখন গানে প্রশ্ন করবে কি গান গায় এবং কি প্রশ্ন করে তুমি লিখে নিয়ে এসো।

নকুলেশ্বর অমনি আসরে গিয়ে বসলেন। মনোহর সরকার সদলে আসরে এসেই একখানা রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কীয় গান আরম্ভ করলেন। গানের বিষয়বস্তু হল—শ্রীকৃষ্ণ যেদিন চন্দ্রার কুঞ্জে নিশিযাপন করে ভোরবেলা শ্রীরাধার কুঞ্জে এসে উপস্থিত হলেন, তখন দেখা গেল তার নূতন ধরনের সাজসজ্জা। পরিধানে চন্দ্রাবলীর শাড়ী, সর্বাঙ্গে নখাঘাত, দন্তাঘাত, কপালে সিন্দুর ইত্যাদি। বেশ-ভূষা দেখে বৃন্দাদূতী শ্রীকৃষ্ণের নবরঙ্গের সাজসজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করছে।

গান করার সময় গানের আগাগোড়া লিখে আনা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তাই বারো বা তের অংশে বিভক্ত এক একটা সখী-সংবাদ গানের মধ্যে যেখানে যেখানে মূল প্রশ্ন লুকিয়ে থাকে, বিশেষতঃ "তিনটি ফুকার ও ডাইনা"—নকুলেশ্বর সেই প্রয়োজনীয় অংশটুকুই লিখে আনলেন। গানে বৃন্দাদূতী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছে—

(১ম ফুকার)—বল বন্ধু আমায় বল, পীতবসন কে ছাড়াল,
কালো অঙ্গে কে পরাল—এমন সুন্দর নীল শাড়ী ॥

(২য় ফুকার)—কার কুঞ্জেতে নিয়ে বাসা, কার পুরালে মনের আশা,
বাদুড়-চোষা আমের দশা—দেখি তোমার কি কারণ ॥

(৩য় ফুকার)—বল বল কালোশশি, কেবা তোমার প্রাণ-প্রেয়সী,
কার কুঞ্জে কাটায়ে নিশি—এসেছ নিশিভোরে ॥

(ডাইনা)—বল শুনি কমলাখি, নয়ন-ধারা কেন দেখি,
সাম্নিকের দোষ আছে নাকি—নইলে কেন চক্ষে জল ॥

উপরিউক্ত ফুকারগুলি লিখে এনে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—গুরুদেব, সম্পূর্ণ গানটি লিখে আনতে পারলাম না। কেবল ফুকারের মূল বিষয় লিখে এনেছি।

কুঞ্জবাবু—সম্পূর্ণ গান লেখার দরকার করে না। মূল কথা কয়টি যে লিখে এনেছ এই যথেষ্ট।

কুঞ্জবাবু তখন জবাব চিন্তা করতে লাগলেন। নকুলেশ্বর তাঁর গুরুদেবের মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—কাগজে কিছু লিখবেন না ?

কুঞ্জবাবু—না। এসব জবাব মনে মনেই রচনা করে আসরে বলতে হয়।

প্রথম ফুকারটি তৈরী করে বললেন—নাও, কালী কলম নাও; ফুকার লিখে মুখস্থ করো।

নকুলেশ্বর—কেন, এই যে আপনি বললেন জবাব লিখতে হয়না; মনে মনে রাখতে হয়। তবে আবার লিখতে বলছেন কেন?

কুঞ্জবাবু—তোমার জন্য বলছি। না লিখে কি তুমি মুখস্থ করতে পারবে?

নকুলেশ্বর—নিশ্চয়ই পারব। আপনি তিনবার বলুন, তবেই হবে।

(১ম ফুঃ)—বললে, পীতবসন কে ছাড়াল, নীলাম্বরী কে পরাল,
কও শুনি আমার কাছে—
এটা ঘুমের ঘোরে হয়েছে।
দাদার সঙ্গে মনোরঙ্গে, শুয়েছিলাম এক পালঙ্কে;
বুঝি দাদার নীল বসনের সঙ্গে—বদল হয়ে গিয়েছে॥

(২য় ফুঃ)—বললে, কার পুরালেম মনের আশা—
বাদুড় চোষা আমের দশা।
গত নিশির যত দুখ—
দূতী বলতে আমার ফাটে বুক।
হারা হয়ে ধবলীরে, মনের দুঃখে বনে ঘুরে,
দূতী অনিদ্রা আর অনাহারে, শুকায়েছে চন্দ্রমুখ॥

দুইখানা ফুকার তৈরী করে কুঞ্জবাবু এক একখানা ফুকার তিনবার করে উচ্চারণ করে নকুলেশ্বরকে বললেন—আমি দুই ফুকারের জবাব তৈরী করলাম; তুমি তৃতীয় ফুকারের জবাবটা তৈরী করতে পারো?

নকুলেশ্বর—আমি তো কিছু জানিনা। ভাবটা একটু বলে দিলে যা হয় একটু চেষ্টা করতে পারি—যদি মন্দ না বলেন।

কুঞ্জবাবু—মন্দ বলবো কেন? যা হয় কর, তবে ভাবটা এই কর যে—আমি রাত্রে অন্ধকারে পথ ভুলে গিয়েছিলেম বলে আসতে পারি নাই।

নকুলেশ্বর তখন তিন নম্বরের ফুকারের জবাবে বললেন—

(৩য় ফুঃ)—বললে কার কুঞ্জে পোহালে নিশি, বল বল কালোশশি,
অন্ধকারে নিশি ঘোর—
পথে কত কষ্ট হল মোর।
চেয়ে দেখ মোর অঙ্গে কত, হয়েছে কণ্টকে ক্ষত,
পথের বাধা-বিঘ্ন করে গত, আসিতে হয় নিশিভোর।

ফুকারের জবাব শুনে কুঞ্জবাবু খুশী হয়ে বললেন—বেশ, বেশ হয়েছে।

আশীর্বাদ করি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক। তবে এখন ডাইনার জবাব-খানা শোন দেখি—

(ডাইনা)—চোখের জল ঝরিছে নাকি সান্নিকের দোষে,
রাধা ছিল শিরোমণি পড়েছে খসে।
আশা ভঙ্গ মনের হুতাশ, বিচ্ছেদ শির-সান্নিকের প্রকাশ,
দাও গো মিলন-লক্ষ্মীবিলাস—শান্তি মধু অনুপান॥

নকুলেশ্বর জবাবের পদগুলি বেশ করে মুখস্থ করে নিলেন। বিপক্ষ দল আসর ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবাবুর দল আসরে গিয়ে বসল। নকু-লেশ্বর গুরুদেবের চরণে প্রণাম করে বললেন—গুরুদেব, আমার বড় ভয় করছে। আগের দিনের মত যদি কোন পদ ভুল করে ফেলি, তবে আপনার বড় গায়িকা শেখ সরলা আজ আবার কি বলে গালাগাল দেয় তার ঠিক নেই।

কুঞ্জবাবু—ভয় কিরে বেটা। মানুষ যে মাটিতে আছাড় খায়, আবার সেই মাটি ধরেই ওঠে। গত দিনের ভুলের কথা যখন স্মরণ আছে, আর ভুল হবেনা। যাও, কোন ভয় নেই।

নকুলেশ্বর গিয়ে খুব সাহসের সঙ্গে জবাবের পদ বলতে লাগলেন। আসরের শ্রোতারাও ছোট একটা ছেলের মুখে চোখা চোখা জবাব শুনে বেশ বাহবা দিতে লাগলেন। আজ আর কোন ভুল হল না। জবাব শেষ করে নকুলেশ্বর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

জবাবের পরে একখানা সখী-সংবাদ গানে বিপক্ষকে প্রশ্ন করতে হবে। বিপক্ষ সরকার এসে সেই গানের জবাব করবেন। কুঞ্জবাবুর নির্দেশানুসারে নকুলেশ্বর পূর্বরাগ বিষয়ক একখানা গান গাওয়াতে আরম্ভ করলেন। গান-খানার নাম "চন্দ্রগ্রহণ"। গোষ্ঠ অবসানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে কালিন্দী যমুনার কূলে গিয়ে শ্রীরাধারানীর অপরূপ রূপ দর্শন করে প্রিয় সখা সুবলকে জিজ্ঞাসা করছে—

(১ম চিতন)—ভানুসুতার কূলে, কানু দাঁড়াইলে, কেলী-কদম্ব মূলেতে।
হেলায়ে নিতম্ব, কক্ষে নিয়ে স্বর্ণকুম্ভ,
এলেন রাই অম্বু আনিতে॥

(১ম ফুকার)—তখন বৃষভানু সুতা রাই, ভানুজার কূলেতে যায়,
তপ্ত কাঞ্চনকায়—হায়;
নীলাম্বরী কটিদেশে—জ্ঞান হয় যেন রাহু এসে,
পূর্ণ শশী অর্দ্ধগ্রাসে, যেমন ভাবাকাশের গায়॥

তখন অপরূপ রূপের ছবি দেখে চক্ষে,
বাঁকা সখা কয় বিস্ময় বাক্যে, সুবল সখার কাছে।
ওরে ভাইরে সুবল, কোথায় দেখেছিস্ বল ;
দিবাভাগে চাঁদ উঠেছে ॥

(ডাইনা)—যেন পাতিয়ে মায়া ফাঁদ, উদয় অপূর্ব চাঁদ, পেয়ে পৌর্ণমাসী,
কত শত চাঁদ ঐ চাঁদের হয়েছে দাসী।
এমন চাঁদ রাহু এসে, রেখেছে অর্দ্ধগ্রাসে,
দেখরে দিবসে চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে।
দিবসে চন্দ্রগ্রহণ কে কবে দেখেছে ॥

(২য় ফুঃ)—ভাইরে যদিও সে অর্ধ-চাঁদ, রাহুতে করেছে গ্রাস,
নাই তার জ্যোতির হ্রাস—হায় ;
নয়ন পথে আলোক রাশি, হৃদয়ে পশিল আসি,
অন্তরের অজ্ঞান তামসী, করেছে বিনাশ ॥
থেকে অন্তরে বিনাশে অন্তরের অমা,
বলরে কোন্ বিধি এই চন্দ্রমা গড়িয়েছে ॥

(অন্তরা)—বলরে চাঁদ কোন্ দেশে ছিল।
কোন্ দেশের চাঁদ কি উদ্দেশে, দিবসে এই দেশে এলো ॥
হেরে তারে মন-চকোরের ধরেছে ক্ষুধা,
কতদিনে পাব চাঁদের সম্মিলন-সুধা
আর কবে দেখেছিস এ চান,
চাঁদ নয়রে নয়ন-ধরা ফান ;
রাহুর প্রাণ কি এতই পাষাণ—
এমন চাঁদকে গ্রাস করিল ॥

(পরচিতান)—এ চাঁদের আলোকে, ঝলকে ঝলকে, পলকে পুলকে পরাণ
চাঁদের অণুরেণু, তা হতেও পরমাণু,
সে তুল্য নয় রে গগন-চাঁদ ॥

৩য় ফুঃ)—ভাইরে এমন চাঁদ রাহু গ্রাসে, পাষাণ প্রাণে মানে কি,
রাহুর সাধ্য কি—হায়,
ইচ্ছা হয় ভাই এই চাঁদেরে, রাহু হইতে এনে কেড়ে,
বক্ষ চিরে হৃদ-মাঝারে, ভরিয়ে রাখি ॥

গানখানা শেষ করে দল নিয়ে বাসায় ফিরে এলে কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়নি তো ?

নকুলেশ্বর—আপনার আশীর্বাদে ভুল হয়নি বটে, তবে প্রাণটা এখনো দুরু দুরু করছে।

কুঞ্জবাবু—ওটা ভাল লক্ষণ। সর্বদা প্রাণে ভয় রেখে কোন কাজ করলে তার আত্মোন্নতি হয়। আর যে 'আমার ভুল হবে না'—এই বলে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে তারই পদে পদে ভুল হয়ে থাকে! চিরদিন মনে রাখবে আমি কিছু জানি না, আমি সবার চেয়ে ছোট, তবেই বড় হতে পারবে। ছোটবেলায় নিশ্চয়ই পড়েছ—বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে।

কথা বলতে বলতে আসরে বিপক্ষ দলের ঢোল-কাঁসি বেজে উঠলো। কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—আর বিলম্ব করো না। যাও, বিপক্ষ দল আসরে গিয়েছে : কি জবাব করে শুনে লিখে আনবে।

নকুলেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে খাতা কলম নিয়ে আসরে বসলেন। মনোহর সরকার মহাশয় জবাব গাওয়াতে সুরু করলেন—

(চিতান)—বাঁকা সখার বাক্য শুনে সুবল সখা কয়।
তোরে বলব কিরে প্রাণ-কানাই, কি দেখে কি ভাবলি ভাই,
দিবসে কি চাঁদের উদয় হয়॥

(১ম ফুঃ)—ভাইরে শুধালি তুই আমার কাছে, দিবসে কি চাঁদ উঠেছে
বললি কি বাঁকা সখা—
নারীর রূপে তোর লাগল ধোঁকা,
সঙ্গেতে নিয়ে সঙ্গিনী—জলের ঘাটে যায় রঙ্গিনী
ওতো চাঁদ নয়রে ভাই চাঁদবদনী, বিনোদিনী রাধিকা॥

(২য় ফুঃ)—বললি চেয়ে দেখ ঐ ভাবাকাশে, অর্দ্ধচন্দ্র রাহুগ্রাসে,
কানাই আমার কথা শোন,—
ও তুই যেরূপ করলি দরশন।
অবগুণ্ঠনেতে ঢাকা, চাঁদবদনী শ্রীরাধিকা,
আধ-বদন যায় রে দেখা,
রাহু নয় ও নীলবসন॥

(৩য় ফুঃ)—বললি ঐ চাঁদে জ্যোতি বিকাশে, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশে,
ও চাঁদ বড় মন্দকর,
ভাই তোর চোখ দুটোরে বন্ধ কর।

কলসী ভরা হয়ে গেলে, জল নিয়ে চাঁদ যাবে চলে,
তখন দেখতে পাবি নয়ন মেলে, ভিতর বাহির অন্ধকার ॥
(৪র্থ ফুঃ)—বললি ইচ্ছা হয় যে ঐ চাঁদেরে, বক্ষ চিরে রাখি ভরে,
বললি কিরে পীতবাস,—
শুনলে লোকে করবে উপহাস।
ঐ চাঁদেরে ভালবেসে, বুকে নিবি কোন্ সাহসে,
শেষে কলঙ্ক রাহুতে এসে, তোরে শুদ্ধ করবে গ্রাস ॥
(ডাইনা)—ঐ চাঁদ ছিল কোন্ আকাশে শুনবি রসময় ?
আয়ান ঘোষের ভাগ্যাকাশে এ চাঁদের উদয় ॥
ঐ চাঁদের সুধার লালসে, যে চকোর রয় আশার আশে,
কাল-কুটীলা মেঘে এসে, শিরে করে বজ্রাঘাত।
(মুথ)—সুধার আশা মিটবে নারে, জ্বলে পুড়ে হবি ভস্মসাৎ ॥

মনোহর বাবুর জবাবের উপরোক্ত পদগুলি নকুলেশ্বর নিজ জেরার খাতায় লিখে রাখলেন।

মনোহর সরকার বনাম কুঞ্জ দত্ত

এমন সময় আসরের শ্রোতৃমণ্ডলী মনোহর বাবুকে বললেন—আপনি এখন টপ্পা-পাঁচালী আরম্ভ করুন।

মনোহর বাবু অমনি টপ্পা গানের সুর দিয়ে টপ্পা আরম্ভ করলেন—

আমি কল্পনাতে হরিশর্মা দিলেম পরিচয়।
অদ্য পড়ে বিষম সমস্যায়, তোমারে দেখিবার আশায়,
অদ্য এসে উড়িষ্যায়, হয়েছি উদয় ॥
আমি লোকের মুখে শুনলেম যেমন—
উড়িষ্যায় স্বচক্ষেতে দেখলেম তাই,
জগবন্ধু আজ তোমার এক বিন্দু করুণা চাই।
শুনি নন্দের নন্দন যেই, শচী সুত হল সেই,
বলরাম হয়েছেন নিতাই ;
তবে শ্রীক্ষেত্রের এই শ্রীমন্দিরে —
কে তোমরা বিরাজ কর দু'টি ভাই ॥

নকুলেশ্বর দেখলেন বরিশাল ছ'আনী কাছারী প্রাঙ্গণে কুঞ্জবাবু যে বিষয়ে শরৎ সরকারের উপর টপ্পা-চাপান দিয়েছিলেন, আজ মনোহর সরকার ও সে বিষয় অর্থাৎ ক্ষেত্রতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই টপ্পা বেঁধেছেন। বিষয়বস্তু এক হলেও

পরিবেশন ও বিশ্লেষণে নতুনত্ব আছে। যা হোক টপ্পার লহর শেষ করে মনোহর বাবু পাঁচালী আরম্ভ করলেন—

(বন্দনা)

নমঃ নমঃ নারায়ণ তুমি সত্য সনাতন
সর্বসিদ্ধি সর্বগুণাধার।
অখিলের বন্ধু তুমি তুমি প্রভু অন্তর্যামী
তব পদে কোটি নমস্কার॥
তুমি কৃপা কর যারে অনলে সলিলে তরে
তার সাক্ষী প্রহ্লাদ এ ভুবনে।
পিতা হিরণ্যকশিপু সাজিয়ে কৃতান্ত রিপু
চায় তারে বধিতে জীবনে॥
নরসিংহ মূর্তি ধরি কশিপুকে ধ্বংস করি
বাঁচাইলে প্রহ্লাদের প্রাণ
তেমনি প্রভু করে দয়া দাও মোরে পদছায়া
শ্রীচরণে করি আত্মদান॥

* * *

বন্দনা করিয়ে ক্ষান্ত টপ্পার ভাবের যে বৃত্তান্ত
এ সভাতে করি নিবেদন।
হরি শর্মা নামটি ধরি পূর্ববঙ্গে বসত করি
করতে এলেম তীর্থ পর্যটন॥
শুনতে পেলেম পরস্পরে গৌরাঙ্গ মূরতি ধরে
কৃষ্ণ গেলেন নদীয়া ভুবন।
তার জ্যেষ্ঠ বলরাম ধ'রে নিত্যানন্দ নাম
নাম-প্রেম করে বিতরণ॥
উড়িষ্যাতে জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
এখানেও প্রসাদের মাহাত্ম্য।
তাই এসে উড়িয়াপুরে জিজ্ঞাসা করি তোমারে
বল, নাম-প্রসাদের তত্ত্ব॥
নন্দের নন্দন যিনি শচী সুত রূপে তিনি
নদীয়াতে যদি জন্ম লয়।

কেবা তবে ক্ষেত্রপুরে তোমরা দু'জন এ মন্দিরে
কোন স্বরূপে আছ দয়াময় ॥
মধ্যস্থলে একটি নারী নারী না সে হয় আনাড়ি
বুঝতে নারি মনে সন্দ হয়।
সধবা না সে বিধবা যথার্থ পরিচয় দিবা
কপালে সিন্দুরের বিন্দু রয় ॥
তোমার সনে কি সম্পর্ক বল শুনি সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম
শ্রীচরণে করি নিবেদন।
শুনতে মনে ক'রে আশা তোমাকে করলেম জিজ্ঞাসা
কর আমার বাসনা পূরণ ॥
নাম আর প্রসাদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ বলে বলে কারে
সত্য করে বল মহাশয়।
এ পর্যন্ত করে ক্ষান্ত টপ্পার যত মূল বৃত্তান্ত
ধুয়া ধরে দিচ্ছি পরিচয় ॥

(ধুয়া)— ও সেই দয়াল মাঝির প্রেমের নায়—
কে যাবিরে আয়রে তোরা আয়।
ও সে বিনা পয়সায়ও পার করে—
পারের কড়ি নাহি চায় ॥
পারের সম্বল নাইকো যার হাতে
দয়াল মাঝির নৌকায় চড় ওপারে যেতে—
ও সে বৈঠা ধরে নিজের হাতে
কৃপা-তরী বেয়ে যায় ॥ (কে যাবিরে—)

ভব-নদীর তরঙ্গ দেখে
ভয় পেয়ে কাতরে যদি মাঝিকে ডাকে—
তবে সাধ্য কি তার দূরে থাকে
নাও লাগাবে কিনারায় ॥ (কে যাবিরে—)

ছেড়ে দে তোর সংসারের খেলা
চেয়ে দেখ তোর অস্তাচলে যায় আয়ুবেলা—
বিনে দয়াল মাঝির পারের ভেলা
কে তরাবে অবেলায় ॥ (কে যাবিরে—)

নামটি তোমার হয় জগবন্ধু
কৃপা করে এ দীনেরে দাও কৃপা-বিন্দু—
আমার পার হতে এই ভব-সিন্ধু
তুমি বিনে নাই উপায় ॥ (কে যাবিরে—)
দুই দিকেতে তোমরা দু'টি ভাই—
মধ্যখানে কোন্ রমণী চিনতে পারি নাই—
উহার অধরে কেন হাসি নাই
সত্য করে কও আমায় ॥ (কে যাবিরে—)

(পাঁচালী)

বেশী কথা বলে আমার নাহি প্রয়োজন।
তত্ত্ব খুলে সত্য কথায় বল বিবরণ ॥
তিন প্রকারের প্রসাদ আছে শুনি পরস্পরে।
কোন্ প্রসাদের কি মাহাত্ম্য কও দেখি আমারে ॥
তোমাদের এই মূর্তি দেখে আমার শান্তি নাই।
কোন্ পাপেতে হলে তোমরা ঠুণ্ডারাম গোসাঁই ॥
এই পর্যন্ত বলে আমি ভাব সাঙ্গ করি।
মুসলমানে বলুন আল্লা হিন্দু বলুন হরি ॥

এই বলে মনোহর সরকার পাঁচালী শেষ করে চলে গেলেন। নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে গিয়ে উপরিউক্ত টপ্পা পাঁচালীর বিষয় জানালেন। কুঞ্জবাবু তখন ঐ টপ্পা-পাঁচালীর জবাব দেওয়ার জন্য আসরে উপস্থিত হলেন। এবং দোহারপত্রের দ্বারা টপ্পা গান আরম্ভ করলেন।

তুমি কৃতকর্মা হরিশর্মা কবির কল্পনায়।
ভেবে বিষয়-বিদ্যা অনিত্য, পড়েছ বৈষ্ণব সাহিত্য,
জান্‌তে ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য, এলে উড়িষ্যায় ॥
ব্রজের মাধুর্যের ধন কৃষ্ণ যিনি—
নদীয়ায় হয়েছেন শচীর নিমাই,
জগবন্ধু বলরাম ঐশ্বর্য-রূপে কাল কাটাই।
নাম আর প্রসাদ ভিন্ন নয়, বেদ-বেদান্তে এইতো কয়,
উড়িষ্যায় সেই স্বরূপ দেখাই ;

আমায় ভক্তে দেখে পূর্ণ মূর্তি—
অভক্তে দেখে ঠুণ্ডারাম গোসাঁই ॥

(বন্দনা)

নমামি কমলাপতি তুমি অগতির গতি
সত্যময় নিত্য নিরঞ্জন।
অনাদির আদি তুমি তুমি শ্যাম অন্তর্যামী
লোকনাথ লোকের জীবন ॥
প্রলয় পয়োধি নীরে তুমি মীন রূপ ধরে
সত্যব্রতে করিলে উদ্ধার।
সমুদ্র মন্থন কালে কূর্ম রূপ ধরেছিলে
পৃষ্ঠে নিলে মন্দারের ভার ॥
বরাহ রূপেতে হরি হিরণ্যক্ষে প্রাণে মারি
পৃথিবীরে করিলে মোচন।
ধরে নরহরি বপু সাজিয়ে কশিপু রিপু
রক্ষা করলে প্রহ্লাদের জীবন ॥
বামন রূপেতে তুমি মাগিয়ে ত্রিপাদ-ভূমি
বলিরাজে করিলে বন্ধন।
নিঃক্ষত্র করিতে ক্ষিতি ধরে ভৃগুরাম মূরতি
করেছিলে ক্ষত্রিয় নিধন ॥
রামরূপে তুমি হরি রক্ষবংশ ধ্বংস করি
জয়-বিজয় করিলে মোচন।
রামকৃষ্ণ অবতার হরিয়ে ধরার ভার
সত্য ধর্ম করিলে স্থাপন ॥
বুদ্ধরূপে পূর্ণব্রহ্ম অহিংসা পরম ধর্ম
এ জগতে করিলে প্রকাশ।
কল্কি রূপে ভবিষ্যতে উগ্র খড়্গা নিয়ে হাতে
ম্লেচ্ছ বংশ করিবে বিনাশ ॥
তোমার মহিমা যত এক মুখে বলিব কত
বর্ণনার বর্ণ নাহি পাই।

কৃপা করে নিজগুণে স্থান দিও শ্রীচরণে
করজোড়ে এই ভিক্ষা চাই ॥

* * *

বন্দনাতে করে শেষ বক্তব্যে করি প্রবেশ
ভক্তগণে করি প্রণিপাত !
হরি শর্মা নাম ধরে আমাকে জিজ্ঞাসা করে
বল শুনি ঠাকুর জগন্নাথ ॥
নন্দের নন্দন যিনি শচীসুত হলেন তিনি
বলরাম নিত্যানন্দ হয় ।
শ্রীক্ষেত্র মন্দিরের মাঝে তোমরা তিন মূরতি সেজে
কে কে আছ বল পরিচয় ॥
ঈশ্বরের দু'টি রাজ্য ঐশ্বর্য আর মাধুর্য
দুই রাজ্যে থাকে দুইজন ।
বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য নাম গোলোকে মাধুর্য ধাম
কৃষ্ণ বিষ্ণু স্বরূপ লক্ষণ ॥
বৈকুণ্ঠ-বিহারী যিনি লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণু তিনি
মথুরাতে গিয়ে জন্ম লয় ।
গোলোকবিহারী হরি দ্বিভুজ-মুরলী-ধারী
রাধাকান্ত হলেন নন্দালয় ॥
দুষ্ট অসুর বিনাশিতে দ্বারকা আর মথুরাতে
লীলা করি আমি নারায়ণ ।
লীলা শেষে দ্বারকাতে জরা ব্যাধের শরাঘাতে
নিম্ববৃক্ষে লীলা সম্বরণ ॥
নিম্ববৃক্ষে হয়ে লয় ভেসে এলেম উড়িষ্যায়
ভক্তবাঞ্ছা করিতে পূরণ ।
ইন্দ্রদ্যুম্নের তপস্যায় ঠেকে ভক্তি সমস্যায়
দারু মূর্তি করেছি ধারণ ॥
আমি আর রুদ্র ব্রহ্মা তিন মূর্তি বিশ্বকর্মা
যখনে করেন নিরমাণ ।

আমার আদেশের জন্য মূর্তি রাখে অসম্পূর্ণ
পরীক্ষা করিতে ভক্তের প্রাণ ॥
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যিনি সুভদ্রা রূপেতে তিনি
মধ্যস্থানে নিয়েছেন আসন।
রুদ্র অংশে বলরাম এসেছেন উড়িষ্যাধাম
ত্রিগুণের হয়েছে মিলন ॥
জাতির কর্তা জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
জাত-কুলীনের অভিমান ঘুচাই।
অন্তরঙ্গ ভক্ত যারা পূর্ণ স্বরূপ দেখে তারা
অভক্তে কয় ঠুঁটোরাম গোসাঁই ॥
মাধুর্যের ধন কৃষ্ণ যিনি রাধার প্রেমে হয়ে ঋণী
গৌর রূপে গেলেন নদীয়ায়।
ভেবে জীবের পরিণাম তারকব্রহ্ম হরিনাম
যেচে যেচে জীবেরে বিলায় ॥
যে বস্তু করে যখন কৃষ্ণনামে নিবেদন
তাহাকেই প্রসাদ বলে কয়।
নামে নিবেদনের জন্য নাম আর প্রসাদ হয় অভিন্ন
দুই বস্তুই নিত্য ব্রহ্মময় ॥
কৃষ্ণে নিবেদন করিলে প্রসাদ ব'লে তারে বলে
ভক্তে খেলে মহাপ্রসাদ হয়।
সেই ভক্তের উচ্ছিষ্ট খেলে মহা মহাপ্রসাদ বলে
তিন প্রসাদে ত্রিতাপ দূরে যায় ॥
তোমার প্রশ্ন ছিল যাহা উত্তর হয়ে গেল তাহা
আর বেশী বলব কি কারণ।
এখন একটু ধুয়ার ছন্দে বলি কিছু মনানন্দে
শর্মার বেটা কর তাই শ্রবণ ॥
(ধুয়া)— মিছে করোনা জাতির বড়াই—
জাতির কর্তা জগন্নাথ গোসাঁই।
আমি জাত কুলীনের জাত ঘোচাতে
কুব্‌রা জোলার ফ্যান খাওয়াই ॥

যথন ছিলাম দ্বারকায় মজে ঐশ্বর্য খেলায়
আমায় দেখবে বলে কুতূহলে নারদ মুনি যায়।
তখন মহিষীরা তাঁকে শুধায়—
কও শুনি নারদ গোসাঁই ॥

শুনি সেই ব্রজধামে মজে শ্রীরাধার নামে।
কালোশশী বাজায় বাঁশী শ্রীরাধার নামে।
ও সেই মধুর প্রেমে পরিণামে—
কি হল তাই শুনতে চাই ॥

তাই শুনে নারদ মুনি কয়, এ তো মাধুর্যের দেশ নয়
এখানে ঐশ্বর্য লীলা করেন রসময়।
ও সেই মাধুর্য প্রেমের পরিচয়—
ঐশ্বর্যেতে বলতে নাই ॥

যদি কৃষ্ণ শুনতে পায় দোষী করিবে আমায়
বিনা দোষে হব দোষী শ্রীগোবিন্দের পায়।
তখন মহিষীগণ ধরিয়ে পায়—
বলে নারদ মুনির ঠাঁই ॥

আমরা বসে অন্দরে শুনব আনন্দ ভরে
সুভদ্রাকে দ্বারীরূপে রাখিলাম দ্বারে।
যদি গোবিন্দ না শুনতে পারে—
তোমার কোন চিন্তা নাই ॥

মুনি অন্দরে ব'সে ব্রজের তত্ত্ব প্রকাশে
মাধুর্য প্রেম ব্যাখ্যা করে ঐশ্বর্যের দেশে।
প্রেমের আকর্ষণে ছুটে আসে—
দু'ভাই কৃষ্ণ আর বলাই ॥

আছে সুভদ্রা দ্বারে দু'ভাই দাঁড়ায় দুই ধারে
প্রেমের টানে হস্তপদ গেল ভিতরে।
ও সেই দারুব্রহ্ম মূর্তি হেরে—
বলে নারদে গোসাঁই ॥

আমায় বল নারায়ণ যেরূপ করেছ ধারণ
কোন্ যুগেতে এই রূপেতে দেখবে জীবগণ।
তখন গোবিন্দ কয় এরূপ রতন—
কলিতে দেখাতে চাই॥
দারুব্রহ্ম রূপ ধরে তাইতে উড়িষ্যাপুরে
তিন স্বরূপে আছি ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দিরে।
শেষে বিমলারে বিয়ে করে—
বিমলার বাজার মিলাই॥

(পয়ার)

ক্ষেত্রতত্ত্ব সত্য করে দিলেম পরিচয়।
যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ সর্বশাস্ত্রে কয়॥
ক্ষেত্রে এসে যারা আমায় ঠুণ্টা বলে ভাবে।
মনের দোষে তারা এসে ঠুণ্টা দেখতে পাবে॥
অন্তরঙ্গ ভক্তে আমি পূর্ণ রূপ দেখাই।
রথস্থ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম নাই॥
গীত গোবিন্দের গান শুনিতে বেগুন ক্ষেত্রে যাই।
নিতাই ভক্তের পাকা কাঠাল চুরি করে খাই॥
ভক্ত হলে হস্তপদ সবই দেখতে পাবে।
ষণ্ডা গুণ্ডা ভণ্ডে আমায় ঠুণ্টা বলে ভাবে॥
অন্তরেতে চাও যদি সেই শুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান।
ভক্তি করে খাও গিয়া কুব্‌রা জোলার ফ্যান॥
এই পর্যন্ত দিলেম আমার ভাব সাঙ্গ করে।
জয় জগবন্ধু বলে বলুন উচ্চৈঃস্বরে॥

এইভাবে মনোহরবাবুর প্রশ্ন ও কুঞ্জবাবুর উত্তর, আবার মনোহর বাবুর প্রত্যুত্তর, পাল্টা প্রশ্ন ও কুঞ্জবাবুর জবাব এবং সর্বশেষে জোটের পাল্লা দিয়ে যদুবাবুর বাড়ীতে নবমী পূজার রাত এগারটায় নেওয়া গান দশমী দিন দ্বিপ্রহরে শেষ হলো। বিশ্রাম ও স্নানান্তে আহার করবার জন্য সবাই রাম্মার বাড়ীতে উপস্থিত। আহার তো নয় যেন বিরাট বিবাহ বাড়ীর নিমন্ত্রণ ভোজন। চার রকম মাছ, মাংস, দধি-চিনি, মিষ্টান্ন, নানা প্রকার ছানার মিষ্টি—জমিদার বাড়ীর উপযুক্ত খাওয়াই বটে।

নকুলেশ্বরের প্রথম ইনাম—সরলার কটাক্ষ

ভোজনান্তে কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—আমি বিদায়ের টাকা নিতে বৈঠকখানায় যাচ্ছি। তুমি দলের সকল গায়ক গায়িকাদের নিয়ে বৈঠকখানায় এসো।

নকুলেশ্বর—কেন, বিদায় নিতে তাদের যেতে হবে কেন?

কুঞ্জবাবু—ইনাম আনতে যাবে।

ইনামটি যে কি পদার্থ নকুলেশ্বর তা জানেন না। তথাপি আর প্রশ্ন না করে খুব বিজ্ঞের মত দলের ঘরে গেলেন এবং সকলকে সঙ্গে করে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলেন। ইনামটা কি দেখবার জন্য নকুলেশ্বর কৌতূহল ভরে নিজে কুঞ্জবাবুর পাশে গিয়ে বসলেন। দোহারপত্রগণ যথানির্দিষ্ট স্থানে বসল।

জমিদার যদুবাবুর বৈঠকখানা নায়েব, গোমস্তা, পেশ্‌কার, ক্যাশিয়ার, পেয়াদা, মৃধায় পরিপূর্ণ। মাঝখানে স্বয়ং যদুবাবু স্বর্গে দেবগণ পরিবেষ্টিত দেবেন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

কুঞ্জবাবুর ঝালকাঠির নামকরা কবির দল; তদুপরি দলে মেয়ে দোহার আছে—যাদের সুতীক্ষ্ণ সুমিষ্ট কণ্ঠে কবিগান অত্যন্ত সুরেলা হয়ে অনুরণিত হতো। দলে মেয়ে-দোহার রাখার খরচ বেশী, কিন্তু গানও করে ভাল। সুতরাং তাঁর দলের বায়না বেশী—বারো শত টাকা। বায়না বাবদ অগ্রিম পাঁচ শত টাকা নিয়েছেন; বাকী সাত শত টাকা ক্যাশিয়ারবাবু কুঞ্জবাবুর হাতে দিলেন। টাকা নিয়ে তিনি এগ্রিমেণ্টে ওয়াশীল দিলেন। কাজ তো মিটে গেল; কিন্তু ইনামটা কি তা নকুলেশ্বর বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ জমিদারবাবু গুরুগম্ভীর স্বরে ক্যাশিয়ারকে ডাকলেন—ক্যাশিয়ার বাবু!

—আজ্ঞে আদেশ করুন।

—বাৎসরিক ইনামের খাতাটা বের করুন তো।

জমিদারবাবুর আদেশ শুনে নকুলেশ্বর খুব উৎসাহিত হয়ে সেই অদৃষ্টপূর্ব ইনামের খাতার অপেক্ষায় চেয়ে রইলেন।

ক্যাশিয়ারবাবু খাতা বের করে যদুবাবুর কাছে ধরে বললেন—এই দেখুন হুজুর: প্রথম গায়িকা—এত, ২য়—এত, ৩য়—এত, প্রথম ধরতা—এত, ২য় —এত, ঢুলী—এত, বেহালাদার—এত ইত্যাদি নামে নামে যখন বলতে লাগল নকুলেশ্বর তখন ভাবলেন—ওঃ, এতক্ষণে বুঝেছি। এদের গান বাজনায় সন্তুষ্ট হয়ে জমিদারবাবু এদের পুরস্কৃত করছেন।

এখানে এই ইনামের খাতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গে বড় বড় রাজা জমিদারদের বাড়ীর নিয়ম ছিল যে যাত্রা, কবি, ঢপ্, কীর্ত্তন, জারি, রামায়ণ ইত্যাদি যে কোন দলের গানই হোক না কেন বায়নার টাকা ছাড়াও দলের প্রত্যেক গায়ক গায়িকাকে ব্যক্তিগতভাবে আলাদা পুরস্কার দান করা। কোন্ গায়ক বা গায়িকা কত পেলো তাদের নামে যে হিসাব রাখা হতো তারই নাম হচ্ছে ইনামের খাতা। পুরস্কারকেই তারা ইনাম বলতো।

নকুলেশ্বরের মনে একটু আফ্‌শোষ্ হলো। ভাবলেন—এরা সকলেই পুরনো লোক। ভাল গান বাজনা শিখেছে বলে এদের নাম খাতায় উঠেছে। কাজেই এরা পুরস্কার পাবে। আমি তো নতুন মানুষ; মূর্খ, কিছুই জানিনা। আমি তো পুরস্কার পাব না। যাক নাই বা পেলাম। ওদের মতো বড় হলে তো পাব। কিন্তু গুরুদেবের নামটি বললেন না কেন? তবে কি যেটি বামুন সেটি উপবাসী থাক্‌বে?

লিষ্ট হিসাবে প্রত্যেককে যথানির্দিষ্ট টাকা ও একখানা করে কাপড় বকশিস্ দিলেন। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের পাওনাই হলো বেশী। প্রত্যেকে পুরস্কার নিয়ে বাসায় চলে গেল। নকুলেশ্বরও যাই-যাই মনে করছেন এমন সময় পুনরায় জমিদারবাবুর গুরুগম্ভীর স্বর ধ্বনিত হলো—পেশ্‌কার বাবু!

—আজ্ঞে আদেশ করুন।

—আমার শো-কেশটা খুলে দেখুন দু'টো প্যাকেট আছে; নিয়ে আসুন তো! পেশ্‌কারবাবু শো-কেস্ খুলে দু'টি পুলিন্দা এনে বাবুর হাতে দিলেন। বাবু নিজ হাতে একটি প্যাকেট খুলে একখানা ঘিয়ে রঙের দো-রঙা শাল বের করলেন। মূল্য নাকি তার একশত টাকা। ঐ শালখানা ধরে কুঞ্জবাবুর গলায় দিয়ে বললেন—যৎসামান্য উপহার গ্রহণ করুন। আপনার গুণের পুরস্কার দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। তারপর নকুলেশ্বরের দিকে চেয়ে বললেন—এসো তো খোকা, আমার কাছে এসো। নকুলেশ্বর নির্ভয়ে গিয়ে যদুবাবুর কাছে বসলেন। বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম তোমার খোকা?

—আমার নাম নকুলেশ্বর।

—কতদিন এ দলে এসেছ?

—এই এ বছর। আপনার আসরেই প্রথম। কিছুই জানি না, নূতন মানুষ। গুরুদেবের কৃপায় এবং আপনার আশীর্বাদে সাহস করে আপনার

আসরেই জীবনে প্রথম দাঁড়িয়েছিলাম। আশীর্বাদ করবেন যেন গুরুপদে নিষ্ঠা থাকে।

জমিদারবাবু নকুলেশ্বরের সবিনয় প্রার্থনা শুনে হাসি মুখে বললেন—এই নাও আমার আশীর্বাদ। মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি—তুমি দিগ্বিজয়ী হও। এই বলে অন্য প্যাকেট খুলে পাঁচ-হাতি একখানা ভাল শীতবস্ত্র নকুলেশ্বরের গলায় জড়িয়ে দিলেন। নকুলেশ্বর অমনি ঢিপ্ করে জমিদারের পায় এবং গুরুদেবের পায় প্রণাম করলেন। পরে হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার করে কুঞ্জবাবুর সঙ্গে বাসাঘরে ফিরে গেলেন।

সেদিনই দালাল বাজার থেকে রওনা হয়ে রিকাববাজার (কমলাঘাট) লক্ষ্মী পূজার গানের বাড়ী পৌঁছতে হবে। যদুবাবুর আদেশে সুসজ্জিত হাতি দুটি নিয়ে মাহুত এসে উপস্থিত। গানের দলকে বাজার ঘাটে পান্‌সীতে পৌঁছে দেবার জন্য। নকুলেশ্বর কয়েকজনকে নিয়ে একটি হাতীর পিঠে উঠে বসলেন। বাকী কয়েকজন কেউ বা হাতীর পিঠে, কেউ বা ভয়ে হাতীতে না চড়ে হেঁটে চললো। সন্ধ্যার পূর্বেই সকলে এসে নিজেদের পান্‌সী নৌকায় আরোহণ করলো।

নৌকায় আসামাত্র প্রবাস হতে বাড়ী আসার মতো আনন্দে সবাই আনন্দিত। আজ রাত্রে নৌকা খোলা হবে না, কারণ মেঘনা নদীতে ডাকাতের ভয় আছে। বিশেষতঃ টাকা পয়সা ছাড়াও এক একটা মেয়ের গায় কম পক্ষে পঞ্চাশ ভরি সোনার গহনা—কারো বা এর দ্বিগুণও ছিল। কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—তুমি মাঝি মাল্লাদের বলে দাও, খাওয়াদাওয়া শেষ হলে যেন নৌকা নিয়ে মাঝগাঙে নোঙ্গর করে। আর ভোর চারটায় যেন নৌকা খোলে।

গুরুদেবের আদেশ মতো নকুলেশ্বর মাঝিদের নির্দেশ দিলেন। সন্ধ্যার পর বাজারের একটা চালাঘরে ঠাকুর-চাকর সকলে গিয়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগল। এদিকে নৌকার মধ্যে এক মহা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। পূজাবাড়ী কে কত টাকা পুরস্কার পেল, কার কাপড় কেমন হলো এই নিয়ে বেশ একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সকলের দেখাদেখি শেষ হলে দলের শ্রেষ্ঠ গায়িকা শেখ সরলা কুঞ্জবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো—কর্তা, কই আপনার উপহারটি তো দেখালেন না? কুঞ্জবাবু অমনি দুটো প্যাকেট বের করে শেখ সরলার হাতে দিয়ে বললেন—দেখ, কি দিয়েছে।

বড় প্যাকেট খুলে কুঞ্জবাবুর শালখানা দেখে বললো—বাঃ! বেশ শালখানা দিয়েছে! দামী শালই বটে! তারপর দ্বিতীয় প্যাকেট খুলে নকুলেশ্বরের গায়ের কাপড়খানা বের করে বলল—এটা কার?

কুঞ্জবাবু বললেন—যদুবাবু নকুলেশ্বরের উপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদস্বরূপ এই চাদরখানা দিয়েছেন। নকুলেশ্বরের নাম শুনেই সরলার মুখখানা কালো হয়ে গেল। একটু বিদ্রূপের সুরে বলল—হুঁ! কুকুরের গলায় সোনার ঘণ্টা!

প্রথম গানের রাত্রে আসরে সামান্য ভুলের জন্য শেখ সরলা নকুলেশ্বরকে অপমানসূচক কথা বলে দলের পরিচালিকা অধরমণির কাছে খুব গালমন্দ শুনেছিল। সেই রাগে সে নকুলেশ্বরকে বিষ-নয়নে দেখতো। তার সঙ্গে কোন প্রকার বাক্যালাপ পর্যন্ত করত না। কথায় বলে যাকে দেখতে না পারে তার ছায়াটাও বাঁকা। সরলার অবস্থাও হয়েছে তাই। নকুলেশ্বর নূতন এসেছে, কিছু জানে না শোনেনা। তার ভাগ্যে এত টাকা দামের একটা আলোয়ান-পাওয়া বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়ে পড়ারই মতো। নকুলেশ্বরের এ সৌভাগ্য সরলার সহ্য হবে কেন? কাজেই সে কুকুরের গলায় সোনার ঘণ্টার শ্লেষাত্মক উপমা দিয়ে নিজের মনের ঝাল মিটিয়েছে।

ঐ কথাটা পরিচালিকা অধরমণির কানে যেতেই তিনি বলে উঠলেন—কি বল্লি সরি! মুখটা যেন দিন দিন তোর খুব বেড়ে গিয়েছে, কেমন? পরের ভাল দেখে বুঝি তোর গায়ে জ্বালা ধরেছে পোড়ারমুখী? অহঙ্কার বেশীদিন থাকেনা মনে রাখিস্। শিখেছিস্ তো একটু গান গাওয়া। তাও একটি পদ বলে না দিলে নিজে তৈরী করে গাইতে পারিস্ না। তাতেই এত দেমাক্। আর যদি কুসুমকুমারীর মতো 'সরকার' হতিস্ তবে তো মানুষকে মানুষ বলে মনে করতিস্ না। দেখবি আর কিছুদিন পরে যখন এই ছেলেটাই একজন 'সরকার' হবে, তখন তোর মত সেখনীকে পায়ে তেল মাখাতে বাঁদীও রাখবে না।

অধরমণির রাগ দেখে কুঞ্জবাবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ছেড়ে দাও অধর! ছেলে মানুষকে ভুলের বশে একটা কথা বলে ফেলেছে। সেজন্য ছেলেটার সামনে ওকে ওভাবে তিরস্কার করলে হয়তো ভবিষ্যতে ছেলেটা খুব অহঙ্কারী হয়ে যাবে। তাতে ওরই পরিণাম খারাপ হবে।

অধরমণি—আপনার আস্কারা পেয়েই তো পোড়ারমুখীর মুখ এত বেড়ে গিয়েছে। কাকে কি বলে ঠিক থাকে না। দু'দিন পরে হয়তো আপনাকেই

দু'কথা বলে বসবে। ইত্যাদি নানা কথা বলে অধরমণি নকুলেশ্বরকে বললেন —তুই রাগ করিসনে বাবা। মনে যেন জেদ থাকে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে যেন এর প্রতিশোধ নিতে পারিস্।

নকুলেশ্বর মুখে কিছু বললেন না বটে, তবে মনে মনে ভাবলেন—সেখ সরলার এই বিদ্রূপ বাক্যই যেন আমার আত্মোন্নতির পথের সহায়ক হয়।

অধরমণির বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েও সেখ সরলা মুখে কোন কথা না বলে দলিতা ফণিনীর মতো মনে মনে ফুসতে লাগল।

মেঘনার বুকে—রিকাববাজার মুখে

শেষরাত্রে নকুলেশ্বর মাঝি-মাল্লাদের ডেকে বললেন—রাত শেষ হয়েছে, নৌকা খুলে দাও।

দাঁড়ি-মাঝি সকলে হাত-মুখ ধুয়ে বদরগাজীর নাম নিয়ে নোঙ্গর তুলে নৌকা খুলে দিল। নকুলেশ্বরের আর ঘুম হলো না। নৌকার ছাদে বসে তিনি মেঘনা নদীর বিস্তৃত বক্ষে আলো-আঁধারের খেলা দেখতে লাগলেন।

নকুলেশ্বর পূর্বাকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন মেঘনা নদীর বুক চিরে সদ্য ঘুমভাঙ্গা তরুণ যেন রক্ত চক্ষু মেলে ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছে; আর তার রক্তবর্ণ আঁখি দেখে রজনীর তামসীঘোর যেন ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতির এরকম ভাব পরিবর্তন দেখে নকুলেশ্বরের প্রাণেও যেন একটা ভাবের সঞ্চার হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন—শ্রীগুরুর শ্রীচরণের কৃপায় যদি আমার হৃদয়েও ঐরূপ জ্ঞান-সূর্যের উদয় হয়, তবে আমার অজ্ঞানের অন্ধকার আপনা হতে বিদূরিত হবে এবং হিংসুক-নিন্দুক পেঁচকের দল পালিয়ে যাবে।

নৌকায় পাল তুলে দিয়ে মাঝি হাল ধরে বসে আছে। দাঁড়ি-মাল্লারা বাদামের কানি-দড়ি ধরে চেয়ে আছে। সাঁ সাঁ শব্দে জল কেটে নৌকা তীব্র-বেগে ছুটে চলেছে। নকুলেশ্বর কূলের দিকে চেয়ে দেখলেন মেঘনার ভাঙনের তাণ্ডবলীলা। কোন বাগান ভেঙ্গে মেঘনার বুকে নেমে গেছে; দু'চারটি বড় বড় গাছের মাথা একটু দেখা যাচ্ছে। কারো বা বিরাট অট্টালিকাময় পুরী অর্ধেক ভেঙ্গে মেঘনার বুকে নিমজ্জিত হয়েছে, আর বাকী অর্ধেক লোভাতুরা মেঘনার গ্রাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিন গুনছে। এসব দৃশ্য দেখে নকুলেশ্বরের মনে কি যেন এক ভাবের সাড়া জাগল। তিনি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে লাগলেন—

ভাঙ্গাগড়া নিয়ে বিধাতার খেলা
মানুষের বোঝা ভার।
আজ বাজে যেথা মিলনের শঙ্খ
কাল সেথা বিচ্ছেদ হাহাকার॥
আজ বহে যেথা কল-প্রবাহিনী
স্বচ্ছ সলিল ধারা।
কাল দেখি সেথা ধু-ধু করে শুধু
তপ্ত মরু সাহারা॥
আজ দেখি যেথা স্বর্ণময় পুরী
আলোর আলেখ্য লেখা।
কাল দেখি সেথা ধ্বংসের মূরতি
শ্মশানের বিভীষিকা॥
আজ দেখি যার সম্মান অপার
সবার সেলাম লুটে।
কাল দেখি তারে সবার দুয়ারে
নতশিরে মাথা কোটে॥
আজ সাজে যিনি রাজা রাজেশ্বর
দীনের ভাগ্য নিয়ন্তা।
কাল দেখি তাঁর কক্ষে ভিক্ষাধার
পরিধানে ছিন্ন কন্থা॥
আজ যে রমণী ভুবনমোহিনী
সবে চায় ভালবাসা।
কাল দেখে তারে সকলেই করে
ঘৃণায় কুঞ্চিত নাশা॥
কত রসিকতা জানহে বিধাতা
না বুঝিয়ে করি দোষী।
যা ইচ্ছা তোমার করো গুণাধার
নকুল তাতেই খুসী॥

রাত প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই কুঞ্জবাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো। তিনি ডাকলেন —নকুল! গুরুদেবের ডাক শুনে নকুলেশ্বর কাগজ কলম নিয়ে ছুটে নৌকায়

মধ্যে গেলেন। কুঞ্জবাবু খুব হুঁকোর তামাক খেতেন। তামাক না দিয়ে তার সঙ্গে কোন কথা বলা যেত না। অধিকাংশ সময় নকুলেশ্বর তাঁর তামাক পরিবেশন করতেন। উদ্দেশ্য—যেভাবে হোক গুরুদেবের মনস্তুষ্টি করে নিজের কার্যসিদ্ধি। নকুলেশ্বর একদিন গুরুদেবের মুখে শুনেছেন—

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন ॥—অর্থাৎ গুরুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং গুরুকে সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করে নানা বিষয় প্রশ্ন করবে। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে সেই-জ্ঞানোপদেশ দান করে অজ্ঞানতা দূর করবেন।

নকুলেশ্বরের উপরিউক্ত গীতার বাক্যটি স্মরণে আছে; তাই বিষ্ণুপুরী সুগন্ধি তামাক কলিকায় সেজে টিকা জ্বেলে বৃন্দাবনী হুঁকোয় চাপিয়ে নলটি গুরুদেবের হাতে দিয়ে বললেন—আমায় ডেকেছেন?

—হ্যাঁ, ডেকেছি। এত সকালে ছাতে কি করছিলে? শরৎকালের ভোরের শিশির খুব খারাপ।

—কিছুই করছিলাম না। ছইয়ের ওপর বসে মেঘনার বুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছিলাম।

—তোমার হাতে ওটা কি?

—একটা কাগজ। পাগলের খেয়াল আর কি!

—দেখি!

নকুলেশ্বর কুণ্ঠিতভাবে কাগজখানা গুরুদেবের হাতে দিলেন। কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরের লেখা কবিতাটি পড়ে হাসতে হাসতে হুঁকার নলটি ছেড়ে দিয়ে ডাকলেন—অধর, অধর! পরিচালিকা অধরমণি বললেন—কি বলছেন!

কুঞ্জবাবু—দেখ, দেখ তোমার নকুলেশ্বর কি লিখেছে! পূর্বেই বলেছি অধরমণি বেশ শিক্ষিতা ছিলেন। কবিতাটি পাঠ করে বললেন—ওটা আমাকে না দেখিয়ে আপনার অতি আদরের গায়িকা ঐ সেখনীকে ডেকে দেখান!

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আমি আশীর্বাদ করছি তুমি দিগ্বিজয়ী কবি হয়ে গুরুর নাম-যশ রক্ষা কর।

ঢাকা রিকাববাজার লক্ষ্মী পূজাবাড়ী

যথাসময়ে নৌকা গিয়ে রিকাববাজার লক্ষ্মীপূজাবাড়ীর ঘাটে পৌছল। সেখানে ঝালকাঠির কবিয়াল উমেশ সরকারের দল বিপক্ষে গান করবে। তাদের নৌকাও ঘাটে এসে পৌছে গেছে।

কুঞ্জবাবুর নৌকার মাঝিমাল্লারা নৌকা বেঁধে উপরে যাবার সিঁড়ি ফেলতেই কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—তুই তিনটি মাঝি নিয়ে কেশবের সঙ্গে বাবুদের বাড়ী গিয়ে আমাদের পৌঁছ-সংবাদ দাও।

কেশব দত্ত হলেন কুঞ্জবাবুর ছোট-ভাই। তিনিই দলের ম্যানেজার। নকুলেশ্বর কেশব দত্তকে কাকাবাবু বলে ডাকতেন। গুরুদেবের আদেশ পেয়ে নকুলেশ্বর খুব আনন্দ সহকারে মাঝিদের নিয়ে কেশববাবুর সঙ্গে বাবুদের বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। বাবুদের বাড়ীর পথের দুই পাশে নানা প্রকার মিষ্টি, মনোহারী, খেলনাপুতুল ইত্যাদির অসংখ্য দোকানপাট; এবং রাধাচক্র ঘোড়াচক্র, সার্কাসের তাঁবু সকল মিলে বিরাট মেলা বসেছে। ভিতর বাড়ীতে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড নাটমন্দির। তার সম্মুখে পূজামণ্ডপে বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা লক্ষ্মী প্রতিমা। দেখে দেখে নকুলেশ্বরের আনন্দ আর ধরেনা।

কেশববাবু নকুলেশ্বরকে নিয়ে বৈঠকখানাঘরে নায়েব বাবুর সঙ্গে দেখা করতে তাদের আদর করে বসতে দিলেন। পরে দলে কতজন লোক আছে জানতে চাইলেন। কেশববাবু বললেন যে মাঝিমাল্লা ঠাকুর-চাকর সহ ছাব্বিশ জন লোক আছে। বলামাত্র নায়েব মশাই খোরাকীর ফর্দ লিখতে লাগলেন। তিন পালা গানে আট বেলা খোরাকী দিতে হবে। ছাব্বিশ জন লোকের চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, মসল্লা প্রভৃতি আট বেলার মত হিসাব করে ভাণ্ডার ঘরে ফর্দ পাঠিয়ে দিলেন।

একসঙ্গে এতগুলি লোকের আট সন্ধ্যার খোরাকীর পরিমাণ দেখে নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবলেন—বাপ্‌রে, এ যেন এক বিরাট বিয়ে বাড়ীর সওদা! মাঝিমাল্লারা সব জিনিষ নৌকায় নিতে লাগল। নায়েব মশাই কেশববাবুকে বললেন—মাছ তরকারী বাবদ একশত টাকা এখন দিলাম। প্রয়োজন হলে আবার জানাবেন। আর জলখাবার মিঠাই-মণ্ডা রোজ সকালে নৌকায় পাঠিয়ে দেব।

কাজ শেষ করে নকুলেশ্বর নৌকায় এসে গুরুদেবের কাছে বললেন—আমি একটু উমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করব? কুঞ্জবাবু বললেন—বেশ তো যাওনা; দেখা করে এসো।

নকুলেশ্বর উমেশবাবুর নৌকায় গিয়ে উমেশবাবুকে প্রণাম করলেন। সেই দলের পরিচালিকার নাম ছিল 'কালা' যামিনী। তার রঙটি ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তাই সকলে তাকে কালা যামিনী বলে ডাকত। কিন্তু তার নাক

মুখ অঙ্গ সৌষ্ঠবে এবং হাসিমুখের বাক্যালাপে যেন একখানি দেবী প্রতিমার মতো মনে হতো। নকুলেশ্বর তাকেও প্রণাম করলেন। যামিনী অমনি সাদরে নকুলেশ্বরকে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে বললেন—নাও একটু মিষ্টি মুখ করো। এই বলে "বাদদশার" মিষ্টি দিলেন।

'বাদদশার' মিষ্টি বলতে কি বোঝায়? পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা দুর্গাপূজার দশহরার দিন হতে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে মিষ্টিমুখ করাবার জন্য নারকেল নাড়ু, চিড়া মুড়ির নাড়ু, তিলের নাড়ু, নারকেলের নানাবিধ খাজা গজা ইত্যাদি প্রস্তুত করে রাখত এবং যার সঙ্গে দেখা হোক ঐ মিষ্টি দিয়ে মিষ্টি মুখ করাতো। এ মিষ্টির ভাগ শুধু হিন্দুরাই পেত না। মুসলমান ভাইরাও হিন্দুর এই উৎসবে মিষ্টি মুখের সাথী হতো।

দলের প্রত্যেক গায়ক ও গায়িকা ঐসব মিষ্টি তৈরী করে সঙ্গে এনেছিল। কালা যামিনীও প্রচুর মিষ্টি তৈরী করে এনেছিল। তাই দিয়ে নকুলেশ্বরকে আপ্যায়িত করে জিজ্ঞাসা করলো—এই কবিগানের প্রবাস তোমার কেমন লাগে? নকুলেশ্বর বললেন—আমার খুব ভাল লাগে এবং গানের আসরে খুব আনন্দ পাই, কিন্তু আমি কিছুই জানি না। আসরে যেতে ভয় হয়; লোকে গালাগালও করে;

কালা যামিনী—কে আবার তোমায় গালি দিয়েছে?

নকুলেশ্বর তখন পূজাবাড়ীর আসরের সকল কথা এবং সরলার ব্যবহার কথাবার্তার ধরণ সব যথাযথ বর্ণনা করলেন। শুনে কালা যামিনী বললো—ওজন্য দুঃখ করোনা ভাই। লোকে যে মাটিতে আছাড় খায় আবার সেই মাটি ধরেই ওঠে। সে ভুলের জন্য তোমায় গালি দিয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে আর ঐরকম ভুল না হয় সেজন্য সর্বদা সতর্ক থাকবে। সরলাকে শত্রু মনে না করে তোমার শিক্ষাক্ষেত্রের বন্ধু বলে জেনে মনে মনে তাকে ভক্তি করো।

বিজয়ার নমস্কার সেরে নকুলেশ্বর নৌকায় ফিরে এসে কুঞ্জবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কোন্ দল আগে আসরে যাবে?

কুঞ্জবাবু—আমি প্রশ্নের আসরের চেয়ে জবাবের আসর পছন্দ করি। কাজেই তিনপালা যখন গান তখন প্রথমদিন উমেশ সরকারের দল আগে আসরে যাবে।

প্রথম দিনের গান

রাত দশটার মধ্যে দুই দলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেল, এবং সকলে একঘণ্টা বিশ্রাম করে নিল। এগারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই উমেশ সরকারের দলের কন্‌সার্ট পার্টি ঢোল, কাঁসি, হারমোনিয়াম, বেহালা নিয়ে আসরে গিয়ে কনসার্ট আরম্ভ করল। কন্‌সার্ট অন্তে দলের গায়ক গায়িকা সকলে আসরে উপস্থিত হয়ে সমবেত কণ্ঠে 'ডাক' গান আরম্ভ করল—

ওহে গৌর সুন্দর রসেরই সাগর নদীয়া নাগর—
হরি হে দীনবন্ধু, দীনে দিন দিবে কবে।
আছি বিষম ভ্রান্তিতে, বিষয় অশান্তিতে—
ন'দে শান্তিপুরে আমায় কবে নিবে॥

অজ্ঞান-মহা তামসী তামসী বিনাশী,
গৌর শশী কবে হৃদয়-আকাশে প্রকাশিবে।
আমার চকোর নয়নে রূপামৃত পানে,
বল আনন্দ-বিমানে কবে উড়িবে॥

(অন্তরা)—জয় শচী-নন্দন ত্রিজগত বন্দন কলির কলুষনাশন।
আন্ধারি গোলোক উজলি ভূলোক, ভবলোক তারণকারণ॥
হরি ত্রিতাপবারক নরকহারক, হারক ভববন্ধন।
দাস অম্বিকা উক্তি, না চাহি মুক্তি, দেহি ভক্তি-ভূষণ॥

ডাকগান শেষ করে উমেশবাবুর দল মালসী-গান আরম্ভ করল।—
এবার ভবে এসে ভবানী গো, তোমায় ভাবি নাই একদিন।
পরম শান্তি ফেলে ভ্রান্তিতে আছি—
মাগো হয়েছি কুচিন্তার অধীন॥

মাগো যখনে হলেম ভূমিষ্ঠ, মিষ্টময় সকল,
তখন মন ছিল সরল, সমান ভাবি সুধা আর গরল।
সে ভাগ্য মা উঠাইলি, জ্ঞান-বেটাকে পাঠাইলি,
মিছে ভুলেতে ভুলালি, জ্ঞানে দিলি অজ্ঞানতার ফল॥

কুজ্ঞানে অজ্ঞান করে মা, জ্ঞান বেটা পামরে,
মায়া-মদ খাওয়াইয়ে মোরে, ঢুকায়েছে চিন্তার বাড়ী।
দিন গেল কুচিন্তার আশে, তোমায় চিন্তি কিসে,
বিয়ে করে চিন্তামণি নারী॥

সাধন করতে গুরুমন্ত্র, বশ করিয়ে জিহ্বা যন্ত্র,
করতে গেলে ধ্যান,
অমনি কুমতি কুচিন্তায় এসে,
নিমেষে মা করে দেয় অজ্ঞান।
চক্ষে হেরি চিন্তার মূর্তি, চিন্তার কার্যে হয়ে ভর্তি,
সার করেছি চিন্তাবৃত্তি, করতেছি চিন্তার চাকুরী।
চিন্তা আমার পায় দিয়েছে চিন্তা-লোহার বেড়ী॥

একে অন্নচিন্তা মহাচিন্তা, করি হাহাকার,
কখনো হই চিন্তায় জমিদার;
আমার কর্মচারী চিন্তারাম সর্দার।
হাতে নাই মা চাউলের টাকা, চিন্তা দোতালাতে থাকা,
চিন্তায় চায় আড়ানী পাখা,
চিন্তায় দৌড়াই হাওয়াই মোটরকার॥

ইত্যাদি আরো রসালঙ্কার পদযুক্ত "চিন্তার মালসী" খানা শেষ করে উমেশ বাবুর দল আসর ছেড়ে গেলে কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—দল নিয়ে আসরে যাও। ডাকগান শেষ করে ওরা যেমন "চিন্তার মালসী" গেয়েছে, তুমিও আমাদের "আশার মালসী" গানখানা গাওয়াবে।

"আশার মালসী" গানখানা সেই বছর নূতন রচনা করেছেন। ঐ নূতন মাল্সীখানা গাওয়া হবে শুনেই সেখ সরলা বলল—ও মাল্সী আমি গাইতে পারব না। ওগান আমার ভাল তালিম হয়নি।

সরলার কথা শুনে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে গিয়ে বললেন—"আশার মালসী" গান সরলা গাইতে চায়না; তার নাকি ভাল তালিম হয়নি। কুঞ্জবাবু বললেন—সরলা "হেড্" গায়িকা। সে যদি ওটা না গাইতে পারে তবে অন্য একখানা পুরানো মালসী গাওয়াও গিয়ে।

কুঞ্জবাবুর এই কথা শোনামাত্র অধরমণি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে কুঞ্জবাবুকে বলে উঠলেন—ঐ সেখনীর জন্য যে আপনার খুব দরদ উথলে উঠছে দেখছি। কেন, আপনার আদরের গায়িকা মাসে মাসে ১২৫।১৫০ টাকা মাহিনা গুনতে পারে আর আসরের বেলায় তিনি নূতন গান গাইতে পারবেন না বললেই হলো? ঐ নূতন গান ওকে গাইতেই হবে; না হলে পনের দিন হেমারতি (অর্থাৎ মাহিনা কাটা যাবে)। এই বলে নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল—কিরে নকুল, ও গানটা তোর ভাল মুখস্থ আছে? বই না দেখে বল্‌তে পারবি তো?

নকুলেশ্বর—ওটা তৈরী হবার সাথে সাথে আমি জলের মতো মুখস্থ করে ফেলেছি।

অধরমণি—তবে যাও, ঐ গানটাই গাওয়াবে। যে বেটাবেটি না পারবে তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে।

কুঞ্জবাবু—দেখ অধর, ওভাবে আস্কারা দিয়ে ছেলেটার মাথা খেওনা।

অধরমণি—কেন, পূজাবাড়ীর কথাটা কি মনে নেই? ছেলেটা নূতন মানুষ। একটা ভুল করেছিল। সেজন্য আসরের মাঝে তাকে কি অপমানটা করেছিল? আজ নূতন গানটা ছেলেটা বলে দিতে পারবে, আর ঐ পুরনো ঘাগী আপনার সোহাগের গায়িকা সেখ্‌নী গাইতে পারবেনা। তবু তাকে কিছু বলা যাবেনা কেন? তিনি কি খড়দা'র মা গোসাঁই নাকি? যা নকুল, তুই ঐ গানটাই বলবি। তারপর দেখে নেব কত ধানে কত চাল।

এসব শুনে সরলা আজ আর কোন কথা না বলে সেজেগুজে আসরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। দলের অন্যান্য দোহারপত্র ইতিমধ্যে আসরে রওনা হয়ে গেছে।

সরলার সঙ্গে সমঝোতা

গানের বাড়ীর দরজায় নদীর ঘাটে পান্‌সী বাঁধা ছিল। সেখান থেকে বাবুর বাড়ীর মধ্যে যেতে রসি দুই পথ হেঁটে যেতে হয়। সরলা সকলের শেষে নৌকা হতে উঠে একা রওনা হয়ে পথের মাঝখানে একটি বটগাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নকুলেশ্বর গুরুপদে প্রণাম করে গানের বই নিয়ে নৌকা থেকে উঠে বটগাছের কাছকাছি গিয়ে দেখেন আলো আঁধারের মধ্যে যেন একটা মনুষ্যমূর্তি

দাঁড়িয়ে আছে। নকুলেশ্বর একটু থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দেখলেন যে সে সরলা। নকুলেশ্বর ভাল মন্দ কিছু না বলে এক পাশ কেটে চলে যাবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। সরলা কাছে এসেই নকুলেশ্বরের হাতখানা ধরে বলল—তোমরা আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা আরম্ভ করেছ কেন?

এতদিন নকুলেশ্বর সরলার সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেননি। কিন্তু আজ আর কথা না বলে পারলেন না। তিনি বললেন—আপনি কি বলছেন? আমরা কি শত্রুতা করছি? আমি আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

সরলা—দলের সকলের সঙ্গে কত কথাবার্তা বল, হাস খেল। আর আমার সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা একবার ফিরেও চাওনা। আমি এমন কি অপরাধ করেছি?

নকুলেশ্বর—না না, অপরাধ কিছুই করেননি। তবে আমি নূতন মানুষ। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় আমিতো তা জানিনা। পাছে কি বলতে কি বলে আবার গালাগাল শুনবো সে ভয়ে আমি আপনার সঙ্গে কোন কথা বলতে সাহস পাইনা।

সরলা—থাক্ থাক্ খুব হয়েছে। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দিওনা। পূজাবাড়ীর আসরে একটা কথা বলেছি বলে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই আমার সঙ্গে পরম শত্রুর মতো ব্যবহার করতেছ। আমি তোমার ভালর জন্যই ও কথাটা বলেছিলাম। দেখবে ভবিষ্যতে তোমারই উপকার হবে। সেই সামান্য কথার জন্য আজ একটা নূতন গান দিয়ে আসরে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে আমায় অপমান না করলে কি আর শত্রুতা শোধ হয়না?

নকুলেশ্বর - আমি কি করবো? গুরুদেবের আদেশ অমান্য করে চলার সাহস আমার নেই। তিনি যা আদেশ দিয়েছেন আমায় তা পালন করতেই হবে।

সরলা—তবে তোমার হাত ধরে অনুরোধ করে বলছি—একান্তই যদি সেই গানটা গাইতে হয় তবে, আমার পেছনে পদগুলো বলার সময় একবার করে না বলে দু'তিন বার করে বলবে। যেন আমি কোন পদ ভুল গেয়ে লজ্জা না পাই। তাতে তো আর তোমার গুরুবাক্য লঙ্ঘন হবে না।

নকুলেশ্বর—আচ্ছা সেভাবেই বলব। পদের জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি এমন ভাবে পদগুলো বলে দেবো যেন আসরের শ্রোতারা আপনার গাইবার আগেই পদগুলি বুঝে নিতে পারে। তখন আপনার একটু ভুল হলেও কেহ লক্ষ্য করবেনা। এখন চলুন, কন্সার্ট শেষ হয়ে গেছে।

নকুলেশ্বরের কথা শুনে সরলা খুব খুশী মনে আসরে গিয়ে ডাক-গান শেষ করল। এখন সেই নূতন মাল্সী গানখানা আরম্ভ হবে। সরলাই দলের শ্রেষ্ঠ গায়িকা—আসরের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে সবার আগে তারই গান ধরতে হবে। নকুলেশ্বর তার পেছনে দাঁড়িয়ে গানের "চিতান" পদ বলতে লাগলেন—

ভবে আসিতে আসিতে, ওমা অসিতে, আশাতে ভুলে রয়েছি।
আমার যে আশাতে ভবে আসা হলনা সুসার,
আশার দেশে আশার বশে, অসার আশার পসার খুলেছি ॥

যখন জননী জঠরে বাসা, কঠোরে তোর চরণ আশা,
হতো কতবার, দেখে অসার অন্ধকার,—
আশা ক্ষেত্রে আসা মাত্রে, আশা-সূত্রে বেঁধেছে আবার।
ভুলায়ে তোর চরণ আশা, দিলে দুরন্ত কু-আশা,
ঠিক যেন নিশির কুয়াসা, দুই নয়নে মায়ার অন্ধকার ॥

আশাহি পরমং দুঃখ মহতের বাক্য,
নৈরাশ্য পরমং সুখ, সতত তাই শাস্ত্রে ঘোষে।
কুলকুণ্ডলিনী গো, আর কতকাল রাখবি আমায়,
বেঁধে আশা-পাশে ॥

সিদ্ধির দেশে সিদ্ধি নাই মা, থাকলে অষ্টপাশ,
ও সেই অষ্টপাশে কষ্ট কিসে, আশার পাশকে যে করেছে নাশ।
যে করে তোর বাসায় বাসা, তার থাকলে মা ভবের আশা,
পুনরায় হয় ভবে আসা, যেতে নারে সিদ্ধির দেশে।
উঠিতে বসিতে মা অসিতে, আছি মিছে আশাতে মিশে ॥

হলো আশা আমার গুরুমন্ত্র, আশা আমার বাদ্যযন্ত্র,
আশা উপচার, করতে নারি পরিহার,
আশা আমার প্রাণের দোসর, আশার সঙ্গে আহার আর বিহার।
আশা গীতা ভাগবত পুথি, আশা আমার মাথার ছাতি,
আশা পরিধানের ধুতি, আশা আমার গলার মোতিহার ॥ ইত্যাদি

'আশার মালসী' গান শেষ হলো। নকুলেশ্বর গানের প্রত্যেক পদ সরলার পেছনে দু'তিনবার কিন্তু অন্যান্য গায়ক গায়িকার বেলায় একবার মাত্র বলায় তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। তারা একটু বিদ্রূপের সুরে নকুলেশ্বরকে বলল—বলি কিহে নকুল ভায়া, আজ শুকনো গাঙে বান ডাকল নাকি?

নকুলেশ্বর—তার মানে? আপনাদের হেঁয়ালির অর্থ তো আমি কিছু বুঝলামনা, খুলেই বলুন না ব্যাপারটা কি?

—না না; এমন কিছু নয়। তবে যার সঙ্গে নয় দশ দিন কোন বাক্যালাপ নেই আজ তার ওপর বড় দরদ দেখা যাচ্ছে কিনা তাই আর কি!

নকুলেশ্বর—কি এমন দরদ দেখলেন?

মানদা নামে অন্য একটি অল্প বয়স্ক গায়িকা ছিল। সে একটু মুচ্‌কী হেসে বলল—গানটা বলে দেবার সময় আমাদের পেছনে একবার আর সরলার পেছনে দু'তিনবার বলতে দেখলাম কিনা, তাই! আমরা একটু জানতেও পারলাম না এ মান-ভাঙ্গার পালাটা কোন সময়ে হয়ে গেল। জানলে না হয় আমরা আনন্দে একটু হুলুধ্বনি দিতাম!

নকুলেশ্বর—আপনারা সবাই ভুল বুঝেছেন। সরলা একজন নামকরা বড় গায়িকা। আর আমি একটা অপদার্থ অজ্ঞান ছেলেমানুষ; কবিগানের কিছু জানিনা। আজ একটা নূতন গানের পদ বলা নিয়ে তাকে আসরে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে অপদস্থ করে আমার কি উন্নতি বা লাভ হতো বলুন?

মানদা—সেদিন পূজাবাড়ীর আসরে সে যে আপনাকে অসংখ্য লোকের মাঝে অপমান করেছিল সে কথাটা কি ভুলে গেলেন?

নকুলেশ্বর—আমি নূতন মানুষ; নাই কোন গুণ, নাই কোন ক্ষমতা। আমার মানই বা কি, অপমানই বা কি? আর সরলা হলো দলের আগ্‌ আসরের নামজাদা গায়িকা। কবিগানের সমাজে সকলের কাছে সে সম্মানের পাত্রী। আমার মা আমাকে ছোট কালে বলেছিলেন—মানী লোককে কখনো অপমানসূচক কথা বলবেনা। বয়োজ্যেষ্ঠ জনকে প্রণাম দিবে—সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। মানী লোকের মান রক্ষা করে চললে ভগবানও তাকে ভালবাসেন। সম্মানী লোককে সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যায়। আমি মাতাঠাকুরানীর সেই বাক্য জীবনে সব সময় স্মরণ রেখে চলতে চেষ্টা করি। আমাকে সরলা যদিও মন্দ বলে থাকে, সে আমার ভালোর জন্যই বলেছে এটাই

আমি মনে করি। তোমরা আশীর্ব্বাদ করো সে ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন আমার জীবনে না ঘটে।

এই বলে নকুলেশ্বর গুরুদেবের কাছে গেলেন। কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—গানখানা কেমন হলো? সরলা পদগুলো গাইতে পেরেছে?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ পেরেছে; তবে প্রত্যেক পদ দু'তিনবার করে বলে দিতে হয়েছে।

কুঞ্জবাবু হেসে বললেন—বেশ করেছ। গুণী লোকের কাছে নতি স্বীকার করে চলাই মহতের লক্ষণ। মহাভারতে কয়েকটি শ্লোকে কি বলেছে শোন—

"ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশব ব্যুপশাম্যতি।'
'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ॥'
'ন পাপে প্রতিপাপং স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।'
'ধর্ম্মেণ নিধনং শ্রেয়ঃ ন জয়ঃ পাপকর্ম্মণা॥'

অর্থাৎ শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে ভাগবত বর্ণনা করতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুরের উপদেশে বলেছিলেন,—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! শত্রুকে প্রীতি দ্বারা, ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে। পাপকর্মে ধর্মরক্ষা হয় না, ধর্মপথে চলতে গিয়ে মরণও ভাল।" তারপর বললেন—এই ভাগবত বাক্যটি স্মরণ রেখে চলিও। ভবিষ্যতে সকলের প্রীতিভাজন হয়ে আত্মোন্নতি করতে পারবে।

তারপর কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—এখন যাও; বিপক্ষ দলের সখী-সংবাদ গানটা শুনে এসো এবং জবাব করার চেষ্টা কর।

নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে শুনলেন উমেশ সরকারের দল গান আরম্ভ করেছে। গানখানার বিষয়বস্তু হলো—পাশা খেলা। একদিন নিভৃত নিকুঞ্জে বসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারানীর সঙ্গে পণ ধরে পাশা খেলছেন। পণ হলো—শ্রীকৃষ্ণের যদি হার হয় তবে তাঁর মোহনবাঁশীটি শ্রীরাধাকে দিতে হবে; আর যদি রাধারানীর হার হয়, তবে তাঁর গলার গজমোতির মালাটি শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হবে। সুচতুরা ললিতার ছলনায় শ্রীকৃষ্ণ হেরে গেলেন। সখিগণ সকলে অমনি হাসতে হাসতে শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে বাঁশীটি কেড়ে নিয়ে রাধারানীকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশী হারিয়ে লজ্জায় অধোমুখে বসে আছেন। তখন রঙ্গদেবী ব্যঙ্গ করে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—

১ম ফুকার

বল দেখি কমলাঁখি, নুনের জাহাজ ডুবল নাকি
কেন আছ অধোমুখী, কি দুঃখে আঁখি ঝরে ॥

২য় ফুকার

বাঁশী হারা হয়ে কানাই, এখন কি বাজাবে সানাই,
বাঁশী কেড়ে নিয়েছে রাই, এখন উপায় হবে কি ?

৩য় ফুকার

চোরের বুদ্ধি সিঁদকাঠিতে, পারবেনা আর সিঁদ কাটিতে,
সিঁদকাঠি হারয়েছে, হাতের বাঁশী মুখের হাসি একসঙ্গে গেছে ॥

ডাইনা

নারীর সঙ্গে পাশা খেলে, শ্যাম তুমি আজ হেরে গেলে,
কোন লাজে আর এ গোকুলে, আজ তুমি দেখাবে মুখ ॥

নকুলেশ্বর গানের ফুকার তিনখানি ও ডাইনা খানা লিখে নিয়ে কুঞ্জবাবুকে দেখালেন। কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গানের জবাব করতে পারবে ?

নকুলেশ্বর বললেন—কি বলতে হবে একটু আভাস দিলে চেষ্টা করতে পারি।

কুঞ্জবাবু বললেন—এ গানের জবাব তেমন কোন গভীর চিন্তার বিষয় নয়। চতুরা গোপিনীদের সঙ্গে চতুরতা করতে হবে। তাই বুঝে যা হয় করো।

নকুলেশ্বর গুরুদেবকে প্রণাম করে একটু নিরিবিলি বসে জবাব চিন্তা করতে লাগলেন। চক্ষু মুদে নকুলেশ্বর দেখলেন যেন তাঁর গুরুদেব এসে হাসতে হাসতে বললেন—কি ভাবছ ? যা বলি তাই করো—

১ম ফুকারের জবাব

বললে, বল বল কমলাঁখি, নুনের জাহাজ ডুবল নাকি,
কি জন্যে আঁখি ঝরে, জাহাজ ডোবে নাই ধোঁকায় পড়ে।
অষ্ট সখী আট খালাসী, সারেং ছিল রাই রূপসী,
জাহাজ পথ ভুলে বিপথে আসি, ঠেকেছে ঠকের চরে ॥

২য় ফুকারের জবাব

বললে, বাঁশী হারা হয়ে কানাই, এখন কি বাজাবে সানাই,
রাই করেছেন বাঁশী জয়, হবে জয় না রাধার পরাজয়।
আসিলে গভীরা নিশি, আপনি বেজে উঠবে বাঁশী,
বাঁশী ফেলে দিবে রাই রূপসী, কাল কুটিলা মাসীর ভয় ॥

৩য় ফুকারের জবাব

বললে, চোরের বুদ্ধি সিঁদকাঠিতে, পারবেনা আর সিঁদ কাটিতে,
সিঁদকাঠি হারায়েছে, আমার বুদ্ধির গোড়া ঠিক আছে।
তোরা যত ব্রজনারী, চোরের বউ বাটপাড়ের হাঁড়ি,
আবার চুরি বিদ্যার করিগরী, শিখিব তোদের কাছে॥

ডাইনার জবাব

নারীর সঙ্গে পাশা খেলায় হলেম অপমান,
জাননা কি এ সংসারে প্রকৃতি প্রধান।
গুণ বিচারে শ্রেষ্ঠা নারী, জগৎ হারে আমিও হারি,
সাধ করে কি ত্রিপুরারি, বক্ষে ধরেন নারীর পাও।
আমাকে ফেলে ফাঁকতালে, তালে তালে করতাল বাজাও॥

এই ভাবে নকুলেশ্বর জবাবখানা তৈরী করে কুঞ্জবাবুর কাছে গিয়ে বসলেন। কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি, জবাব তৈরী হলো?

—হয়েছে কিনা জানিনা। তবে আপনার বলা কথা কয়টাই মুখস্থ করে এনেছি।

—সে কি রে! আমি আবার তোকে কখন কি বলেছি।

—আমি যখন নির্জনে বসে খুব চিন্তা করছিলাম, তখন যেন আপনি আমার কাছে গিয়ে অভয় দিয়ে বললেন—ভয় কিরে, আমি যা বলি তাই কর। তখন আপনি যে কয়টি কথা বলেছেন আমি তাই বলছি, আপনি শুনুন।

কুঞ্জবাবু খুব উৎসাহ সহকারে বললেন—কই, কি বলেছি বল দেখি!

নকুলেশ্বর তখন জবাবের সব পদগুলি বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত শুনে কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে কোলের উপর বসিয়ে বললেন—বেশ! বেশ হয়েছে। তবে আজ হতে মনে রেখো—যখনি যে কোন বিষয় চিন্তা কর, গুরুপদে সমর্পণ করে দিয়ে অন্তরে গুরুমূর্তি চিন্তা করলে, গুরুরূপে শ্রীভগবান এসে অভয়বাণী প্রদান করে তোমার সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করবেন।

গুরুদেবের কথা শুনে নকুলেশ্বরও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—যদি জীবনে কখনো কবি হতে পারি, তবে আসরে যাওয়ার আগে শ্রীগুরুর শ্রীমূর্তি ধ্যান না করে, অন্তরে অন্তরে তাঁর অনুমতি না নিয়ে কখনো কবিগানের আসরে পদার্পণ করব না।

কুঞ্জবাবুর পদধূলি গ্রহণ করে নকুলেশ্বর দল নিয়ে আসরে গেলেন ও সখী সংবাদের জবাবখানা গাওয়াতে আরম্ভ করলেন। আজ আর নকুলেশ্বরের যেন কোন ভয় ভাবনা নেই। সর্বদাই মনে হচ্ছিল যেন তাঁর গুরুদেব পেছন থেকে পদগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। নির্ভুলভাবে জবাবখানা শেষ করে আনন্দ সহকারে নকুলেশ্বর গুরুদেবের আদেশানুসারে একখানি 'বেড়গান' অর্থাৎ প্রশ্ন লুকিয়ে আছে এমন গান গাওয়াতে আরম্ভ করলেন।

গানখানার বিষয়বস্তু হলো এই—কদমতলার ঘাটে জল আনতে গিয়ে কেলি-কদম্ব বৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে এসে, শ্রীরাধারানীকে ভয় দেখাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে কালো ভূত কল্পনা করে আয়ান-ভগ্নী কুটিলা রাধারানীকে ভূত সম্পর্কে সাবধান করে বলছে—

(চিতান) ব্রজে কৃষ্ণলীলা মধুর খেলা, প্রেমিকা প্রেমে বিহ্বলা,
প্রেম বিবাদী কাল কুটিলা, সে প্রেমের বাদী।
যেমন দেখে পাপী রত্নাকরে, জল ছিলনা রত্নাকরে,
অপ্রেমিকে দেখলে পরে, শুকায় প্রেম-নদী॥

(১ম ফুকার) একদিন গোষ্ঠ খেলা অবসানে নাগর কালিয়া,
কেলি-কদম্বের মূলে খেলে হেলিয়া দুলিয়া।
কাল কুটিলা গিয়া জলে, শ্যামকে দেখে কদম তলে,
জল ভরা কলসী ফেলে, ঘরে যায় পালিয়া॥

ব্যস্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বলে রাধিকারে
সোনা বউ তুই থাকিস ঘরে, হয়ে শত সাবধান।
কালো ভূতের ভয় লেগেছে,
জলের ঘাটে কদম গাছে, ভূতের বাসস্থান॥

(ডাইনা) কালোভূত এসেছে দেশে, কদমতলা রইল বসে,
ঘাড় ভেঙ্গে খায় রক্ত চুষে, কুলবধূ যদি পায়।
ঘরের বাহিরে হলে পরে, কখন জানি ভূতে ধরে,
জল আনিবার ছলা করে, যাসনেলো বউ যমুনায়॥
কলসী কাঁখে দেখে যদি সুন্দরী যুবতী,
দৃষ্টি করে তাহার প্রতি, নষ্ট করে জাতিমান।
পড়ে সে ভূতের কবলে অকালে যায় প্রাণ॥

(২য় ফুকার) দেখলেম কুটকুটে বিদঘুটে কালো সে ভূতের চেহারা,
ও তার কটীতটে পীতধটি গলে গুঞ্জছড়া।
অধরে মুরলী ধরে, হাসিতে উদাসী করে,
কুলবধূ দেখলে পরে, করে চোখ ইসারা॥
সকাল সন্ধ্যায় কান পেতে রাই থাকিস গৃহকাজে,
শুনতে পাবি মাঝে মাঝে, কদম গাছে ভূতের গান॥

(অন্তরা) কালোভূত দেখে যমুনার পাড়ে, পরাণ কাঁপে ভূতের ডরে।
তারে ঘরের বাহির করে ছাড়েগো—
ভূতে যার উপরে নজর করে॥
রাধেগো, বার ভূত তার সঙ্গে আছে, অঙ্গভঙ্গি করে নাচে,
কখন কখন কদম গাছে, লাফ দিয়ে চড়ে।
ও তুই একলা গেলে জলের ঘাটে গো রাধে,
তোরে কখন জানি ভূতে ধরে॥

(পরচিতান) আছে কদমতলায় ভূতের থানা, ভূত মিলেছে বার জনা,
তাইতে তোরে করি মানা, ওপথে যেতে।
ও সেই ভূতের দৃষ্টি পড়ে যদি, হবে তোর অসাধ্য ব্যাধি,
খাটবেনা মন্ত্র ঔষধি, সে ভূত ছাড়াতে॥

(৩য় ফুকার) রাধে! নূতন ধরন ভূতের গড়ন আঁখি বাঁকা বাঁকা,
ও তার আজানুলম্বিত ভুজে নর রক্ত মাখা।
করেতে পাচনী ধরা, ঠোঁট দুটি তার রক্তে ভরা,
ভূতের মাথায় মোহন চূড়া, তাতে ময়ূর পাখা॥

এই ভাবে প্রথমে জবাব ও পরে প্রশ্নের গানখানা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসরে বিরাট জন সমুদ্রে এক আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সকলেই নকুলেশ্বরের নির্ভিকতা ও বাচন ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে তার ভবিষ্যৎ কবি জীবন সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করতে লাগল।

আসরের সম্মুখে বসা একজন বিশিষ্ট প্রবীন শ্রোতা নকুলেশ্বরকে ডেকে বললেন—আচ্ছা বাবা! তুমি ছেলেমানুষ এত লোকের মধ্যে জবাব বলতে তোমার প্রাণে একটু ভয় হলো না?

নকুলেশ্বর নতশিরে বললেন—না, ভয় করবে কেন? আমি তো নিজের

কৃতিত্বে কিছু বলিনি। গুরুদেব আমাকে যা বলিয়েছেন, আমি তাই বলেছি। আমার তো ভয় পাবার কোন কারণ নেই!

নকুলেশ্বরের গুরুপদে একনিষ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্ণ বাক্য শুনে সেই প্রবীন রসজ্ঞ শ্রোতা তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—ভবিষ্যতে তুমি এক নির্ভিক ও সুবক্তা কবি হতে পারবে। নকুলেশ্বর সেই শ্রোতাটির পদধূলি নিয়ে আসর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কবিগানের শ্রোতা—কবিগান ও তরজাগান

এখানে পাঠকদের মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে শ্রোতা তো সবাই; যার কান আছে সেই শোনে। তবে একটি শ্রোতার উপরে রসজ্ঞ বিশেষণটি বসান হলো কেন?

এর উত্তরে কবিগানের শ্রোতাদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা অবশ্য দরকার। না হলে পূর্ববঙ্গের কবিগান সম্পর্কে যে কোন আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। কারণ সঙ্গীতের শ্রোতাই আসল সম্পদ। কবিয়ালের ভাষায়—

শ্রোতাহীন সভায় এসে,
কি রস দিবে কবি কাব্যরসে,
উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দেশে,
রজকের কি প্রয়োজন?

সুতরাং শ্রুতি শক্তি থাকলেই শ্রোতা হওয়া যায়না। কবি গানের রসজ্ঞ এবং বিজ্ঞ শ্রোতা হতে হলে নিজের ভিতরে একটু কাব্যের ছোঁয়াচ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং রসের উৎস থাকা একান্ত প্রয়োজন।

তরজা গানের শ্রোতা অনেক পাওয়া যায়। কারণ তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজ বোধগম্য; যেমন—

প্রশ্ন—চক্ষু দিয়া বংশ জন্মে কার?

উত্তর—ইক্ষু দণ্ড এবং বাঁশ।

প্রশ্ন—মাতৃগর্ভে বসে স্তব করে কে?

উত্তর—ভীষ্মদেব—গঙ্গার পুত্র। তিনি গঙ্গায় নেমে স্তব করেন। ইত্যাদি সামান্য সাধারণ কথা নিয়ে তাদের তরজা গান হয়। কিন্তু কবিগানের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাদের আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি সবই শাস্ত্র সম্মত। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী, বেদ, উপনিষদ, কোরান্, বাইবেল ইত্যাদি

ধর্মগ্রন্থের রহস্য উদ্ধার করা এবং তাহার যুক্তি সঙ্গত সমালোচনা দ্বারা রসিক শ্রোতাদের আনন্দ পরিবেশন করাই কবিয়ালদের টপ্পা ও পাঁচালীর উদ্দেশ্য। তা ছাড়া এমন একটি জিনিস তারা পরিবেশন করেন যা তরজা গানের শ্রোতাদের তো দূরের কথা স্বয়ং তরজা গায়কদের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। সে বিষয়গুলি হল—গানে প্রশ্ন ও গানের মাধ্যমে সেই প্রশ্নের জবাব। পূর্ববঙ্গের কবিগানের এ এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই গানগুলিও শাস্ত্র সম্মত এবং তার জবাবও শাস্ত্র, লোকাচার, সহজ বুদ্ধি ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত ও গীত হয়। এই জাতীয় গানগুলির মধ্যে আবার আলাদা আলাদা শ্রেণী বিভাগ থাকে—যেমন সখী-সংবাদ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার বিষয়বস্তু নিয়ে, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর, বিরহ, রথযাত্রা, রাসলীলা, বসন্ত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে রচিত গানগুলি এক কথায় সখী সংবাদ নামে অভিহিত হয়। এর প্রত্যেকটি গানের মধ্যে কবি বিভিন্ন কাব্যরসের পরিবেশন করে থাকেন। রস শাস্ত্রে বলে রস দশটি, যথা—

শৃঙ্গার বীর বীভৎস রৌদ্র হাস্য ভয়ানকা।
করুণাদ্ভুত শান্তাশ্চ বাৎসল্যশ্চ রসা দশ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দশবিধ রসের রসিক বলে রসরাজ বা রসময় নাম ধারণ করেছেন। যে যেমন রসের রসিক তিনি তার ভিতরে তেমন রসের অনুভূতিই লাভ করে থাকেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী কংস-বধ লীলা প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে ভাগবত বর্ণনাচ্ছলে বলেছিলেন—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ, স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্,
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা, স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং, তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

ভাঃ ১০।৪৩।১৭

অর্থাৎ সর্বরস-কন্দর্প-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে বলরাম সহ প্রবেশ করলেন, তখন তার অঙ্গে দশ প্রকার রসেরই আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু সকলে তা দেখলেন না। যে যেমন ভাবুক, যে যেমন রসিক সে তাঁকে সেই ভাবেই দেখলেন। যেমন,—

নারীরা শৃঙ্গার রসে মদন ভাবিল।
রাজগণ বীর রসে চরণ সেবিল॥

অজ্ঞেরা বীভৎস রসে দেখে বিকটরূপ।
মল্লগণ রৌদ্র রসে দেখে বজ্র স্বরূপ ॥
গোপগণ হাস্য রসে স্বজন ভাবিল।
কংস ভয়ানক রসে মৃত্যুকে স্মরিল ॥
যোগীরা করুণ রসে পরতত্ত্ব ভাবে।
বৃষ্ণিগণ শান্ত রসে দেবজ্ঞানে সেবে ॥
দুষ্টেরা অদ্ভুত রসে নত করে মাথা।
অনুগত হয়ে থাকে ভেবে শাস্তি দাতা ॥
পিতামাতা বাৎসল্যেতে করে পুত্র জ্ঞান।
দশবিধ রসে খেলে কৃষ্ণ ভগবান ॥

কবির দলের কবিরা অর্থাৎ সরকার মহাশয়েরা ঐ সব গানের মধ্যে দিয়া নানাবিধ রসের পরিবেশন করে থাকেন।

যাঁরা প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা তারা গানগুলির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একাগ্র-মনে শ্রবণ করে ভাবগুলি ও গানের ভাষান্তরালে লুক্কায়িত প্রশ্নগুলি স্মরণ রাখেন। তারা বিপক্ষ সরকারের কাছে ঐ জাতীয় পদগুলির সরস জবাব শুনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন।

পূর্ববঙ্গের কবিয়ালগণ খুব জোর দিয়ে বলে থাকেন যে এই জাতীয় প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা পূর্ববঙ্গের ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে ভিন্ন অন্যত্র অত্যন্ত দুর্লভ।

এমন অনেক শ্রোতা ছিলেন যারা গানের জবাবে এমন আত্মহারা হয়ে থাকতেন যে সরকার মহাশয়েরা জবাবের ফুকারের ত্রিপদীটি বলবার সময় দুই পদ বলতেই তারা আগেই শেষ পদটি বলে নেচে উঠতেন। এ কি সামান্য অনুভূতি! কবির মনের ভাবটা গ্রহণ করে তার ভাবের অভিব্যক্তি যাদের মুখে বক্তার বক্তৃতার পূর্বেই ব্যক্ত হয়, তাদের শ্রোতা না বলে রসজ্ঞ কবি বললেও অত্যুক্তি হয়না। এই জন্যই পূর্বোক্ত শ্রোতাটির পূর্বে রসজ্ঞ বিশেষণটি বসান হয়েছে।

সরলার প্রশংসা—সেকালের গুরু-শিষ্য

নকুলেশ্বর আসর হতে এসে গুরুপদে প্রণাম করতেই কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন--কি করে এলে? আজ আবার কোন ভুল করে গালাগালি খাও নি তো?

নকুলেশ্বর জবাব দিবার আগেই আজ সরলা হাসতে হাসতে বলল—না কর্তা, আপনার নকুলেশ্বর আর সে নকুলেশ্বর নেই। এই কয়দিনের মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল পরিবর্তন হয়ে গেছে। আপনি তো আসরের কাছে যান নি ; গেলে ওর ভাবভঙ্গি ও বলার ছন্দ শুনে অবাক হয়ে যেতেন।

শেখ সরলার মুখে আজ নকুলেশ্বরের প্রশংসা শুনে নকুলেশ্বরের সেই মাতৃস্বরূপিনী অধরমণি অমনি ব্যঙ্গ স্বরে বলে উঠলেন—থাক, থাক ; তোর আর সুখ্যাতি গাইতে হবে না। আকাশে চাঁদ উঠলেই দশজনে দেখবে। হাতের কঙ্কণ দর্পণ দিয়ে দেখতে হয় না। তুই থাম। ভূতের মুখে রাম নাম ভাল লাগে না।

অধরমণির এইসব কটূক্তি শুনেও সরলা সেদিন তার কোন প্রতিবাদ করলো না। বরং নিজেকে যেন অপরাধী মনে করে মুখ নীচু করে বসে রইল।

কুঞ্জবাবুর দলে পুরুষদের মধ্যে নকুলেশ্বরের সমবয়সী কেহ ছিল না। তবে গায়িকাদের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত মানদা নাম্নী মেয়েটি ছিল খুব চটুল। গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলে ঠোঁট পোড়া। মুখে কোন কথা এলেই ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্তা না করেই চট্‌পট্‌ বলে ফেলত। শেখ সরলার মুখে নকুলেশ্বরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে নকুলেশ্বরকে সম্বোধন করে বলল—কি গো নকুলদা, আজ কার মুখ দেখে আপনার রাত ভোর হয়েছিল ? ভাগ্যটা যে বড় সুপ্রসন্ন দেখছি। বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ার মতো।

নকুলেশ্বর বললেন—সে কি ! তুমি কি বলছ! তোমার কথার মাথা-মুণ্ড আমি কিছু বুঝলাম না। পরিষ্কার করে বল।

মানদা একটু মুচকী হেসে বলল—বলব আর কি ! এতদিন পরে রসনাহীন কুমীরের মুখে যে রসের সন্ধান পেলেন এটা আপনার সৌভাগ্য নয় তো আর কি ? এই আনন্দের দিনে আমাদেরও একটু মিষ্টিমুখ করালে হতো না কি !

মানদার কথায় নকুলেশ্বর একটু লজ্জিত হলেন। কারণ আত্ম প্রশংসা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। তার উপর লক্ষ্মীপূজার দিনে মেয়েটা মিষ্টি মুখের আবদার করেছে। কিন্তু তার আবদার পূরণ করার মতো সামর্থ নকুলেশ্বরের ছিল না। কেননা তিনি কুঞ্জবাবুর কাছে কোন মাহিনা পেতেন না। এমনকি জামা কাপড় পর্যন্ত নয়। বাড়ী হতে আসার সময় তাঁর মায়ের দেওয়া দু'তিনটে জামা কাপড় নিয়ে এসেছিলেন ; তা পরেই আসরের কাজ চালাতেন। এক কথায় যাকে বলে রিক্ত হস্ত—নকুলেশ্বরও তাই।

বিশেষতঃ কুঞ্জবাবু ছিলেন একটু শক্ত প্রকৃতির মানুষ। সহজে টাকা পয়সা খরচ করে 'ডাক সরকারকে' জামা কাপড় দেওয়া বা হাত খরচ দেওয়া পছন্দ করতেন না। আর সেকালে 'ডাক-সরকার'গণও মনে করতেন—শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে শিক্ষককেই মাহিনা দিতে হয়। মাহিনা দেবার পরিবর্তে নিজে কৃচ্ছ্র সাধন করে যে কোন প্রকারে মন জুগিয়ে গুরুদেবের কাছে যদি কিছু শিক্ষা করা যায় সেটাই তাদের পরম লাভ। গুরুদেবের কাছে ছাত্রে আর ভৃত্যে কোন পার্থক্য ছিল না। গুরুদেব যখন যা আদেশ করতেন কায়মনোবাক্যে ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করে নির্বিচারে তা প্রতিপালন করে গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করাই ছিল তাদের ধর্ম ও কাম্য।

আজকাল ভোল বদলে গেছে। এখন কবি শিক্ষা করতে এসে অনেকেই শিক্ষকের কাছে মাহিনা আদায় না করে শিক্ষানবিশী করতে চায় না। গুরুদেবের কোন কাজ করতে অসম্মান মনে করেন। পা ধুয়ে জুতা জোড়া এগিয়ে দিতে বললে শিষ্য মশাইরা ইতঃস্তত করেন—হাতে ধরে না এনে পায়ে করে এগিয়ে দিলে কেমন হয়! এমনকি প্রসঙ্গক্রমে গুরুদেবের সকৃতজ্ঞ গুণগানেও অনেক শিষ্যের প্রচণ্ড অনীহা। ৺হরিচরণ আচার্য-কর্তা অনেক দুঃখেই গেয়েছিলেন—

আগে কবির শিষ্য-ছাত্র ছিল বাড়ীভরা,
দিতেম খাওয়াপরা, শিখাইতেম ছড়া,
এখন করে তারা স্বরাজ নিশান খাড়া।
মরার উপর ধরে খাঁড়া,—
বলে এই বুড়া সব নষ্টের গোড়া।
এখন কোন শিষ্য ছাত্রে, হেরিনা পাপ নেত্রে,
যেমন বহু পুত্রের পিতা আঁটকুড়া॥

কিন্তু নকুলেশ্বর ছিলেন সেকেলে শিষ্য। গুরুদেবের কোন কাজের মধ্যে যাতে অন্য কেহ অংশীদার হতে না পারে এই ছিল তার লক্ষ্য। গুরুদেবের কাপড় কেচে দেওয়া, তামাক সেজে দেওয়া, পা টিপে দেওয়া—এই সকল ছিল তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। বিনিময়ে কখনো অর্থের কামনা না করে গুরুদেবের কাছে শাস্ত্র জ্ঞান ও তত্ত্ব ভিক্ষা করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন।

কাজেই নকুলেশ্বর রিক্ত হস্ত। মানদার ঐ মিষ্টির আবার রক্ষা করতে না পারায় লজ্জায় নিজেকে নিজে খুব ছোট মনে করতে লাগলেন। তখন

নকুলেশ্বরের মনের অবস্থা দলের মধ্যে একজন মাত্র ব্যক্তি উপলব্ধি করল। সে হলো দলের হারমোনিয়ামওয়ালা—নাম যামিনীকান্ত নন্দী।

দলে আসা অবধি এতদিন পর্যন্ত এই সদাশয় লোকটির সঙ্গে নকুলেশ্বরের বিশেষ কোন কথাবার্তা হয়নি! কারণ দিন রাত্রির মধ্যে বেশির ভাগ সময় নকুলেশ্বর অতিবাহিত করতেন গুরুদেবের সেবায়। সর্বদা তাঁর মন জুগিয়ে কিছু শিক্ষা করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সেজন্য দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে তেমন আলাপ আলোচনার অবসর হতো না।

আজ নকুলেশ্বরের মনটা যখন সাফল্য ও আশার আন্দোলনে আন্দোলিত তখন ঐ যামিনীকান্ত নন্দী উপযাচক হয়ে নকুলেশ্বরের পক্ষ সমর্থন করে মানদাকে সম্বোধন করে বলল—কিরে মানি! শুধু শুধু ছেলেটাকে লজ্জা দিচ্ছিস কেন? মিষ্টি মুখের দিন তো আর ফুরিয়ে যায়নি। একটু অপেক্ষা কর। এই ছেলেটাও একদিন মানুষ হবে, টাকা পয়সা উপার্জন করবে। তখন কত মিষ্টি মুখ করতে পারবি! ব্যস্ত কেন; অপেক্ষা করে দেখ, সবুরে মেওয়া ফলে।

যামিনীকান্ত নন্দীর কথা শুনে মানদা যেন একটু লজ্জিত হয়ে বলল—না, না, ও কিছু না। নকুলবাবুর সঙ্গে একটু রহস্য করছিলাম। আশা করি নকুলবাবু রাগ করবেন না!

যামিনীকান্তকে নিজের পক্ষ সমর্থন করতে দেখে নকুলেশ্বর খুব আনন্দ সহকারে তাকে একটি প্রণাম করে বললেন—দাদা, আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে আপনার ঐ আশ্বাস বাক্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পারি।

যামিনীকান্ত নকুলেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে বলল—ভয় কি ভাইটি! গুরু-পদে একান্ত নিষ্ঠা এবং নম্রতা থাকলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তুমি গুরুকৃপায় সকলের কৃপাভাজন হয়ে কবি সমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করতে পারবে। তবে তোমায় একটা কাজ করতে হবে।

নকুলেশ্বর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করতে হবে আমি তো জানি না। আপনি আমার দাদা; আমায় বলে দিন কি করতে হবে।

যামিনীকান্ত—তোমার গুরুদেব কুঞ্জবাবু নিঃসন্তান। তার কোন পুত্র-কন্যা নেই। তুমিও কায়স্থ, তিনিও কায়স্থ। অতএব তুমি তাঁকে গুরুদেব বলে না ডেকে 'বাবা' বলে ডেকো। তাহলে তিনি তোমাকে পুত্রের মতো স্নেহ করবেন এবং প্রাণ খুলে সুশিক্ষা দিবেন।

যামিনীকান্তের কথা শুনে নকুলেশ্বর সেই দিন থেকে কুঞ্জবাবুকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন।

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—তোমরা যে ভূতের গানখানা গেয়ে এলে উমেশ সরকার তার কি জবাব করে তুমি গিয়ে শুনে এসে আমাকে বলবে। যাও আসরে যাও।

নকুলেশ্বর যামিনীকান্তকে বললেন—চলুন দাদা, আসরে যাই। জবাবখানা শুনে আসি।

এই বলে যামিনী নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে আসরে গিয়ে বসলেন। উমেশ সরকার দলসহ আসরে এসে সেই "কালো ভূতের" গানের নিম্নরূপ জবাব গাওয়া আরম্ভ করলেন—প্রথম ফুকারে বললেন—

তখন কাল কুটিলার কুটিল বাক্যে শ্রীরাধিকা কয়।
তোমায় বলব কি গো ননদী, ভয় পেয়ে থাক যদি,
ভূতের ওঝার লও গিয়ে আশ্রয়॥

—১ম ফুকারের জবাব—

নাকি ভূত দেখলে যমুনার পারে, কদম গাছে খেলা করে;
তুমি হয়ে অসন্তোষ, কেন ভূতের প্রতি কর রোষ।
আমরা গেলে জল আনিতে, পাই না কভু ভূত দেখিতে,
তুমি ভূত দেখ তোমার আঁখিতে, ওটা তোমার মনের দোষ॥

—২য় ফুকারের জবাব—

বললে, কুলবধূ দেখলে পরে, ভূতে চোখ ইসারা করে;
আমরা তো তা দেখিনা, ওটা তোমার মনের কল্পনা।
আমরা যত কুলনারী, জল ভরিয়ে তাড়াতাড়ি,
কাঁখে কলসী নিয়ে ঘরে ফিরি, ভূতের পানে তাকাই না॥

—ডাইনা—

জলের ঘাটে হল নাকি কালো ভূতের ভয়,
তোমার পক্ষে হতে পারে, সতীর পক্ষে নয়।
সরষে পড়া লয়ে সঙ্গে, জল আনতে যাই মনোরঙ্গে,
ছিটা দিলে ভূতের অঙ্গে; ভূত পালায় সাত সাগর পার।

—৩য় ফুকারের জবাব—

বললে, করেতে পাচনী ধরা, ভূতের মাথায় মোহন চূড়া,
শোভিত ময়ূর পাখে ; মিছে ভয় দেখালে আমাকে।
কৃষ্ণ কালো কদম গাছে, উচ্চ পুচ্ছে ময়ূর নাচে,
তোমার চূড়া বলে ভ্রম হয়েছে, ভূতের কি চূড়া থাকে।

জবাবে বৈচিত্র্য

জবাবের ফুকার কয়খানা লিখে নিয়ে যামিনীকান্তের সঙ্গে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে চললেন ফুকার গুলি শোনাবার জন্য। যেতে যেতে নকুলেশ্বর যামিনীকান্তের কাছে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা দাদা! কুটিলা তো রাধারানীর ননদী। সে কৃষ্ণকে কালো ভূত কল্পনা করে ভয় দেখাবার ছলে যদি রাধারানীকে বিদ্রূপ করতে পারে, তবে তার জবাবে রাধারানী ননদী কুটিলাকে একটু আক্রমণ করে কথা বললে কি ভাব অশুদ্ধ হয় ?

কবিগানের দলের সঙ্গে থেকে থেকে যামিনীকান্তের কবির কাব্য ধারা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মেছিল। সে হাসতে হাসতে বলল—না, না, ভাব অশুদ্ধ হবে কেন ? কবিদের জবাবের মধ্যে কাব্য হলো প্রধান অঙ্গ। কাব্যজ্ঞান থাকলে পিতা পুত্রে, গুরু শিষ্যে, ননদ-ভাজের কথাবার্তায় স্থান বিশেষে কাব্যালঙ্কার পরানো যায়! তবে দেখতে হবে মাথার অলঙ্কার পায় এবং পায়ের অলঙ্কার মাথায় পরানো না হয় যেন। কেন, উমেশ বাবুর জবাব কি তোমার মনোমত হয়নি ?

নকুলেশ্বর জিভ কেটে বললেন—ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলবেন না। আমি কবিতে একটা দুগ্ধপোষ্য বালক মাত্র। আমি জবাবের কি জানি। তবে ননদীর সঙ্গে একটু রসিকতা করা যায় কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

যামিনী বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব করা যায়। তুমি যদি পার তবে তোমার মনোমত ঐ ফুকার কয়টার জবাব করে শোনাও তো!

নকুলেশ্বর তখন যামিনীকান্তকে নিয়ে নৌকার ছাদে বসে বললেন—দাদা আপনি শুনুন ; যদি ভুল হয় আপনি সংশোধন করে দিবেন।

যামিনীকান্ত বলল—আচ্ছা বল :

তখন কাল কুটিলার কুটিল বাক্যে দুঃখে শ্রীরাধিকা কয়।
তোমায় বলব কিগো কুটিলে, সরলে আর কুটিলে,
কোন কালে ঘটে না প্রণয়॥

—১ম ফুকারের জবাব—

আমরা নিত্য যাই যমুনার কূলে, ভূত দেখি নাই কোন কালে,
ভূত দেখে এলে অদ্ভুত ; বুঝি ভূত নয় ওটা যমের দূত।
বারো ভূতের পালায় পড়ে, ভূতের মত বনে ঘুরে,
তুমি ভূত দেখ এই জগৎ জুড়ে, বনের ভূত না মনের ভূত ॥

—মিল-মুখ—

পতিব্রতা সতী মোরা পতির দিকে মন,
ননদিনী তোমার মতন, আমরা নইকো বুদ্ধি হীন।
ভূত ভাবিয়ে মনোভ্রান্তে, হলে কেন দুশ্চিন্তার অধীন ।।

—ডাইনা—

জলের ঘাটে হল নাকি কালো ভূতের ভয়,
বড়াই বুড়ী সঙ্গে থাকে জল আনার সময়।
ভূতের দৃষ্টি পড়লে পরে, বড়াই বুড়ী যদি ঝাড়ে,
ভূতাস্ত ছাড়াতে পারে, ভূত-পেত্নী তার আজ্ঞাধীন।
আত্মবৎ মন্ত্রতে জগৎ জানি চিরদিন ॥

—২য় ফুকারের জবাব—

বললে, কুলবধূ দেখলে পরে, ভূতে চোখ ইসারা করে ;
সদ্য বিধবা যারা, ভূতের নজরে পড়ে তারা।
কুলজা যায় জলের ঘাটে, মাটির পানে চেয়ে হাঁটে,
তারা ভূতের দিকে চায়না মোটে, কখন করবে ইসারা ॥

— ৩য় ফুকারের জবাব —

বললে, করেতে পাঁচনী ধরা, ভূতের মাথায় মোহনচূড়া,
রক্তমাখা পাদপদ্ম ; তারে ভূত বলা ন্যায় বিরুদ্ধ।
ভূত হলো অপদেবতা, মোহনচূড়া পাবে কোথা,
বুঝি ভূত নয় ওটা ভূতের পিতা, মহাদেবের আরাধ্য ॥

জবাবখানা একটা কাগজে লিখে নকুলেশ্বর যামিনী নন্দীকে শোনাতেই সে চিলের মত ছোঁ মেরে কাগজটা নিয়ে নৌকার মধ্যে কুঞ্জবাবুর কামরায় হাসতে হাসতে উপস্থিত হলো। কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে যামিনী, বড় হাসছ যে, ব্যাপার কি ?

যামিনী অমনি তার হাতের কাগজখানা কুঞ্জবাবুর হাতে দিয়ে বলল—দেখুন আপনার ছেলের কীর্তি।

কুঞ্জবাবু—উমেশ সরকারের জবাব লিখে আনতে ভুল করে এসেছে বুঝি ?

যামিনী—না, এটা উমেশ সরকারের জবাব নয়। আপনার শ্রীমানের রচিত জবাব।

কুঞ্জবাবু অবাক হয়ে বললেন—সে কি! ওকে তো উমেশ সরকারের জবাব-খানা লিখে আনতে বলেছিলাম। ও বুঝি আসরে না গিয়ে নিজে পাণ্ডিত্য ফলিয়েছে, কেমন ?

যামিনী—না না ; সে আসরে গিয়েছে এবং উমেশ সরকারের জবাবও লিখে এনেছে। তবে সে জবাবখানা ওর তেমন মনঃপূত হচ্ছিল না ; তাই আমার কাছে জিজ্ঞাসা করল যে, "জবাবে কুটীলাকে একটু বিদ্রূপ করলে কি ভাল হতো না ?" আমি বললাম, "তুমি কিভাবে বিদ্রূপ করতে চাও বলতো !" নকুলেশ্বর আমার কথা শুনে এই জবাবখানা লিখেছে। আমার তো মনে হয় ওর রচনার পারিপাট্য উমেশ সরকারের রচনার চেয়ে একটু উন্নত ধরনেরই হয়েছে। আপনি কি বলেন ?

কুঞ্জবাবু কাগজখানা পড়লেন। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো তাঁর অন্তরে যেন একটা আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হচ্ছিল। বাইরে একটু কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন—ছেলেটার সাহস তো কম নয়। অত প্রাচীন কবির রচনার উপর কলম ধরা! এটা আমি পছন্দ করিনা! কই সে উদ্ধতের শিরোমণি ? তাকে একবার ডাক তো!

যামিনীকান্ত নকুলেশ্বরকে ডেকে বলল—ভেতরে এসো। তোমার বাবা তোমাকে ডাকছেন।

নকুলেশ্বর তাড়াতাড়ি ছাদ হতে নেমে এক কল্‌কে বিষ্ণুপুরী তামাক সেজে বৃন্দাবনী গুড়গুড়িতে চাপিয়ে নিয়ে কুঞ্জবাবুর সামনে রেখে অপরাধীর মতো নতশিরে বসে রইলেন। কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—এটা তুমি লিখেছ ?

নকুলেশ্বর ভয়জড়িত কণ্ঠে বললেন—আমি লিখিনি। আপনাকে স্মরণ করে লিখেছি। আপনি যা লিখিয়েছেন তাই লিখেছি। ভালমন্দ দোষ গুণ আমি জানিনা। যামিনী দাদার উৎসাহে দু'চার কথা লিখেছি। অন্যায় হলে ক্ষমা করবেন।

কুঞ্জবাবু বললেন—উমেশ সরকারের জবাবখানা কই, দাও তো!

নকুলেশ্বর উমেশ সরকারের জবাব লেখা কাগজখানা কুঞ্জবাবুর হাতে

দিতেই তিনি তাঁকে বললেন—যাও বিশ্রাম করগে। আজ প্রথম দিনের গান এই পর্যন্তই শেষ হলো। আজ আর কিছু হবেনা।

কাব্যশক্তির ক্রমবিকাশ—গুরুদেবের আশা ও আশঙ্কা

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে কামরা হতে সরিয়ে দিয়ে যামিনীকান্তকে বললেন—বস যামিনী। দেখি উমেশ সরকার কি জবাব করেছিল, আর ও ছোঁড়াই বা কি করেছে।

জবাবের কাগজ দু'খানা দেখে কুঞ্জবাবু যামিনী নন্দীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—কিহে যামিনী! নকুলের জবাবখানা তো তুমি শুনেছ; ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয় বলতো।

যামিনীকান্ত—আমি আর কি বলব! তবে ওর উৎসাহ উদ্দীপনা, রচনার পারিপাট্য, এবং উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আমার মনে হয় যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ও একজন জনপ্রিয় কবি বলে লোকসমাজে পরিচিত হতে পারবে।

কুঞ্জবাবু—আমারও তাই বিশ্বাস। ছেলেটার বাইরের চালচলনে একটু বোকাবোকা মনে হয় বটে কিন্তু ওর ভিতরে একখানা তীক্ষ্ণধার কাব্য-ছুরি লুকানো আছে। সে ছুরির আঘাতে একদিন বহু কবিয়ালকেই ক্ষতবিক্ষত হতে হবে—যদি না অন্য কোন উপদ্রবে তার ধার নষ্ট হয়ে যায়। জান তো, ভাল জিনিষের অনেক শত্রু। কর্দমাক্ত পথে চলতে গেলে পদে পদেই পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ মেয়েদের নিয়ে আমাদের দল গঠিত। দলে অল্প-বয়সী কয়টা গায়িকা আছে। আর ছেলেটারও উঠতি বয়স; সুশ্রী সুঠাম চেহারা। সংযম নিয়ে এই অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে থেকে আত্মোন্নতি করা আর হাঙ্গর কুম্ভীরের মধ্য হতে রত্ন আহরণ করা সমান কথা। অতএব তোমার উপর এই ছেলেটার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করলাম। সর্বদা ওর উপর লক্ষ্য রাখবে যেন কোন মতে পথভ্রষ্ট না হয়।

যামিনীকান্ত—যে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তবে আমার একটি অনুরোধ—নকুল কায়স্থের ছেলে, আপনিও কায়স্থ; বিশেষতঃ আপনি অপুত্রক। ও যখন আপনাকে বাবা বলে ডাকে আপনিও ওকে ছাত্র হিসেবে শাসন না করে পুত্র হিসেবে পোষণ করুন। ভগবান না করুন, এই প্রবাসে থেকে আপনার কোন অসুখ-বিসুখ হলে ও এক গ্লাস জল দিতে পারবে, শুশ্রূষা করতে পারবে। ভবিষ্যতে আপনার অবর্তমানে আপনার নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা

অক্ষুণ্ণ রেখে কবি-জগতে আপনাকে অমর করে রাখতে পারবে। অতএব আপনি ওকে পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন করুন।

দ্বিতীয় দিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা! আজ তো আমাদের দলকে আগে আসরে যেতে হবে। প্রশ্নের গান কি হবে এবং পাঁচালীর বিষয়বস্তু কি হবে বলে দিন; আমি সেই ভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকি।

কুঞ্জবাবু বললেন—গান সম্বন্ধে আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করে দলের গায়ক গায়িকাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। আসরে যে গান বেশ ভালভাবে লগ্ন করে গেয়ে তারা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পারবে সেই গান গাওয়ানই তোমার কর্তব্য।

সরলার সাক্ষাতে

নকুলেশ্বর যামিনী নন্দীর কাছে গিয়ে বললেন—দাদা, বাবা তো আজকের গান সম্বন্ধে গায়ক গায়িকাদের মত নিয়ে কাজ করতে বললেন। আমি কার কাছে কি জিজ্ঞাসা করব! আপনি দয়া করে একটু জিজ্ঞাসা করুন না, তারা কোন্ গান ভাল গাইতে পারবে।

যামিনীকান্ত—কেন, তুমিই জিজ্ঞাসা কর না। ভয় কি? শেখ সরলা দলের শ্রেষ্ঠ গায়িকা। তার কাছে জিজ্ঞাসা করাই ভাল। যাও, সরলার কাছে গিয়ে বল যে আজ কোন্ সখী-সংবাদ গাইলে ভাল হয় বলুন।

তদনুসারে নকুলেশ্বর গানের খাতাটা নিয়ে শেখ সরলার বিছানার কাছে যেতেই সরলা খুব আগ্রহ সহকারে হাসি মুখে বলল—আজ যেন আমার সুপ্রভাত বলে মনে হচ্ছে। কথায় বলে, 'কাঙ্গালের দুয়ারে হাতীর পাড়া।' তা কি মনে করে এ শুভাগমন হলো?

সরলার শ্লেষাত্মক বাক্যে নকুলেশ্বর নিজেকে একটু বিব্রত মনে করলেন। তিনি অন্য কোন ভূমিকা না করে সরলভাবে বললেন—গুরুদেব আমাকে পাঠিয়েছেন, আজ কোন্ গানখানা গাইবেন তা জিজ্ঞাসা করার জন্য। গানখানা জানতে পারলে আমিও একটু দেখে শুনে নিতে পারি। আমি তো নূতন মানুষ। তাই আবার যদি কোন ভুল করে বসি।

সরলা বলল—না না; আর কোন ভুল হবে না। আমিই বরং তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম, সেজন্য লজ্জিত ও দুঃখিত। লোকে বলে, শিকারী বিড়ালের

গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। যাক সে কথা। বসো, এত সঙ্কোচ কেন? আমি বাঘও নই, আর ভালুকও নই। তোমার মতো রক্তমাংসের তৈরী মানুষই বটে। ভয় কি? বসো বলছি—এই বলে নকুলেশ্বরের হাতখানা ধরে খুব আদর করে বসালো।

নকুলেশ্বর বসতেই সরলা প্রশ্ন করল—আচ্ছা তুমি না কবি হতে এসেছ! কবির প্রাণে আবার এত কাঠিন্য থাকবে কেন? কবির প্রাণ হবে স্বচ্ছ; ফুলের মতো সুন্দর, কোমলতায় ভরা। কিন্তু তোমার প্রাণে তো তার একটা লক্ষণও দেখতে পাইনা।

নকুলেশ্বর—কেন, এমন বৈলক্ষণ্য কি দেখলেন?

সরলা—নিজের মনকেই প্রশ্ন করে দেখ যে, কোন্‌টাই বা সুলক্ষণের কাজ করেছ! দলে এতগুলি লোক আছে। সকলের সঙ্গেই তুমি মেলামেশা কর। আর আমি কবে কি বলেছি সেই জন্য আমাকে যেন একঘরে করে রেখেছ। মেলামেশা তো দূরের কথা, চোখে চোখ পড়লেও অমনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাক। এটাই বুঝি তোমাদের সুলক্ষণের পরিচয়!

নকুলেশ্বর—না, না সে কথা নয়। আপনি ভুল বুঝেছেন। তবে কি জানেন, আমি ছেলেমানুষ, দলে নূতন এসেছি। কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তাও জানিনা। বিশেষতঃ ঐ সেদিন আপনার কাছে ধমক খেয়ে আমি খুব ঘাবড়ে গেছি! আপনাকে দেখলে আমার ভয় করে; কথা বলতে সাহস হয় না।

সরলা—থাক থাক, আর মন-রাখা কথা বলতে হবে না। আমি সব বুঝি। যাক সে কথা। আজ গানের পরে তুমি একটু নির্জনে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি তোমাকে কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করব। সে কথা কারো কাছে ব্যক্ত করবে না। বল, তুমি রাজী আছ?

নকুলেশ্বর—আচ্ছা আমি রাজী আছি। আপনার সুযোগ মতো আমাকে ডাকবেন। এখন গানটার কথা বলুন। কি গান আজ গাইবেন।

সরলা—হরি আচার্য মহাশয়ের সেই যে 'মান' গানখানা আছে, সেখানা দেখে নাওগে।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে গানের খাতা বের করে নকুলেশ্বর গানখানা মুখস্থ করতে লাগলেন। যামিনীকান্ত নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল—কি হে নকুল! সরলার কাছে যেতে তো খুব ভয় পেয়েছিলে, এখন কি হলো! কোন মন্দ কথা বলেছে কি?

নকুলেশ্বর—না, দাদা, সে কোন রাগ তো করেই নি, বরং নিজের ভুলের জন্য সে নিজেই অনুতপ্ত মনে হলো।

যামিনীকান্ত—আচ্ছা যাও, গানখানা ভাল করে দেখে নাও। মনে রেখ, ক্ষমাই মহত্বের লক্ষণ। কোন কাজের ভুল ত্রুটির জন্য কেউ যদি তিরস্কার করে, সে শত্রু নয়, পরম আত্মীয়। সেই তিরস্কারকে পুরস্কার মনে করে যে কাজ করতে পারে, সর্বদা সতর্ক হয়ে চলতে পারে, তারই সাধনা সিদ্ধ হয়। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি স্মরণ রেখে চলবে—

মানের আসন আরাম শয়ন নয়তো তোমার তরে,
সব ছেড়ে আজ খুসী হয়ে চলো পথের পরে।
এসো বন্ধু তোমরা সবে
আজকে যাত্রা করব মোরা অমানিতের ঘরে॥
মাথায় করে তুলে লব অপমানের ভার।
দুঃখীর শেষ আলোয় যেথা
সে ধূলাতে লুটাই মাথা
ত্যাগের শূন্য পাত্রটি নিই আনন্দ রস ভরে॥

—তোমার এই কবি শিক্ষাও একটি কঠিন সাধনা। মান অপমান ঘৃণা লজ্জা অহঙ্কারাদি ত্যাগ করে এই কাব্য-সাধনা করতে হবে। তাই মহাপুরুষেরা বলে থাকেন—

পদ্ম তুলতে হলে পরে কণ্টকের ভয় করবে না।
হাঙ্গর কুমীর ভয় করিলে রত্ন তুলতে পারবে না॥

—কাল কুটিলার কুটিল বাক্যবাণে আহত না হলে কি শ্রীরাধারানী শ্রীগোবিন্দ প্রেমামৃতের অধিকারিণী হতে পারতেন!

যামিনীকান্ত নন্দী ছিল কুঞ্জবাবুর দলে হারমোনিয়াম বাদক। কিন্তু লোকটি ছিল খুব সরল ও সৎপ্রকৃতির একটি খাঁটি মাটির মানুষ। তার সরলতা ও সচ্চরিত্রের জন্য কুঞ্জবাবু তাকেও পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। সেই জন্যই নকুলেশ্বরের দেখাশোনার ভার ঐ যামিনী নন্দীর উপরই দিয়েছিলেন। যামিনীও নকুলেশ্বরকে নিজের ছোট ভাইটির মতো স্নেহ করত। নকুলেশ্বর যখন যে কাজ করতেন যামিনী নন্দীকে আগে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে কিছু করতেন না।

সন্ধ্যার আগে থেকেই বাবুর বাড়ীর লক্ষ্মী মণ্ডপে ঢাক, ঢোল, দামামা, সানাই বেজে উঠল। দলের ঠাকুর-চাকর রান্নার কাজে ব্যস্ত। রান্না শেষ

করে ঠাকুর নৌকায় সংবাদ পাঠাল—রান্না হয়েছে, সকলে খেতে আসুন। সকলে যার যার থালা বাটি সঙ্গে নিয়ে রান্নার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। বাবুর বাড়ীর দরজায় নদীর ঘাটে একখানি ঘর এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠান। সবাই গিয়ে সেই উঠানে লাইন দিয়ে বসে গেল।

আহারান্তে সকলে নৌকায় এসে নিজ নিজ পোষাক পরে সজ্জিত হতে লাগল। অল্প বয়স্কা মেয়েদের নর্তকীর মতো জরির কাজ-করা পোষাক পরতে হতো। কারণ সে সময়ে নিয়ম ছিল আসরে কন্‌সার্ট পার্টি কন্‌সার্ট দেওয়ার পরেই ঐ নর্তকী-বেশী মেয়েরা আসরে গিয়ে আগে নাচগান করবে। তারপরে অন্যান্য গায়ক ও বর্ষিয়সী গায়িকারা আসরে যাবে।

এই ভাবে সব সেজেগুজে প্রস্তত হতেই কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—যাও, এখন দল নিয়ে তুমি বাসাঘরে যাও। বাসাঘর অর্থে গানের ফাঁকে বসবার জায়গা। একদল যতক্ষণ আসরে গান করবে, অন্যদল ততক্ষণ ঐ বাসা-ঘরে বসে অপেক্ষা করবে। বিপক্ষ দল গান শেষ করে তাদের বাসাঘরে চলে যেতেই এই দল আবার আসরে প্রবেশ করত। দুই দলের জন্য দুইটি ঘর নির্দিষ্ট থাকত।

কুঞ্জবাবু ছিলেন একটু কৃপণ প্রকৃতির লোক। নিজেও তেমন সাজসজ্জা পছন্দ করতেন না; সামান্য পোষাকে চলতেন। নকুলেশ্বরের বেলায়ও ছিলেন তেমনি উদাসীন? নকুলেশ্বরকে তো কোন মাহিনা দিতেন না। কাজেই সে কি দিয়ে সাজপোষাক করবে। বাড়ী হতে দলে আসবার সময় সামান্য যা কিছু নিয়ে এসেছিল সেই মাত্র তার সম্বল। নিজেই তা সাবান-কাচা করে পরিষ্কার করে নিতেন। এক দিন এই নিয়ে যামিনী নন্দী 'কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের কাছে কথা তুলেও কোন সদুত্তর না পেয়ে দুঃখিত হয়ে নকুলেশ্বরকে বলেছিল—তুমি খুব আনন্দ সহকারে কাজ করে যাও। তোমার জামা কাপড়ের জন্য ভাবতে হবে না। আমিই তার ব্যবস্থা করব। নকুলেশ্বর এ কথায় হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না।

যামিনী নন্দীর সঙ্গে বাসাঘরে গিয়ে বাবুর বাড়ীর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে নকুলেশ্বর দলের লোকদের জন্য বিড়ি পান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিলেন। বাবুর বাড়ীর ঘড়িতে এগারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঢন্ ঢন্ করে ঘণ্টা বেজে উঠল। নকুলেশ্বর দলের বাদকদের আসরে গিয়ে কনসার্ট দিতে বললেন। তারা সকলে গিয়ে কনসার্ট আরম্ভ করল। তিনখানা কনসার্টের পরেই নর্তকী-

বেশী মেয়েরা আসরে গিয়ে নাচগান আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ নাচ গান করার পর ধরতা দোহাররা আসরে গিয়ে সমবেত কণ্ঠে ডাক-বন্দনা গান ধরল।

নকুলেশ্বর রচিত প্রথম ডাক-গান

এই ডাক গানখানা নকুলেশ্বর রচনা করে রেখেছিলেন। ভয় ক'রে কুঞ্জ-বাবুকে দেখান নি। আজ বাসাঘরে গিয়ে যামিনীকান্তকে বললেন—দাদা! আমি পুরানো ডাকের সুরে একখানা ডাক-গান লিখেছি। আপনি যদি বলেন তবে গানখানা আপনাকে দেখাই। যামিনী গানের পদগুলি শুনে খুব আনন্দিত হয়ে সেখ সরলাকে বলল—সরলা, নকুলেশ্বর একখানি নূতন ডাক গান লিখেছে। আজ আসরে গাইতে পারবে?

সরলা—সে কি কথা! আমি এ গানের বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানিনা। কি সুর কি পদ না জেনে শুনে নূতন গান কেমন করে আসরে গাইব? কেন, নৌকায় বসে গানখানা আমার কাছে বললে চণ্ডী অশুদ্ধ হতো নাকি? না, আসরে এনে এটা আমাকে একটা লজ্জা দেওয়ার কৌশল?

সরলার কথা শুনে নকুলেশ্বর বললেন—ছিঃ ছিঃ! এ আপনি কি বলছেন? আপনাকে আমি কি লজ্জা দিতে পারি? তবে আগে শোনাই নি কেন জানেন? কি জানি গুরুদেব হয়তো গালাগাল দেবেন যে বেটা বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়! সেই ভয়ে আমি কারো কাছে বলিনি। তবে সুরটি আমার দেওয়া নয়। কারণ আমি তো অ-সুর। সুর জানিনা; তাই পুরনো সুরেই গান লিখেছি।

সরলা একটু মুচকি হাসল! তার হাসিতে বোঝা গেল সে যেন মনে মনে খুসীই হয়েছে। বাইরে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বলল—কই, শুনি পদগুলি! পদগুলি একবার শুনেই সরলা বলল—বেশ, বেশ! চল, আজ এই ডাকখানাই গাইব। ভাল করে বলে দেবে কিন্তু!

বাসায় বসে এই সব কথার পর আসরে গিয়েই গানখানা গাইতে আরম্ভ করল—

ওহে গৌর হরি, নদীয়াবিহারী, এসো হে কীর্তন মাঝে।
এ আসরে এসে, নব ভাবাবেশে, নাচ কীর্তনিয়া সাজে॥
সাধু গুরু মুখে করেছি শ্রবণ,
যেথা হবে হরিনাম সংকীর্তন,
সেই বৃন্দাবনে মদনমোহন, তোমারই বাঁশরী বাজে॥

নামগানে যার, বহে অশ্রুধার, নয়ন বয়ান ভাসে,
তুমি চিরদিন, হয়ে পরাধীন, বদ্ধ থাক তারি পাশে।
কৃপা করে তুমি শ্রীশচীনন্দন,
শিখাইয়ে দাও নাম সংকীর্তন,
নয়নে ছুটিবে প্রেম প্রস্রবণ, শমন পালাবে লাজে॥

(অন্তরা)—নাম-নামিনে অভেদাত্মা বলে ভাগ্যবান।
নিত্য সত্য নাম তত্ত্ব অমৃত সমান॥
এ নাম নিলে পরে, ভাব সাগরে, ছুটবে প্রেমের বান॥
মত্ত হয়ে নাম গানে, হরি নামামৃত পানে,
উঠবে প্রাণে ভাবের তুফান।
অধম নকুল বলে, হরি বলে যায় যেন এ প্রাণ॥

এই গানখানা গাইতে কারো কোন অসুবিধা হল না। কারণ একে ত পুরানো সুর; তারপর নকুলেশ্বর পদগুলিও বেশ পরিষ্কারভাবে দুই তিনবার করে বলে দিয়েছিলেন। ডাক গান শেষ করে কবিগুণাকর হরি আচার্য মহাশয়ের রচিত 'নৌকার মালসী' নামক যে গানখানা ছিল তা গাওয়ালেন। এবং দলবল সহ বাসাঘরে ফিরে এলেন।

বিপক্ষ উমেশবাবুর দলও আসরে গিয়ে ডাক ও মালসী গান শেষ করে চলে এলো। নকুলেশ্বর দ্বিতীয় আসরে দল নিয়ে প্রবেশ করে শেখ সরলার নির্দেশিত হরি আচার্য মহাশয়ের রচিত মান-গান গাওয়ালেন। গানখানার বিষয়বস্তু হলো—

গোষ্ঠ খেলা সাঙ্গ করে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ধেনু বৎস ও রাখালগণকে নিয়ে নন্দালয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মাবতী এসে শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিয়ে গেলেন। চন্দ্রাবলীর অনুরোধ এবং ভক্তিতে বাধ্য হয়ে ভক্তবৎসল ভগবান চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি যাপন করে ভোর বেলা রাধারানীর কুঞ্জে উপনীত হয়ে দেখেন, শ্রীমতী রাধারানী কুপিতা নাগিনীর মত মানের ফণা তুলে গর্জন করছেন। শ্রীগোবিন্দ 'মঞ্চময়ী মানং' বলে পায় ধরে কত সাধ্য সাধন করছেন; কিন্তু কিছুতেই সে মানিনীর মান ভাঙ্গাতে পারছেন না। এমন সময় বৃন্দা-দূতী এসে শ্রীগোবিন্দের পক্ষ হয়ে ইন্দুমুখী রাধারানীকে উপদেশ দিচ্ছেন। বৃন্দা-দূতী বলছেন—

(ক) রাধে! একদিনের এক অপরাধে, সাধের ধনকে ধরাস পদে,
তোর প্রাণে কি দয়া নাই?

(খ) দেবারাধ্য শ্যাম নীলপদ্ম, ধরেছে তোর শ্রীপাদপদ্ম,
বল দেখি কি কারণে ?

(গ) চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদাই থাকে আমোদিনী,
কেন রাই-কুমুদিনী আজ মুদিনী, শ্যাম-সুধাকর দর্শনে ?

(ঘ) সূর্যোদয়ে কমলিনী, কি জন্য হলি মলিনী,
কিসে রাই তোর এত দুখ ?

(ঙ) সাধে সাধে কেন বিষাদ, কাছে থাকতে মহাপ্রসাদ, উপবাসী কেন রও ?—ইত্যাদি নানা ভাবে বৃন্দাদূতী রাই শ্রীমতীকে প্রবোধ দিচ্ছে। সাধারণ উপমা অলঙ্কার ও অনুপ্রাস যমকের সুসঙ্গত প্রয়োগে গানটি আচার্য-কর্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মান-গান। গান শেষ হলে দোহারপত্রকে বাসাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নকুলেশ্বর কাগজ কলম নিয়ে আসরে বসে রইলেন—উমেশ সরকার এই গানের কি জবাব করেন তা লিখবার জন্য।

একটি গানের দু'টি জবাব

উমেশ সরকার সদলে আবার আসরে এসে উক্ত গানের জবাব গাওয়াতে আরম্ভ করলেন—

আমি কুটিল কালার প্রেমে পড়ে,
জীবন যৌবন দিলেম তারে,
কালার প্রেমে দিয়ে ডুব ;
কালা আমায় শিক্ষা দিল খুব।
আসার আশায় রেখে মোরে,
নিশি কাটায় চন্দ্রার ঘরে,
তাই মান করেছি নিশি ভোরে—
দেখবো না আর কাল রূপ ॥

পর-নারীর প্রেমে মজে কপট নাগরে,
তার দিকে চাবনা ফিরে, এই করেছি ভাবনা।
কালো কোকিল কালো ভৃঙ্গ, সখী আমার কুঞ্জে রাখবনা ॥

শ্যামনীলপদ্ম, কেন অদ্য, পড়ল আমার পায়,
পায় ধরিয়ে কপট কালা মান ভাঙ্গিতে চায়,

মান করেছি মানে রব, কারো কথা না শুনিব,
শ্যাম গেলে পর শ্যামকে পাব, মান গেলে মান পাবনা।

২য় ফুকার—বললে, চন্দ্র উদয় হলে পরে, কুমুদিনী আমোদ করে,
জান না কি বৃন্দে সই, আমি ও চাঁদের প্রত্যাশী নই,
চন্দ্র ছিল চন্দ্রার কাছে, নষ্টচন্দ্র দোষ লেগেছে,
ও চাঁদ দেখলে পরে পাতক আছে,
তাইতে অধোমুখে রই ॥

৩য় ফুকার—বললে সূর্য দেখে কমলিনী, কি জন্য এত মলিনী,
মেঘে যদি ঢাকা রয়, তারে কেবা বলে সূর্যোদয়,
চন্দ্রাবলী-মেঘে ঢাকা, চাঁদের আলো যায়না দেখা,
তাইতে বিষাদে পদ্মিনী একা, দুঃখেতে মুদিত হয় ॥

৪র্থ ফুকার—বললে, কি সাধে রাই এত বিষাদ, কাছে থাকতে মহাপ্রসাদ,
উপবাসী কেন রও, বলি দূতি আমার কথা লও,
দেবের ভোগে লাগলে পরে, মহাপ্রসাদ বলে তারে,
কেন ভূতপ্রেতের উচ্ছিষ্ট মোরে, প্রসাদ জ্ঞানে খেতে কও ॥

এই ভাবে উমেশ সরকার মহাশয় জবাব শেষ করলেন। নকুলেশ্বর পদগুলি সব লিখে নিয়ে বাসায় গিয়ে যামিনীকান্তকে দেখিয়ে বললেন—দেখুন দাদা, জবাবখানা কেমন হয়েছে।

যামিনী পদগুলি শুনে বলল—বেশ তো হয়েছে। আচ্ছা এই গানটির জবাব যদি তোমাকে করতে হতো, তা হলে তুমি কি করতে?

নকুলেশ্বর—আমি মনে মনে একটা মোটামুটি ধারণা করে রেখেছি। আপনি যদি শোনেন, তবে বলতে পাতি।

যামিনী খুব উৎসাহ সহকারে বলল—বেশ তো। সে তো খুব ভাল কথা। কিবা গান, কিবা টপ্পা, যে কোন বিষয় প্রতিপক্ষের কাছে যখন প্রশ্ন করবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ধারণা করে রাখবে যে যদি এই প্রশ্ন তোমাকে কেউ করে তবে তুমি কি জবাব করবে। এই ধারণা যার না আছে সে কখনো বড় কবির সরকার হতে পারেনা। আচ্ছা, বলতো তুমি কি রকম জবাব ধারণা করে রেখেছ?

নকুলেশ্বর জবাবের প্রথম চিতান হতে বলতে আরম্ভ করলেন—

শুনে বৃন্দাধনীর হিতবাণী, বলে মানিনী তখন।
তোরে বলব কিগো সজনী, যে দুঃখে যায় রজনী,
আমি জানি, জানে আমার মন॥

১ম ফুকার—কালার বাঁশী শুনে পূর্বরাগে, জীবন যৌবন দিলাম আগে,
শ্যামকে ভেবে গুণাধিক, শ্যামের গুণ নাই মোটে ন্যূনাধিক
পেয়ে চন্দ্রার কামের ব্যসন, অটল চাঁদের টলে আসন,
এখন মান-দণ্ডে না করলে শাসন, লম্পট পুরুষ রয়না ঠিক॥

মিল—ম্লান করেছি মানে রব শোনগো সজনী,
বিফলে গেল রজনী, এ দুঃখ কি সওয়া যায়।
কুঞ্জ হতে বের করে দে, সাধে সাধে কেন গোল বাধায়॥

ডাইনা—শ্রীপাদপদ্মে শ্যাম-নীলপদ্ম পড়ল কি কারণ,
মানের দণ্ডে ভণ্ড শ্যামের ভণ্ডামী এমন;
আগে কেটে বৃক্ষের গোড়া, পরে দেয় শ্যাম জলের ধারা,
লাথি মেরে পায়ে ধরা, সে ধরায় কি প্রাণ জুড়ায়?
আশা ভঙ্গ অপরাধে দোষী শ্যামরায়॥

২য় ফুকার—বললে, চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদাই থাকে আমোদিনী,
জাগতিক এ ঘটনা, কিন্তু অসময় তা খাটেনা।
রাত্রে যখন চন্দ্র ওঠে, আমোদে কৌমুদী ফোটে,
যদি ভোরে চন্দ্র মাথা কোটে, কুমুদিনী ফোটেনা॥

৩য় ফুকার—বললে, সূর্যোদয়ে কমলিনী, কি জন্য এত মলিনী,
কিসে রাই তোর এত দুখ, সই তোর কথা শুনে ফাটে বুক।
চন্দ্রাবলী-রাহুর গ্রাসে, দিবাকরের কর বিনাশে,
তাইতে অন্ধকারে মন বিরসে, কমলিনীর মলিন মুখ॥

৪র্থ ফুকার—বললে, সাধে সাধে কেন বিষাদ, কাছে থাকতে মহাপ্রসাদ,
কেন উপবাসী রই, আমি ও প্রসাদের ভক্ত নই।
মহাপ্রসাদ ছিল আগে, কাইল নিশিতে কাম সোহাগে,
লাগে অশুচী পিশাচীর ভোগে, মহাপ্রসাদ রইল কই॥

৫ম ফুকার—বললে, সাধে সাধে কেন বিষাদ, কাছে থাকতে মহাপ্রসাদ,
উপবাস কেউ করে না, তুইতো জানিসনে মোর ধারণা।

আশা দিয়ে কালোশশী, চন্দ্রার ঘরে কাটায় নিশি,
তাইতে আমার ভাগ্যে একাদশী, চন্দ্রার ভাগ্যে পারণা ॥

নকুলেশ্বরের জবাবখানা আদ্যোপান্ত শুনে যামিনী উল্লাসে নকুলেশ্বরের পিঠ চাপড়ে বলল—সাবাস, সাবাস! এই অল্পদিনের মধ্যে তোমার উপর গুরুদেবের কৃপা হয়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি দিগ্বিজয়ী হও।

এমন সময় কুঞ্জবাবু এসে বাসাঘরে প্রবেশ করে বললেন—কিহে যামিনী! এত উৎসাহ কিসের; কি হয়েছে!

নকুলেশ্বর তার জবাবের কাগজখানি তাড়াতাড়ি লুকাবার চেষ্টা করছিলেন। যামিনী কাগজখানা কেড়ে নিয়ে কুঞ্জবাবুর হাতে দিয়ে বলল—এই দেখুন আপনার ছেলের কীর্তি! কুঞ্জবাবু কাগজখানার দু'একটি ফুকার পড়ে বললেন—এটা কি উমেশ সরকারের করা জবাব বুঝি!

যামিনীবাবু—না, না। এটা শ্রীমানের রচনা। আমি ওকে বলেছিলাম যে এই গানখানা যদি তোমার বিপক্ষে কেউ গায় তবে তুমি তার কি জবাব করতে। নকুলেশ্বর অমনি এই জবাবটি লিখে কাগজখানা আমাকে দেখতে দিয়েছিল। উমেশ সরকারের জবাব ওর কাছে লেখা আছে। কই নকুল সেই জবাবখানা কর্তাকে দেখাও।

নকুলেশ্বর উমেশ সরকারের জবাব লেখা কাগজখানা কুঞ্জবাবুর হাতে দিলেন।

কুঞ্জবাবু যামিনীকান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি জবাবখানা কেমন দেখলে!

যামিনী—আমি যা দেখলাম তাতে আমার মনে হয় এ ছেলে অতি অল্পদিনের মধ্যে কবি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে আপনার মুখোজ্জ্বল করতে পারবে। ওর আর এক গুণ লক্ষ্য করেছি। বাসাঘরে এসে গানের অবসরে দোহারপত্ররা কত রকম কথা বলে—হাস্যালাপ, ঠাট্টা, মস্করা, তাস খেলা ইত্যাদিতে সময় কাটায়। কিন্তু নকুলেশ্বর তাদের ধারে কাছেও ঘেঁসে না—আপন মনে নির্জনে বসে কি ভাবে, কি করে তা ভগবানই জানেন!

কুঞ্জবাবু—হ্যাঁ, আমিও তা লক্ষ্য করেছি। প্রথম প্রথম মনে করেছিলাম ছেলেটা একটু বোকা ধরনের; তাই লোকের সঙ্গে মিশতে জানেনা, কথা বলতে জানেনা। সেইজন্য অমনধারা গুম ধরে চুপচাপ্ বসে থাকে। কিন্তু এখন বুঝেছি ওটা ওর বোকামির লক্ষণ নয়। কবি শিক্ষার জন্য ও মনেপ্রাণে স্থির

প্রতিজ্ঞ। কাজেই বাজে কথা, গল্প গুজব ও খেলাধূলার দিকে ওর লক্ষ্য নেই। এটা ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভ সংকেত।

নকুলেশ্বরকে কাছে ডেকে কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—এই আসরেই তো টপ্পা-পাঁচালী আরম্ভ করতে হবে। আমাদের প্রথম আসর; টপ্পার লহর তৈরী করে পাঁচালী বলতে পারবে?

নকুলেশ্বর বললেন—আমি তো আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানিনা। কি নিয়ে আলোচনা করতে হবে, বিষয়বস্তুটা বলে দিলে আপনার আশীর্বাদে এক-প্রকার কাজ চালিয়ে আসতে পারব।

কুঞ্জবাবু বললেন—কি বিষয় নিয়ে কবির লড়াই চলবে সে সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই কবিয়ালের মধ্যে গান আরম্ভের আগে কোন আলোচনাই হতে পারবে না। আসরের শ্রোতাদের ইচ্ছাই পূর্ণ করতে হবে। আজ আসরের শ্রোতাগণ যম-সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনতে ইচ্ছা করেছেন। তুমি কল্পনায় সাবিত্রী হয়ে যম-রূপী প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল উমেশ শীলকে প্রশ্ন করবে যে, আমার পতি সত্যবান যজ্ঞ-কাষ্ঠ আহরণ করতে বনে এসে শিরঃপীড়ায় মূর্চ্ছিত হয়ে আমার অঞ্চলের উপর শয়ন করে আছেন। তুমি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে মহিষ বাহনে চর্মডুরি নিয়ে এসে পতিকে ত্যাগ করে সরে যেতে আমাকে অনুরোধ করছ কেন? আর তোমার সঙ্গে একটি কদাকার কন্যা কেন? তার চব্বিশটি চক্ষু, আঠারটি হস্ত, ছয়টি চরণ কেন? এই কন্যার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? তোমার মাতাপিতার পরিচয় কি?—ইত্যাদি প্রশ্নগুলি লহর এবং ত্রিপদী ছন্দে বলতে পারবে তো?

নকুলেশ্বর একটু হেসে গুরুদেবকে প্রণাম করে বললেন—চেষ্টা করে দেখি!

এই বলে নকুলেশ্বর সেখান হতে উঠে একটু নির্জনে গিয়ে মনে মনে শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করে টপ্পা-পাঁচালীর ছন্দ ও শব্দ যোজনার কথা ভাবতে লাগলেন।

নকুলেশ্বরের প্রথম টপ্পা—নকুলেশ্বর বনাম উমেশ শীল

দল আসরে গিয়েছে। কন্‌সার্ট হয়ে গেছে। এক্ষুণি টপ্পা করতে হবে। গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে টপ্পার লহর করতে আরম্ভ করলেন। সম্মুখে গায়িকা শেখ সরলা, পেছনে মানদা। নকুলেশ্বর পদ দিলেন—

আমি কল্পনায় সাবিত্রী সতী, তুমি কাল শমন।
এসে পতির সনে জঙ্গলে, পড়েছি ঘোর অমঙ্গলে,
অদ্য কি আছে মোর কপালে, জানেন নারায়ণ॥
অদ্য শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে—
পতি মোর কোলের পরে মূর্চ্ছা যান,
ভূমিতে আঁচল পেতে, রেখেছি তাঁহার তনুখান।
নিয়ে করেতে চর্মডুরি, মহিষের পৃষ্ঠে চড়ি,
তুমি আজ হয়ে আগুয়ান।
কেন করজোড়ে আমার কাছে—
কাতরে ভিক্ষা চাও মোর পতির প্রাণ?

এই বলে লহরখানা শেষ করে নকুলেশ্বর ডাক-ধুয়া ও ছড়া ধরলেন—

কে বুঝিবে বিধির বিধি, যা লিখেছে জন্মের কালে।
জীবের ভাঙ্গা কপাল লয়না জোড়া—
সুখ হয়না পোড়া কপালে॥

(ডাকছড়া)

নমঃ নমঃ বিশ্বপতি তুমি শ্যাম অগতির গতি
তুমি প্রভু নিত্য নিরঞ্জন।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি চতুর্বেদের মূল
তুমি নিত্য সত্য সনাতন॥
স্থাবর জঙ্গম আদি কীট পতঙ্গ নানাবিধি
তুমি প্রভু করেছ সৃজন।
খেলা তোমার ভাঙ্গাগড়া সৃষ্টি স্থিতি লয় করা
জরা মরা উত্থান পতন॥
প্রলয় পয়োধি জলে সত্যব্রতে উদ্ধারিলে
মৎস্য মূর্তি করিয়ে ধারণ।
হয়ে কূর্ম অবতার ধরিয়ে মন্দার ভার
করাইলে সমুদ্র মন্থন॥
বরাহ মূরতি ধরে জলমগ্ন ধরিত্রীরে
দন্তে তুলি করিলে উদ্ধার।

নরসিংহ রূপ ধরি কৈশিপু বিনাশ করি
করেছিলে দেবের উপকার ॥
হয়ে বামন মহাবলী বলিরে ছলেতে ছলি
দিয়েছিলে পাতালে আগার
ভৃগুরাম রূপ ধরে নিঃক্ষত্রিয় বসুধারে
করেছিলে একবিংশ বার ॥
রাম রূপে অবতংশ বধিয়ে রাক্ষস বংশ
জয় বিজয় করিলে মোচন।
রামকৃষ্ণ রূপ ধরি দুষ্কৃতি বিনাশ করি
করেছিলে ধর্ম সংস্থাপন ॥
সেজে বুদ্ধ মহাজ্ঞানী অহিংসার মহাবাণী
মহামন্ত্র করেছ প্রচার।
ভবিষ্যতে কলির শেষে কল্কি রূপে ধরায় এসে
ম্লেচ্ছ বংশ করিবে সংহার ॥
হরিতে ধরার ভার যুগে যুগে অবতার
হও তুমি পতিতপাবন।
অধম পতিত আমি শ্রীচরণে প্রণমামি
দাও প্রভু রাতুল চরণ ॥
বন্দনা করিয়ে শেষ বক্তব্যে করি প্রবেশ
কল্পনায় সাবিত্রী মোর নাম।
তোমার নাম মৃত্যুপতি তোমার চরণে নতি
লহ মোর স্বভক্তি প্রণাম ॥
আজ আমি পতির সনে যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণে
বনমাঝে করি আগমন।
অকস্মাৎ পতি মোর শিরঃপীড়ায় সকাতর
ধরাতলে হল অচেতন ॥
ধরাতে অঞ্চল পাতি শোয়াইয়ে নিজ পতি
করিতেছি সিঞ্চন ব্যজন।
তুমি কেন অকস্মাৎ আসিয়া বাড়ালে হাত
নিতে মোর পতির জীবন ॥

মহিষের পৃষ্ঠে চড়ি করে নিয়ে চর্মডুরী
কাহারে বান্ধিবে মহাশয়।
তোমার সঙ্গে একটা নারী, নারী না ওটা আনাড়ী
চিন্‌তে নারি দেখে লাগে ভয়॥
লৌহ সম কৃষ্ণ গাত্র চতুর্বিংশ রক্ত নেত্র
অষ্টাদশ হস্ত তার রয়।
এলো তোমার পাছে পাছে ছয়খানা চরণ আছে
তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক হয়?
চব্বিশ চক্ষে কি বা করে অষ্টাদশ হাতে কি ধরে
ছয় চরণে কোথায় বিচরণ।
কার কন্যা সে কার যুবতী কেন এ বিকট মূরতি
কে তার পতি বল কাল শমন॥
শুনতে পাই পরস্পরে তোমার মাকে দেখলে পরে
তোমার বাবা মুখ ফিরায়ে রয়।
তোমার মায়ের স্বভাব মন্দ নইলে কেন করে দ্বন্দ্ব
তোমার বাবা এত রুষ্ট হয়॥
টাট্টু ঘোড়ার বাচ্চা বলে তোমারে বলে সকলে
এ দুর্নামটা হল কি কারণ।
বল তোমার জন্মের মর্ম কোন ঘোড়ায় দিয়েছে জন্ম
কার গর্ভে জন্মেছ শমন॥
আর কেন বেশী কথা বলব তোমায় সভার হেথা॥
অল্পে অল্পে করলাম সমাপন।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করে ধুয়ার ভাবে সূত্র ধরে
আরো কিছু করি উদ্দীপন॥

এই বলে নকুলেশ্বর ভাটিয়ালী গানের সুরে ধুয়া ধরে গাইতে লাগলেন—

হারে, ভাঙ্গন নদীর কূলেরে মন,
ঘর বান্ধিলি কি সাহসে।
ভোগ বাসনার তুফান উঠি, ভিটীর মাটি পৈল খসে॥
দুই খুটির পর ঘর ছিল খাড়া,—
দুইখানি তার রুয়া মাঠাম, দুইখানি আড়া,

কাম কামনা-বাঁশের বেড়া, ছিল ঘরের চারিপাশে।
পাপের ঘুণে খেয়ে করল সারা,
কোন সাহসে আছিস বসে॥
চর্ম্ম-ছনের ছাউনী আটি,—
বেতের বাধন দিয়েছিলি সাড়ে তিন কোটি।
কামের-ঘুণে দিল কাটি, এঁটে রাখবি কিসে।
গেল বাঁধন খুলে, পৈল ঝুলে,
নদীর কূলে ভাঙ্গন আসে॥
ঈশান কোণে উঠল ভীষণ ঝড়,—
কখন জানি উড়ে যায় তোর জরা জীর্ণ ঘর।
বান ডেকে আসিল জোয়ার, সকল তোমার গেল ভেসে।
অধম নকুল বলে, এ ঘর ফেলে,
দেশের মানুষ চল দেশে॥
—ঘর বান্ধিলি কি সাহসে।
মন শিক্ষায় নাই আর প্রয়োজন,—
কল্পনাতে সাবিত্রী নাম করিলেম ধারণ।
বিপক্ষে তুমি কাল শমন, সেজে আজ কৃতান্ত বেশে।
দণ্ড হাতে এই বনেতে,
এসেছ আজ কি উদ্দেশে॥
কাল কৃতান্ত তোমায় সবে কয়,—
কোন্ বস্তুকে কর অন্ত বল মহাশয়।
কারে নিয়ে যাও যমালয়, পাপপুণ্যের বিচারের আশে॥
আবার কি সংহার করিয়ে হল,
সংহার কর্ত্তা কীর্তিবাসে॥
দেহ দ্বারা সকল কর্ম হয়,—
মৃত্যুকালে ধরাতলে দেহ পড়ে রয়।
তবে চর্মডুরী দিয়ে গলায়, কারে তুমি বান্ধ কসে।
তুমি কারে নিয়ে জম্বুদ্বীপে,
শাস্তি দাও বিচারের শেষে॥
—ঘর বান্ধিলি কি সাহসে।

(পয়ার)

আর তবে বেশী কথা বলব না বলব না।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত দিলাম কাব্য আলোচনা॥
যম তর্পণে চৌদ্দ যমের নাম শুনিতে পাই।
তার ভিতরে তুমি কোন্ যম বল দেখি তাই॥
তোমার বাবার দাঁতের মাড়ি কে ভাঙ্গিল গিয়া।
কেন তোমার বাবার পূজা চাউলের গুঁড়া দিয়া॥
এই সকল বৃত্তান্ত আমি করিব শ্রবণ।
সত্য করে তত্ত্বকথা বল কাল শমন॥
সবার পদে স্বভক্তিতে করি নিবেদন।
বিদ্যাবুদ্ধি শূন্য আমি অতি অভাজন॥
গুরু-পিতা কুঞ্জ দত্তের আশিস বাণী নিয়ে।
যা কিছু বর্ণনা করি সভাতে আসিয়ে॥
গুণের ভাগটা গুরুপদে করে সমর্পণ।
দোষের ভাগটা নিজের শিরে করিলাম গ্রহণ॥
এই পর্যন্ত এ পাঁচালী আমি সাঙ্গ করি।
গুরুপ্রীতে সবে মিলে বলুন হরি হরি॥

এইভাবে টপ্পা-ছড়া-পাঁচালীর মাধ্যমে বিপক্ষের প্রতি অনেকগুলি প্রশ্নের উত্থাপন করে নকুলেশ্বর বাসাঘরে এসে গুরুপদে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন। দলপতি কুঞ্জবাবু আনন্দ সহকারে নকুলেশ্বরকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আশীর্বাদ করি, মা বাগ্বাদিনী তোমার জিহ্বায় অধিষ্ঠিত থাকুন। অল্পদিনের মধ্যে তুমি প্রথিতযশা কবিরত্ন বলে লোকসমাজে সমাদৃত হও। আচ্ছা এখন যাও ; উমেশ সরকার টপ্পাখানার কি জবাব করে শুনে এসো।

নকুলেশ্বর গিয়ে আসরে বসলেন। উমেশ সরকার দল নিয়ে আসরে এসে টপ্পাখানার জবাব বলতে আরম্ভ করলেন—

তুমি কল্পনায় সাবিত্রী সতী, আমি কাল শমন।
তোমার প্রাণের পতি সত্যবান, অদ্য তার জীবন অবসান,
তাইতে গ্রহণ করতে তাহার প্রাণ, দিলাম দরশন॥
আমি চর্ম ডোরে বন্দী করে—
জীবাত্মা নিয়ে জম্বুদ্বীপে যাই ;

পাপ পুণ্যের বিচার করে—
পুনর্বার সংসারে পাঠাই।
ভূমিতে আঁচল পাতি, রেখেছ আপন পতি,
আমি তার জীবন ভিক্ষা চাই ;
কারণ সতীর অঙ্গ স্পর্শ করতে,
দুরন্ত কৃতান্তেরও শক্তি নাই ॥

লহর টপ্পাখানা শেষ করে উমেশ সরকার পাঁচালী বলতে আরম্ভ করলেন তিনি প্রথমে ডাক ধুয়া দিলেন—

লীলাময়ের লীলাখেলা, কে বুঝিবে সুক্ষ্মাসূক্ষ্ম।
ভাঙ্গাগড়া তাঁরই খেলা, আমি মাত্র উপলক্ষ ॥

(বন্দনা)

গুরুপদে দেহ চিত্ত   হবে দেহের প্রায়শ্চিত্ত
গুরু ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন
সর্ব মূলাধার গুরু   গুরু ব্রহ্ম কল্পতরু
গুরুপদে মজ আমার মন ॥
শুদ্ধ করে দেহযন্ত্র   গুরুদত্ত মহামন্ত্র
নিরজনে জপ অনিবার।
শ্রীগুরু অসীম অনন্ত   গুরু আদি গুরু অন্ত
গুরু ব্রহ্ম সর্বমূলাধার ॥
অজ্ঞান তামসী নিশি   জ্ঞান-দীপ পরকাশি
যে ঘুচায় জীবের অন্ধকার।
সেই গুরু চরণ-পদ্ম   হৃদয়ে করিয়ে বদ্ধ
করি শত কোটি নমস্কার ॥
বন্দনা করিয়া ক্ষান্ত   টপ্পাখানার যে বৃত্তান্ত
প্রকাশ করি রত্ন সভার ঠাঁই।
কেঁদনা সাবিত্রী সতী   মরেছে তোমার পতি
মৃত্যুপতি শিয়রে দাঁড়াই ॥
মর-রাজ্যে জন্ম ধরে   আজ বাদে কাল সবাই মরে
চিরদিন অমর কেহ নয়।

সকলেরই মৃত্যুকালে পড়তে হবে কাল কবলে
কর্ম ফলে পুনঃ জন্ম হয় ॥
তোমার পতির অল্প আয়ু ফুরায়েছে আয়ু বায়ু
আজ হবে দেহের পতন।
আত্মাকে হরিবার জন্যে সঙ্গে নিয়ে মৃত্যু কন্যে
আমি আজ এসেছি শমন ॥
মৃত্যুকন্যার ছয়টি চরণ ছয় রিপু করিবে দমন
চব্বিশ চক্ষে চব্বিশ চন্দ্র ক্ষয়।
আঠারটি হস্ত দিয়ে আঠার মোকাম বান্ধিয়ে
আঠার দেবতা হরে লয় ॥
মৃত্যুকন্যা আমার ভগ্নী প্রলয়ের মহা অগ্নি
প্রজ্জলিত করিবে যখন।
জীবদেহের আমিত্ব পুড়ে আত্মা থাকে স্থক্ষ্মাকারে
আমি তারে করি যে বন্ধন ॥
মিথ্যা একটা প্রবাদ বাণী সূর্যদেবের প্রণয়িনী
পদ্মিনীরে সর্বলোকে কয়।
পদ্মিনী নয় আমার মাতা ওটা একটা প্রবাদ কথা
তবু আমার সাঙ্গা মাতার ভয় ॥
সূর্য পূজায় পদ্ম দিলে পূজা লয়না কোন কালে
পিতা সূর্য মুখ ফিরায়ে রয়।
ক্ষুদ্র জ্ঞানী মানুষ যারা আমার মাতা বলে তারা
পদ্মিনীরে করে নিরূপণ।
এই পর্যন্ত করে ক্ষান্ত ধুয়া ধরে মূল বৃত্তান্ত
আরো কিছু করি উদ্দীপন ॥

(ধুয়া)

যারা ভুলেছে মহামায়ায়,
মায়ার ফাঁসি পড়ে তার গলায়।
তারা মায়ার ঘোরে এ সংসারে,
বারে বারে আসে যায় ॥

শোন গো সাবিত্রী সতী, মরেছে তোমার প্রাণপতি,—
মৃত্যুকালে এসেছি আমি মৃত্যুপতি ;
ভবে সবার হবে এমনি গতি, নিয়তি এড়ান দায় ॥
জীবের ষষ্ঠী বাসরে, ব্রহ্মা যা লিখন করে,
খণ্ডাতে পারেনা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করে ;—
ও সেই বিধির বিধি অনুসারে, সংসারে জীব আসে যায় ॥
আমার সাঙ্গা জননী, একদিন সেজে অশ্বিনী,
পিতা বিশ্বকর্মার ঘরে চলে যখনি ,—
তখন অশ্ব সেজে দিনমণি, অশ্বিনী কুমার জন্মায় ॥
সূর্য অশ্বরূপ ধরে, তাইতে তুমি রাগ করে,
টাট্টু ঘোড়ার বাচ্চা বলে, বললে আমারে ;
তোমার বাবার শ্রাদ্ধে মন্ত্র পড়ে, তর্পণ করো ঘোড়ার পায় ॥
সতী আমার কথা লও, যদি পতির মঙ্গল চাও,
মরা পতি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যাও—
যদি আত্মার রাজ্যে আত্মা মিশাও, পরজন্মে পাবে তায় ॥
—মায়ার ফাঁসী পড়ে তার গলায় ॥

(পয়ার)

আর তোমারে বেশী কথা বলে কার্য নাই
এই পর্যন্ত এ পাঁচালী শেষ করে যাই ॥
সভার মাঝে আছেন যত সাধু বৈষ্ণবগণ।
অধীনের দণ্ডবৎ করিবেন গ্রহণ ॥
চতুর্দিকে আছেন যত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
স্বভক্তিতে প্রণাম করি করে কৃতাঞ্জলি ॥
এ সভাতে আছেন যত মুসলমান ভাই।
সকলের জনাবেতে সেলাম দিয়ে যাই ॥
এই পর্যন্ত বলে আমার ভাব সাঙ্গ করি।
মুসলমানে বলুন আল্লা হিন্দু বলুন হরি ॥

এই ভাবে উমেশ সরকার টপ্পা-পাঁচালীর মাধ্যমে গানের জবাব দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গানও শেষ হয়ে গেল। যে যার নিজের পান্‌সীতে গিয়ে উঠল।

রিকাববাজার লক্ষ্মীপূজা বাড়ীতে কবিগান শেষ করে কুঞ্জ দত্ত ও উমেশ শীল এই উভয় কবিয়ালের দলই নারায়ণগঞ্জে এসে "চাড়ার ঘোপে" নৌকা বাঁধল। চাড়ার ঘোপটা হলো রেল স্টেশন ও কালীর বাজারের মাঝখানে একটা হ্রদের মতো বিস্তৃত জলাশয়। যত কবির দল যাত্রার দল পূর্ববঙ্গের এক জিলা থেকে আরেক জিলায় ঢাকা হয়ে যাবার পথে ঐ চাড়ার ঘোপে এসে নৌকা বেঁধে রান্নাবান্না আহারাদি করত। পঞ্চাশ ষাটটি বিবিধ রকম গানের দলের ঐ চাড়ার ঘোপটা ছিল মিলন-কেন্দ্র। কত রকম গান বাজনা আনন্দ উৎসবে দিনরাত্র যেন একটা মেলা জমে থাকত।

নকুলেশ্বর এই স্থানটি আর কখনো দেখেননি। কারণ বরিশালের ঝালকাঠি থেকে নৌকা খুলেই নোয়াখালীর দালাল বাজারে দুর্গাপূজা বাড়ী, সেখান থেকে ঢাকা জিলায় রিকাববাজারে লক্ষ্মীপূজা বাড়ীতে গান শেষ করে তাদের দল সোজা চাড়ার ঘোপে এসে নৌকা বেঁধেছে। এখানে এলে সকল দলই চাড়ার ঘোপে নৌকা বেঁধে রেখে ঢাকেশ্বরীর পূজা দিতে ঢাকা শহরে যায়। নকুলে-শ্বরের কাছে এ জায়গাটা অপরিচিত। তাঁর কাছে এই বিরাট জনকোলাহলপূর্ণ আনন্দমুখর আনন্দ মেলায় পরিণত ত্রিবেণী সঙ্গমটি অবর্ণনীয় মনোমুগ্ধকর মনে হলো।

চাড়ার ঘোপের পাশেই ডেভিড কোম্পানীর পাটের অফিস। এই চাড়ার ঘোপ হ্রদটি ঐ কোম্পানীর নিজস্ব। তবে এই সব গানের দলের ব্যবহারের জন্য এ জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছিল। বিনা খাজনায় যত দিন ইচ্ছা গানের দলের নৌকা এখানে থাকতে পারত।

কবির দলে যোগদানে তিরস্কার

ঐ চাড়ার ঘোপে বাসকালে একটি ঘটনায় নকুলেশ্বরের মনটা একটু চঞ্চল করে তুলেছিল। উক্ত ডেভিড কোম্পানীতে নকুলেশ্বরের ছোট ভগ্নীপতি তারিণী চন্দ্র চাকুরী করত। নকুলেশ্বর তা জানতেন না।

নকুলেশ্বরের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল গুরুদেবের কাপড় ধোয়া, বিছানা পরিষ্কার করা, তামাক সাজা, তাঁর জন্য আলাদা রান্না করা ইত্যাদি। চাকরকে বঞ্চিত করে গুরুসেবার এ কাজগুলি তিনি চাকরের থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য স্বার্থহীন নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বদা যে কোন ছুতায় গুরুদেবের নৈকট্য লাভ। কোন একটা কাজ উপলক্ষে তাঁর কাছে থাকতে পারলে অনেক

কিছু জানতে শিখতে পারবেন বলেই নকুলেশ্বর স্বহস্তে গুরুসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন নকুলেশ্বর চাড়ার ঘোপে চরে বসে গুরুদেবের কাপড়-জামায় সাবান দিচ্ছেন এমন সময় তার ভগ্নীপতি তারিণী চন্দ সেখানে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—কে রে নকুল না?

নকুলেশ্বর মাথা তুলে কোট-প্যান্ট পরা বাবুটিকে দেখে প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মুখে কোন কথা জোগাল না। তারিণী চন্দ বললেন—হাঁ করে কি দেখছিস? চিনতে পারিসনি বুঝি। আমি তোর ভগ্নীপতি। দেখতো চিনিস কি না!

নকুলেশ্বর ছিলেন তিন বোনের ছোট। কাজেই তারিণীবাবুর তুই-তামারি কথায় রুষ্ট না হয়ে বরং সাদরে বললেন—এখানে দাঁড়িয়ে কেন? চলুন পান্সীতে বসে আলাপ করবেন; আর আমার গুরুদেবের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে। তারিণীবাবু একটু উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন—যে চাকরী নিয়েছ দেখছি এর আবার গুরুও আছে নাকি!

নকুলেশ্বর একটু মলিন মুখে বললেন—এই কাপড় কাচাই আমার চাকরী নয়, আমি কবি হতে এসেছি। গুরুসেবা, গুরুর পরিচর্যা না করলে গুরুকৃপা লাভ করা যায় না।

তারিণীবাবু রাগতস্বরে বললেন—রেখে দে তোর গুরুসেবা! ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে একটা নোংরা বিদ্যা শিখতে এসে চাকরের কাজ করতে হবে? কোন ভদ্রলোক কি কবির সরকার হয়? আমি তোকে বারণ করছি, একাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে যা নতুবা আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তুই না হয় ঘৃণালজ্জার মাথা খেয়ে মেয়ে-কবির দলে চাকর হয়েছিস, কিন্তু আমার তো একটা মান-সম্মান আছে। আমি একটা সাহেব কোম্পানীর অফিসার। তুই আমার শ্যালক হয়ে এই সব নোংরা কাজ করলে আমার মাথা কাটা যায়। তাই বারণ করছি এসব কাজ করতে পারবি না।

তারিণীবাবুর এইসব লম্বা-চওড়া উপদেশগুলি নকুলেশ্বরের কানে যেন বিষ ঢেলে দিল। তিনি অমনি তারিণীবাবুর মুখের উপর বলে দিলেন—আজ যেন শ্যালকের প্রতি বড় দরদ উথলে উঠল দেখছি! আমি যখন অভাবের তাড়নায় মুদী দোকানে চিটাগুড় বেচেছিলাম, কুমোরের দোকানে হাড়িবাসন বেচে-ছিলাম, মুসলমানের অন্নদাস হয়ে গৃহশিক্ষকতা করেছিলাম—কই তখন তো

দরদ দেখিনি! পাঠ্যপুস্তক বা জামা-কাপড় দিয়ে তো অফিসারবাবু সহায়তা করেন নি। তখন আমার সেই সব নোংরা কাজে তো কারো লজ্জা হয়নি, মাথা কাটা যায়নি। আমি মেয়ে-কবির দলে কবি শিক্ষা করতে এসেছি বলে যার মাথা কাটা যাচ্ছে তিনি দয়া করে আর পরিচয় দিতে এ মুখে আসবেন না। আমি আমার মঙ্গলের পথ বেছে নিয়েছি। যতদিন মানুষের মত মানুষ হতে না পারি ততদিন এই নোংরা পরিবেশের মধ্যেই থাকব; নোংরা কাজই করব। যান, আপনি আপনার সাহেবের গোলামী করুন আর আমি আমার শ্রীগুরুর গোলামী করে কৃতকৃতার্থ মনে করব। আশীর্বাদ করে যান—এই চাকর খেটে যেন গুরুর কৃপায় ভবিষ্যতে চাকর খাটাতে পারি।

বলতে বলতে নকুলেশ্বরের চোখে জল এসে গেল। নকুলেশ্বর ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে। লেখাপড়া শিখবার জন্য তাঁকে অনেক ছোট কাজ করতে হয়েছে। তথাপি তিনি সফল মনোরথ হতে পারেন নি। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই যেন ভগবানের ইঙ্গিতেই এপথ বেছে নিয়েছেন। আজ তাঁর সেই শুভ সংকল্পে বাধা দিতে এসেছে বলে তিনি মনের দুঃখে উন্মাদের মতো তারিণীবাবুকে এরকম কটু ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। তারিণীবাবু বুঝলেন এই ভূত ছাড়াবার মন্ত্র আর তার ঝুলিতে নেই; তাই তিনি রাগে হন্‌হন্ করে চলে গেলেন।

নকুলেশ্বর নৌকায় গিয়ে এই ঘটনার কথা পিতামাতার কাছে পত্র দিয়ে জানালেন। কয়দিন পর তাঁর মাতাঠাকুরানী পত্রোত্তরে জানালেন, শুভ কাজে বহু বিঘ্ন থাকে বাবা! সেজন্য মন খারাপ করো না, ভগ্নীপতি তো দূরের কথা আমরা তোমার পিতামাতা হয়েও তোমাকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে পারিনি। অনন্যোপায় হয়ে যাঁর হাতে তোমাকে সঁপে দিয়েছি তিনিই তোমার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন! তাঁর সেবা পূজাই তোমার জীবনের ধর্ম। গুরুকৃপা লাভ হলে মানুষের দুষ্প্রাপ্য কিছু থাকে না। আশীর্বাদ করি গুরুপদে তোমার একনিষ্ঠ ভক্তি থাকুক! এবং গুরুর করুণাধারা অমৃতধারার মতো তোমার মস্তকে বর্ষিত হোক!

মাতাঠাকুরানীর আশীর্বাদ লিপিখানি পেয়ে নকুলেশ্বরের আনন্দ উদ্দীপনার উৎসে যেন দ্বিগুণ বান ডাকলো। কায়মনোবাক্যে তিনি গুরুসেবা এবং কাব্যানুশীলন করে যেতে লাগলেন।

ঢাকেশ্বরীর কালী বাড়ীতে

পরের দিন কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—সকালে স্নান করে সকলকে নিয়ে ঢাকায় মা ঢাকেশ্বরীর বাড়ী রওনা হব। সেখানে গিয়ে মায়ের পূজা ও 'মহল্লা' দিতে হবে। মহল্লা শব্দের অর্থ হল, পূজার পরে মায়ের সম্মুখে একখানা ডাক গানে মায়ের বন্দনা করা। সকল কবির দলই চিরদিন এই নিয়ম পালন করতেন।

গুরুবাক্যে নকুলেশ্বরের খুব আনন্দ। কারণ সে আজ পর্যন্ত ঢাকা শহরেও যায়নি, এবং মা ঢাকেশ্বরীর দর্শনও তাঁর ঘটেনি। সেজন্য নকুলেশ্বর নিজে দলের সকলকেও তাগিদ দিলেন। সকলে স্নান সেরে বেলা আটটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে ঢাকায় রওনা হলো। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় যাবার দুটি ব্যবস্থা আছে। বাসেও ট্রেনে যাওয়া যায়। নকুলেশ্বর সকলকে বললেন, চলুন আমরা ট্রেনেই যাই। ট্রেনে যাওয়ার উদ্দেশ্য, সে কোনদিন ট্রেনে উঠা তো দূরের কথা ট্রেন চোখেও দেখেনি। কারণ বরিশাল জেলায় সে জন্মেছে, সে জেলায় ট্রেন চালু নেই। কাজেই সেই অপূর্বদৃষ্ট জিনিষটা দর্শনের জন্য নকুলেশ্বরের এই আগ্রহ! তার অনুরোধে সকলেই সেই প্রস্তাবে রাজী হলো। টিকিট কেটে সকলে ট্রেনে উঠল। কুঞ্জবাবুও সঙ্গে আছেন।

নকুলেশ্বর যামিনী নন্দীর কাছে বসে বসে ট্রেন সম্বন্ধে বহু কথা জানতে চাইলেন। এত বড় একটা গাড়ী এতগুলি লোক নিয়ে এত দ্রুত কি করে চলে, কে টেনে নেয় ইত্যাদি সব উদ্ভট প্রশ্ন করতে লাগলেন। যামিনীকান্ত তাকে ধীরে ধীরে এই বাষ্পীয় যানটির গঠন ও চলন সম্পর্কে বলতে লাগল। নকুলেশ্বর বললেন—দাদা, পাঠ্য পুস্তকে পড়েছি বটে কিন্তু চক্ষে তো দেখিনি, তাই আপনাকে বিরক্ত করলাম, রাগ করবেন না।

যামিনী নন্দী হেসে বলল—না না রাগ করব কেন; বরং নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণে তোমার আগ্রহ দেখে খুব আনন্দ লাভ করলাম। সব বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু না হলে তার কখনো আত্মোন্নতি হয় না।

যামিনী নন্দীর কাছে রেল গাড়ী সম্বন্ধে নানা কথা শ্রবণ করে নকুলেশ্বরের মনে যেন কি একটা ভাবের উদ্দীপনা উদ্দীপিত হলো। অমনি তিনি পকেট হ'তে একখানা কাগজ বের করে আপন মনে কি যেন লিখতে লাগলেন। লেখা শেষ করে কাগজখানি যামিনী নন্দীর হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন তো দাদা, ঢাকেশ্বরী বাড়ী গিয়ে ডাক-গানের পরিবর্তে এই গানটি চলে কিনা।

যামিনীকান্ত বলল—পদগুলি বল, আমি শুনি। নকুলেশ্বর স্বরচিত গানের পদগুলি বলতে লাগলেন, যথা—

জীবের দেহ রেলের গাড়ী।
দশ ইন্দ্রিয় দশটি চাকা, মন বেটা করে ড্রাইভারী॥
কামনা লোহার বয়লারে, ভোগের কয়লা দিয়ে ভরে,
কামাগুনে গরম করে নিত্য চিত্ত-বারি।
আশার বাষ্প ওঠে, গাড়ী ছোটে, হংস হংস শব্দ করি॥
ঈড়া পিঙ্গলা লাইনে, বিবেকের বাঁশী শুনে,
চলে ছয় স্টেশনে, জ্ঞানের হুইসাল ছাড়ি
তাতে ছয় বেটারে ভার দিয়েছে, এই গাড়ীর লাইন ক্লিয়ারী॥

(অন্তরা) এ গাড়ী গড়েছে কোন্ ইঞ্জিনীয়ার।
গাড়ীর দমের কলে দম লাগালে চলে অনিবার॥
মূল স্টেশন মূলাধারে, সেখান হতে গাড়ী ছাড়ে,
ছয় স্টেশনের ওপারে ঢাকা সহস্রার।
ভাবের টিকিট হাতে, পারে যেতে ভাবুক প্যাসেঞ্জার॥
গাড়ী চলে বায়ুর বলে, আয়ু-বায়ু কমে গেলে,
দম দিলে সে দমের কলে, দম লবে না আর।
গুরু কুঞ্জ বলে নকুলরে তোর গুরুমন্ত্র সার॥

যামিনীকান্ত গানের পদগুলি শুনে বলল—বেশ হয়েছে, দাও দেখি কাগজখানা। এই বলে কাগজখানা নিয়ে যামিনীকান্ত কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের কাছে গিয়ে কাগজখানা তাঁর হাতে দিল এবং বলল, দেখুন তো এই ডাক-গান খানা ঢাকেশ্বরীর বাড়ী গাওয়া চলবে কিনা!

কুঞ্জবাবু—এ গানটা পেলে কোথায়।

যামিনীকান্ত—নকুলেশ্বর লিখেছে।

কুঞ্জবাবু—বেশ বেশ এই তো চাই। যখন যে ভাব মনে উদয় হয় ভাষা দিয়ে ছন্দ দিয়ে সেই ভাবকে রূপ দেওয়ার নামই হচ্ছে কাব্য। গাড়ী হতে নেমে দোহারপত্রকে একটু দেখিয়ে না দিলে ওরা গাইতে পারবে না।

ঢাকা গিয়ে গাড়ী পৌছান মাত্রই কুঞ্জবাবুর আদেশে তিন খানা ঘোড়ার গাড়ী আনা হলো। যামিনীকান্ত এক গাড়ীতে সেখ সরলা, মানদা ও একজন

ধরতা দোহারসহ নকুলেশ্বরকে নিয়ে উঠল। কুঞ্জবাবু এক গাড়ীতে; অন্য গাড়ীতে দলের অন্য সকলে উঠে ঢাকেশ্বরীর বাড়ী রওনা হলো।

গাড়ী চলতে শুরু করলে যামিনী নন্দী বলল—কই নকুল, সেই গান-খানা বল, সরলা মানদা ওরা একটু দেখে নিক। নকুলেশ্বর গানখানা বারবার করে বলতে লাগলেন আর ওরা সুর দিয়ে ঠিক করে নিল।

নূতন গান পেলে শেখ সরলার খুব আনন্দ হয়। কাজেই সে এই নূতন গান-খানা বেশ ভাল তালিম দিয়ে নিল। ইতিমধ্যে গাড়ী গিয়ে ঢাকেশ্বরীর বাড়ী পৌঁছল। ঢাকেশ্বরীর বাড়ী যেই যায়, তাকেই মায়ের মন্দিরে ডালা (ভোগ) দিতে হয়। দলের সকলেই ব্যক্তিগতভাবে সামর্থানুযায়ী ডালা কিনে মায়ের পূজা দিল। কুঞ্জবাবু সরকারী অর্থাৎ দলের পক্ষ থেকে পূজার জন্য প্রচুর পরিমাণ ডালা এবং ফুলচন্দনাদি কিনবার জন্য নকুলেশ্বরের কাছে টাকা দিয়ে বললেন—যাও, ডালা কিনে মায়ের মন্দিরের পূজারীর হাতে দেবে। তারপর সকলে মিলে মায়ের পূজার সময় একখানা ডাক-গান গাইবে।

নকুলেশ্বর—কোন্ ডাক গানখানা গাইতে হবে ?

কুঞ্জবাবু—গায়ক গায়িকারা যেটা ভাল গাইতে পারে তাদের মত নিয়ে সেটাই গাওয়াবে।

নকুলেশ্বর যামিনী কান্তকে নিয়ে পূজার দ্রব্যাদি কিনে মন্দিরে গিয়ে তাকে বললেন—কোন্ ডাক-খানা গাইতে হবে আপনি সকলের কাছে জিজ্ঞাসা করুন। জিজ্ঞাসা করার আর প্রয়োজন হলোনা। নকুলেশ্বরের কথা শুনেই শেখ সরলা বলে উঠল—কেন, আবার জিজ্ঞাসা কেন ? গাড়ীর মধ্যে বসে যে গানখানা শিখালে সেই গানখানাই মা ঢাকেশ্বরীর পদে উৎসর্গ কর।

পূজার ঘণ্টা বেজে উঠতেই সকলে মিলে মন্দিরের দ্বারে সমবেত হলো। যামিনীকান্ত হারমোনিয়ামে সুর তুলতেই নকুলেশ্বর সেই সদ্য রচিত গাড়ীর ডাকখানার পদ বলতে আরম্ভ করলেন। শেখ সরলা ও মানদা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে গান আরম্ভ করল। অন্যান্য সকলে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে ঐ সব পদের সুরানুযায়ী পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ দোহারী করতে লাগল।

কুঞ্জবাবু মন্দির প্রাঙ্গনে বৈঠকখানা ঘরে বসে বিশ্রাম করছিলেন। নূতন গানের সুর কানে যেতেই তিনি সকলের পেছনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে গানের পদগুলি শুনতে লাগলেন। নকুলেশ্বরের তখন অন্যদিকে তাকাবার অবসর ছিল

না। নূতন গানের নূতন পদগুলিও তাদের যথোপযুক্ত সুরারোপের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। পাছে বা কোন পদ ভুলে গিয়ে লজ্জা পেতে হয় এই চিন্তাতেই সে উৎকণ্ঠিত। তাই কুঞ্জবাবুর আগমন এবং অন্তরাল থেকে গান শোনা নকুলেশ্বর কিছুই জানতে পারেন নি।

গানখানা শেষ করে পেছনে ফিরে গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে নকুলেশ্বর তাঁকে প্রণাম করলেন। কুঞ্জবাবু হাসিমুখে নকুলেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—মা ঢাকেশ্বরী তোমার বাসনা পূর্ণ করুন!

সরলার সঙ্গে নিরালায়

পূজা শেষ হতে কিছুক্ষণ বাকী আছে। নকুলেশ্বর নাটমন্দির হতে বের হয়ে শিবের মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে বসে একটু বিশ্রাম করছেন। এমন সময় শেখ সরলা সেখানে গিয়ে নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল—কিহে কবি মহাশয়, এখানে বসে আবার কোন্ কাব্য রচনা করা হচ্ছে? নকুলেশ্বর বললেন—ছিঃ ছিঃ, আমাকে একথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আমি কাব্যের জানিই বা কি; আর কি কাব্যই বা রচনা করব। এখানে নিরিবিলি বসে একটু বিশ্রাম করছি মাত্র।

সরলা—আমি যে তোমাকে গোপনে একটি কথা বলব বলে সেদিন বলেছিলাম, এখন কি তোমার তা শোনার সময় হবে?

নকুলেশ্বর—কেন হবে না? কি বলতে চান বলুন।

সরলা—আমি অল্প দিনের মধ্যেই এ দল ছেড়ে দিয়ে ঝালকাঠি যাবো। ছোটবেলা থেকে পরের দলে দোহার হয়ে কাজ করে গেলাম, কিন্তু নিজে কিছু করতে পারলাম না। গোলোকমণির মেয়ে কালা যামিনী উমেশ সরকারকে নিয়ে নিজে দল করে কেমন সুখ্যাতি লাভ করেছে। তুমি যদি রাজী থাক, তবে আমিও তোমাকে নিয়ে স্বাধীনভাবে দল করে দেশবিদেশে যশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারব। এখানে তুমি বিনা মাইনায় খাটুনি খেটে মর; একখানা ধুতি কাপড় কেনার পয়সাও পাওনা। আমি তোমাকে উপযুক্ত মাহিনা ও খাওয়া-পরা সব দেবো। বল, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

কথাগুলো নকুলেশ্বরের কানে যেন বিষ বরিষণ করছিল। তিনি বললেন—আপনি কী আমার মন পরীক্ষা করছেন, না পূর্ব-শত্রুতা শোধের জন্য একটা নূতন ফন্দি এঁটেছেন। দোহাই আপনার! আমাকে অর্থ স্বার্থের প্রলোভন দেখিয়ে

পথভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করবেন না। আমি কবির সরকারী শিক্ষা করার জন্যে গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়েছি। তিনি যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন এই আমার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। আপনি আমার সাধনার পথে কণ্টক হবেন না।

সরলা—সে কি! তুমি আমাকে এমন ভুল বুঝলে কেন? আমি তোমার শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য একথা বলিনি। তোমার ভালর জন্যই বলেছি। তুমি যাঁকে গুরু বরণ করেছ, তিনি যাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন—অর্থাৎ তোমার গুরুর গুরু খুলনা নিবাসী সেই বিধু সরকার মহাশয়কে মাহিনা করে দলে রাখব। তুমি দল চালাবে, তিনি তোমাকে যুক্তি পরামর্শ-উপদেশ-নির্দেশ দেবেন পেছন থেকে। তা হলে তুমি অতি অল্পদিনের মধ্যেই শক্তিশালী কবি হতে পারবে। তোমার অর্থ পরমার্থ দু'দিকই রক্ষা হবে। বল, তুমি রাজী?

নকুলেশ্বর জীবনে কাউকে কখনো কটু কথা বলেন নি। কিন্তু সরলার হিতোপদেশে অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—দেখুন, আপনার অযাচিত হিতোপদেশ শুনে হরি আচার্য মহাশয়ের 'হরিদাসের কবিগান' খানার 'ডাইনা'র কয়েকটি পদ আমার মনে পড়ে গেল। হরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে বলেছিলেন—

আমার গাছের পাতায় ঝুপড়ি বাঁধা,
নামেতে মন প্রাণ দিয়েছি বাঁধা,
তোর রূপের ধাঁধায় গেলাম পড়ে।
এমন গরীবের দুয়ারে কেন হাতির পাড়া পড়ে॥
আর খুলে রেখে বক্ষের স্তন,
চক্ষু ঠারিস কি কারণ,
ওসব ফাত্‌রা লোকের সাত রাজার ধন—
কেন এ বৈরাগীরে দেখালি?

সরলা বলল—কেন, আমি তোমাকে এমন কি অন্যায় কথা বলেছি যে তোমার ঐ হরিদাসের গানটা মনে পড়ে গেল?

নকুলেশ্বর—হরিদাস ঠাকুর যেমন একনিষ্ঠ মনে ভগবানের নাম সাধনে বসেছিলেন, বেশ্যা বেটী এসেছিল তার সাধন ভজন নষ্ট করবার জন্য, আমিও তেমনি একাগ্র মনে গুরুদেবের চরণাশ্রয় করেছি কবি হবার জন্য। আর আমার এই সাধন পথে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে আপনি ঐ সব প্রলোভন দেখাচ্ছেন। তাই হরিদাসের ভজন নষ্ট করার অপচেষ্টার কথাই স্মরণ হয় কিনা আপনিই একটু

দেখুন। তবে জেনে রাখুন, যতদিন পর্যন্ত আমি কবিয়াল হবার উপযুক্ততা অর্জন করতে না পারি, এবং পৃথক দল গড়ার জন্যে গুরুদেবের অনুমতি না পাই, ততদিন আমি কোন প্রলোভনেরই বশীভূত হয়ে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা। একটা কথা আপনাকে বলছি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি একজন নাম করা গায়িকা। তারপর আছে অর্থ সম্পদ। আপনার গায়ে দেড় শ' দুই শ' ভরি সোনার গহনা আছে। আপনি একজন নামজাদা ভাল সরকার নিয়ে অনায়াসে দল গঠন করতে পারেন। আমার মতো একটা হতভাগ্য আনাড়ী বালকের মাথাটা না খেলেও চলবে। তাই আমার অনুরোধ—এরকম গায়ে-পড়া দরদ দেখাবার চেষ্টা আর কখনো করবেন না।

এই বলে নকুলেশ্বর সেখান থেকে উঠে কুঞ্জবাবুর কাছে গেলেন। কুঞ্জবাবু বললেন—পূজা শেষ হয়েছে, চল এখন নারায়ণগঞ্জে ফিরে যাই।

ত্রিপুরা উদয়পুরে বায়না

দলবল সহ নকুলেশ্বর নারায়ণগঞ্জে এসে পান্সীতে গিয়ে দেখেন দুইজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

তারা বললেন—আমরা পার্বত্য ত্রিপুরার উদয়পুর হতে আসছি। সেখানে আগরতলা মহারাজের কাছারী বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। পনের দিন সেই মেলা থাকে। সেই মেলায় কবিগান গাওয়ার জন্যে বায়না করতে এসেছি।

নকুলেশ্বর—বিপক্ষে কোন্ দল থাকবে ?

ভদ্রলোক—চাঁদপুরের বিখ্যাত কবি হরকুমার শীল মহাশয়কে বায়না করা হয়েছে।

নকুলেশ্বর আর কিছু না বলে কুঞ্জবাবুর আসার অপেক্ষায় রইলেন, কারণ পথের দূরত্ব, যানবাহনাদির ব্যবস্থা, রাহা-খরচ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে কত টাকা চাওয়া দরকার সে সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না। কুঞ্জবাবু নৌকায় এলে নকুলেশ্বর গিয়ে তাঁকে এই বায়নার কথা জানালেন। কুঞ্জবাবু তাদের সঙ্গে কথা বলে তিন পালা গানে পনের শত টাকা ও যাতায়াত খরচ দাবী করলেন।

তারা বলল—টাকাটা বড় বেশী দাবী করলেন। হরকুমার শীলের দল

বায়না করেছি নয় শত টাকায়। এই দেখুন তার এগ্রিমেণ্ট। এই বলে বায়না পত্রটা কুঞ্জবাবুর হাতে দিলেন।

কুঞ্জবাবু বললেন—ওটা দেখে কি লাভ হবে? তার পুরুষ গায়কের দল। সে কম টাকায় বায়না নিতে পারে, কেননা তার খরচ কম। আমাদের ঝালকাঠির মেয়ের দল বায়না করতে হলে বেশী টাকা লাগবে, কারণ খরচ খুব বেশী—ইত্যাদি অনেক কথার পরে স্থির হলো: তিন পালা গানে বারো শত টাকা এবং কুমিল্লা হতে উদয়পুর পর্যন্ত নৌকা ভাড়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ দেড়শত টাকা, মোট তের শত পঞ্চাশ টাকা। কুঞ্জবাবুর নির্দেশ মতো নকুলেশ্বর চুক্তিপত্র লিখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—উদয়পুর জায়গাটা কেমন, পথ ঘাট কেমন ইত্যাদি।

বায়নাদার ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বললেন—উদয়পুর একটি পাহাড়ী জায়গা। পাহাড়পর্বতের আধিক্যের জন্যই ঐ রাজ্যের পার্বত্য ত্রিপুরা নাম হয়েছে। ওখানে প্রসিদ্ধ দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির আছে। সেখানেই ছিল ত্রিপুরাসুর নামক অসুরের রাজধানী। সেই ত্রিপুরাসুর নাকি এই দেবী প্রতিমা স্থাপন করে তাঁর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন। তাই দেবী ত্রিপুরেশ্বরী নামে খ্যাত। শিবঠাকুর নাকি যুদ্ধ করে ত্রিপুরাসুরকে হত্যা করেছিলেন; তাই তাঁর এক নাম ত্রিপুরারি। সেখানে দেবাসুর যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ অসংখ্য অসুরের হাড়গোড় এখনো দেখা যায় ইত্যাদি প্রাচীন ও রোমাঞ্চকর গল্প কথা শুনতে শুনতে নকুলেশ্বরের উৎসাহ উদ্দীপনার সীমা রইল না। কতক্ষণে গিয়ে এই সব প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত স্থান স্বচক্ষে দর্শন করবেন তা ভেবে মনে প্রাণে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকদ্বয় বায়না দিয়ে চলে গেলেন। কথা রইল, নির্দিষ্ট তারিখে তারা কুমিল্লায় গোমতী নদীর নৌকাঘাটে থাকবে। সেখান থেকে তাদের সঙ্গে একত্রে দল রওনা হয়ে গানের জায়গায় যাবে।

কুঞ্জবাবু সকল দোহারপত্রকে বললেন—দশ বারো দিনের জন্যে তোমাদের প্রয়োজনীয় জামাকাপড় জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। নৌকা কুমিল্লা যাবে না, গৌরীপুর বাজারের ঘাটে নৌকা রেখে যেতে হবে। নকুলেশ্বর নিজের এবং কুঞ্জবাবুর জামাকাপড় দশ বারো দিন বাইরে থাকার মতো বিছানাপত্র ও গানের বই-খাতা ইত্যাদি মিলিয়ে একঠা গাঁটরী বেঁধে নিলেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে নৌকা খুলে গৌরীপুরের ঘাটে বেলা চারটায় এসে

পৌঁছাল। কুঞ্জবাবু বললেন—বেলা প্রায় শেষ। এখন রওনা হবার সময় নেই। বাজারের একটা চালাঘরে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কর। নকুলেশ্বরকে বললেন—তুমি যামিনীকে নিয়ে বাজারে গিয়ে দুই তিন খানা গাড়ীর ব্যবস্থা কর।

তারা দুইজন বাজারে গিয়ে জানতে পারলেন সেখানে কোন ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায় না। গরুর গাড়ী আছে। সেগুলো মানুষ বহন করার উপযোগী করেই তৈরী। উপরে সুন্দর ছই-দেওয়া, ভিতরে বেশ প্রশস্ত জায়গা—পাঁচ ছয় জন লোক বসতে পারে। সেখানকার লোক এই গাড়ীতেই যাতায়াত করে।

যামিনী নন্দী বলল—অন্য কোন গাড়ী যখন আর নেই, তখন এই গরুর গাড়ীই ভাড়া করি।

নকুলেশ্বর—তা ছাড়া আর উপায় কি! ভোরে ত রওনা দিতেই হবে। এই গাড়ীই ভাড়া করে বলে দিন ভোর চারটার সময় আমাদের পানসী ঘাটে যেন উপস্থিত হয়।

যামিনীকান্ত গাড়োয়ানদের ডেকে জিজ্ঞাসা করল—ভোর চারটায় আমাদের নিয়ে কুমিল্লা রওনা হতে হবে! দুইখানা গাড়ী কত ভাড়া চাও?

গাড়ীয়ালারা ত্রিশ টাকা চাইলে অনেক দরাদরির পর বিশ টাকায় দুই খানা গাড়ীর ভাড়া ঠিক করে বলল—চল আমাদের দলের কর্তার সঙ্গে কথা বলে আসবে। এই বলে তারা গাড়ীয়ালাদের নিয়ে কুঞ্জবাবুর কাছে এলেন। কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে নকুল, গাড়ী ভাড়া হলো?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ, বাবা। কিন্তু অন্য কোন গাড়ী ছিল না; তাই আমরা দুইখানা গরুর গাড়ীই ভাড়া করেছি। এই যে গাড়ীয়ালারা এসেছে। ওদের কি বলবেন বলে দিন।

কুঞ্জবাবু—কেন ওদের সঙ্গে ভাড়ার কথাবার্তা ঠিক করনি?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ করেছি; দুইখানা গাড়ী ত্রিশ টাকা ভাড়া। ভোর চারটায় আমাদের নিয়ে রওনা হবে।

কুঞ্জবাবু—ঠিক আছে। ওহে গাড়োয়ান, তোমাদের অগ্রিম বায়না বাবদ কিছু দিতে হবে নাকি?

গাড়োয়ান—না হুজুর। আগাম লাগব ক্যারে। আমরা ত এই গেরামেরই লোক। এই-হানেই থাকি। আপনাগো কি অবিশ্বাস করবার পারি! আগাম লাগব না কর্তা, আমরা ঠিক মুরগা ডাকের লগে লগে আইমু, সেলাম।—এই বলে গাড়ীয়ালারা চলে গেল।

গৌরীপুর বাজারে জাতি নিয়ে বজ্জাতি

বাজারে খুব লম্বা একটা চালাঘরের একদিকে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাত নয়টার মধ্যে রান্না শেষ করে পাচক ঠাকুর পানসীতে খবর পাঠালে সকলে উঠে খেতে গেল।

দলের মধ্যে দু' তিনটি দোহার ছিল গোঁড়া হিন্দু। তাদের শুচিস্পর্শ-রোগ এমন উৎকট ছিল যে অন্য কোন নীচ জাতের ছায়া গায় পড়লেও তারা স্নান করতে পারলে বাঁচত। এই ব্যাপারে কুঞ্জবাবুও তাদের উপর খুব বিরক্ত ছিলেন —অনেক সময় অনেক উপদেশও দিয়েছেন। কিন্তু তাদের মজ্জাগত ব্যাধির কোন উপশম হয়নি। সেদিন রান্না ঘরে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই লোক তিনটি রান্নার জায়গায় গিয়ে দেখে, যে চালাঘরে রান্না হয়েছে সেই ঘরের অপর মাথায় কয়েক জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখেই ঐ ধরতা তিনজন ভয়ানক চটে গিয়ে রান্নার ঠাকুরকে খুব গালমন্দ করতে লাগল —তুমি কি রকম বামুন হে! তোমার চাইতে তো চামারের বামুনেরও একটু শুচি-অশুচি জ্ঞান আছে। গলায় মিছামিছি একটা গরুর দড়ি নিয়েছ কেন?

ঠাকুর তো অবাক! সবিনয়ে বলল—কেন আমাকে গালিগালাজ করছেন? আমি এমন কি অন্যায় করেছি? তারা বলল—অ্যাঁ, ন্যাকা! বলে কিনা কি করেছি?' কি না করেছ শুনি! তোমার রান্নাঘরে অন্য কতগুলো ছোট জাতের লোক উঠে বসে আছে, আর তুমি পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢং দেখছ। বলি, কবিগান করতে এসেছি বলে কি জাতধর্মও খোয়াতে হবে নাকি? যাই দেখি দলপতির কাছে; হয় আমাদের অন্য খাবারের ব্যবস্থা করবে, নয়তো আমরা আজই এ দল ছেড়ে চলে যাব।

বাজারের মধ্যে অবস্থিত লম্বা চালাঘরটির মাঝে মাঝে বেড়া দিয়ে ভাগ করে পাঁচ ছয়টি আলাদা আলাদা দোকানদার হাটবারে বসে দোকান করে। তারই পুব মাথার দিকের ঘরে রান্না হয়েছে। আর পশ্চিম মাথায় স্থানীয় কয়েকজন লোক বসে কথাবার্তা বলছে। গৌরীপুর মুসলমান প্রধান জায়গা। ওদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমানও ছিল। এই ব্যাপার নিয়ে যারা হুলুস্থুল বাধাল তারাও কেউ উচ্চ বর্ণের হিন্দু নয়—কৈলাস নট্ট, মণীন্দ্র বৈরাগী ও ভদ্র দেবনাথ —এই তিন ব্যক্তির দ্বারাই গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

কুঞ্জবাবুর জন্যে ভাত আনতে নকুলেশ্বর থালা বাটি হাতে রান্নাঘরে গিয়ে

দেখেন ওরা তিন জনে মিলে ঠাকুরকে খুব গালাগাল করছে। নকুলেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা এ রকম হল্লা করছেন কেন? কি হয়েছে?

কৈলাস নট্ট দাঁতমুখ খিঁচিয়ে একটা ধমক দিয়ে বলল—কি হয়েছে! কেন চোখের মাথা খেয়েছ নাকি! ঐ দেখ না রান্নাঘরে বেটা হতচ্ছাড়া বামুন কাদের ঢুকিয়েছে?

নকুলেশ্বর—আপনারা ভুল করছেন। ঠাকুর ওদের ঘরে ঢুকাবে কেন? ওরা নিজেরাই ঢুকে বসেছে। বাজারের চালাঘর, যার ইচ্ছা সে ঢুকতে পারে। ঠাকুর ওদের বাধা দেবে কেন; আর দিলেই বা ওরা শুনবে কেন? আর ওরা ঢুকেছে বলে এমন অন্যায়ই বা কি হয়েছে! পঁচিশ ত্রিশ হাত লম্বা একটা চালাঘর—আলাদা আলাদা বেড়া দিয়ে পাঁচ ছয়টা ঘর করা হয়েছে। তার শেষ মাথায় মাঝে তিন চার ঘরের ব্যবধানে ঐ লোকগুলি বসেছে। তাতেই আমাদের ভাতের জাত গেল নাকি?

মণি বৈরাগী বলল—তোমার আর ছোট মুখে বড় কথা বলতে হবে না। তোমার কাজে তুমি যাও। কবিগান করবার জন্যে দাদন খেয়েছি; জাত খোয়াবার জন্য দাদন নিই নাই যে এই ম্লেচ্ছাচার সহ্য করব!

নকুলেশ্বর নম্রভাবে বললেন—আচ্ছা ধরতা মশাইরা, আপনারা বয়োবৃদ্ধ, আমি একটা ছেলেমানুষ, জ্ঞানগম্যিশূন্য তা সত্য! তবে একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো—সেদিন ঢাকেশ্বরী মায়ের বাড়ী পূজা সেরে আমরা যে হোটেলে খেয়েছিলাম সেখানেও ত দেখলাম বড় একটা ঘরের মধ্যে আলাদা আলাদা কামরায় কত জাতি কত ঘরে বসে খাচ্ছে। আপনারাও তো নির্বিবাদে রুইমাছের কালিয়া, ইলিশ মাছের লট্‌পটি সহযোগে বিনাবিচারে খেয়েদেয়ে এলেন। কই তখন তো এই জাতের বিচার ছিল না! আজ এই গৌরীপুর বাজারের চালাঘরে জাতের বিচার উথলে উঠল নাকি?

ওরা খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করল—থাম, থাম, বেটা তোর কাছে আর বিচার-আচার শিখতে হবে না। ওসব আমরা বেশ জানি। কোথায় হোটেলের কামরা ঘর, আর কোথায় বাজারের চালাঘর। বেটা ঘোড়া গাধা সমান করতে এসেছে। কি সমদর্শী সাধুর চেলা রে!

কৈলাস ধরতা বলল—না হবে কেন? যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। মিলেছে ভাল!

ব্যক্তিগতভাবে ওরা নকুলেশ্বরকে যা বলেছে তাতে তাঁর মনে দুঃখ হয়নি;

কিন্তু সেই সব কটূক্তির সঙ্গে কুঞ্জবাবুর নামও জড়ানোতে নকুলেশ্বর খুব চটে গিয়ে বললেন—আমি সমদর্শীও নই, আর সাধুও নই ; রক্তে-মাংসে গড়া সামান্য মানুষ। মনুষ্যত্ব শিক্ষা করবার জন্যে যাঁর আশ্রয় নিয়েছি তাঁকে আমি মহামানুষ মনে করি। চাঁদের আলোর সমালোচনা করা জোনাকীর পাছার আলোর শোভা পায় না। আয়না ধরে আগে নিজের মুখের ভঙ্গিটা দেখে পরের মুখের সমালোচনা করতে হয়। দলের মধ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ বর্ণ হিন্দু বর্তমান থাকতে নিম্নবর্ণের লোকের মুখে জাতিতত্ত্বের সমালোচনা, কুয়ার ব্যাঙের সাগর পাড়ি দেওয়ার মত হাস্যকর।

তারপর তিনি দলের অন্যান্য সকলকে ডেকে বললেন—যারা জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে কুঞ্জবাবুর কবির দলে ভর্তি হয়েছেন তারা অনর্থক রাত না করে খেয়েদেয়ে নৌকায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। ভোর চারটায় কুমিল্লা রওনা হতে হবে। এই বলে তিনি কুঞ্জবাবুর ভাত তরকারী নৌকায় দিয়ে এসে খেতে বসলেন। খাওয়া সেরে কুঞ্জবাবুর নিকট সব ঘটনা বলে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, যে তিনটি কুলীন অনাহারে থাকল তাদের কি ব্যবস্থা হবে। কুঞ্জবাবু বললেন—তাদের জন্য চিড়া গুড়ের ব্যবস্থা করে দাও।

নকুলেশ্বর জনপ্রতি আট আনা পয়সা দিয়ে বললেন—এই নিন পয়সা ; যা ইচ্ছা কিনে খাবেন। দেখবেন যেন আবার ছোট জাতের ছুঁৎ না লাগে!

আহারান্তে সকলেই নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিল ; কিন্তু নকুলেশ্বরের চোখে আর ঘুম আসে না। তার মনের মধ্যে কেবল চালাঘরের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট তথাকথিত ছোটলোক ও সাধারণ মুসলমান কয়জনার অপ্রতিভ ও অপরাধ ভারাক্রান্ত মলিন মুখের ছবি বারবার উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। কতক্ষণ ওঠাবসা করে শেষে কালি কলম নিয়ে লিখতে লাগলেন—

দুখের নিশি ভোর হয়েছে—
জেগে ওঠো ক্ষুদ্র সবে,
ঐ শোন ভাই ভোরের সানাই
বেজে উঠলো রুদ্র রবে।
জাত জুয়াড়ীর জাতের বোঝা
ফেলে দাও আস্তাকুঁড়ে,
তোমরাও যে মানুষ জাতি
জানুক সবে জগৎ জুড়ে।

কুকুর ছুঁয়ে অনায়াসে
ঠাকুর ঘরে যেতে পারে,
মানুষ ছুঁলে জাত থাকেনা
কোন্ পশু এই সমাজ গড়ে।
শ্রীগৌরাঙ্গ যীশু বুদ্ধ
আত্মশুদ্ধ মানুষ জাতি,
সবার সাথে খায় এক পাত্রে,
জাতের মুখে মেরে লাথি।
শুঁড়ির জলে ভুঁড়ি মোটা
মদের নেশায় মাতামাতি,
দধির জলে জাত মরে না
নদীর জলে জাতাজাতি।
অতীত কালের পতিত যারা
গুণে কর্মে অনুন্নত—
লাগতে হবে দেশের কাজে
জাগতে হবে জাগার মত!
সব হরিজন এক পরিজন
সব জাতি এক হরিবোলা,
নিন্দুকের মুখ বন্ধ করতে
জগবন্ধুর দরজা খোলা।
কুবরা জোলার ফেন খেলে পর
জগন্নাথের কৃপা হবে,
যবন হরিদাসের সাথে
গৌর নাচে মহোৎসবে।
কিসের যবন কিসের বামন
কিসের মুচি ডোম আর হাড়ি,
সবার মাঝে যে বিরাজে
সেই তো আল্লা যীশু হরি।
কই রবে ভাই জাতির বড়াই—
যেদিন আঁখি মুদে যাবে,

সকল জাতে একই সাথে
এক মাটিতে আশ্রয় লবে।
নকুল বলে দূরে ফেলে
জাতি ধর্ম বৈষম্যতা,
সবে মিলে ধরে গলে
ধন্য কর ভারতমাতা।

রাত চারটা বাজতে না বাজতেই নকুলেশ্বর বৃন্দাবনী হুঁকায় বিষ্ণুপুরী তামাক সেজে কুঞ্জবাবুকে জাগিয়ে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি নকুলেশ্বরকে অধিক রাত্রি জাগার কারণ জিজ্ঞাসা করলে নকুলেশ্বর তাঁকে ঐ কবিতাটি দেখালেন। কুঞ্জবাবু তা পড়ে আনন্দ সহকারে বললেন—বেশ হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। এটা বেশ করে মুখস্থ করে নাও। প্রত্যেক গানের আসরে আসর-বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে এই কবিতাটিও আবৃত্তি করবে। তাতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ হিন্দুদের জাত্যাভিমানের মুখোস খুলে যাবে এবং সমাজ হতে শুচি-স্পর্শ-বিষম বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটনের সহায়ক হবে।

ভোর রাতে পূর্বদিনের ভাড়া করা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা গাড়ী নিয়ে পান্‌সীর কাছে এসে উপস্থিত। নকুলেশ্বর দলের সকলকে প্রস্তুত হয়ে রওনা হবার জন্য তাগিদ দিলেন।

কুঞ্জবাবু বললেন—একজন চাকর ও রান্নার ঠাকুর আমাদের সঙ্গে যাবে। অন্যান্য মাঝিমাল্লাদের নিয়ে অধরমণি পান্‌সীতে থাকুক। এই বলে তিনি নৌকা থেকে উঠে গাড়ীর কাছে গেলেন। নকুলেশ্বর সহ দলের সবাই কুঞ্জবাবুর নিকটে গেলে তিনি যামিনী নন্দীকে বললেন—দেখ যামিনী, আমি গরুর গাড়ীতে উঠব না; হেঁটেই যাব। আর যদি কেউ আমার মত গরুর গাড়ীতে যেতে না চায় তবে সেও আমার সঙ্গে আসুক। তুমি অন্যান্যদের নিয়ে গাড়ীতে রওনা হও। নকুলকেও তোমার গাড়ীতেই নিয়ে যেও। আমাকে কুমিল্লা অন্নপূর্ণা হোটেলে পাবে। এই বলে তিনি রওনা হলেন।

নকুলেশ্বর দেখলেন আর কেউ কুঞ্জবাবুর সঙ্গে যায়না, তখন সেই পূর্ববর্ণিত শুদ্ধাচারী ধরতা তিনজনকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন। গুরুদেবের সঙ্গে যাত্রা করুন। গরুর গাড়ীতে যাওয়া মহাপাপ। গরুর প্রতি লোমকূপে দেবতার বাস। এই গরু পিতৃপুরুষ উদ্ধারের বৈতরণীর তরীস্বরূপ। আমরা নাস্তিক, ধর্মজ্ঞানহীন। আমাদের কোন ভয় নেই;

আমরা গরুর গাড়ীতেই যাব। কিন্তু আপনাদের মত শুদ্ধাচারী পবিত্র ধর্মভীরু হিন্দুকে গরুর গাড়ীতে উঠতে দিয়ে ত আপনাদের ধর্ম নষ্ট করতে পারিনা! যান যান, বিলম্ব করবেন না। গুরুদেবের সঙ্গে পথ ধরুন।

কষা চাবুকের আঘাত খেলে আলসে ঘোড়া যেমন দ্রুতবেগে ছুটতে বাধ্য হয়, ধরতা তিনজনের অবস্থাও তাই। নীরবে তারা কোন বাদ প্রতিবাদ না করে কুঞ্জবাবুর অনুসরণ করল।

যামিনী নন্দী শেখ সরলা ও মানদাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে নকুলেশ্বরকে নিয়ে নিজেও ঐ গাড়ীতে উঠল। অপর গাড়ী ঠাকুর চাকর বিছানাপত্র ও রান্নার সরঞ্জামাদি নিয়ে পশ্চাদানুসরণ করল।

আবার সরলা-প্রসঙ্গ

গাড়ীতে নকুলেশ্বর যামিনীকান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, আমাদের বিপক্ষে যিনি উদয়পুরে গান করবেন সেই হরকুমার শীল মহাশয় নাকি খুব বিখ্যাত কবি! আপনি কি আগে তাঁকে দেখেছেন?

যামিনী—হ্যাঁ, দেখেছি এবং তাঁর গানও অনেক শুনেছি। সত্যিই তিনি খুব বড় কবি।

নকুলেশ্বর—আচ্ছা, বাবার (কুঞ্জবাবুর) চেয়েও কি তিনি বড় কবি?

যামিনী—সে তুলনা করবার ক্ষমতা আমার মতো অপদার্থের নেই। তবে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এইটুকু বলতে পারি যে তিনি ভাব-গাম্ভীর্য-পূর্ণ কবি। গানের জবাব, টপ্পা খুব ভালই করেন বটে, তবে পাঁচালী বলার মুখ আমাদের কুঞ্জবাবুর মতো নয়। এত দ্রুত ছন্দাকারে পাঁচালী আমি আজ পর্যন্ত কারো মুখে শুনিনি।

নকুলেশ্বর—দাদা আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি যেন বাবার মতো পাঁচালী বলার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারি।

যামিনী—আমি সব সময় কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তুমি যেন কুঞ্জবাবুর নাম রাখতে পার। তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে শুভকার্যে বহু বিঘ্ন। তাই সর্বদা সতর্ক হয়ে না চললে পদে পদে পদস্খলনের আশঙ্কা আছে।

যামিনী নন্দীর কথা শুনে নকুলেশ্বরের মনে হঠাৎ সেই ঢাকেশ্বরী বাড়ীতে শেখ সরলার গায়ে-পড়া হিতৈষিণীসুলভ উপদেশ ও প্রলোভনাত্মক কথাগুলি

মনে পড়ে গেল। তিনি ক্ষণেকের তরে আনমনা হয়ে গেলেন। তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে যামিনীকান্ত জিজ্ঞাসা করল—কিহে নকুল, অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছ?

নকুলেশ্বর এত দিন মনে করেছিলেন যে শেখ সরলার সেই দিনের কথা-গুলো কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। নিজেই নিজের উপর আস্থা রেখে সতর্ক হয়ে চলবেন। কথাটা কুঞ্জবাবুর কানে উঠলে সরলা তাঁর বিষদৃষ্টিতে পড়বে এই ভয়ে তিনি কথাটা গোপন রাখতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ যামিনীনন্দীর আশা ও সাবধানবাণী শুনে নকুলেশ্বরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি সসঙ্কোচে যামিনীকান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, একটা কথা বলব?

যামিনী—কি কথা বল না। এত সঙ্কোচ কিসের?

নকুলেশ্বর—না সঙ্কোচ নয়, তবে লোকে বলে অপ্রিয় সত্য কথাও বলতে নেই! তাই একটু ইতস্ততঃ করছি, কি জানি আপনি কি মনে করেন।

যামিনী—না, না, তোমার কোন ভয় নেই। যা বলার নির্ভয়ে বলতে পার।

নকুলেশ্বর—আচ্ছা দাদা, খুলনার বিধু সরকার মহাশয়কে আপনি চেনেন কি?

যামিনী—হ্যাঁ, চিনি বই কি! তিনিই তো আমাদের কুঞ্জবাবুর কবি-গানের শিক্ষা গুরু। কুঞ্জবাবু বিধু সরকারের দলে প্রথমে ধরতা গায়ক হয়ে ঢুকেছিলেন! দু'চার মাস পরেই তিনি গানের দোহারী ছেড়ে দিয়ে বিধু সরকারের কাছে "সরকারী" (কবিয়ালী) শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। বিধুবাবুও তাঁর আগ্রহ এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিন চার বছর শিক্ষার পরেই তিনি স্বয়ং কবির দল গঠন করেন এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। আচ্ছা বিধুবাবুর কথা হঠাৎ তোমার মনে পড়ল কেন?

নকুলেশ্বর তখন একে একে ঢাকেশ্বরী বাড়ীতে সরলা যে মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিল সে সব কথা খুব আস্তে আস্তে যামিনী বাবুর নিকটে বললেন। কারণ সরলাও ঐ গাড়ীতেই ছিল; সে শুনলে হয়তো লজ্জা পাবে।

কিন্তু যামিনীকান্ত সরলার দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্যের কথা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না। সে সরলাকে ডেকে বলল—কিরে সরি! খুব বড় কবিওয়ালী হয়েছিস বুঝি! তাই বামন হয়ে চাঁদ ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছিস কেমন! পরের দলে গান করতে ইচ্ছা না হয় তো ক্ষমতা থাকলে নিজে দল

করবি। তা বলে একটা ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার ফন্দি এঁটেছিস কেন? যে ডালে আশ্রয় নিয়েছিস তার মূলে কুঠারাঘাত করার পরিণাম কি একবার ভেবে দেখেছিস? ভিখারীর মেয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াতিস। দত্তবাবু যদি আশ্রয় দিয়ে কবিগান গাওয়া না শেখাতেন তবে তোকে আজ কে চিনত, কে জানত? যার দয়ায় আজ তুই বড় গায়িকা হয়েছিস, লোকের কাছে আদর সম্ভ্রম পাচ্ছিস, কোন্ সাহসে তুই আজ তাঁর দল ভেঙ্গে, তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাত্র-পুত্রকে লোভ দেখিয়ে কোল ছাড়ার মতলব এঁটেছিস? কয়খানা সোনার গয়না গায় দিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করিস! দুধ কলা দিয়ে কেউটে সাপের বাচ্চা পুষে দত্তবাবু দেখছি প্রকাণ্ড ভুল করেছেন। কথায় বলে—

শর্করা শতভারেণ নিম্ববৃক্ষমুপার্জ্জিতম্।
পয়সা সেচিতং নিত্যং ন নিম্ব মধুরায়তে॥

[শতভার চিনি স্তূপাকার করে তার উপরে নিমগাছের বীজ বপন করে প্রত্যহ দুধ দিয়ে স্নান করালেও সেই নিমের তিক্ততা-দোষ ঘুচে তা কখনো মিষ্টতা লাভ করেনা]

আচ্ছা, আমি আজ দত্তবাবুকে বলে তোর বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করছি।

পূর্বকথিত মানদা নামে অল্পবয়সী চঞ্চল চটুল গায়িকাটিও এই গাড়ীতেই ছিল। যামিনী নন্দীর মুখে হঠাৎ এইভাবে সরলাকে তিরস্কৃত হতে দেখে অনেকটা হতভম্বের মতো সে জিজ্ঞাসা করলো—দাদা, আপনি সরলাদিকে এমন মন্দ বলছেন কেন? সে কি করেছে?

যামিনী—কি আর করবে? এতদিন যার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছে যার চেষ্টায় দলের শ্রেষ্ঠা গায়িকার সম্মান পেয়েছে, পোড়ারমুখী আজ তাঁরই দল ভেঙ্গে দিয়ে নিজে দল করে সর্দারণী হবার স্বপ্ন দেখছে। শুধু কি তাই, বেটির কত বড় সাহস যে নকুলেশ্বরকে দল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিধু সরকারকে মাহিনা দিয়ে রেখে ওকে 'সরকারী' শিক্ষা দিয়ে শ্রেষ্ঠ কবি করে তুলবার সাধ জেগেছে, ও স্বপ্ন দেখিয়েছে।

মানদা—ওমা, সে কি কথা গো? ভিতর ভিতরে এতদূর গড়িয়েছে! কই আমরা তো কিছু টের পাইনি! এই সেদিন যে ছেলেটাকে প্রকাশ্য গানের আসরে মূর্খ অপদার্থ ইত্যাদি কত কি বলে গালাগাল দেওয়া হল আর দুই মাস যেতে না যেতেই তার শিক্ষার জন্য, তাকে মানুষ করার জন্য এত দরদ

উথলে উঠল কেন? বুঝেছি, পুতনা রাক্ষসীর কচি রক্ত-মাংস খেতে সাধ হয়েছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ পোড়ামুখীর মরণও হয়না! আচ্ছা দেখি আমিও প্রতিজ্ঞা করে বলছি—ওর মত একটা পিশাচী দলে না থাকলে বাবার দল অচল থাকবে না। আর ও যে নরকের কীট হয়ে স্বর্গের পারিজাতের মধু খেতে সাধ করেছে ওর সে গুড়েও বালি। দাদা, চলুন আজই গিয়ে বাবার কাছে সব কথা বলে এই রাক্ষসী শেখনীকে দল থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করি।

যামিনী—তুই ব্যস্ত হসনে বোন। আমাদের বুড়ীমা অধরণি একথা শোনা মাত্রই ওকে চুলের মুঠি ধরে দল থেকে বের করে দেবেন; দত্তবাবুর অনুমতির অপেক্ষা করবেন না।

নকুলেশ্বর ঝগড়া বিবাদ পছন্দ করতেন না। হঠাৎ আবেগের বশে যামিনী নন্দীর কাছে কথাগুলি বলে ফেলে নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী মনে হতে লাগল। তার মুখ দিয়ে আর কোন বাক্যস্ফূর্তি হল না। লজ্জায় ক্ষোভে সরলার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। ঐ সব তিরস্কার ও গঞ্জনায় কোন বাক্‌বিতণ্ডা না করে সে অধোমুখে বসে রইল।

বেলা দুই প্রহর আন্দাজ গাড়ী গিয়ে একটা বাজারে পৌছল। যামিনী বলল—চল নকুল, এখন সকলের জন্য কিছু জল খাবারের ব্যবস্থা করি। না হয় সারাদিনে আর খাওয়া হবে না। কুমিল্লা গেলে পর ভাতের ব্যবস্থা হবে। দত্তবাবু আগে গিয়ে হোটেলে সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। এই বলে যামিনী নকুলেশ্বরকে নিয়ে বাজারে গেলেন।

একটা বট গাছের নীচে পুকুর পাড়ে গাড়ী রেখে সকলে স্নান-আহ্নিক করে জল খেতে বসল। পুরুষদের জন্য চিড়া গুড় দই, আর মেয়েদের জন্য সিঙ্গাড়া মিষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা হল। খাওয়া শেষে আবার গাড়ী চলতে শুরু করল।

বায়না ফেরতের সম্ভাবনা—নকুলেশ্বরের চালাকি

কুমিল্লা অন্নপূর্ণা হোটেলে গিয়ে যখন গাড়ী পৌছল তখন বেলা চারটা বেজে গেছে। কুঞ্জবাবু হোটেলে সকলের জন্য খাবার তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন। গাড়ী পৌছতেই জিনিসপত্র নামিয়ে হোটেল ঘরে নিয়ে তোলা হল। রাত্রে হোটেল-বাস করতে হবে। গাড়োয়ানরাও খেয়ে-দেয়ে গৌরীপুরের পথে ফিরে গেল। দলের সকলে খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিশ্রাম ঘরে গিয়ে

শয্যাশ্রয় করল। এমন সময় কুঞ্জবাবু এসে যামিনী নন্দীকে ডেকে বললেন—যামিনী, বড় বিপদ হল যে!

যামিনী—কি বিপদ হল আবার!

কুঞ্জবাবু—কি আর বলব, এখানে এসে নৌকা ভাড়া করতে গোমতী নদীর ঘাটে গিয়ে জানলাম এক-গাছের যে সব খোন্দা নৌকাগুলো উদয়পুর পর্যন্ত যাতায়াত করত তারা অনেকেই আসেনি। যে দুই একখানা নৌকা ঘাটে আছে তারাও ভাড়া যেতে স্বীকার করছেনা।

যামিনী-- কেন? ভাড়া বেশী চায় বুঝি?

কুঞ্জবাবু—আরে না না। টাকার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তারা বলছে যে গোমতী নদীতে জলের বেগ এত বেড়েছে যে কোন মতেই উজান ঠেলে নৌকা চালান সম্ভব নয়। গোমতী নদীতে তো কখনো জোয়ার হয় না। শুধু ভাটি; জল নীচের দিকে নামা ছাড়া কখনো উপর দিকে ওঠে না।

জনৈক নাইয়া—হ্যাঁ কর্তা। গাঙের পানি বড় বেহাল। আপনিরা নাও কইরা গেলে গান রক্ষা হইবো না, আপনাগো গান কাইল পরশু। ফজরের লগে লগে নাও খুইল্যা দিলেও এই উজান বাইয়া আমরা আট দশ দিনেও উদয়পুর পৌঁছবার পারুম না।

যামিনী—এখন তবে উপায়?

কুঞ্জবাবু—তাইতো ভাবছি! পাহাড়ী রাস্তা। অন্য কোন যান-বাহনও চলেনা। এখন বায়না ফেরৎ দেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। যামিনী, তুমি বায়নাদারকে ডেকে আন; সে এই হোটেলেই আছে।

যামিনীকান্ত বায়নাদার মশাইকে ডেকে আনলে কুঞ্জবাবু বললেন—দেখুন, বড় আশা করে আপনার গানের বায়না নিয়েছিলাম। কিন্তু নৌকা চলাচলে অসুবিধার দরুণ আর উদয়পুর যাওয়া হলনা। আপনি বায়না ফেরৎ নিন।

বায়নাদার বললেন,—এখন যদি আমি বায়না ফেরৎ নিই তবে কাছারীতে গিয়ে আমি মুখ দেখাতে পারবনা। আগরতলা রাজার কাছারী, বিরাট প্রদর্শনী ও মেলা বসেছে। কত আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই সব আনন্দ উদ্দীপনার মূল উৎস হল আপনাদের কবিগান। হরকুমার শীলের দল বোধহয় এতক্ষণে কাছারীতে পৌঁছে গেছে। এমতাবস্থায় আমি এখন কি করি আপনিই বলুন।

নকুলেশ্বর এতক্ষণ সকলের কথাবার্তা শুনছিলেন। গানে যাওয়া হবে না

শুনে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বায়নাদারদের মুখে তিনি উদয়পুরের প্রাচীন কাহিনী শুনে মনে মনে কত কল্পনার আলপনা অঙ্কন করেছিলেন! কতক্ষণে সেখানে গিয়ে সেই সব প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত নয়ন মুগ্ধকর রমণীয় পীঠস্থান দর্শন করবেন, কতক্ষণে জাগ্রত দেবী মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর চরণে সার্থক কবি হওয়ার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করবেন, কতক্ষণে সেই স্বনামধন্য অচেনা কবি শ্রীযুত হরকুমার শীলের অভিনব কাব্য-স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করে তাঁর চরণে আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন—এই ছিল নকুলেশ্বরের ধ্যানজ্ঞান।

কিন্তু অকস্মাৎ গানে যাওয়া হবে না শুনে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। কুঞ্জবাবুর কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—বাবা একটা কথা বলব?

কুঞ্জবাবু—কি বলবে বল না।

নকুলেশ্বর—আমি বলছিলাম কি এখান থেকে কি হেঁটে উদয়পুর যাওয়া যায় না?

কুঞ্জবাবু—দূর বোকা ছেলে! হেঁটে যাওয়া কি ছেলেখেলা? এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল রাস্তা—তাও সর্বত্র সমতল নয়—খাড়ি উঁচানীচা পাহাড়ী পথ। তোমাদের নিয়ে সেই দুর্গম পথে যাওয়া কি সম্ভব? বিশেষতঃ সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে।

নকুলেশ্বর—সে পথে কি লোক চলাচল করে না?

কুঞ্জবাবু—হ্যাঁ করে, কিন্তু খুব সাহসী ও পরিশ্রমী লোকের দরকার। একে তো ঐ দুর্গম পথ, পথের দুই পাশে শাল গজারী সেগুন ইত্যাদি নানাবিধ বড় বড় গাছের বন। বাঘ ভালুক শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর লীলা-ক্ষেত্র। এক প্রকার জনমানবশূন্য।

কুঞ্জবাবুর মুখে এই সব কথা শুনতে শুনতে নকুলেশ্বরের দর্শন-লালসা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হল। তিনি বললেন—বাবা, আপনি সেজন্য ভয় করবেন না। আমরা ত অনেক লোক আছি। ভয় কি? মানুষকে ভয় করে এমন প্রাণী জগতে আছে বলে ত মনে হয় না। আপনি যামিনী দাদার কাছে কিছু টাকা দিয়ে খুব ভোরে একজন বায়নাদারকে সঙ্গে নিয়ে আগে ভাগে চলে যান। আমি ও যামিনীদা অন্য বায়নাদারের সঙ্গে দলের সকলকে নিয়ে পেছনে যাব।

কুঞ্জবাবু—কেন, তাতে লাভ কি!

নকুলেশ্বর—লাভ অন্য কিছু নয়। আপনি সঙ্গে থাকলে দোহারপত্র সকলে নানাপ্রকার বায়না ধরবে। কেহ বলবে আর চলতে পারছি না, কেহ বলবে বড় ক্ষুধা পেয়েছে, কেহ বলবে এমন পথেও মানুষ চলে নাকি ; জীবনের চেয়ে কি টাকা বেশী হল ইত্যাদি নানা ওজর-আপত্তি তুলে আপনাকে বিরক্ত করবে। আপনি সঙ্গে না থাকলে ওসব কথা বলতে সাহস পাবে না। যদি কিছু বলে তবে আমরা বলব—আমাদের সঙ্গে ঝামেলা করবেন না। যার যা বলার থাকে গানের বাড়ী গিয়ে দলপতির নিকট বলবেন। আমরা যদি যেতে পারি আপনারা কেন পারবেন না। তখন ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক পা বাড়াতে বাধ্য হবে।

কুঞ্জবাবু একটু হেসে পঁচিশটি টাকা যামিনী নন্দীর হাতে দিয়ে বললেন—আমি ভোর চারটায় চলে যাব। তোমরা দলের সকলকে নিয়ে পেছনে এসো। পথে কোন হোটেল রেস্তোঁরা পেলে সকলকে স্নানাহার করিয়ে নিও। সাবধান, কোন কথা নিয়ে যেন বিবাদ বিসংবাদ না হয়।

রাত্ ভোর হওয়ার আগেই কুঞ্জবাবু একজন বায়নাদারকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার সময় নকুলেশ্বরকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। নকুলেশ্বর ধড়ফড় করে উঠে হাতমুখ ধুয়ে এসে দলের সকলকে ডেকে তুলে বললেন,—খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে চলুন। ভোর বেলা পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে খুব ভাল হাঁটা যাবে।

সরলা নকুলেশ্বরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—দলপতি বাবুকে দেখছিনা কেন?

নকুলেশ্বর—তিনি বিশেষ কারণে একটু আগে রওনা হয়ে গেছেন। আমরা একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলে পথেই তাঁর দেখা পাব।

সরলা—আমরা তবে কার সঙ্গে যাব?

নকুলেশ্বর—কেন, আর একজন বায়নাদার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন। তার কাছে আমরা এই উদয়পুর সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প শুনতে শুনতে এবং বনের শোভা দেখতে দেখতে বেশ আনন্দে চলে যাব। আর বিলম্ব করবেন না। আসুন, মা ত্রিপুরেশ্বরীর নাম নিয়ে তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়ি।

উদয়পুরের পথে—বনৈশ্বর্যের মাঝে

দলের সকলে উদয়পুরের পথে রওনা হল। পথের দুই ধারে অপূর্ব বনের শোভা; আকাশ ছোঁয়া বড় বড় শাল গজারী ও অসংখ্য নাম না জানা বৃক্ষ শোভিত বনরাজি, উঁচুনীচু পথ। কোন কোন স্থানে চারদিকে উঁচু টিলা। মাঝে প্রকাণ্ড দীঘির মত নীচু জায়গা। চারপাশে মুলি বাঁশের বাগান এমন সুন্দরভাবে উঠেছে যে দেখলে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড দিঘীর চারপাড় সবুজ ভেলভেটে বাঁধান। তার ভিতর কত শত বানর হনুমান এবং রং বেরঙের পাখীর লীলাখেলা কলকাকলী। যেই দিকে চায় চোখ ফিরাতে ইচ্ছা হয়না। সেই সব দেখতে দেখতে কখন যে দুপুর হয়ে গেল এবং কত পথ অতিক্রান্ত হল কেউই সেই হিসাব করার অবসর পায়নি।

বেলা প্রায় দু'টা বেজে গেছে। এতক্ষণের মধ্যে সূর্যের মুখ কারো চোখে পড়ে নি। সূর্যদেব যেন বনের ফাঁকে ফাঁকে অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর মত মাঝে মাঝে উঁকি মেরেই আবার লজ্জায় বৃক্ষান্তরালে লুকিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার পাশে একটি প্রকাণ্ড বট বৃক্ষতলে ছোট একটি পান্থশালা। এখানে আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। তার পাশেই একটি মনোরম ঝরনা। ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে উচ্ছ্বসিত জলধারা নিম্নাভিমুখে প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতি যেন শ্রান্তক্লান্ত পথিকের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য অতি সুস্নিগ্ধ সুশীতল জল-প্রপাতের উৎসদ্বার চির দিনের জন্য খুলে রেখেছেন।

যামিনীকান্ত নকুলেশ্বরকে বলল—নকুল, সকলকে নিয়ে এখানেই স্নানাহার সেরে নেওয়া কর্তব্য। পথে আর কোথাও সুবিধা হবে কিনা জানিনা।

পান্থশালার মালিকের সঙ্গে চুক্তি হল—জন প্রতি আট আনা দিলে নিরামিশ খাবার—ডাল, তরকারী, ভাজা পাওয়া যাবে। সকলে মিলে ঝরনার জলে স্নান করে এসে তাড়াতাড়ি আহার-পর্ব শেষ করে আবার যাত্রা শুরু করতে তৈরী হবে। বিশ্রামের অবসর নেই। বায়নাদার মশাই বললেন—এখানে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। সামনে খুব ভয়াবহ স্থান এখনও বহুদূর যেতে হবে। রাত হলে বিপদের সম্ভাবনা।

এই কথা শোনা মাত্র সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা যেন পলকে স্তিমিত হয়ে গেল। মনে এক অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। ক্ষণেকের তরেও বিশ্রাম না করে আবার সকলেই পথে বেরিয়ে পড়লেন। বায়নাদার মশাই চলেছেন আগে আগে; তিনি বললেন—সকলে একটু জোর কদমে পা ফেলবেন।

সামনে একটা বড় পাহাড়। বেলাও পড়ে এসেছে। সন্ধ্যার আগেই সেই পাহাড়টি পার হতে হবে। নতুবা ভারী বিপদ।

নকুলেশ্বর—বিপদের কথা বলছেন কেন? কি বিপদ বলুন না।

বায়নাদার—ঐ পাহাড়ে নানা রকম হিংস্র জন্তর বাস—বাঘ, ভালুক, শূকর। মাঝে মাঝে বন্য হস্তীরও উপদ্রব হয়। কাজেই কষ্ট করেও সন্ধ্যার পূর্বে পাহাড়টা পার হতেই হবে।

এই কথা শোনামাত্র মানদা সরলা যামিনীকান্তকে ধরে কান্না শুরু করল। নকুলেশ্বরেরও যে ভয় না হয়েছে তা নয়। কিন্তু মনের আতঙ্ক বাইরে প্রকাশ না করে ঐ সব ভয়বিহ্বলা মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্য বললেন—আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? হিংস্র পশুর প্রাণেও একটা ভয় আছে। আমরা এত গুলি মানুষ দেখলে তারাও প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। বিশেষতঃ প্রাচীনদের মুখে শুনেছি—

অদৃষ্টে লিখনং যস্ত ষষ্ঠী জাগর বাসরে।
ন হরি শঙ্কর ব্রহ্মা চান্যথা কর্তুমর্হতি॥
[ষষ্ঠী রাত্রে বিধাতা পুরুষ যার অদৃষ্টে যা লিখে দিয়েছেন,
স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও তার অন্যথা করতে অসমর্থ]

সোজা বাংলায়—বনের বাঘে খায়না মানুষ মনের বাঘে ধরে খায়,
মনের হিংসা দূর করলে, হিংসুকের হিংসা পালায়॥

কান্না সম্বরণ করে সরলা নকুলেশ্বরকে বলল—রেখে দাও তোমার কবিত্ব। এখন ওসব ভাল লাগেনা। আগে প্রাণটা বাঁচাও, পরে কবিত্ব করার ঢের সময় পাবে।

নকুলেশ্বর—আমিও তো প্রাণটা বাঁচাবার কথাই বলছি। জোর কদমে পা ফেলে না চললে চোখের জলে কি বাঘ ভালুকের মন ভুলান যাবে! আসুন তাড়াতাড়ি পা ফেলে সেই ভয়াবহ স্থানটা সন্ধ্যার আগেই পার হয়ে যাই।

আবার চলা শুরু হল। কিন্তু পা যেন আর চলতে চায় না। এক নাগাড়ে হাঁটার পর কারো কারো পা ফুলে গেছে। শরীরও খুব ক্লান্ত, তথাপি জোর কদমে চলতে হবে, সম্মুখে ভয়াবহ স্থান।

পড়ি কি মরি করে সকলে পশ্চাৎ-বিতাড়িত অশ্বের ন্যায় ছুটতে আরম্ভ করল। বনের শোভা, ফুলের সৌন্দর্য, পাখীর কাকলি সব অন্তরের অন্তস্থল হতে অন্তর্হিত হয়ে সেখানে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা বাসা বেঁধেছে। কোনদিকে

কারো কোন লক্ষ্য নেই, শুধু ছুট আর ছুট। বেলা অনুমান সাড়ে চারটে যখন বাজে, বায়নাদার মশাই অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন—ঐ দেখুন, সেই পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে।

ভল্লুক শিকারের কৌশল

নকুলেশ্বর ভয়ের মধ্যেও একটু কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে বায়নাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওখানে আপনি কি কোনদিন কোন ভয়ের সম্মুখীন হয়েছেন।

বায়নাদার—না, আমি এপথে আরো কয়েকবার চলাচল করেছি। কিন্তু এযাবত কোন ভীতিকর জীবজন্তুর সম্মুখীন হইনি।

নকুলেশ্বর—তবে যে ভয়ের কথা বলছেন তা কি শুধু অনুমান সাপেক্ষ?

বায়নাদার—না, শুনেছি পরশুদিন দুইজন টিপ্‌রা রমণী এই বনে একটি বিরাট ভালুক মেরে আমাদের উদয়পুরের মেলায় নিয়ে মৃত পশুর প্রদর্শনীতে দিয়েছে। সেই মৃত ভালুকের জুটি মেয়ে-ভালুকটা নাকি কান্ত বিরহে অশান্ত হয়ে দুর্দান্ত ক্ষেপে গেছে।

নকুলেশ্বর বিস্ময়ান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বলেন কি! দুটি মেয়ে একটা জলজ্যান্ত ভালুক মেরেছে! এও কি সম্ভব?

বায়নাদার—অসম্ভবের কোন কারণ নেই। জন্মাবধি ওরা বাঘ ভালুকের সঙ্গে বনে বাস করে করে জানোয়ারের সামিল না হোক, ওসব জীবজন্তুর গতিবিধি ও কলা-কৌশল সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে গেছে। ভয় বলতে কোন জিনিষ ওদের প্রাণে নেই। হিংস্র পশুর কাছে ওরা শত গুণ হিংস্র। আবার সরল প্রাণ মানুষের কাছে ওরা খুব সহজ সরল ভক্তপ্রাণ ও ধর্মভীরু। মানুষকে ওরা দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। আমাদের ওখানে গেলেই ওদের আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

নকুলেশ্বর—আচ্ছা কি ভাবে ওরা ঐ সব হিংস্র পশু শিকার করে?

বায়নাদার—ওদের মধ্যে পুরুষ মেয়ে সবাই সমান সাহসী ও সমান শক্তিশালী। যে জঙ্গলে শিকারে যাবে আটজন (পুরুষই হোক আর স্ত্রীলোকই হোক) চার দলে বিভক্ত হয়ে বনের চারপাশ থেকে দুইজন করে হাতে ভোজালী নিয়ে বনটাকে ঘিরে ভিতরের দিকে এগোতে থাকে, এবং নানাবিধ জন্তুর মত শব্দ করতে থাকে। বাঘকে ওরা মোটেই ভয় করে না। বাঘকে বলে কুত্তা আর ভালুককে বলে যোদ্ধা। কারণ বাঘ মানুষ দেখলে কখনো কখনো

পালিয়ে যায়। আর ভালুক দুই পায়ে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে জিভ বের করে কাছে আসে। বনের মধ্যে ঢুকে ওরা ভালুকের মত শব্দ করতে থাকে। ভালুক ঐ শব্দ শুনে অন্য ভালুক মনে করে স্ববিক্রমে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে। শিকারীও এগিয়ে যায়। ভালুক তখন অন্য ভালুক মনে করে শিকারীর সম্মুখে কাঁধের উপর দুই হাত তুলে দেয়। মানুষের অঙ্গ স্পর্শ মাত্রই জিভ বের করে তার ভুল ভাঙ্গে এবং মানুষ বলে চিনতে পারে। শিকারী তখন কালবিলম্ব না করে ভালুকের হাঁ করা মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জিহ্বাটা বাম হাতে ধরে ডান হাতে জিহ্বা মূলে তীক্ষ্ণধার ভোজালী বসিয়ে দেয়।

শিকারীদের হাতে শুধু ভোজালিই থাকে না। অন্য একটি জিনিষও সঙ্গে থাকে—এক বিঘৎ পরিমাণ লম্বা কতগুলি শক্ত বাঁশের কঞ্চি।

নকুলেশ্বর—সেগুলি দিয়ে আবার কি হয়?

বায়নাদার—ভালুক এসে শিকারীর গায়ে হাত দেওয়া মাত্র অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যদি সে তার ভোজালী জিহ্বা-মূলে ঢুকাতে না পারে তখন পালান ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। শিকারী তখন আগে আগে খুব বেগে দৌড় দেয়। ক্রুদ্ধ ভালুকও তার অনুসরণ করে পেছনে ছুটতে থাকে। অনন্যোপায় শিকারী তখন সেই বাঁশের কঞ্চি একটি ভালুকের গায়ে ছুঁড়ে মেরে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

নকুলেশ্বর—সামান্য এক বিঘৎ একটা বাঁশের কঞ্চি মেরে কি লাভ?

বায়নাদার—লাভ অন্য কিছু নয়। ওটা হল আত্মরক্ষার একটা কৌশল মাত্র। ভালুক খুব জেদী। বাঁশের কঞ্চি গায়ে পড়ামাত্র সে রেগে সেই কঞ্চিটাকে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করে। এবং যতক্ষণ না ওটাকে ভাঙ্গতে পারে ততক্ষণ সে শিকারীকে আর অনুসরণ করে না। এই অবসরে শিকারী বহু দূরে সরে যাবার অবসর পায়।

একান্ত নিরুপায় হলে অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে শিকারীদের আরও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেটি হল—শ্বাস বন্ধ করে মড়ার মত পড়ে থাকা। ভালুকের একটা ধর্ম আছে। সে মরা মানুষ স্পর্শ করে না। ভালুকের হাত থেকে রক্ষা পেতে শিকারীদের কুম্ভকযোগ শিক্ষা করতে হয়।

বায়নাদারের মুখে শোনা এই কৌতূহলোদ্দীপক কথাবার্তা নকুলেশ্বরের নিকট বড়ই প্রীতিপদ মনে হলো এবং ভীতিপ্রদ মনোভাব ও পথ চলার কষ্টও যেন দূরীভূত হয়ে গেল অনেক পরিমাণে। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

দিনমণি অস্তাচলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বনের ভীতিকর নিস্তব্ধতা যেন ভয়াল মূর্তিতে চারদিক গ্রাস করতে উদ্যত।

এতক্ষণ বায়নাদার তথা পথের সাথীর মুখে ভল্লুক শিকারের বিভিন্ন কলা-কৌশলের কাহিনী শুনতে শুনতে নকুলেশ্বর ও তার সঙ্গীসাথীগণ অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় বায়ানাদার বলল—এই দেখুন আমরা ভালুক-মারা পাহাড়টার গায়ে এসে পড়েছি। এই কথা শোনা মাত্র সকলের বুকের মধ্যে শত শত হাতুড়ির ঘা পড়তে সুরু করল যেন।

বন মাঝে বনদেবী

ভীষণ বনটাকে অন্ধকার রাক্ষসী গ্রাস করে ফেলেছে। পথ ঘাট চোখে দেখা যায় না। সমস্ত পাহাড়টাই নিথর নিস্তব্ধ। একটি শুকনো পাতা পড়ার শব্দেও প্রাণ চমকে ওঠে। এমন সময় দূর থেকে ভেসে এলো বামা কণ্ঠস্বর—হুঁ-সি-য়া-র হো! নকুলেশ্বর একটু বিচলিত হয়ে বায়নাদারকে বললেন—ওটা কিসের শব্দ?

বায়নাদার—ভয় নেই, ওটা ভূত প্রেতের শব্দ নয়। পাহারাওয়ালা চৌকিদার কোন এক টিপ্‌রা রমণী পথিককে সতর্ক করে দিচ্ছে।

বলতে না বলতে সম্মুখে এক অপূর্ব মূর্তির আবির্ভাব হলো। নীল রঙের একখণ্ড কটিবেষ্টনী, একখণ্ড বক্ষাবরণ, মস্তকে একখানা রুমাল বাঁধা। কপালে তিলক, গলায় লালবর্ণের মালা, ডানহাতে ভোজালি ও বামহাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে এক নারী সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ দর্শনে বনদেবী বলেই ভ্রম হয়।

সন্ধ্যা হতেই বায়নাদারের নির্দেশে দলের লোকজনও দু'তিনটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে পথ চলছিল। মেয়েটি সামনে এসে আধো আধো বাংলা ভাষায় বলল—হাপনি লোক কোথায় যাবে?

বায়নাদার—আমরা উদয়পুরে রাজার কাছারীতে যাব।

রমণী—এই আঁধার রাতে পাহাড়ে পথে যেতে পারবে না। বিপদ হবে।

নকুলেশ্বর মেয়েটির কথা শুনে বললেন—কি বিপদ হবে; আর তুমিই বা কে? আমরা অনেক লোক, আমাদের বিপদের ভয় দেখাচ্ছ। আর তুমি সতের আঠারো বছরের মেয়ে; একা এপথে তোমার ভয় নেই?

রমণী—আমরা ভয় করি না। এই বনেই আমরা জন্মেছি। বনেই আমাদের ঘর, হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে আমাদের পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। এই তো পাঁচ

সাত দিন পূর্বে আমরা একটা বড় ভালুক এই পাহাড়ে মেরেছি। সেটা ছিল মেয়ে ভালুক, তার মর্দানা ভালুকটা ওর শোকে পাগলা হয়ে গেছে। তাই তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এই পথে লোক চলাচল বন্ধ রাখবার জন্য পাহারা দিচ্ছি। আমি হচ্ছি চৌকিদার। আপনারা এ রাতে আর এগোতে পারবেন না। আমার ঘরে চলুন, রাত কাটিয়ে ভোরে চলে যাবেন।

বায়নাদার—বাছা, তুমি জানো না, আমার সঙ্গে এই যে সব লোক দেখছ এরা গানের দলের লোক। রাজার কাছারীতে কবিগান হবে। আজ রাতে না গেলে গান নষ্ট হবে।

বায়নাদারদের মুখে রাজার কাছারীর গানের কথা শুনে মেয়েটির মনে একটু ভয় হল যেন। সে বলল—আচ্ছা, তবে চল আমি তোমাদের এই পাহাড়টা পার করে দিয়ে আসি। তোমাদের আলোগুলো নিভিয়ে দাও। সাড়া শব্দ না করে আমার পেছনে পেছনে খুব জোরে পা চালিয়ে আস। সাবধান কোন রকম শব্দ করোনা। তাহলে পাগলা ভালুকটা শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে আসবে। আমি একা হলে ভয় ছিলনা। তোমাদের জন্যই ভয়।

মেয়েটির নির্দেশমত সব আলো নিভিয়ে দিয়ে তার পিছু পিছু সকলে ছুটতে আরম্ভ করল। একে তো সারাদিন দুর্গম পাহাড়ে পথে হেঁটে হেঁটে পা ফুলে কলা গাছ; পা পাড়ার শক্তি নেই কারো; তার উপর প্রাণের তাগিদে অন্ধকার অসমান পথে ছুটে চলা যে কি নিদারুণ কষ্টদায়ক তা একমাত্র ভগবান জানেন।

কারো মুখে কথা নেই; একজন অপরজনকে ধরে মেয়েটির পশ্চাদনুসরণ করছে। একটি পাতা পড়ার শব্দেও সবাই চমকে উঠছে—এই বুঝি সেই মৃত্যুদূত এসে পড়ল। নকুলেশ্বরের মনে উদয়পুর সম্পর্কে যত উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়ে সব পলকে স্তিমিত হয়ে গেল। নিজের মনে নিজেকে তিনি শত ধিক্কার দিতে লাগলেন। তিনি না জেনে শুনে কি ছেলেমানুষী করেছেন এখন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। এই পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে নিজে অজ্ঞ হয়েও বিজ্ঞের মত দলের সকলকে বলেছিলেন আমরা যেতে পারলে আপনারা কেন পারবেন না। এভাবে ছোট মুখে বড় কথা বলার জন্য তিনি মনে মনে বড়ই লজ্জিত হলেন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে তিনি কখনো পড়েন নি। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। নিজে চক্রান্ত করে তিনি কুঞ্জবাবুকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি সঙ্গে থাকলেও এত ভয় হতোনা। মনে মনে

প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে এমন বাচালতা আর কখনো করবেন না। যা হোক, বাইরে ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়ে সরলা ও মানদাকে বললেন—আসুন, আমরা যামিনী দাদাকে ধরে চলতে থাকি। ভগবানের নাম স্মরণ করে তিনজনে যামিনীকান্তকে ঘিরে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলতে লাগল।

অবশেষে তারা যখন সেই মৃত্যু গহ্বর থেকে সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছল তখন রাত বারোটা।

চৌকিদার মেয়েটি একটু হেসে বলল—আর কোন ভয় নেই। এখন এখানে একটু বিশ্রাম করুন। আপনাদের গন্তব্যস্থল আর বেশী দূরে নয়, মাত্র ক্রোশ খানেক রাস্তা—এই বলে মেয়েটি আগেই বসে পড়ল। তার গা ঘেঁষে দলের অন্যান্যরাও বসে পড়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘণ্টা খানেক বিশ্রামের পরেই মেয়েটি বলল—এবারে লণ্ঠন জেলে নিন। এবং নিজের লণ্ঠনটিও জেলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও বলল—চলুন, আপনাদের কাছারী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

মেয়েটির অনুসরণ করে ঘণ্টা দুয়েক চলার পর রাজ-কাছারির মেলার আলো দেখা গেল। সকলে ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে কাছারী বাড়ী প্রবেশ করলেন।

অবশেষে উদয়পুরে

এদিকে কুঞ্জবাবু সন্ধ্যার প্রাক্কালেই উদয়পুর পৌঁছে গেছেন বটে কিন্তু পশ্চাদাগত দলের লোকদের জন্য তাঁর মন বড়ই অস্থির। এত রাত হয়ে গেল এখনো দলের লোক এল না। তবে কি পথে কোন বিপদ আপদ হল, না পথ ভুলে বিপথে গেল ইত্যাদি জল্পনা কল্পনা করতেছিলেন; এমন সময় দ্বিতীয় বায়নাদার মারফৎ দলের লোকজনদের পৌঁছানর খবর পেয়ে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। নকুলেশ্বর গিয়ে গুরুপদে প্রণাম করলেন। কুঞ্জবাবু বললেল—আমাদের বাসাঘরে বিছানাপত্র সব প্রস্তুত আছে, তোমরা সবাই হাত মুখ ধুয়ে গিয়ে বিশ্রাম কর।

নকুলেশ্বর—জল কোথায়?

বায়নাদার—এখানে জলের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই, গোমতীর জলেই হাত-মুখ ধু'তে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।

নদীর পাড়ে গিয়ে দেখা গেল জল অন্ততঃ দুই'শ হাত নীচে। মাটি কেটে ধাপ ধাপ সিঁড়ির মত করা আছে। সেখানে নেমে হাত পা ধু'তে হবে। এ

যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এত নীচে নামার মত শরীর ও মনের অবস্থা কারো নয়। তাই ফিরে এসে ধূলিপায়েই সবাই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কাছারীর কর্তৃপক্ষ আহারাদির ব্যবস্থা খুব ভালই করেছিলেন বটে, কিন্তু কারো ভাগ্যেই খাওয়া জুটল না। কুঞ্জবাবু বহু ডাকাডাকি করেও কাউকে তুলতে পারলেন না। অবিরত পথ চলার পরিশ্রমে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে সবাই অঘোর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল। সেই রাতেই গানের কথা ছিল, কিন্তু রাত শেষ হয়ে যাওয়ায় গান আর হলনা।

রাত ভোর হয়েছে। বেলা আট নয় ঘটিকার মধ্যেও কারো চৈতন্য নেই। কুঞ্জবাবু গিয়ে একে একে সকলকে ডাকতে লাগলেন। ডাকলে কি হবে, সকলেই উত্থানশক্তি রহিত। সারা শরীরে বেদনা ও জ্বর; নড়াচড়ার শক্তিও কারো নেই। কুঞ্জবাবু বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কি করে গানের চুক্তি রক্ষা করবেন। বিপক্ষে হরকুমার শীলের দলও গত সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছে। এই অবস্থায় কি করণীয়?

যামিনী নন্দী বলল—আপনি নায়েববাবুর কাছে গিয়ে আমাদের এই অবস্থার কথা বলুন। তাহলে তিনিই যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

কুঞ্জবাবু কাছারীতে গিয়ে সব কথা বলতেই নায়েববাবু উঠে এসে দলের লোকের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে কুঞ্জবাবুকে বললেন—আমি এদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। গান, সেতো আমার হাতে। এতো আর পাবলিকের গান নয় যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। গান হবে পরে; আগে এরা দু'চার দিন বিশ্রাম করুক। শরীর সুস্থ না হলে কি গান করা যায়! আমি বিপক্ষ দলের হরকুমারবাবুকে গিয়ে বলি যে গান চারদিন পরে হবে। আপনারা সকলেই সুস্থ হয়ে নিন।

নায়েববাবুর সহানুভূতি পেয়ে সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাচল। যেন মৃতদেহে পুনঃ জীবন সঞ্চার হলো।

নকুলেশ্বরের অবস্থা আরো শোচনীয়। শরীরের তাপমাত্রা শত ডিগ্রীর উপরে, সর্বাঙ্গ ব্যথায় জরজর। ছেলেমানুষ, এই দুঃসাহসিক অভিযানের ধকল তার সইবে কেন? নিজের শারীরিক অস্বস্তির ওপর, দোহারপত্রের দুর্গতির কারণ হবার মানসিক গ্লানিও তাকে আরো মুষড়ে দিয়েছে। নৌকা চলাচল বন্ধ বলে বায়না ফেরৎ দিবার ষোল আনা ইচ্ছা ছিল কুঞ্জবাবুর। পথের অন্ধিসন্ধি না জেনে ষড়যন্ত্র করে কুঞ্জবাবুর মত পরিবর্তন করে সেই এতগুলি লোকের

শারীরিক ও মানসিক কষ্টের কারণ হয়েছে। এই সব চিন্তা তাকে আরো দুর্বল ও মর্মাহত করেছে।

সকলের ঘুম ভাঙ্গল বেলা প্রায় বারোটায়। গত রাতে কারো খাওয়া হয়নি। সবাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর; স্নানাহার করবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সকলে মিলে গোমতী নদীতে স্নান করতে গেল।

গোমতী খুব বড় নদী নয়; কিন্তু তার নিম্নাভিমুখী স্রোত এত প্রবল যে একটা হাতীকে পর্যন্ত তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়ে নিতে সক্ষম। বড় বড় গাছের চালি, মুলী বাঁশের ভুরগুলিকে তীর বেগে স্রোতে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নদীতে নামবার সাহস কারো হল না। কূলে বসে ঘটীভরে জল ঢেলে স্নান সেরে ফিরে এসে আহারাদি করে বিশ্রাম নেওয়া হোল।

চারদিন বিশ্রামের পর গান হবে শুনে নকুলেশ্বরের মনে উদয়পুর দর্শনের স্বপ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে সুরু করল। তিনি যামিনী নন্দীকে বললেন—দাদা, চারদিন পরে যখন গান হবে তখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ উদয়পুরের দেবী ত্রিপুরে-শ্বরীর মন্দিরটি দর্শন করে এলে ভাল হয় না? যামিনীকান্ত হেসে বলল – ছেলেমানুষী করে যে ভুল করে বসেছ আগে সেই ভুলের মাশুল উশুল হোক। সুস্থ হও, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

পথের ক্লান্তি ভুলে

তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘণ্টা খানেক বিশ্রামের পর নকুলেশ্বর মানদা সরলাসহ, দলের অন্যান্য সকলকে বললেন—চলুন, এখন সবাই তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়ি।

সরলা একটু রহস্য করে বলল—এক তীর্থ দর্শন করাতে এনে তো গা ব্যথা ও জ্বরের রোগী সাজিয়েছে, আবার এ তীর্থটি তোমার কত দূর! বিশ-পঁচিশ মাইল হবে না তো?

নকুলেশ্বর—না, না; সামান্য পথ। আগেই এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

সরলা –ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়, তা জাননা বুঝি? তোমার ছেলেমানুষী আর ভাল লাগে না।

নকুলেশ্বর—ছেলেমানুষীই বলুন আর যাই বলুন, নারদ মুনি সত্যভামাকে পতিদান ব্রতের উৎসাহ না দিলে শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমাই প্রচার হতো না।

সরলা—থাক থাক নারদমুনি, আর কাব্য করতে হবে না। এখন তোমার কবি-কাব্য বন্ধ রেখে কোন যমের বাড়ী যেতে হবে বল!

নকুলেশ্বর—যমের বাড়ী বলছেন কেন—কৈলাস কাশী বলুন। সেখানে জাগ্রত দেবী ত্রিপুরেশ্বরী বর্তমান। এমন দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে এই পার্বত্য ত্রিপুরায় এসে দেবী দর্শন, এ জীবনে আর হবে বলে মনে হয় না। এই সুবর্ণ-সুযোগের অপচয় না করে দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করাই শ্রেয়।

বায়নাদারকে সঙ্গে নিয়ে সকলে দেবী দর্শনে চললেন। পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল, পাহাড়ী ঝর্ণা, বৃক্ষরাজির শোভা, ফুলের সৌন্দর্য, পাখীর কূজন ইত্যাদি মিলে যেন একটা আনন্দলোকের সৃষ্টি হয়েছে। তার মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে শরীরের ক্লান্তি, পথের দূরত্ব কিছুই কারো মনে ছিল না। কতক্ষণে দেবী দর্শন হবে এই ছিল একমাত্র লক্ষ্য—'সাগর সঙ্গমে যথা সুরধনী চলে।'

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে—অতীত ও অলৌকিক

এভাবে চলতে চলতে অদূরে মা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গনে আরতির কাঁসর ঘণ্টা ও ঢাকের শব্দ শোনা গেল। আর একটু এগোতেই মন্দির চূড়ায় সুবর্ণ কলসী ও চক্র পতাকা চোখে পড়তেই সবাই মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মন্দির চত্বরে এসে উপস্থিত হলো।

শ্বেত-পাথরে নির্মিত কারুকার্য খচিত স্বর্ণ পাতে মোড়া নয়টি চূড়াবিশিষ্ট মায়ের মন্দির। প্রত্যেক চূড়ায় দশ-মহাবিদ্যার এক একটি মূর্তি খোদিত। নয়টি চূড়ায় নয়টি মহাবিদ্যার মূর্তি দেখে নকুলেশ্বর সন্দিগ্ধ মনে বায়নাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি। শুনেছি দক্ষযজ্ঞে যাবার জন্য শিব ঠাকুরকে ভয় দেখাবার নিমিত্ত 'মা' নাকি কালী-তারা ভুবনেশ্বরী-ষোড়শী ইত্যাদি দশ-মহাবিদ্যার মূর্তি ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এখানে মন্দিরের নয়টি চূড়ায় নয় মহাবিদ্যার মূর্তি খোদিত রয়েছে—'তারা' মূর্তি বাদ পড়ল কেন?

বায়নাদার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নকুলেশ্বরকে নিয়ে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কাছে গিয়ে তার প্রশ্নের কথা জানালেন।

পুরোহিত ঠাকুর নকুলেশ্বরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। পরে বায়না-দারকে বললেন—বাবা, এই মন্দিরে প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী এসে মাকে দর্শন করে জাঁকজমকে পূজা দিয়ে চলে যায়। কিন্তু এই জাতীয়

প্রশ্ন কেহ কখনো করেনি। ছেলেটির প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে ও খুব তথ্যানুসন্ধানী হবে।

পুরুত ঠাকুর নকুলেশ্বরকে কাছে ডাকলেন। তিনি তাঁর চরণে প্রণাম করে কাছে বসলেন। নকুলেশ্বরের নাম ধাম, সব জিজ্ঞাসা করার পর বললেন—বাছা, তুমি যে প্রশ্ন করেছ এটা স্বাভাবিক। দশ মহাবিদ্যার নয়টি মূর্তি বর্তমান ; একটি কেন নেই ? এর কারণ হচ্ছে—ত্রিপুরাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতারা গুরু বৃহস্পতির আদেশে 'তারা' দেবীর উপাসনা আরম্ভ করলেন। দেবতার স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী দশভুজা মূর্তি ধারণ করে বাজ, চক্র, অঙ্কুশ, গদা ইত্যাদি প্রহরণে সজ্জিত হয়ে দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বললেন—মাভৈ ! মাভৈ !! দেবগণ, তোমাদের আর কোন ভয় নেই। আমি ত্রিপুরাসুরকে বধের জন্য মহাকালরূপী শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে এই বেশে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়ে ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস করে ত্রিপুরেশ্বরী নামে প্রতিষ্ঠিত হব।' সেই তারাদেবীই এই ত্রিপুরেশ্বরী নামে অধিষ্ঠান করছেন। যাও, মন্দিরে গিয়ে মায়ের ভুবনমোহিনী স্বর্ণ প্রতিমা দর্শন কর। চল, আমিই তোমাদের সব দেখিয়ে দিচ্ছি।

নকুলেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেই দেখলেন প্রকাণ্ড এক হাড়িকাঠ। চারদিক পাথর দিয়ে বাঁধান। হাড়িকাঠের গোড়া হতে একটি পাকা নর্দমা গিয়ে একটি পাকা চৌবাচ্চার সঙ্গে মিশেছে। পুরোহিত ঠাকুরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদয়াস্ত মায়ের পূজা হয়। ভক্তগণ পূজায় নানাবিধ বলিদান করে—হাঁস মুরগী কবুতর হতে সুরু করে ছাগ ছাগী মেষ মহিষ। অসংখ্য মানত করা পশুপাখীর বলির রক্তে জায়গা কর্দমাক্ত না হবার জন্যই এই ব্যবস্থা। বলিদানের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত স্রোত এই নর্দমা দিয়ে ঐ পাকা চৌবাচ্চায় জমা হয়। ভক্তগণ সেই রক্তে অবগাহন করে তাদের মানত সফল করে।

অদূরে আর একটি পাথুরে হাড়িকাঠ লোহার শিকের মজবুত বেড়া দিয়ে ঘেরা দেখে নকুলেশ্বর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওখানে আবার ওটা কি ?

পুরোহিত—ওটা খোদ রাজার সরকারী হাড়িকাঠ। ওখানে কোন পশুপাখী বলি হয় না। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে মহারাজ স্বয়ং পূজা দিতে এসে একটি নরবলি দিয়ে তার তপ্ত রক্তে ত্রিপুরেশ্বরীর তৃপ্তি সাধন করতেন।

নকুলেশ্বর—এখনো কি এখানে নরবলি হয় ?

পুরোহিত—না। ব্রিটিশ সরকারের শাসন আরম্ভ হবার কিছু দিনের মধ্যেই নরবলি প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

হাড়িকাঠের মতো মধ্যস্থলে কাটা দুটি সুউচ্চ পাথরের পীলারের সঙ্গে মোটা একটি লোহার বীমের সঙ্গে পিতলের শিকলে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা পিতলের ঘণ্টা। তার গায়ে দেবনাগরী অক্ষরে কি যেন লেখা। ঘণ্টাটির আকৃতি দেখে নকুলেশ্বর পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা এই বিরাটকায় ঘণ্টাটির ওজন কত হবে ; আর এটি কোন সময় বাজান হয় ?

পুরোহিত—আমার চৌদ্দ পুরুষ অবধি আমরা এই মন্দিরের পূজারী। আমার বয়স এখন একশত দশ বছর। আমি ছোটবেলায় ঠাকুরদাদার কোলে বসে গল্প শুনেছি, এই ঘণ্টাটির ওজন নাকি পাঁচ মণ সাড়ে বাইশ সের। কোন যুগে তৈরী তা কেউ বলতে পারে না। ওর কাজ হল—মায়ের পূজার সব আযোজন অন্তে ঐ ঘণ্টার শিকল টেনে বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই পূজা ও বলি আরম্ভ হয়। ঐ ঘণ্টার মাঝের দোলনা হাতুড়ীটার ওজনই নাকি এক মণের কাছাকাছি। তবে বাজাতে কোন কষ্ট হয় না। এমন কৌশলে ওটা বাঁধা আছে যে শিকল টান দিয়ে ছেড়ে দিলে ঢনাঢন্ ঢনাঢন্ করে বিকট শব্দে বাজতে থাকে। মন্দিরের পেছনে আছে একটি প্রকাণ্ড দিঘি। সেই দিঘিতে অসংখ্য বিরাটাকৃতি মাছ ও কচ্ছপ কাউট্যা ইত্যাদি জলজ প্রাণীর বাস। ঘণ্টা বেজে উঠলেই তারা সকলে এসে জলের কিনারায় উপস্থিত হয়ে বলির প্রসাদ পাবার জন্য অপেক্ষা করে। অপরাহ্নে পূজার বলি আরম্ভ হলেই তোমরা তা নিজ চোখে দেখতে পাবে। এখন চল মন্দিরে গিয়ে মাতৃমূর্তি দর্শন করবে। এই বলে পুরোহিত ঠাকুর সকলকে নিয়ে মন্দির দ্বারে উপস্থিত হলেন।

মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটা মৃত কচ্ছপের কঙ্কাল দেখে নকুলেশ্বর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে এই মরা কচ্ছপের কঙ্কাল কেন ?

পুরোহিত—ও যে মায়ের ভক্ত ; এই দিঘিতেই বাস করত। মৃত্যু কাল উপস্থিত জেনে নিজে এসে মন্দিরের দ্বারে প্রাণত্যাগ করেছে। এই দিঘির মাছ ও কাছিমের অঙ্গে আঘাত করলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। সে জন্য সব জলজন্তু নির্ভয়ে দিঘির জলে বিচরণ করে। কেহ তাদের ধরতে ও মারতে পারেনা। ওরা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের রক্ষিত প্রাণী বা ভক্ত বলে গণ্য।

মন্দিরে প্রবেশ করে নকুলেশ্বর দেখলেন রত্নখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে সিংহবাহিনী দশভুজা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের স্বর্ণ প্রতিমা বিরাজমান। সে যে কি অপূর্ব

মনোমুগ্ধকর ভুবনমোহিনী মূর্তি স্বচক্ষে না দেখলে ভাষায় বর্ণনাতীত। সেই জগন্মোহিনী মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে মনে নকুলেশ্বর কি যে প্রার্থনা করলেন তা তিনিই জানেন।

এদিকে অপরাহ্ণে পূজার আয়োজন শুরু হয়েছে। ভক্তগণ দলে দলে দেবীর পূজা ও বলির উপকরণ নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত। গুড়ুগুড়ু শব্দে ঢাক ঢোল বাজাতে লাগল। দলের সবাই নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী মায়ের পূজার ডালা, মালা, জবা বিল্বদল কিনে এনে পূজারীর হস্তে অর্পণ করলেন। মন্দির প্রাঙ্গণেই বাজার—মিঠাই মণ্ডা পত্র পুষ্প ধূপ দীপ সব পাওয়া যায়।

নকুলেশ্বর সামান্য কিছু ডালা এবং একটি রক্ত জবা নিয়ে পুরোহিতের হাতে দিয়ে বললেন—প্রভু আমার এই রক্ত জবাটি আপনি মায়ের পাদস্পর্শ করিয়ে আমাকে দিবেন।

পুরোহিত—কেন, এ ফুলটি নিয়ে কি করবে ?

নকুলেশ্বর—আমি মায়ের এই প্রসাদী মানত করে কবচে পুরে ধারণ করব।

এমন সময় মন্দির প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করে সেই বিরাটকায় ঘণ্টাটি ঢং ঢং শব্দে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলি আরম্ভ হল। কত ছাগ, মেষ, পাখী বলি হতে লাগল তার হিসাব কে রাখে। পুরুত ঠাকুর বললেন—চল, ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করে আসি। এই বলে প্রথম যে পাঁঠাটি বলি হয়েছিল সেটি কেটে কেটে ছোট ছোট খণ্ড করে একটা ঝুড়িতে ভরে দিঘির দিকে চললেন।

দিঘির দক্ষিণ পাড়ে অন্ততঃ বিঘা খানেক জায়গার মাটি জলের সঙ্গে সমতল করে কাটা। সেখানে জলের গভীরতা হাঁটু পরিমাণের বেশী হবে না। দিঘির পাড়ে গিয়ে দেখা গেল বহু পুরাতন বড় বড় নানাবিধ মাছ, কচ্ছপ, কাউট্যা ইত্যাদি সেই জায়গাটুকু জুড়ে প্রসাদের অপেক্ষায় সকলে জড়ো হয়ে আছে। পুরুত ঠাকুর দলের সকলকে বললেন—তোমরা এই ঝুড়ি হতে এক এক খণ্ড মাংস নিয়ে ভক্তদের মুখে দাও। এক খণ্ডের বেশী মাংস দেবেনা, এবং একজনকে ছাড়া দু'জনকে দেবার চেষ্টা করবে না। যার মুখে দিবে সে প্রসাদ নিয়েই স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে।

সকলে এক এক খণ্ড মাংস নিয়ে হাঁটু জলে নেমে মাছ কচ্ছপ যার সামনে যা পড়েছে তার মুখে মাংস দিতেই তারা বহু দিনের পোষা জীবজন্তুর মতো তা নির্ভয়ে মুখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নকুলেশ্বর এতক্ষণ দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রসাদ বিতরণ মহোৎসব দেখতে-

ছিলেন। পুরুত ঠাকুর বললেন—কিহে ছেলে, তুমি যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে? নেমে এস।

নকুলেশ্বর—আমার শরীরটা খুব খারাপ। জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে। তাই জলে নামতে সাহস হয় না।

পুরোহিত—ও কিছু না। নেমে এসে কোন ভক্তকে প্রসাদ দাও, অবসাদ দূর হবে।

নকুলেশ্বর এক টুকরো মাংস নিয়ে জলে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ভীষণ চিৎকার করে দৌড়ে এসে তীরের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পুরুত ঠাকুর দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—কিহে, অমন চিৎকার করে ছুটে এলে কেন?

নকুলেশ্বর—বাপ্‌রে বাপ, কি একটা ভীষণ জন্তু যেন রক্তচক্ষু করে আমাকে খেতে এসেছিল।

পুরোহিত—দূর, দূর, পাগল ছেলে! ও কিছু না। কৈ কোথায় সে জলজন্তু! এস তো দেখে আসি।

নকুলেশ্বর—আমি আর যেতে পারব না। আপনি গিয়ে দেখুন। ঐ যে ঐ খানটায় স্থির হয়ে আছে। আপনি মাংসটা তাকে দিয়ে আসুন।

পুরোহিত—সে আমার হাতে প্রসাদ নেবে কেন? তুমি হাতে করে না দিলে অভুক্ত চলে যাবে। তাতে সেবাবাদের অপরাধ হবে। এসো আমার সঙ্গে, কোন ভয় নেই। এখানে হিংস্র প্রাণীরাও হিংসা ভুলে গেছে। এই বলে নকুলেশ্বরকে হাত ধরে জোর করে নিয়ে গিয়ে দেখালেন—বহুদিনের পুরাতন একটা গজার মাছ। বহুকাল এই জলে বাস করে গায়ে শ্যাওলা পড়েছে। মনে হয় যেন সর্বাঙ্গ লম্বা লম্বা লোমে আবৃত। আকারে অন্ততঃ তিন চার হাত লম্বা। গজার মাছের চক্ষু বড় এবং রক্তবর্ণ। পুরুত বললেন—নাও, মাংসখণ্ড ওর মুখের কাছে ধর। আমি তো সঙ্গে আছি। ভয় কি!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নকুলেশ্বর মাংসখণ্ড হাত বাড়িয়ে তার মুখের কাছে ধরতেই সে পোষমানা প্রাণীর মতো টপ্ করে মুখে নিয়ে পেছন ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল বটে, কিন্তু নকুলেশ্বরের বুকের দুরু দুরু কম্পন তখনও বারণ হলো না ভক্ত মহোৎসব শেষ করে সকলে মন্দিরের দিকে ফিরে চললেন।

মায়ের মন্দিরটি একটি টিলার উপর অবস্থিত। মন্দিরে ওঠানামা করবার জন্য সম্মুখে পেছনে দুই দিকেই সিঁড়ি আছে। সে সিঁড়ি কিন্তু কাঠ পাথর

বা ইঁটের নয়—একটা নূতন পদার্থ দিয়ে তৈরী। নকুলেশ্বর পুরুত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা বলুন তো এ সিঁড়ি কিসের তৈরী? পুরোহিত—প্রাচীনকালে এই স্থানে দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মা তারা সিংহবাহিনী দশভুজা মূর্তিতে দেবতাদের উদ্ধারের জন্য অসংখ্য অসুরকে ধ্বংস করেছিলেন। তারা সবাই ছিলেন অসুররাজ ত্রিপুরাসুরের বংশধর। স্ববংশে ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস করে মা তারা 'ত্রিপুরেশ্বরী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সেইসব নিহত অসুরের পুঞ্জীভূত অস্থি সংগ্রহ করে এই সিঁড়ি তৈরী হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখ মায়ের তীক্ষ্ণধার খড়্গের আঘাতের চিহ্ন প্রত্যেক অসুরের অস্থিতে বর্তমান।

সকলে লক্ষ্য করে দেখলেন এক একটা অস্থি যেন দশ বারো হাত লম্বা কলাগাছের গুঁড়ি। তার দুই দিক কলম কাটার মতো। কোন গাছ এক কোপে কেটে ফেললে যেমন দেখায় সে রকম। হাড়গুলোর রং শ্বেতধূপের রং-এর মতো। লোহার চাইতেও শক্ত। যে কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে আঘাত করলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো নির্গত হয়।

সকলে তো দেখে অবাক! যাদের দেহের একটা অস্থিখণ্ড দশ-বারো হাত লম্বা তাদের দেহটা যে কি ছিল তা সেই বিশ্বস্রষ্টা বিধাতাই জানেন।

এদিকে মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতি শেষ হতেই সকলে মাকে প্রণাম করে রাত দশটায় কাছারী বাড়ীতে পৌঁছলেন। কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—সবাই খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর। আগামী রাত্রে গান হবে।

উৎসাহী শ্রোতাদের উস্কানি

এমন সময় ক'জন ভদ্র যুবক এসে কুঞ্জবাবুকে জিজ্ঞাসা করল—এই ছেলেটি কি আপনার পুত্র?

কুঞ্জবাবু—হ্যাঁ, পুত্রই বটে! কেন একথা জিজ্ঞাসা করছেন?

যুবক—এ ছেলেটি কি গান করে?

কুঞ্জবাবু—না, গান করেনা, 'সরকারী' শিখে। অর্থাৎ কবি হবার চেষ্টা করছে এবং ভাল পাঁচালী বলতে পারে।

যুবক—তবে আমাদের একটা বিশেষ অনুরোধ—বিপক্ষে আমরা আমাদের ত্রিপুরা জেলার স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ কবি হরকুমার শীল মহাশয়কে আপনার বিপক্ষে পাল্লা দিতে এনেছি। এবার ত্রিপুরা ও বরিশালে কম্পিটিশন্ হবে। সুতরাং

এই ছেলেটিকে দিয়ে এমন প্রশ্ন করাবেন যেন হরকুমার শীল কোন উত্তর দিতে না পারে।

কুঞ্জবাবু—এ তোমাদের ভুল ধারণা। কবির মুখ কেউ কখনো বন্ধ করতে পারেনা। বিশেষতঃ হরকুমারবাবু দেশবরেণ্য প্রাচীন কবি। তাঁর কাছে এই দুধের ছেলেটা এমন কি প্রশ্ন করবে যার উত্তর তিনি দিতে পারবেন না? তবে তোমরা এখন যাও, আমি একটু ভেবে দেখি।

এই বলে যুবকদের বিদায় দিয়ে কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—কেমন শুনলে ত?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ বাবা শুনলাম; কিন্তু এ যেন বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার গল্প। আমি কিই বা জানি; আর কি প্রশ্নই বা করবো! তবে আপনার আশীর্বাদ থাকলে প্রথম আসরে আমি একটু ছেলেমানুষী করতে পারি—যদি আপনি রাগ না করেন।

কুঞ্জবাবু—না না, রাগ করবো কেন। তবে মানী লোকের মান রক্ষা করে কথা বলবে। তিনি যেন মনে কোন রকম ব্যথা না পান। সর্বদা মনে রাখবে, মহৎ লোকের আশীর্বাদ তোমার কাব্য জগতের পরম পাথেয়। যাও, সকলে গানের জন্য প্রস্তুত হও গে।

যে যার শয্যা গ্রহণ করে অচিরে নিদ্রামগ্ন হলো। নকুলেশ্বর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন—আগামীকাল আমাদের প্রাগ-আসর। মেযে নিয়ে দল গঠিত বলে কবির নিয়মানুযায়ী আমাদেরই প্রথম প্রশ্ন করতে হবে। কি প্রশ্ন করব? শুনেছি হরকুমার শীল মশাই একজন স্বনামধন্য প্রাচীন কবি। কবিপূজ্য হরি আচার্য মহাশয়ের সমকক্ষ এবং সহকর্মী এই হরকুমার সরকার—ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তা এবং আশা উদ্দীপনার মধ্যেই নকুলেশ্বরের রাত ভোর হ'লো।

ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে তিনি বাসায় বসলেন। যে ঘরে তাঁদের বাসা দেওয়া হয়েছে সেটি একটি প্রাচীন দস্তাবেজখানা। কাছারীর নানাবিধ কাগজপত্রে ভরা। নকুলেশ্বর বসে বসে কি চিন্তা করছেন, হঠাৎ একখানা পাতা ছেঁড়া পুথি তার চোখে পড়ল। তিনি সেখানা নামিয়ে এনে দেখলেন ওটা একটা মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

নকুলেশ্বর বইখানি খুলে খুব আগ্রহসহকারে পড়তে পড়তে একটা বিষয়ের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। বিষয়টি যদিও প্রাচীন মহাভারতের সমালোচনা, কিন্তু তার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু নূতন তথ্য সমাবেশ করা হয়েছে। নকুলেশ্বর

যেন অন্ধকারের মধ্যেও একটা আলোর সন্ধান পেলেন। বেশ করে সেই বিষয়টা তিনি হৃদয়ঙ্গম করে নিলেন। মনে মনে স্থির করলেন—আজ এই অস্ত্রই হরকুমার সরকারের উপর প্রয়োগ করব। কিন্তু তাঁর মনের কথা কারো কাছে ব্যক্ত করলেন না; এমন কি কুঞ্জবাবুর কাছেও নয়। পুঁথিখানি যথাস্থানে রেখে তিনি মনে মনে একটি টপ্পা (প্রশ্ন) রচনা করে নিলেন।

রাত দশটায় গান আরম্ভ হবে। সন্ধ্যার পূর্বে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে যেতেই তিনি বললেন—সকাল সকাল খেয়েদেয়ে প্রস্তুত হও। আর সরলা ও মানদাকে বল যে প্রত্যেক আসরে নাচের পোষাক পরে একটি করে নাচ গান করতে হবে। এখানে শুধু কবিগান চলবে না; কারণ স্থানীয় অধিবাসী টিপ্‌রা, লেপ্‌চা, গারো, কুকী—তারা ওসব গান ও কূটতার্কিক প্রশ্ন জবাব বুঝবে না। তাদের মনস্তুষ্টির জন্য ঐ নাচের ব্যবস্থা করতে হবে।

নকুলেশ্বর সরলা ও মানদাকে কুঞ্জবাবুর আদেশ জানালেন এবং আহারান্তে সকলকে আসরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। নিজের মনের মধ্যে কিন্তু সর্বদা সেই ছেঁড়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের ছেঁড়া পাতার বিষয়টি উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। সেই বিষয়টি নিয়ে রচিত টপ্পার পদগুলি বার বার নিজের মনে মনে গাইতে লাগলেন।

উদয়পুরে কবিগান

মহারাজার কাছারী বাড়ীতে ঢং ঢং করে রাত দশটার ঘণ্টা বাজতেই কুঞ্জবাবুর দল আসরে প্রবেশ করল। বিরাট আসর; লোক গিজ গিজ করছে। সাধারণতঃ পূর্ব বাংলা কবি-পাগল দেশ। তার উপর দুই বিখ্যাত কবিয়ালের কবির লড়াই শুনবার জন্য আগরতলা, ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী থেকে বিপুল সংখ্যক কাব্যরস সন্ধিৎসু রসিক শ্রোতার সমাবেশ হয়েছে। আসরের তিন দিকে ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আসন; আর একদিকে স্থানীয় অধিবাসীদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। আসরে আটটি পাম্প লাইট জ্বালানো হয়েছে। এ গুলি সে সময় খুব প্রচলিত ছিল। এখন আর চোখে পড়েনা। হাজার পাওয়ার ডে-লাইটের চেয়েও বড়। ভিতরে লম্বা দুটো করে ম্যাণ্টেল। নীচে মাটিতে বসানো থাকত কেরোসিন তেল ভরা একটা ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের সঙ্গে তামার পাইপ লাইটের সঙ্গে লাগানো। নীচে পাম্প দিলেই ঐ কেরোসিন বাষ্প হয়ে ম্যাণ্টেলে পৌঁছে, উজ্জ্বল আলোকে আসর উদ্ভাসিত করতো।

প্রথমে দুই দলের ঢুলী (বাইন) আসরে গিয়ে মহড়া বাজনা শুরু করল। তারপর হারমোনিয়াম বেহালা ও সানাই'র সমবেত বাজনা আরম্ভ হলো। বাজনা শেষ হতেই নর্তকী বেশে সরলা ও মানদা আসরে প্রবেশ করল।

কালো রং-এর সল্‌মা চুন্‌কি লাগানো ঘাগরা পরা, গায়ে জরির কাজ করা কালো বডি-কোট, তার উপর সিল্কের ওড়না, মাথায় সোনার জাল টিকলি, হাতে গলায় নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার—সত্যিই যেন স্বর্গীয় নর্তকীর মর্ত্যে আবির্ভাব। নাচের কনসার্ট বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোমুগ্ধকর নৃত্যাভিনয় আরম্ভ হলো। নৃত্যের তালে ছন্দে আসর এমন জমজমাট হয়ে উঠল যে টিপরা ও গারোদের আনন্দ আর ধরেনা। তারা কেহবা তোয়ালে, কেহবা রুমাল নর্তকীদের অঙ্গে ছুঁড়ে মারতে লাগল। সেগুলি আবার একেবারে শূন্য নয়—দুই পয়সা থেকে দুই টাকা পর্যন্ত তাতে বাঁধা আছে।

ওদের নাচের বাহাদুরী এবং শিক্ষার কৌশল দেখে নকুলেশ্বর নিজেকে খুব ছোট মনে করতে লাগলেন। নাচে গানে তালে সুরে যশঃ প্রতিষ্ঠায় ওদের তাঁর চাইতে শত গুণ শ্রেষ্ঠ মনে হলো। গুরুকৃপায় কত দিনে যে তিনিও সর্বজন সমক্ষে যশঃ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন সেই ভাবনা ভাবতে লাগলেন।

নাচের পালা শেষ হতেই নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে দোহারদের ডাক ও ভবানী বিষয় গান বলে দিতে লাগলেন। ডাক গানটি তাঁর নিজের রচিত—

এসো হৃদে এসো গো মা হর-রাণী।
হর এ দুর্গতি হর, হর উর বিহারিণী॥
গড়ায়ে বাসনার মূর্তি, রস দিয়ে রসনার বৃত্তি,
ফুল দিয়ে আশা-নিবৃত্তি, সাজাব চরণ দুখানি॥
কাম-রিপুকে পশু করে, প্রেমের যূপকাষ্ঠে ভরে,
অনুরাগের খড়্গ ধরে, যজ্ঞার্থে বধিব প্রাণী॥
সাজায়ে ভক্তি-নৈবেদ্য, বাজায়ে জ্ঞান-ঢাকের বাদ্য,
ষোল জনে হয়ে বাধ্য, করব তারা জয় ধ্বনি॥

(অন্তরা) ভক্তি প্রিয় পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চ বাতি জ্বেলে,
পঞ্চমূর্তি পাঞ্চজন্যে, পঞ্চ মন্ত্র তুলে।
যেন জাতি-বিদ্যা মোহত্বঞ্চ, এ পঞ্চ যাই ভুলে॥

পঞ্চ মন্ত্র প্রণবাদি, পঞ্চবিধ পূজার বিধি,
তান্ত্রিকেরা পঞ্চ তন্ত্রে বলে।
যেন নকুলের পঞ্চত্বে আত্মা পঞ্চতত্ত্বে মিলে ॥

ডাক গান শেষ করে মালসী গান আরম্ভ হলো। গানখানি একজন প্রাচীন কবির রচনা—

কত কর্ম ফলে মানব কুলে জনম গ্রহণ।
ভবে এসে, ভুলে মায়ার বশে, হল না শক্তি আরাধন ॥

জন্ম মাত্রে দেখি কর্মক্ষেত্রে, চতুর্দিকে মায়া জাল,
ভুলে বিষয়-মদে, পদে পদে হয়েছি মাতাল। —মাগো—
ছিল এই বাসনা দশভুজা, পাদ-পদ্ম করিব পূজা,
মাথায় নিয়ে পরের বোঝা, আমি হারাইলেম পরকাল ॥

পরকে আপন ভেবে এখন খাটি অবিরত,
চোখ বাঁধা বলদের মতো, আর আমায় ঘুরাইওনা।
দিন গেল দিন গেল দুর্গে, আরো কিবা আছে ভাগ্যে,
কিছু নাইকো জানা ॥

জরাতে ঘিরিলে দেহ, স্ত্রীপুত্রে করবে না স্নেহ
দশ ইন্দ্রিয় হইবে দুর্বল।
ভাঙবে অনিত্য সংসারের আশা, ফুরাইবে বল ভরসা,
কেউ দিবেনা পিপাসাতে জল ॥

এদিন গেল মায়ার ভুলে, নিদানের দিন কাছে এলে,
পাপ দেহের পঞ্চত্বকালে, নাম নিতে যেন ভুলি না ॥

ইত্যাদি দেহতত্ত্ব বিষয়ক মালসী গানখানা শেষ করে নকুলেশ্বর দল নিয়ে বের হয়ে এলেন।

হরকুমার সরকার মহাশয়ের পুরুষ দোহার নিয়ে দল গঠিত বলে নাচগানের কোন বালাই নেই। তার-দল আসরে গিয়েই ডাক গান আরম্ভ করল—

ত্বং কালী কালবারিণী কলুষ নাশিনী তারা।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনী দক্ষসুতা দুঃখহরা ॥

চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী, চণ্ড-মুণ্ড দলনী,
ত্রৈলোক্যজনপালিনী, ত্বং হি চন্দ্রচূড় দারা ॥

দিগম্বরীদিগ্বসনা, বিরূপাক্ষ বক্ষাসনা,
নরমুণ্ড বিভূষণা, খর্পরী মা খড়্গ-ধরা ॥

(অন্তরা) ত্বং হি তারা ত্রিনয়ণা ত্রিগুণধারিণী।
ত্বং হি শিবসিমন্তিনী ত্রিতাপহারিণী ॥

ত্বং দেবী গায়ত্রী গীতা, ত্বং হি মা সাবিত্রী সীতা,
ত্বং তারা ত্রিলোকতারিণী।
আমায় অন্তকালে নিও কোলে, কালনিবারিণী ॥

ডাক-বন্দনা শেষ করে তারাও একখানি মনশিক্ষার মালসী গান গেয়ে আসর ছেড়ে গেলেন। সখী-সংবাদ গাইতে নকুলেশ্বর দল নিয়ে দ্বিতীয় বার আসরে ঢুকতেই কাছারীর নায়েব মশাই ফরমাশ করলেন—এখন সখী-সংবাদ না গেয়ে হরি আচার্য মশাই'র রচিত "ভল্লুকের লহর কবি" গানটি করুন। নকুলেশ্বর বাসাঘরে গিয়ে কুঞ্জবাবুর মত চাইলে তিনি বললেন—আসরের মত নিয়ে কাজ করাই ভাল। তারা যদি সখী-সংবাদ না শুনে কবি শুনতে চায়, তাই কর গিয়ে। নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে সেই ভল্লুকের কবিখানা গাওয়াতে আরম্ভ করলেন—

ভল্লুকের 'কবি' ও জবাব

আমি ভিক্ষাজীবী অক্রুর মুনি, দরিদ্রের শিরোমণি,
ভিক্ষাতে রক্ষা উদরটা।
তোরে লোকে বলে মহামহিম মহিমা অপার,
কৃষ্ণ তুই আমার, গুণের ভাইর বেটা ॥

ও তুই প্রভাস তীরে করিস যজ্ঞ, দরিদ্রের ফিরল ভাগ্য,
আমন্ত্রণ করেছিস ত্রিলোক, এল অনেক ভদ্রলোক।
এসে সব দেব-গন্ধর্ব, সভার বাড়ালেন গর্ব,
আবার দেখি কি একটা অপূর্ব, এল এক ভূতুড়ে ভল্লুক ॥

হল কি অঘটন আনন্দের ঘটা, ও তোর প্রভাস যজ্ঞের বেশ প্রভাটা,
সভাটার শোভাটার আর নাই কসুর।
হাবলা বাবলা কথা কয় মুখে, এল কোন্ জংলা থেকে,
বাংলা বাহাদুর॥

ওটা পাকিয়ে চক্ষু হাঁকিয়ে এসে,
সভাটা ঝাঁকিয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে,
কত কি চাকিয়ে চাকিয়ে খায়—
অঙ্গে ধুম্বা ধুম্বা লোম্বা ভরা, ভোম্বল দাসের প্রায়।
কইতে আমার ভয় করে, জামাই বলে কয় তোরে,
কথা সত্য করে বল দেখিরে, কৃষ্ণরে ভল্লুক কিরে তোর শ্বশুর।
ওটা দীঘে পাশে এক সমান অপরিমাণ জোর॥

যজ্ঞে ভল্লুক এল এল বলে, যত সব ছেলে পেলে,
মিলে সব ঢিলে মারে গায়ে, আমোদ লেগেছে সভায়।
কেহ হাসে খিটখিটায়ে, কেহ দেয় ধূলা ছিটায়ে,
ওটা ভ্রূকুটি দেয় কিটমিটায়ে, লাল চোখে মিটমিটায়ে চায়॥
সভায় সুস্থির হয়ে বসেনা মে'টে, আবার পল্‌কে পল্‌কে চমকে ওঠে,
চোখ দুটা ঝল্‌কে যেমন মানিক জোড়॥

ও তুই বিয়ে করলি ষোল হাজার, হাজার হাজার রাজার ঝি।
করলি কৈ বিয়ে ভল্লুকের মেয়ে, কৃষ্ণরে কৈ আমার সে মাতাজী॥
তোর এক শ্বশুর সভায় এল রাজা সত্রাজিৎ,
এল আর এক শ্বশুর ভীষ্মক রাজা জগতে পূজিত—
জানি তাদের কুলজী। —মরি হায়রে—
ও তোর ভল্লুক শ্বশুর কুলীন বেশী,
সে বটে জানোয়ারগঞ্জের ব্যানার্জী॥

ভল্লুক একা একা যজ্ঞ স্থলে, এল প্রভাসের কূলে,
সঙ্গে আর কেহ নাই সঙ্গী।
যেমন অমাবস্যার চাঁদ উঠেছে, এই সভার ভিতর,
সাবাস সাবাস তোর, শ্বশুরের ভঙ্গী;

বাছা! ভল্লুক যদি হয় তোর শ্বশুর, কেন মর্যাদার কসুর,
শ্বশুর তোর পশুর শ্রেষ্ঠ হয়, আমার এক কথায় সংশয়।
ফুতফুতায় রাগের ভরে, কুতকুতায় ভাল্‌কে জ্বরে,
ওটায় কেতকুতায়ে মানুষ মারে, তাই দেখে আমার করে ভয়॥

'ভল্লুকের কবি' গাওয়া শেষ করে নকুলেশ্বর দলসহ বাইরে এলেন। কুঞ্জবাবু বললেন—কি হে নকুল, বাইরে এলে কেন?

নকুলেশ্বর—কবি তো গেয়ে এলাম।

কুঞ্জবাবু—ভারি তো দিগ্বিজয় করে এলে! বিপক্ষে হরকুমার সরকার মশাই কি জবাব করেন তোমার শোনবার বুঝি প্রয়োজন নেই। মনে রেখো, তোমার বিপক্ষে যদি কেউ এই গানটি করে তবে তার কি উত্তর করবে সেজন্য নিজেরও সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। নিজে যে প্রশ্নের উত্তর জান না কখনো কারো কাছে সে প্রশ্ন করবে না। কাজেই তিনি কি জবাব করেন তা না শুনলে শিখবে কি করে?

কুঞ্জবাবুর তিরস্কারে নকুলেশ্বর খুব লজ্জিত হলেন। তাড়াতাড়ি আসরে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে হরকুমারবাবুর দল আসরে প্রবেশ করল। সকলের পেছনে হরকুমারবাবু।

সৌম্য দর্শন, কাঁচা পাকায় মিশানো চুল, বেশ পরিপাটি করে সিঁথি কাটা, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরনে; গলায় একখানা গরদের চাদর—ফুটফুটে চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং—দেখলে ভক্তিতে আপনি মাথা নুইয়ে আসে। আসরে আসামাত্র নকুলেশ্বর তাঁর চরণে প্রণাম করতেই তিনি নকুলেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—গুরু-কৃপা লাভ হোক।

হরকুমার বাবু প্রথমেই সেই ভল্লুকের কবিখানার জবাব দিতে লাগলেন—

তুমি কল্পনাতে অক্রুর খুড়ো, আমি হই কৃষ্ণ পীতবাস।
তুমি যজ্ঞ সভায় দেখে শ্বশুর জাম্বুবানের রূপ,
বেয়াই বলে খুব, করলে উপহাস॥

বললে, ভল্লুক নাকি আমার শ্বশুর,
এ কথায় কসুর কিছু নাই, যেদিন পাতাল পুরে যাই।
স্যামন্তক মণির তরে, গিয়ে ভল্লুকের ঘরে,
আমি জাম্বুবতী বিয়ে করে, হয়েছি ভল্লুকের জামাই॥

করে দেব দানব গন্ধর্ব এসে, ঋক্ষরাজ ভল্লুকের আদর,—
আমার শ্বশুরের কি দর।
তুমি তো দীনভিখারী, ভিক্ষা লও বাড়ী বাড়ী,
হয়ে সামান্য আদার বেপারী, নিতে চাও জাহাজের খবর॥

বললে, ভল্লুকের গায় লোম্বা ভরা
তাই দেখে তোমার করে লাজ,
ওটা শ্বশুর মশাইর সাজ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী মিলে, দুরন্ত শীতের কালে,
তোমরা ঢুকলে বেয়াইর লোমের তলে, সারিবে ভোট কম্বলের কাজ।

তুমি বয়সে বুড়ো অক্রুর খুড়ো, এসেছ প্রভাস যজ্ঞেতে—
কেবল আমার ভাগ্যেতে।
দুই বেয়াইর বলিহারি, শ্বশুরের লোম্বা ভারী,
আবার খুড়ো মশাইর লম্বা দাড়ী, মিলেছে যোগ্যে যোগ্যেতে॥

বললে, ভ্রূকুটি দেয় কিটমিটায়ে তাই দেখে বাঁচনা ডরে,
পেয়ে বেয়াইকে ধারে।
শ্বশুর মোর বড় রঙ্গী, পেয়েছে যোগ্য সঙ্গী,
তাইতে মুখটা অমন করে ভঙ্গী, সে একটু রঙ্গরস করে॥

বললে, ভল্লুক শ্বশুর কুলীন বেশী, জানোয়ারগঞ্জের ব্যানার্জী,
ভাল দেখালে আর্জি।
কুলীন বেয়াইকে ধরে, নিয়ে যাও তোমার ঘরে,
ও বেশ উকুন বেছে দিতে পারে, যদি হয় বেয়াইনের মর্জি॥

সভায় জাঁকিয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে—
এসেছে ভদ্র সভায় ভদ্র বেশে, জানে সে ভদ্র লোকের মান।
ও যে রামের মন্ত্রী ষড়যন্ত্রী বুড়া জাম্বুবান॥
তাইতে পাছে রেখে তাকিয়া, বসল সভায় জাকিয়া,
তোমার ডোর কৌপ্‌নীর বহর দেখিয়া,
রাগ করে রক্ত-চক্ষু করে চায়।

জাননা অক্রুর খুড়ো, ও যে তোমারও এক যুগের বুড়ো,
প্রণাম কর পায়॥

নকুলেশ্বর জবাবখানা লিখে নিলেন। আসর থেকে হরকুমার সরকার মশাইর প্রতি আদেশ হল—আপনিও একখানা "লহর কবি" গাওয়ান। নকুলেশ্বর গানটা শুনতে উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন।

হরিদাস-হবিবুল্লা কাজীর 'কবি' ও জবাব

হরকুমার বাবুর দল বরিশালের কবিয়াল শ্রীহরিচরণ নাথ (সরকার) রচিত "হরিদাস-হবিবুল্লা কাজীর কবি" নামক গানটি গাইতে লাগল। গানখানার মর্মার্থ হল—কল্পনায় হবিবুল্লা কাজী যেন যবন হরিদাসকে বলছেন—

(ক) তুই হরিনাম করিস্ কেন?
(খ) সেলাম ছেড়ে দণ্ডবৎ করিস কেন?
(গ) নামাজ রোজা ছেড়ে দিয়ে দিন রাত নাম-কীর্তন করিস কেন?
(ঘ) মুরগী ছাগী কোরবাণী দিলে বেহ্স্ত্ পাবি—তা না করে ভেক নিয়ে বৈরাগী হলি কেন?
(ঙ) মাথা মুড়ায়ে করঙ্গ ধারণটা কোন্ ধর্ম?
(চ) নানীকে দিদি বলিস কেন?
(ছ) তোদের ঐসব আউল-বাউল দরবেশ নাড়া, সব বেটা গাঞ্জা-খোর।
(জ) তুই মরলে বৈষ্ণবেরা তোকে খাড়া করে মাটি দিবে, তার চেয়ে মুসলমানের কবর কত ভাল।
(ঝ) লুঙ্গী ছেড়ে কপ্নী পরেছিস্ কেন?—ইত্যাদি রহস্যপূর্ণ কবিখানা গেয়ে গেলেন।

নকুলেশ্বর গানখানির প্রশ্ন-জড়িত পদগুলি লিখে নিয়ে কুঞ্জবাবুকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভল্লুকের কবির কি জবাব করলো শুনেছ?

নকুলেশ্বর—আজ্ঞে হ্যাঁ শুনেছি। আমি লিখে রেখেছি।

কুঞ্জবাবু—বেশ করেছ। জবাবটি তোমার খাতায় লিখে রাখ; প্রয়োজন হলে তখন কাজে লাগবে।

নকুলেশ্বর—আমিও ওর একখানা জবাব মনে মনে করে রেখেছি।

কুঞ্জবাবু—তাই নাকি! কই বলতো শুনি।

নকুলেশ্বর—প্রথম চিতান থেকে স্বরচিত জবাব বলতে লাগলেন—

১। তখন অক্রুর মুনির বাক্য শুনে, দুঃখে কয় সে দ্বারকানাথ।
তুমি বয়সে বুড়ো অক্রুর খুড়ো, স্বধর্মেতে মন,
কেন অকারণ, মারতে চাও মোর জাত ॥

২। একটা ভল্লুক হলো আমার শ্বশুর, তা দেখে তোমার মনে দুখ্ ;—
শোন এই বিয়ের কৌতুক।
স্যামন্তক মণির তরে, গিয়ে সেই পাতাল পুরে,—
আমি জাম্বুবতী বিয়ে করে,
সেই মণি পেয়েছি যৌতুক ॥

৩। তাইতে ভল্লুক হলো আমার শ্বশুর, বিয়াই হয় তোমার,
এখন ছেড়ে দিয়ে জাতির গুমর,
বিয়াইকে আদর করে ঘরে নেও।
চার ঠ্যাঙে জড়িয়ে ধরে, যদি লেঙ্গুর দিয়ে বাতাস করে,
কত শান্তি পাও ॥

৪। আমার শ্বশুরের গায় লোম্বা ভরা,
দেখে তোমার চক্ষু ছানাবড়া,
লোম দেখে তুমি হলে ভীত,
তোমায় বিয়াই'র সঙ্গে কোলাকুলি, করতে হবে কত।
তখন লোমগুলা করবে ফুর্‌ফুর্‌, অশান্তি হবে প্রচুর,
তাহার লোম্বাগুলা করিতে দূর,—
ক্ষুর ধরে বেশ করে কামায়ে লও।
নিয়ে মোর খুড়ীর ঘরে আদরে বসাও ॥

৫। যত ছেলেপিলে ঢিলে মারে, তা দেখে তুমি দুঃখ পাও,—
একটু কৃপাদৃষ্টে চাও।
দুষ্ট ছেলেদের ভীড়ে, না রেখে প্রভাস তীরে,
নিয়ে মান্যমান এই অতিথিরে,
খুড়িমার অন্দরে বসাও ॥

৬। ওটা ভ্রূকুটি দেয় কিটমিটায়ে, তাই তোমার ডরে ধরেছে,—
উহার মনে পড়েছে।
স্বজাতির সঙ্গে থেকে, রসরঙ্গ করতো সুখে,
তোমার দাড়ীগোঁফের বহর দেখে,
জ্ঞাতি ভাই মনে করেছে॥

৭। ওটায় কেতকুতায়ে মানুষ মারে, তাই দেখে উঠলে শিহরি,—
আমার খুড়ীমা বুড়ি।
বিয়াইকে নিয়ে রঙ্গে, রাখ তোমার সঙ্গে,
যেন ফাঁক পেয়ে বিয়াইনের অঙ্গে,
আবার সে না দেয় সুড়সুড়ি॥

জবাবখানা শুনে কুঞ্জবাবু সহাস্যে নকুলেশ্বরকে বললেন—বেশ জবাব হয়েছে; আর তোমার লিখে রাখা দরকার হবে না। এখন হরকুমারবাবু যে 'কবি' খানা গাইয়েছেন তার জবাব কি কিছু চিন্তা করেছ?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ, একটু চিন্তা করেছি। তবে আপনি একটু আভাষ দিলে আমি কোন প্রকারে কাজ চালিয়ে আসতে পারি।

কুঞ্জবাবু—গানটি যখন ভক্ত হরিদাসের উক্তিতে গীত হয়েছে তখন ভক্ত স্বভাব বজায় রেখে এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জবাব দিতে হবে। যাও, আর সময় নেই, আসরে গিয়ে যা হয় কর। ভয় নেই, আমি তো পেছনে আছি। আর গানের জবাব শেষ করেই টপ্পা-পাঁচালী আরম্ভ করতে হবে।

নকুলেশ্বর—আশীর্বাদ করবেন যেন আপনার মুখ রক্ষা করতে পারি।

নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে 'হরিদাস-হবিবুল্লা কাজীর কবি'র জবাব দিতে আরম্ভ করলেন—

১। তখন হবিবুল্লা কাজীর বাক্যে, দুঃখে বলে হরিদাস।
হরিনামে মত্ত হলে চিত্ত, মিলে নিত্যধাম—
তাইতে হরিনাম, করি বার মাস॥

২। বললে, সেলাম ছেড়ে, কিসের তরে,
দণ্ডবৎ কর বারে বার—
নিলেম বৈষ্ণবের আচার।

দণ্ডবৎ সাধুর চিহ্ন, প্রণাম সেলাম অভিন্ন,
যেমন এক জলের নাম ভিন্ন ভিন্ন,
জল পানি অপ্‌ আর ওয়াটার ॥

৩। বললে, চাঁচর কেশ মুড়ায়ে মাথা, করেতে নিলে করঙ্গ—
এসব কোন্‌ ধর্মের অঙ্গ ?
চাঁচর কেশ মুড়ো মাথা, অঙ্গেতে ছেঁড়া কাঁথা,
আমায় শিক্ষা দিলেন এই দীনতা,
প্রেমদাতা দয়াল গৌরাঙ্গ ॥

৪। আমি নানীকে আজ দিদি বলি,
ডাকে কিছু যায় আসে না—
ও সব দু'দিনের চেনা।
যত সম্পর্কের খেলা, বিভিন্ন ছাঁচে ঢালা,
যেমন তার বাজু অনন্ত বালা,
গলাইলে সবই এক সোনা ॥

৫। আমি ত্যাগ করিয়ে রোজা নামাজ, হরি নাম লই দিবানিশি—
তাতে কিসে হই দোষী।
যে বস্তু যার উপাস্য, তারে সে পায় অবশ্য,
যেমন যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥

৬। বললে, লুঙ্গী ছাড় কৌপ্‌নী পর,
এ তোমার কোন্‌ ধর্মের স্বভাব—করতে পরমপতি লাভ।
ভজিতে পীতবাসে, সাজতে হয় নারীর বেশে,
সেজে ডোর কৌপীন আর বহির্বাসে, নিয়েছি ব্রজগোপীর ভাব ॥

৭। আবার আউল-বাউল-দরবেশ যত,
সবারে গাঁজাখোর বানাও—একটু নিজের পানে চাও।
বাউল সব সিদ্ধির জোরে, লাভ করে সিদ্ধেশ্বরে,
তোমরা পচা পান্তার জাবান করে,
কোন্‌ নেশায় কাজীর পানি খাও ॥

৮। আমায় খাড়া করে, গাড়ার চেয়ে,
কবরে দিতে চাও নাকি—মরার এখনো বাকী।
প্রাণপাখী গেলে উড়ে, শবদেহ থাকে পড়ে,
তারে গাড়ে পোড়ে দেয় কবরে,
মড়ার আর ভাল মন্দ কি ?

৯। আমি কাম-কামনা ভোগ-বাসনা পরিহরি—
আমার ভেকের গুরু গৌর হরি,
হবেন সেই ভবপারের কর্ণধার।
হিংসায় না আল্লা পাবে,
বরং চিরতরে বন্ধ হবে, বেহেস্তের দুয়ার ॥

১০। বললে, কাজ কি হয়ে ভেক বৈরাগী,
কোরবাণি দিতে বল মুরগী ছাগী,
আমরা তো ধারিনা তার ধার—
জানি অহিংসা পরম ধর্ম বৈষ্ণবের আচার।
শুনি ইব্রাহিম অকপটে, নিজ হাতে পুত্র কাটে,
ওসব মুরগী ছাগী কেটে কেটে,
করোনা দোজ্‌খের পথ পরিষ্কার।
বৈষ্ণব নিন্দা অপরাধ, প্রায়শ্চিত্ত নেই তার ॥

নকুলেশ্বর বনাম হরকুমার শীল

জবাব দেওয়া শেষ হতেই নকুলেশ্বর আসরের গণ্যমান্য শ্রোতাদের নিকটে জানতে চাইলেন যে তিনি টপ্পা শুরু করবেন কিনা। শ্রোতৃবর্গ একবাক্যে 'তাই হোক' বলে সম্মতি জানালে তিনি সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিষয়টি নিয়ে রচিত টপ্পার সুরের পদগুলি গাওয়াতে লাগলেন। সরলা আসরের আগে আর মানদা পেছনে—মাঝখানে দাঁড়িয়ে নকুলেশ্বর পদযোজনা করে দিতে লাগলেন—

আমি কল্পনায় জৈমিনী মুনি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
কেন দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি, আর কেন পঞ্চ সন্ততি,
জানতে গেলাম সম্প্রতি, মার্কণ্ডের সদন ॥

মুনি মার্কণ্ড বলিলেন আমায়, যাও তুমি মুনি শমীকের ভবন—
তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে পক্ষী আছে চারিজন।
ও সেই মার্কণ্ডের আদেশ ক্রমে, শমীক মুনির আশ্রমে,
তোমাদের পেলেম দরশন।
তোমরা পক্ষীদেহী নরভাষী—
কও শুনি কোন্ গোত্র কাহার নন্দন॥

টপ্পার লহরটি শেষ করে নকুলেশ্বর ডাক-ছড়া আরম্ভ করলেন—

আমি কল্পনায় জৈমিনী মুনি লোকের কাছে তত্ত্ব শুনি
মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
ভারতে লিখেছেন তত্ত্ব দ্রৌপদী সতীর সতীত্ব
দেখে আমার সন্দিগ্ধ হয় মন॥
পঞ্চ পতি নিয়ে সঙ্গে যিনি বেড়ায় রাঢ়ে বঙ্গে
কেমন করে সতীসাধ্বী হয়।
সতীত্ব দেখাবার তরে তিনটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে
ভারতে দিয়েছেন পরিচয়॥
ঋতুবতী গাভীর পাছে পাঁচটি বৃষ ছুটিতেছে
তাই দেখিয়ে দ্রৌপদী হাসিল।
গাভী পেয়ে মনস্তাপ দিয়েছিল অভিশাপ
তাইতে নাকি পঞ্চপতি হল॥
দ্বিতীয় কারণ লিখেছে ভক্তি করে শিবের কাছে
'পতিং দেহি' বলে পঞ্চবার।
তথাস্তু বলিয়ে বাক্য দিয়েছিলেন বিরূপাক্ষ
তাইতে নাকি পঞ্চপতি তার॥
তৃতীয় কারণের কথা, বাক্য দেয় সে কুন্তীমাতা
লক্ষ্য বিঁধে দ্রৌপদীকে পায়।
ফল বলিল মায়ের স্থানে ভাগ করে খাও পঞ্চজনে
অনুমতি দিলেন নাকি মায়॥
এই তিনটি কারণের তরে পঞ্চপতি বিহার করে
শুনে শুদ্ধ হয় না আমার মন।

সন্দেহ ছিল অন্তরে মূল তত্ত্ব জানিবার তরে
গিয়েছিলাম মার্কণ্ডের সদন ॥
মার্কণ্ড বলেন আমারে যাও তুমি শমীকের ঘরে
তত্ত্বজ্ঞানী পক্ষী চারিজন।
তার আশ্রমে বিরাজ করে, প্রশ্ন গিয়ে কর তারে
করবে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন ॥
মার্কণ্ডের আদেশ ক্রমে এসে শমীকের আশ্রমে
তোমাদের পেলেম দরশন।
পক্ষী-দেহী নর-ভাষী কে তোমরা কোন্ ছদ্মবেশী
যোগী ঋষি কিংবা দেবগণ ॥
বল তোমরা কাহার পুত্র কিবা জাতি কিবা গোত্র
কোথায় করলে শাস্ত্র অধ্যয়ন।
সর্বশাস্ত্র পারদর্শী কোন যোগী না কোন মহর্ষি—
বলে কর সন্দেহ মোচন ॥
তারপরে দ্রৌপদীর তত্ত্ব আমার কাছে বল সত্য
কেন তাহার পঞ্চ পতি হয়।
পূর্বোক্ত তিন কারণ বিনে অন্য কারণ কি গোপনে
জান যদি বল সমুদয় ॥
দ্রৌপদীর যে পঞ্চ ছেলে অকালে পঞ্চত্ব পেলে
কি পাতক করিয়ে সঞ্চয়।
কোথা হতে এসেছিল কোথায়ই বা চলে গেল
খুলে বল তত্ত্ব সমুদয় ॥
এ সকল বৃত্তান্ত কথা জানব বলে এলেম হেথা—
কর আমার বাসনা পূরণ।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করে ধুয়ারভাবে সূত্র ধরে
আরও কিছু করিব বর্ণন ॥

(ধুয়া) আমার হৃদয়-পিঞ্জরে বসে মন-পাখী হরি বলনা।
ও তোর গোণা দিন ফুরায়ে এল,
হরিনাম বলার সময় হল না ॥

আশা করে রেখে পিঞ্জিরায়,
বুট ছাতু আর মাখন ছানা খাওয়ালেম তোমায়।
তবু বনের পানে মন যেতে চায়—
জংলা স্বভাব আর গেল না॥
ভেবেছিলাম খেয়ে দুধ-কলা,
খাঁচায় বসে এই হরিনাম বলবি তিন বেলা।
দেখি নাম নিতে তোর অবহেলা—
পাখী তোর স্বভাব ভাল না॥
এখনও তুই ভেবে পরিণাম,
দিন থাকিতে রসনাতে বল হরিনাম।
এত করে শিক্ষা দিলাম,—
তবু নামে মন গলে না॥
মন শিক্ষায় নাই আর প্রয়োজন,
কল্পনাতে আমি হলেম জৈমিনী ব্রাহ্মণ।
শুনতে ভারতের বিবরণ—
অন্তরে হল বাসনা॥
'পঞ্চ লিঙ্গে ভবেৎ বেশ্যা' কয়,
পাঁচ পতি করে দ্রৌপদী কিসে সতী হয়?
প্রাতঃকালে নাম কেন লয়—
কোন্ গুণে পাতক থাকে না॥
পূর্বজন্মে না থাকিলে পাপ,
পুত্রশোকে কেন সতী পেল মনস্তাপ?
তাদের প্রতি এই অভিশাপ—
কে দিয়েছে তাই বল না॥
(পয়ার) দ্রৌপদীর সেই পঞ্চ পুত্র পূর্বে কোথা ছিল,
কার অভিশাপে তারা মর্ত্যলোকে এল।
শাপভ্রষ্ট চন্দ্র ছিল অভিমন্যু বীরে,
চন্দ্রলোকে চলে গেল কুরু যুদ্ধে মরে।
দ্রৌপদীর সেই পঞ্চপুত্র কিবা পাতক করে,
বিনাযুদ্ধে অশ্বত্থামা কি কারণে মারে।

গুণী জ্ঞানী ভদ্র বিজ্ঞ সভায় আছেন যারা,
নকুলের দণ্ডবৎ গ্রহণ করবেন তারা।
গুরুপদে প্রণাম করে আমি সাঙ্গ করি,
মনানন্দে সবে মিলে বলুন হরি হরি॥

এই বলে নকুলেশ্বর পাঁচালী শেষ করে বাইরে এসে দেখেন, কুঞ্জবাবু অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। নকুলেশ্বর এসে প্রণাম করলেন। তিনি বললেন—পাঁচালী বেশ ভালই হয়েছে, তবে বিষয়টি বড় জটিল হয়ে গেছে। একটা ভক্তিমূলক আলোচনা করাই উচিত ছিল। যাক এখন যাও, তুমি বিশ্রাম করগে। আমি টপ্পার জবাবটা শুনে আসি।

নকুলেশ্বর বাসাঘরে গিয়ে বসলেন; কিন্তু তার শরীর খুব অসুস্থ বলে মনে হল। তিনি যামিনী নন্দীকে বললেন—দাদা, আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। যামিনী নন্দী তার গায়ে হাত দিয়ে বলল—তোমার শরীর বেশ গরম, আবার জ্বর উঠতে পারে। হাতমুখ ও মাথা ধুয়ে ফেলে একটু শুয়ে থাক।

নকুলেশ্বর শুলেন বটে কিন্তু তার মনটা সুস্থ নেই। কি যেন একটা অজানা আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লেন। কুঞ্জবাবু টপ্পার জবাব শোনবার জন্য আসরের কাছে আছেন। নকুলেশ্বর বিছানায় শুয়েই শুনতে পেলেন, হরকুমার সরকার মহাশয় আসরে উঠে টপ্পার উত্তর দিতে আরম্ভ করেছেন—

অদ্ভ আজগুবি এক টপ্পা শুনে বেহাল হয়েছি।
আমি ভাব রসের বিষয় নিয়ে,
আজীবন কবিগান গেয়ে,
ভক্ত সমাজে গিয়ে সুনাম পেয়েছি।
আমার শেষ জীবনে কবিগানে,
আজ একটা খট্‌কা প্রশ্ন শুনতে পাই—
কোন পুরাণের প্রশ্ন হয়, সে বিষয় আমার জানা নাই!
যেমন লবকুশের তীক্ষ্ণ শরে, রামচন্দ্র গেলেন হেরে—
আমারও দশা হল তাই।
আমি বৃদ্ধকালে পরাণ খুলে, তোমাকে আশীর্বাদ করিয়ে যাই॥

(ডাকছড়া) তুমি নাম ধরে জৈমিনী মুনি করেছ যে প্রশ্নখানি
শুনে আমি বড় লজ্জা পাই।
ব্যাস মুনির ভারত লেখা আমার তাহা আছে দেখা
অন্য গ্রন্থ আমি দেখি নাই॥
যে তিনটি কারণের তরে পঞ্চপতি গ্রহণ করে
যাজ্ঞসেনী দ্রুপদ নন্দিনী।
সেই তিনটি কারণ বিনে অন্য কারণ এ ভুবনে
কারো মুখে কভু নাহি শুনি॥
অন্য অন্য কবি যারা সত্য মিথ্যা বলে তারা
আসর জয়ের করে অভিনয়।
কিন্তু আমি এ জীবনে যা দেখি নাই নিজ নয়নে
মিথ্যা বলে নিতে চাইনা জয়॥
হরি কথা কৃষ্ণ কথা তাই দিয়ে যথাতথা
করে থাকি ভাবের আন্দোলন।
তোমরা যত নব্য ছেলে মানুষকে ঠকাবে বলে,
খট্‌কা শাস্ত্রের আছে প্রয়োজন॥
প্রাচীন প্রাচীন কবি যারা ধর্মকথা দিয়ে তারা
মুগ্ধ করেন ভক্ত শ্রোতাগণ।
জানা বিষয়ের ভিতরে কে কেমন রস সৃষ্টি করে
শ্রোতারা তাই করিত গ্রহণ॥
আমিও সেই প্রাচীন দলে অ'চিন কথা কারে বলে
এ জীবনে আমার জানা নাই।
কৃষ্ণ-কথা বলে বলে ভেসে ভেসে নয়ন জলে
পাই যেন সেই যুগল কানু-রাই॥
আশীর্বাদ করি তোমারে আমার মতো এমনি করে
কারোরে করোনা নাজেহাল।
কৃষ্ণ কথায় লোক মজাইও মহতের আশীর্বাদ লইও
সুখে যাবে ইহ-পরকাল॥

(ধুয়া) মন তোর দেহঘরে চোর ঢুকেছে রে—
ঘরের দরজা খোলা পাইয়া।
ও সে জাগা-ঘরে চুরি করে রে--
বাঁশের সাত-ঘরা বাঁশী বাজাইয়া ॥
তুচ্ছ চোরে চুরি করে, যখন গৃহী থাকে ঘুমের ঘোরে—
আবেশে চেতনা হারাইয়া।
সিঁদ কেটে ঢুকিয়ে ঘরে রে—
ঘরের সকল লয়ে যায় পলাইয়া ॥
এই চোরের এক বাহাদুরী, জীবের দ্বিদল পদ্মে তের জুড়ি-
মাল কোঠায় মালের সন্ধান পাইয়া।
ও সে সিঁদ না দিয়ে ঘরে গিয়ে রে—
শেষে পালায় ঘরের মালিক লইয়া ॥
অনুরাগের চৌকিদারে, এ চোরকে ধরিতে পারে—
রূপগঞ্জের পরগণাতে যাইয়া।
শেষে জ্ঞানবাবুর বিচারে চোরে রে—
জীবেরে ভক্তি জেলে দেয় পাঠাইয়া ॥
কবির কাব্য অনুসারে, তুমি জৈমিনী মুনি নাম ধরে—
পরিচয় দিয়েছ আসিয়া।
কেন দ্রৌপদীর হয় পঞ্চপতি গো—
সে তো নিজেই গেলে বলিয়া ॥
গাভীর শাপ আর মাতৃবাক্য, বর দিয়েছেন বিরূপাক্ষ—
এই তিনটি কারণের লাগিয়া।
হল যাজ্ঞসেনীর পঞ্চ পতি গো—
এই তো ব্যাস মুনি দিলেন লিখিয়া ॥
ব্যাসমুনি শাস্ত্রপ্রণেতা, লিখে গেছেন যে বারতা,
তাই আমরা নিয়েছি শিখিয়া।
তুমি কোন পুরাণে কি দেখেছ গো—
ওটা তুমি বাছা পড় গিয়া ॥
মধুলুব্ধ ভ্রমর যারা, মধু খুঁজে বেড়ায় তারা—
তৃপ্ত হয় পদ্ম-মধু পাইয়া।

কিন্তু পচা ঘায়ের মাছি হলে গো—
তারা বেড়ায় পচা ঘা খুঁজিয়া ॥
আমরাও এই জনম ভরে, মধুর তালাশ করে করে—
ঠেকেছি তিনকালে আসিয়া।
তোমরা কুট খুঁজিয়ে কুটিল হয়ে গো—
শেষে মরবে বোলতার কামড় খাইয়া ॥

(পয়ার) অধ্যাত্ম ভারতের কথা করহে শ্রবণ,
কর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রাখিও স্মরণ।
ধর্ম আর অধর্মে সদা করে থাকে রণ
ধর্ম হল যুধিষ্ঠির আর অধর্ম দুর্যোধন।
বিবেক আর বৈরাগ্য হল ভীষ্ম আর বিদুর,
ধর্ম রথের সারথি সেই গোবিন্দ ঠাকুর!
মন্দমতি অন্ধ রাজা সর্বনাশের মূল,
দুঃখ-রূপী অক্ষ চালক শকুনি মাতুল।
যজ্ঞরূপা যাজ্ঞসেনীর ক'রে নির্যাতন,
অধর্ম দুর্যোধন হল স্ববংশে নিধন।
পঞ্চ পাণ্ডব হল পঞ্চ যজ্ঞের মূরতি,
পঞ্চযজ্ঞের সেবা করে যাজ্ঞসেনী সতী।
কুটিল পথে চলতে গেলে আছাড় খেতে হয়
সরল পথে সরল মতে চলো সব সময়।
এই পর্যন্ত বরে ক্ষান্ত পালা সাঙ্গ করি—,
জয় পরাজয় গোবিন্দ পায় বল হরিহরি ॥

এই বলে হরকুমার সরকার এমন সুন্দর ভাবে মূল প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করে গেলেন যে আসরের কোন শ্রোতা তার প্রতিবাদ করবার অবসর পেলেন না। কেননা, তিনি যা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। আগের দিনের প্রাচীন কবিয়াল 'সরকারগণ' শুধু রামায়ণ-মহাভারত-হরিকথা-কৃষ্ণ কথা নিয়েই আলোচনা করতেন। অন্যান্য শাস্ত্র পুরাণাদি পড়া বিশেষ প্রয়োজন মনে করতেন না। এমন কি কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য মহাশয়ও ঐ পথের পথিক ছিলেন তাঁরা শুধু রসের সৃষ্টি করেই শ্রোতার মন জয় করেছেন, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, কুট কাটিল্যের ধার ধারেন নি। তথ্যের

তত্ত্বের উপর তাঁরা জোর দিতেন বেশি—ভাবরসের সুষ্ঠু পরিবেশনে শ্রোতার মন ভিজিয়ে আসর মাৎ করতেন। কাজেই নকুলেশ্বর মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে কুটিল প্রশ্ন হরকুমারবাবুর উপর চাপান দিলেন তার জবাব অজ্ঞাত থাকারই কথা।

গুরুদেবের তিরস্কার—হরকুমার শীলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

নকুলেশ্বর শারীরিক অসুস্থতার দরুণ আসরে টপ্পার জবাব শুনতে যেতে পারেন নি। কুঞ্জবাবু জবাব শুনে এসে একটু বিরক্তি সহকারেই নকুলেশ্বরকে বললেন—এভাবে কূট প্রশ্নের অবতারণা করে সম্মানী মানুষের মান নষ্ট করার পরামর্শ তোমাকে কে দিয়েছে? মনে করেছ মানুষকে অপদস্থ করতে পারলেই বুঝি 'কবি' হওয়া যায়। সাবধান, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর কখনো করবে না—এই আমার আদেশ; চিরদিন স্মরণ রেখে চলবে।

নকুলেশ্বর নির্বাক হয়ে গুরুদেবের তিরস্কার শুনলেন। পরে বললেন—বাবা এটা আমার দোষ নয়। গত সন্ধ্যায় কয়টি যুবক এসে আপনার নিকট আর্জি পেশ করেছিল যে কঠিন প্রশ্নের অবতারণা করে যেন হরকুমার শীলকে হারিয়ে দিই—তার থেকেই এই অনর্থ সৃষ্টি।

কুঞ্জবাবু—তারা কি তোমাকে এই বিষয়বস্তুটাও বলে দিয়েছিল না কি? শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করোনা।

নকুলেশ্বর—না, তারা বিষয়বস্তু বলেনি বটে, তবে নতুন ও শক্ত কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করবার জন্য অনুরোধ করেছিল। লোভ সম্বরণ করতে না পেরে আপনাকে না জানিয়ে আসরে গিয়ে প্রশ্ন করে ফেলেছি। আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন।

কুঞ্জবাবু - আমি ক্ষমা করবার কে? যার কাছে অন্যায় করেছ তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।

নকুলেশ্বর আর কাল বিলম্ব না করে অসুস্থ শরীর নিয়েই হরকুমারবাবুর বাসা ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে বললেন—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি বড় অন্যায় করেছি।

হরকুমারবাবু নকুলেশ্বরকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে বললেন—না না, তুমি কি অন্যায় করেছ, কিসের ক্ষমা করবো?

নকুলেশ্বর—আমি কয়েকটি যুবকের পরামর্শে আপনার কাছে আজ এই

খটকা প্রশ্ন তুলে আপনার মনে ব্যথা দিয়েছি। এমন ভুল আমি জীবনে কখনো করবো না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

হরকুমারবাবু—না না, তোমার কোন ভুল হয়নি। তোমাদের এইতো সময়। নূতন সরকার হয়েছে, নূতন নূতন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নূতন নূতন বিষয়বস্তু সংগ্রহ করবে। যশঃ প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। না হলে বড় হবে কি করে? আমি একজন প্রাচীন কবি। আমি যে এ বিষয় কিছু জানি না, তা তো তোমার জানার কথা নয়। তোমার কর্তব্য তুমি করেছ। তবে কি জান বাবা, আমাদের যুগটা ছিল সরলতার যুগ। আমরা সহজ সরল বিষয় নিয়ে রসের সৃষ্টি করে রসিক শ্রোতাদের মনে আনন্দ পরিবেশন করেছি। এখন সে যুগও নেই, সে কালও নেই। জগতটাই বাঁকা পথে চলতে শুরু করেছে। কুটিল কাটিল্য কপটতা মিথ্যা প্রবঞ্চনা এ সকল হল এ যুগের পথের পাথেয় স্বরূপ। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এসব শিখতে হবে বৈ কি! নতুবা চলবে কি করে? তাই বলছি নূতন নূতন নানাবিধ শাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস কোরান বাইবেল অধ্যয়ন কর। কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়, ছোট নয়। সব গ্রন্থের সার সংগ্রহ করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে চির স্মরেণ্য ও বরেণ্য হও—এই আমি আশীর্বাদ করি।

মহৎ লোকের ক্ষমার মহত্ব দেখে নকুলেশ্বর অবাক হয়ে নিজে শত অপরাধী মনে করে লজ্জাবনত মস্তকে হরকুমারবাবুকে প্রণাম করে চলে এলেন।

অসুস্থ নকুলেশ্বর—গৃহে প্রত্যাবর্তন

বাসাঘরে এসে নকুলেশ্বর বিছানা করে সটান শুয়ে পড়লেন। দেখে সরলা জিজ্ঞাসা করল—কিগো অমন করে শুয়ে পড়লে কেন, কী হয়েছে?

নকুলেশ্বর—(ক্ষীণস্বরে) আমার শরীর খুব অসুস্থ। বুকে ভয়ানক বেদনা। মনে হয় খুব জ্বর এসেছে।

সরলা নকুলেশ্বরের গায়ে হাত দিয়ে বললে—ও মা, সত্যিই তোমার গায়ে খুব তাপ। হঠাৎ এমন জ্বর হল কেন?

নকুলেশ্বর—কি জানি কেন এমন হল। আপনি একটু দয়া করে গুরুদেবকে ডেকে আনুন।

সরলা তাড়াতাড়ি কুঞ্জবাবুকে ডাকতে গেল। নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবতে

লাগলেন হরকুমারবাবুর মনে ব্যথা দিয়েছেন বলেই হয়তো ভগবান তাঁকে এই শাস্তি দিচ্ছেন।

অনতিবিলম্বে কুঞ্জবাবু এসে নকুলেশ্বরের মাথায় হাত দিয়েই বললেন—সর্বনাশ, খুব জ্বর উঠেছে দেখছি!

নকুলেশ্বর—বাবা, আমি কথা বলতে পারি না। বুকে খুব বেদনা।

কুঞ্জবাবু—সরলা, তুমি ওর কাছে বসে একটু সেবাযত্ন কর। আমি দেখি কোন ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় কিনা। জ্বরটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

কুঞ্জবাবু কাছারীতে গিয়ে নায়েব বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে কি কোন ভাল ডাক্তার আছে? আমার ছেলেটার খুব জ্বর উঠেছে।

নায়েববাবু—আপনি যান। আমি এখনি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি।

নায়েববাবুর সঙ্গে ডাক্তার এসে নকুলেশ্বরকে পরীক্ষা করে বললেন—জ্বরের অবস্থা ভাল না। বুক পরীক্ষা করে মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা।

শুনে কুঞ্জবাবু খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বললেন—এমন দুর্গম জায়গা; কি করে আমি ওকে নিয়ে নৌকায় যাব। নৌকা রয়েছে অনেক দূরে, গৌরীপুর বাজার ঘাটে।

ডাক্তারবাবু—আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখি কি করতে পারি। এই ঔষধগুলি যথানির্দেশ মতো খাওয়াবেন; আর এই ঔষধটা খুব আস্তে আস্তে বুকে মালিশ করে একটু গরম সেঁক দেবেন।

দিনটা কোন রকমে কেটে গেল। সন্ধ্যার পরে আবার গানের আসর বসবে। কুঞ্জবাবু আজ বড় মনঃক্ষুণ্ণ। একে তো নকুলেশ্বরের জন্য চিন্তা, তার উপর আসরে গান বলা, জবাব করা, পাঁচালী বলা ও শোনা সবই আজ তাঁর নিজেকে করতে হবে।

নকুলেশ্বর কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন—বাবা, আজ আপনার বড় কষ্ট হবে। কিন্তু কি করবো আমার কথা বলবারও ক্ষমতা নেই। হঠাৎ এ রকম স্বরভঙ্গ হয়ে গেল কেন? আমি বুঝি জীবনে আর গান গাইতে পারব না?

কুঞ্জবাবু—ছিঃ ছিঃ ও কি কথা! তুমি শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে। ভয় কি? আজ রাত্রে গান শেষ করে আমরা আগামী দিন নৌকায় যাব। তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।

নকুলেশ্বর—বাবা, হয়তো আমি সুস্থ হয়ে উঠবো ; কিন্তু শ্রদ্ধেয় হরকুমার বাবুর গান পাঁচালী শোনবার বড় বাসনা ছিল। সে আশা পূর্ণ হল না। এ জীবনে আর সে সুযোগ পাব কিনা কে জানে ? এই আমার দুঃখ।

সন্ধ্যার পর আসরে গান আরম্ভ হলো। তবে কি গান, কি জবাব বা টপ্পা-পাঁচালী হয়েছে তার কিছুই নকুলেশ্বর জানতে পারেন নি।

পরদিন গান শেষ করে কুঞ্জবাবু বিদায়ের টাকা পয়সা নিয়ে নায়েববাবুকে বললেন—এখন তাড়াতাড়ি আমাদের যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

নায়েববাবু তৎক্ষণাৎ একটা খোন্দা নৌকা ও চারজন মাঝি মাল্লার ব্যবস্থা করে দিয়ে বললেন—আপনারা সকলে গিয়ে নৌকায় উঠুন। জলের যা কারেণ্ট অল্প সময়ের মধ্যেই এই খোন্দা নৌকা কুমিল্লায় গিয়ে পৌছবে।

মাঝিরা নৌকা খুলে দিল। নকুলেশ্বর জ্বরে অচৈতন্য। রাত এগারটা নাগাদ নৌকা কুমিল্লার ঘাটে পৌছল। রাত্রে পূর্ব পরিচিত হোটেলে থেকে পরদিন সকালে চারখানা ঘোড়ার গাড়ী করে নকুলেশ্বরকে নিয়ে গৌরীপুর বাজার ঘাটে পান্‌সীতে এসে পৌছলেন।

সরলার অক্লান্ত সেবা—আরোগ্য লাভ

তার পরের দিন সকাল বেলা নকুলেশ্বর চোখ মেলে দেখলেন শেখ সরলা তার শিয়রে বসে কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। তিনি ক্ষীণস্বরে সরলাকে বললেন—আপনি আমার জন্য এত কষ্ট করে আমাকে ঋণী করছেন কেন ?

সরলা—তুমি কথা বলো না, চুপ করে থাক। ডাক্তার তোমার মাথায় জলপট্টি দিতে বলেছে। এতে আবার ঋণ করার মত কি হলো ? আগে সেরে ওঠো, তারপর ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করলেই চলবে।

নকুলেশ্বর কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না ; বুকে অসহ্য বেদনা। ইঙ্গিতে সরলাকে বললেন—বাবা কোথায়, তাঁকে একবার ডেকে দিন।

সরলা তাড়াতাড়ি কুঞ্জবাবুকে ডাকলেন। তিনি এসে নকুলেশ্বরের বুকে হাত দিয়ে বললেন—কেমন লাগছে ?

নকুলেশ্বর অতিকষ্টে বললেন—বাবা, আমি কথা বলতে পারছি না কেন ? আমার স্বরভঙ্গ হয়ে গেছে ; আমি বোধ হয় জীবনে আর গান গাইতে পারব না।

কুঞ্জবাবু—পারবে পারবে, খুব পারবে। অসুস্থ শরীরে দুই দিন জোর দিয়ে

আসরে কথা বলেছ; সেজন্য বুকে ব্যথা হয়েছে ও কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেছে। ওজন্য দুশ্চিন্তা করো না; শীঘ্রই সেরে যাবে।

নকুলেশ্বর কিন্তু সে কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না। ভাবতে লাগলেন—আমি মহতের অবমাননা করেছি। কতগুলি ছেলে ছোকড়ার কথা মতন আমি একটা কূট প্রশ্নের অবতারণা করে মাননীয় হরকুমার শীলের মতো ভক্ত-কবিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে অপদস্থ করেছি; তার মনে ব্যথা দিয়েছি। সেই অপরাধেই আমার স্বরভঙ্গ হয়েছে। গুরুদেবের কাছে শুনেছি—

আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধর্মং লোকানামাশিব মেব চ।

হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহতের মর্যাদা নষ্ট করে তার আয়ু সম্পদ যশ ধর্ম স্বর্গ কল্যাণ আকাঙ্ক্ষিত সব বস্তুই নষ্ট হয়। আমি সেই মহতের অবমাননা করেছি; মর্যাদাহানি করেছি; আমার এ পাপের কি আর মুক্তি আছে? এই সব কথা ভাবতে নকুলেশ্বরের দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে দেখে কুঞ্জবাবু বললেন—কাঁদছো কেন? খুব কষ্ট হচ্ছে? মনের কথা গোপন করে নকুলেশ্বর বললেন—হ্যাঁ, খুব কষ্ট হচ্ছে; আপনি আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিন।

নকুলেশ্বরের জ্বরের অবস্থা দেখে কুঞ্জবাবুও খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও দলের ম্যানেজার কেশববাবুকে ডেকে বললেন—নকুলের জ্বরের যে অবস্থা তাতে ওকে এভাবে রাখা উচিত হবে না; আজই তুমি ওকে নিয়ে রওনা হও। ওকে ওর মা বাবার কোলে না পৌঁছান পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

কেশববাবু বললেন—ওর যা অবস্থা তাতে ওকে নিয়ে আমার একা যেতে সাহস হচ্ছে না; আর একজনকে সঙ্গে দিন।

কেশববাবুর কথা শোনামাত্র সরলা কুঞ্জবাবুকে বললেন—আমিও ওর সঙ্গে যাব, তাহলে ওর কোন অসুবিধা হবে না; আপনি আমাকে যেতে আজ্ঞা করুন।

কুঞ্জবাবু সরলার প্রস্তাবে রাজী হয়ে বললেন—যেতে পারো; যত্নের সঙ্গে তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, তুমি আবার কেশবের সঙ্গে চলে আসবে।

গৌরীপুরের ঘাট হতে পান্‌সী খুলে গজারীয়া স্টেশনে এসে নোঙ্গর করলেন। দেশে যাবার প্রস্তুতি দেখে নকুলেশ্বর কেঁদে কেঁদে কুঞ্জবাবুকে বললেন—বাবা, আপনি আশীর্বাদ করুন শীঘ্র শীঘ্র রোগ মুক্ত হয়ে আবার যেন আপনার চরণে আশ্রয় নিতে পারি।

কুঞ্জবাবুও আর্দ্রকণ্ঠে নকুলেশ্বরকে আশীর্বাদ করে বললেন—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। কোন দুশ্চিন্তা করো না। ভগবানকে ডাক। তিনি মঙ্গলময় ; তোমার মনোবাসনা অবশ্য পূর্ণ করবেন।

রাত দু'টায় ঢাকা হতে বরিশালগামী মেল ষ্টিমার এসে গজারীয়া ঘাটে ভিড়ল। শেখ সরলা ও কেশববাবু নকুলেশ্বরকে নিয়ে ষ্টিমারে উঠলেন। দোতলায় বেশ করে বিছানা পেতে সরলা নকুলেশ্বরকে শুইয়ে দিল। নোঙ্গর তুলে হুইসল দিয়ে ষ্টিমার বরিশাল অভিমুখে রওনা হলো।

পরের দিন অপরাহ্ণ চারটায় ষ্টিমার এসে বরিশাল ঘাটে পৌঁছল। দুইজনে ধরে নকুলেশ্বরকে একখানা নৌকায় তুলে বরিশাল টাউন থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে নকুলেশ্বরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

বাড়ী গিয়ে পৌঁছতে রাত সাড়ে সাতটা বেজে গেল। নকুলেশ্বরকে ধরাধরি করে বাড়ীতে আনতে দেখে তার মা কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন। কেশববাবু তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—কাঁদছেন কেন ? ওর জ্বর হয়েছে আর কিছু নয়। ভয়ের কোন কারণ নেই। শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

নকুলেশ্বরের পিতা ছিলেন একজন নিদানশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ কবিরাজ। তিনি এসে নকুলেশ্বরের নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—খুব ঠাণ্ডা লেগে ওর বুকে শ্লেষ্মা জমেছিল। তার উপর বুকে জোর দিয়ে হয়তো কথা বলা অথবা গান করার দরুণ বুকে আঘাত লেগে নিউমোনিয়ার মতো হয়েছে। তবে এখনো তেমন কোন মারাত্মক অবস্থা নয়। নিয়মিত চিকিৎসা ও সেবা যত্নে ভাল হয়ে যাবে।

কেশববাবু—ভগবান করুন আপনার কথাই যেন সত্য হয়। নকুল যেন শীঘ্র রোগমুক্ত হয়, এই তাঁর কাছে প্রার্থনা। যাক্, এখন চল সরলা, এই নৌকায় গিয়েই শেষ রাত্রে ষ্টিমার ধরতে হবে।

সরলা—না ম্যানেজার বাবু, এখন আর আমার দলে যাওয়া হবে না। নকুলেশ্বরের অসুখ সেরে গেলেই আমি নিজ বাড়ী ঝালকাঠি যাবো। আপনি দলপতির কাছে বলবেন, তিনি যেন রাগ না করেন। দল আবার ঝালকাঠি ফিরে এলেই দলে যোগ দেব।

নকুলেশ্বরের মা সজল চোখে কেশববাবুর পানে চেয়ে বললেন—ভগবানের কাছে আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আপনাদের কৃপায় আমি আমার অঞ্চলের ধনকে ফিরে পেয়েছি। আপনারা না থাকলে আমার বাছার যে কি

হতো তা ভগবানই জানেন। এত কষ্ট করে ওকে নিয়ে এসেছেন, সারাদিন স্নান খাওয়া হয়নি। এখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করুন; আগামী কাল বৈকালে যাবেন।

কেশববাবু—না, আমার এখনি যেতে হবে। আমি না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের দলের নৌকা গজারীয়া ঘাটে বাঁধা থাকবে। তাতে অন্যান্য জায়গায় যে সব গানের বায়না আছে সেগুলি নষ্ট হবে। আপনি সামান্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমি খেয়েদেয়েই রওনা হবো।

নকুলেশ্বরের মা তাড়াতাড়ি কেশববাবু ও সরলার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। খাওয়া শেষে কেশববাবু বললেন—নকুলের অসুখ সেরে গেলেই দলের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পত্র দিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করবেন।

কেশববাবু সে রাতেই বরিশাল চলে গেলেন শেষ রাতে ঢাকার ষ্টিমার ধরার জন্য। এদিকে পিতার সুচিকিৎসা, মায়ের স্নেহ, সরলার শুশ্রূষা এবং সর্বোপরি গুরুদেবের আশীর্বাদের ফলে নকুলেশ্বর আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ কণ্ঠস্বরটি বন্ধ হয়ে গেল। কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা না বললে কেহ তার কথা বুঝতে পারত না। নকুলেশ্বর কাঁদ কাঁদ স্বরে সরলাকে বললেন—আপনারা প্রাণপণ চেষ্টায় আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন সত্য; কিন্তু এ বাঁচার চেয়ে আমার মরণ যে শতগুণে ভাল ছিল। আমার কত আশা, কত কামনা আমি কবি হবো, যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবো। ভগবান আমার সে আশা নির্মূল করে দিলেন। কণ্ঠস্বরই যদি না থাকে তবে কি নিয়ে আমি কবির আসরে দাঁড়াব। জীবনে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ না করতেই পারলাম, তবে আমার এ মরার মতো বাঁচায় কি লাভ ?

সরলা—সেজন্য তুমি ভেবনা। গুরু কৃপায় এবং পিতামাতার আশীর্বাদে যখন জীবনটা পেয়েছ সবই আবার ফিরে পাবে। ছেলেদের কণ্ঠস্বর চিরদিন সমান থাকে না। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে 'বয়সা' ধরে। ছেলেরা কৈশোরে পদার্পণ করলেই কণ্ঠস্বর বিকৃত অর্থাৎ মোটা হয়। ওর জন্য ভাবনার কিছু নেই। শরীর সুস্থ সবল হলে হারমোনিয়াম নিয়ে ভাল করে রেওয়াজ করলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

নকুলেশ্বর—আপনি যাই বলুন, যতই সান্ত্বনা দিন—আমার মন বলছে এটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

নকুলেশ্বরের মা এই কথা শুনে বললেন—সে আবার কি কথা? পাপের কথা বলছিস্ কেন? তুই এমন কি পাপ করেছিস বাবা?

নকুলেশ্বর—মা তুমি জাননা, আমি এক সর্বজনমান্য মহাপুরুষ কবিকে গানের আসরে অপমান করেছি।

নকুলের মা সরলাকে বললেন—বলতো মা, ও কাকে অপমান করেছে?

সরলা—না না, ওর কথা শুনবেন না। ও কিছু না। কবিগানের আসরে ও রকম হয়েই থাকে। তাতে আবার পাপপুণ্য কি? এই বলে উদয়পুরের আসরে হরকুমার শীলের সঙ্গে গানের আনুপূর্বিক বিবরণ মাকে শোনালেন। শুনে মা খুব দুঃখিত হয়ে নকুলেশ্বরকে বললেন—ছিঃ ছিঃ! তোর এমন দুর্মতি হয়েছে? কবি শিখতে গিয়ে এমন ঔদ্ধত্য শিখেছিস? ছোট বেলায় কি পড়িস্‌নি 'মানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য' তুই সেই মহৎ ব্যক্তির অপমান করেছিস। এর চেয়ে মহাপাপ আর কি হতে পারে? লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই শিক্ষালাভ করবার জন্যই কি আমি তোকে কুঞ্জবাবুর হাতে সঁপে দিয়েছিলাম?

মাতাঠাকুরানীর তিরস্কার শুনে নকুলেশ্বর সাশ্রুনয়নে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—মা তোমার যত ইচ্ছা. আমাকে গালমন্দ কর আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু আমার গুরুদেবের নামে কিছু বলোনা। তিনি আমার খামখেয়ালীর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। কয়েকটি চঞ্চল বালকের প্ররোচনায় আমি একাজ করেছি—তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। সেজন্য তিনিও আমাকে খুব ভৎসনা করেছেন। তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, জীবনে আর কোন দিন এইরূপ মানী লোকের মানহানিকর কাজ করবো না। তবে যদি কেউ বিনাকারণে আক্রমণ করে, আমি যেন সে আক্রমণ প্রতিহত করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি সেই আশীর্বাদ করো।

নকুলেশ্বরের মা—জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে একটা কথা সব সময় মনে রাখিস—'বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে।'

সব সময় মনে করবি তুই সকলের চেয়ে ছোট, অহংকারের বশবর্তী হয়ে নিজেকে খুব বড় মনে করিস না।

'আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়।
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়॥

এই কথাটি তোর বাবা সব সময় বলেন। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট কোন

মুসলমানকেও তিনি আসখুন বসখুন ছাড়া, তুই তুমি বলে কথা বলতে কখনো শুনিনি। তাতে কি তিনি ছোট হয়ে গেছেন? বরং পাড়ার হিন্দু মুসলমান সবাই তাঁকে দেখলে নমস্কার করে। তুইও যদি সর্বদা নম্রতা নীচতা নিয়ে চলতে পারিস তবে দেখবি তার প্রতিদানে সকলেই তোকে সম্মান দেবে।

ঝালকাঠি ফেরার মন্ত্রণা

এই বলে মাতাঠাকুরানী কার্যান্তরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর নকুলেশ্বর সরলাকে বললেন—আচ্ছা আপনি যে আমাকে হারমোনিয়াম নিয়ে রেওয়াজ করতে বললেন, আমার তো হারমোনিয়াম নেই। কি দিয়ে রেওয়াজ করব?

সরলা—সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না। আমার ঘরে খুব ভাল হারমোনিয়াম আছে। মা'র কাছে অনুমতি নিয়ে ঝালকাঠি আমার বাড়ীতে চল। যতদিন কুঞ্জবাবু দল নিয়ে ঝালকাঠি না আসেন ততদিন আমার বাড়ীতে থাকবে। তোমার সেবা যত্নের কোন ত্রুটি হবে না—খাওয়া দাওয়া করবে আর দুইবেলা নিশ্চিন্ত মনে কণ্ঠস্বর রেওয়াজ করবে। তোমার গুরুদেব ঢাকার ফিরা শেষ করে দল নিয়ে ঝালকাঠি এলেই আমরা আবার দলে যোগ দেব।

নকুলেশ্বর—মা যদি রাজী না হন?

সরলা—সে ভাবনা আমার। আমি বলে কয়ে মাকে রাজী করে নেব।

রাতে খেতে খেতে সরলা বলল—মা, একটা কথা বলবো?

মা—কি বলবে বল না; সঙ্কোচ করছো কেন?

সরলা—আমি বলছিলাম কি আপনার ছেলের অসুখ তো ভাল হয়েছে। এখন যদি ও এভাবে ঘরে বসে থাকে, তবে সব ভুলে যাবে। গান বাজনা যত চর্চার মধ্যে থাকে ততই উন্নতি হয়। সেজন্য বলি, আপনি মত দিলে ওকে আমি ঝালকাঠি সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

মা—কোথায় নিয়ে যাবে? ওর গুরুদেবের দল তো এখনো ঝালকাঠি আসেনি। ও কোথায় থাকবে, কি খাবে, বিশেষতঃ ওর শরীর এখনো তেমন সুস্থ সবল হয়নি। আরও কিছুদিন বিশ্রাম ও ভাল ঔষধপত্রের দরকার।

সরলা—সেজন্য আপনি ভাববেন না। কুঞ্জবাবু দল নিয়ে ফেরা পর্যন্ত ও আমার বাড়ীতে, আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। ওর খাওয়া পরা সেবা শুশ্রূষার ভার আমি নিলাম। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে বলকারী ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে দেবো। আপনার কোন চিন্তা নেই।

মা—আচ্ছা তুমি যে বললে গানবাজনা চর্চার মধ্যে না থাকলে ও সব শিক্ষা ভুলে যাবে। তোমাদের দল ঝালকাঠি না আসা পর্যন্ত কোথায় গানবাজনার চর্চা হবে ?

সরলা—বলেন কি মা! আপনি জানেন না ঝালকাঠি ৭।৮টা কবিগানের দল আছে। সব দলই তো ঢাকার ফিরায় যায় না। অনেকে বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর এই সব জেলাতেই গান করে বেড়ায়। বর্তমান সময়ে অনেকগুলি দল ঝালকাঠি উপস্থিত আছে। কারণ এখন সেখানে বারোয়ারী ৺কালীপূজার ধুম পড়ে গেছে! ঝালকাঠি বন্দরের অলিতে-গলিতে শুধু বারোয়ারী পূজা আর গান। কত জায়গায় গান হয় শুনুন—কাপুড়িয়া পট্টি, তামাক পট্টি, কাঁসারী পট্টি, পাটি পট্টি, কাঠ পট্টি, আড়তদার পট্টি, ফড়িয়া পট্টি, শীতলা খোলা, কালী বাড়ী আটচালা, মদনমোহনের আখড়া, ইত্যাদি আরো কত আসর। শুধু কবিগান নয়—কবি, যাত্রা, ঢপ, কীর্তন, জারি ইত্যাদি নানা রকম গানের আয়োজন ও অনুষ্ঠান। ঝালকাঠি বন্দরটা হল সঙ্গীতের পীঠস্থান বিশেষ। সেখানে কি চর্চার অভাব! তারপর আপনার ছেলের অনুকরণ শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির যে পরিচয় আমরা এই কয়দিনের মধ্যে পেয়েছি, তাতে মনে হয়, এই সব চর্চার মধ্যে থাকলে ওর খুব উন্নতি হবে। আপনি দেখবেন ভবিষ্যতে আপনার ছেলে একজন নামজাদা কবি হয়ে ওর গুরুদেব ও আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মা—বাছা তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ও যেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে কবি সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারে।

তখন নকুলেশ্বরকে ডেকে বললেন—বাবা, সরলা তোকে সঙ্গে নিয়ে ঝালকাঠি যেতে চায়। ও তোদের দলের সবচেয়ে নামী গায়িকা হয়েও তোর জন্য যা করেছে, পরম আত্মীয়ও তা করে না। ওর সঙ্গে তোর কোন অসুবিধা হবে না। তবে, একথা মনে রাখিস—তোর বাবা এখন বৃদ্ধ। আর বেশীদিন পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারবেন না। তোকেই সংসারের ভার নিতে হবে। তুই যে বিদ্যা শিক্ষা করতে গেছিস্ মনেপ্রাণে তা শিখে মানুষের মতো মানুষ হয়ে সংসার প্রতিপালন করবি—এটাই সবাই আশা করে। মনে রাখিস শুভ কাজে বহু বিঘ্ন। কখনো গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিস না। অসৎসঙ্গে মিশে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনিস না। আশীর্বাদ করি যেন তোর মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

নকুলেশ্বর একমনে মায়ের উপদেশ শুনতে শুনতে মনে মনে সরলার তারিফ করতে লাগলেন। এত সহজে যে সে মাতাঠাকুরানীকে রাজী করাতে পারবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

সখের দলের 'সরকার'

রাত ভোর হতেই তারা ঝালকাঠি রওনা হবেন স্থির হলো। পরদিন সকালে যাত্রার আয়োজন করছেন এমন সময় দুজন ভদ্রলোক এসে বললেন— আমরা বরিশাল শহরের কাছে কাশীপুর গ্রাম থেকে আসছি। আপনার নাম কি নকুলেশ্বর ?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ, আপনারা কি জন্য এসেছেন ?

আগন্তুকদ্বয়—শুনলাম আপনি নাকি ঝালকাঠির শ্রেষ্ঠ কবিয়াল কুঞ্জদত্ত মহাশয়ের কাছে কবি শিক্ষা করে এসেছেন ? আমাদের একটি সখের কবির দল আছে। সেই দলে 'সরকারী' করবার জন্য আপনাকে নিতে চাই, যদি আপনার মত হয়।

নকুলেশ্বর—দেখুন আপনারা ভুল শুনেছেন। কবি শিক্ষা করা তো দূরের কথা, আমি কবির 'ক'ও শিখতে পারিনি। কেবল হাতে-খড়ি নিয়ে কিছুদিন ডাক সরকারী করে এসেছি। প্রকৃত কবির আমি কিছুই জানিনা। আপনারা অন্য সরকারের চেষ্টা করুন।

নকুলেশ্বরের কথা শুনে সরলা তাকে ডেকে বলল—তুমি এসব অবান্তর কথা বলে ভদ্রলোকদের ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন ? তুমি কি জান বা না জান তা ওনারা না জানতে পারেন, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি একটু চুপ করে বসো ; আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলি।

তারপর সরলা এসে ভদ্রলোকদের বললেন—দেখুন উনি কবি ভালই শিখেছেন বটে, তবে আমাদের ঝালকাঠির পেশাদার দলে আর আপনাদের সখের দলের গানে একটু পার্থক্য আছে। আপনারা কোন্ সুরে টপ্পার লহর গান করেন তা ওঁর জানা নেই। তাই উনি বায়না নিতে অস্বীকার করছেন।

ভদ্রলোকদ্বয়—সেজন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। আমাদের গানে জবাব টপ্পার ঝামেলা নেই। কারণ আপনাদের ব্যবসায়ী দলের মতো তো আর আমাদের তাল তালিম নেই। গ্রাম্য সব কাজের মানুষ। অবসর মতো

একটু আনন্দ করা। বিপক্ষ দলের অবস্থাও তথৈবচ। দুই দলে দুই জন 'সরকার'—একটু পাঁচালী বলতে পারলেই হবে।

সরলা—পাঁচালীর জন্য কোন চিন্তা নেই। সে শুনলেই বুঝতে পারবেন। আর আপনারা ওঁর পারিশ্রমিক কি দেবেন ?

ভদ্রলোক—দেখুন আমাদের সখের দল। দোহারপত্রের কোন টাকার বালাই নেই ; শুধু সরকার আর ঢোল কাঁসীর খরচমাত্র লাগে। তা আপনারা কত চান ?

সরলা—বেশী দাবী করবো না। ত্রিশ টাকা নগদ আর যাতায়াত খোরাকী খরচ দেবেন।

ভদ্রলোকদ্বয় একবাক্যে স্বীকার করে বললেন—গানের তারিখ আগামী পরশু দিন রাত্রে। আমরা নৌকায় করে আপনাকে নিয়ে যাব এবং গান শেষ হলে পৌঁছে দেব।

কথাবার্তা ঠিক করে অগ্রিম বায়না বাবদ দশটি টাকা দিয়ে তারা বিদায় হলেন। নকুলেশ্বর তখন সরলাকে বললেন—আপনি এ কি করলেন ? এরকম ছেলেমানুষী করে আমাকে আসরে লজ্জায় ফেলার ব্যবস্থা না করলে কি চলতো না ? তা ছাড়া আমার কণ্ঠস্বর এখনো ঠিক হয়নি।

সরলা—তুমি থাম তো। তোমার কোন চিন্তা নেই। যা শিখেছ তাই করবে। গুরুর নাম স্মরণ করে আসরে যাবে, দেখবে কেউ তোমাকে লজ্জা দিতে পারবেনা। এখন ওসব দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে মনটাকে প্রস্তুত কর। পরশু দিন ওরা নৌকা নিয়ে আসবে। ভয় কিসের ? তোমায় একা যেতে হবে না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আর তত দিনে গলাও অনেক সেরে যাবে।

নকুলেশ্বর—আপনি তো ভদ্রলোকদের কাছে আপনার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কিছুই বললেন না।

সরলা হাসিহাসি মুখে বলল—আমার আবার পারিশ্রমিক চাই কি ? আমি তো আর তাদের কাজ করতে যাচ্ছি না। তোমার সুবিধা অসুবিধা দেখবার জন্য এবং আসরে তোমার একটু সাহায্য করবার জন্য আমি যাব। পারিশ্রমিক যদি দিতেই হয় তুমি দিও। তুমি যখন আসরে পাঁচালী বলবে তখন তোমার পেছনে ধুয়া-গানে সাহায্য করতে ওরা পারবে বলে মনে হয় না। পেছনে ধুয়া ধরা ভাল না হলে কবির সরকারকে যে কি বিপদে পড়তে হয় তা ওরা না জানলেও আমি তো জানি। শুধু টাকার লোভেই তোমার জন্য এ

বায়না ধরি নি। তোমার কবির উত্তম, কবির উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য এবং তোমার যশ প্রতিষ্ঠা বিস্তার লাভ করাবার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা।

নির্দিষ্ট দিনে নৌকা এসে ঘাটে পৌঁছল। নকুলেশ্বর সরলাকে বললেন—আমার বড় ভয় করছে। তাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই। বিশেষত একা আর কখনো খোদ হয়ে কাজ করিনি। গুরুদেব পেছনে ছিলেন—আমি নির্ভয়ে কাজ করেছি—আজ কার ভরসা করবো?

সরলা—তুমি ভুল বুঝেছ। এতদিন গুরুসেবা করেও মনের দুর্বলতা দূর করতে পারলে না। মনে বিশ্বাস রাখ, তুমি যেখানেই থাক গুরুদেব তোমার সঙ্গেই আছেন। যখনই আসরে যাবে একাগ্র মনে তার স্বরূপ চিন্তা করে আদেশ চেয়ে নিও। দেখো মনে মনে বল পাবে, প্রাণে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগবে।

সরলার মুখে এসব কথাবার্তা শুনে নকুলেশ্বরের প্রাণে সাহসের সঞ্চার হলো। তিনি মনে মনে গুরুদেবের আদেশ প্রার্থনা করলেন। তারপর পিতামাতাকে প্রণাম করে সরলার সঙ্গে নৌকায় উঠলেন। যথাসময়ে নৌকা গিয়ে গানের ঘাটে ভিড়ল।

'সরকার' (কবিয়াল) এসেছে শুনে পাড়ার লোকজন দেখতে এলো। যারা সরকারকে আনতে গিয়েছিল তাদের জিজ্ঞাসা করল—কই, সরকার কই? তারা নকুলেশ্বরকে দেখিয়ে দিল।

নতুন বৌ দেখতে এসে পাড়ার লোকে যেমন নানারকম মন্তব্য ও সমালোচনা করে, এরাও তেমনি করতে লাগল। কেউ বলল—এ আবার কেমন সরকার! এর যে এখন পর্যন্ত মুখ থেকে দুধের গন্ধ যায়নি। একেবারে ছেলেমানুষ! এটুকু বয়সে ও জানেই বা কি, আর সরকারীই বা কি করবে? সরকারী করতে হলে একটু ভার-ভার্তিক লোক হওয়া দরকার; অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এ কি ছেলেখেলা যে ছেলেমানুষ দিয়ে চলবে? আর একজন বলল—তা যা বলেছ ভাই, কবির আসর—এতো ছেলেমানুষি করার জায়গা নয়? বিপক্ষে এসেছেন প্রসন্ন সরকার। বুড়োমানুষ, তাঁর কত জ্ঞান, তিনি বহুদর্শীলোক। লোকে বলে শতেক মারি ত বৈদ্য। প্রসন্ন সরকারের সঙ্গে পাল্লা করা কি চারটিখানি কথা! দেখবে আসরে সে একটা ধমক দিলে সোনার যাদু পালাবার পথ পাবে না, ইত্যাদি। এসব উক্তি প্রত্যুক্তি ও মন্তব্য শুনে নকুলেশ্বর গুরুদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন।

নানা কথা শুনতে শুনতে সরলা খুব বিরক্ত হয়ে বলল—যান যান, এখানে

ঝামেলা বন্ধ করুন। এতো বাজারে কালীপূজার পাঁঠা কিনতে আসেন নি যে ওজন করে দেখবেন, মাংস বেশী আছে কিনা, প্রসাদ পেট ভরা পাবেন কিনা। এর নাম কবিগান। ছেলে বুড়োয় কিছু আসে যায় না। ছোট একখানা কুড়ালের ঘায়ে বিরাট বিরাট বটগাছও কাটা পড়ে। পণ্ডিতেরা বলেন, 'বৃক্ষস্ত কি নাম,—ফলেন পরিচিয়তে।' বৃক্ষের নাম ফলেই পরিচয় হয়। এখন যান, বিরক্ত করবেন না। বিশ্রাম করতে দিন।

সরলার মুখে এসব কাটাকাটা কথা শুনে সমালোচকগণ লজ্জা পেয়ে স্থান ত্যাগ করল। নকুলেশ্বর এতক্ষণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বায়নাদার ভদ্রলোক এসে এসব অহেতুক মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাদের বিশ্রামের সুব্যবস্থা করে দিলেন।

খোদ সরকার হিসেবে প্রথম আবির্ভাব

সন্ধ্যার পর গানের আসরের প্রস্তুতি সুরু হলো। সামিয়ানা খাটানো হয়েছে, বিছানা পাতা হয়েছে, নিমন্ত্রিত লোকজন এসে আসরে বসেছেন।

জনৈক কর্তাব্যক্তি এসে সরলাকে বলল—আমাদের দলে 'সরকারী' করবার জন্যই নকুলবাবুকে এনেছি। আমি এই দলের ধরতা (শ্রেষ্ঠ গায়ক)। আমাদের দলই আগে আসরে যাচ্ছে। আমাদের ডাক, মালসী, সখি-সংবাদ ইত্যাদি গান হয়ে গেলে টপ্পা পাঁচালীর সময় আপনাদের ডেকে নেব। আপনারা এখন বিশ্রাম করুন।

সরলা নকুলেশ্বরকে বলল—এখন একটু ঘুমিয়ে নাও, রাত জাগতে হবে তো।

নকুলেশ্বর শুলেন' বটে; কিন্তু তাঁর চোখে কিছুতেই ঘুম এলোনা। পূর্ববর্তী সমালোচকদের বাক্যবাণ তাঁর কানে যেন দুন্দুভির মতো বাজছে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দল আসরে গেল। আসরে গিয়েই তারা এক খানা ডাক গান গাইতে আরম্ভ করলো, ডাক গানখানা শেষ করে একখানা মালসী গান ধরল বটে, কিন্তু তাল তালিম নাই বলে ছেড়ে দিয়ে চলে এলো। তাল তালিম থাকবে কি করে? তাদের তো আর পেশাদার দল নয়—সখের দল। সারাদিন কাজ কর্ম সেরে সন্ধ্যার পরে গ্রামের উৎসাহী কিছু লোক একত্র হয়ে দু' একটি গান কোন রকমে শিখেই মনে করে তাদের গানের দল ঠিক হয়েছে, অন্য গ্রামের দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। দুই দলে দুই জন 'সরকার' আর দু'টি ঢুলী হলেই হল।

নকুলেশ্বরের দল আসর ছেড়ে চলে আসার পর বিপক্ষ দল আসরে প্রবেশ করে ঢুলীর ঢোল বাজনার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সহকারে কিছুক্ষণ নাচানাচি করে একখানা ডাকগান আরম্ভ করলো—

তারা ! মাগো আমার ভবের ব্যাপার সারা।
আমি কুচিন্তায় কৃশ, কৃষকের বৃষ, বয়সে হয়েছি বুড়া ॥
আগে কবির শিষ্য-ছাত্র ছিল বাড়ী ভরা,
দিতেম খাওয়া পরা শিখাইতেম ছড়া ;
এখন করে তারা, স্বরাজ নিশান খাড়া,
বলে এই বুড়া সব নষ্টের গোড়া ॥
এখন কোন শিষ্য ছাত্রে, হেরি না পাপনেত্রে,
যেমন শতপুত্রের পিতা হয় আঁটকুড়া ॥

(অন্তরা) মাগো, মায়ার খেলা মায়ার লীলা রবে পড়িয়া।
কানমলা খুব খাওয়াইলি মা বাজিকরের মাইয়া,
কিসে অমৃত ফল করব আশা বিষবৃক্ষ রোপিয়া ॥
এখন পড়েছি মা মরণ পথে, তারণ কারণ শরণ পথে,
পারি যেন বিদায় হতে, এই কয়টি নাম লইয়া।
হরিচরণ বলে মরণ কালে, দিসনে নাম ভুলাইয়া ॥

ডাক গানখানা গাওয়া শেষ হল। গানটির শেষে 'হরিচরণ বলে' এই ভনিতা শুনে নকুলেশ্বর সরলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই গানটি কোন্ হরিচরণের লেখা? একি সেই কবি-সম্রাট হরিচরণ আচার্যের লেখা, না অন্য কোন হরিচরণের লেখা? আপনি অনেক দিন কবির দলে আছেন। অনেক পুরনো গান জানেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সরলা—হরি আচার্যের লেখাও হতে পারে! কেন, সেজন্য তোমার মাথা ব্যথা কেন?

নকুলেশ্বর—না, তেমন কিছু নয়, তবে রচনার পদগুলি কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে। এ লেখা আচার্য কর্তার বলে মনে হয় না। ব্যাসমুনির নাম দিয়ে অনেক বাজে লেখকের বাজে গল্পকথা শাস্ত্র পুরাণে প্রক্ষিপ্ত ভাবে চলে কিনা, তাই সন্দেহ হয়। এ গান যদি হরি আচার্য মহাশয়ের লেখাও হয়, তবে নকল-নবিশের দোষে তিন নকলে আসল খাস্তা হয়েছে।

সরলা—সেজন্য তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখনই হয়তো তোমার আসরে যেতে হবে ; নিজের কাজের জন্য প্রস্তুত হও।

নকুলেশ্বর বনাম প্রসন্ন সরকার

এসময় বায়নাদার এসে নকুলেশ্বরকে বলল—এখন আপনার আসরে যেতে হবে। আমাদের প্রথম আসর, আপনাকেই টপ্পা (প্রশ্ন) করতে হবে।

নকুলেশ্বর গুরুদেবকে স্মরণ করে সরলাকে নিয়ে আসরে গেলেন। সরলাকে বললেন—আমার টপ্পার লহরটি আপনাকে গাইতে হবে। ওদের দ্বারা হবে না। বলামাত্র সরলা উঠে দাঁড়াল। নকুলেশ্বর পেছনে দাঁড়িয়ে লহরটি বলতে আরম্ভ করলেন—

আমি মরুতের পুত্র মারুতি, তুমি হও শ্রীরাম।
তুমি যজ্ঞ কর অযোধ্যায়, সেই যজ্ঞ দেখিবার আশায়,
এসে স্বভক্তিতে তোমার পায়, করিতেছি প্রণাম॥
লোকে পাপের তরে যজ্ঞ করে—
তুমি তো পাপের বাবা নারায়ণ—
তুমি কোন পাপের তরে করেছ যজ্ঞের আয়োজন ?
শুনি এক বিষ্ণু চতুরাংশে, জন্মেছ সূর্য বংশে,
কিসে হও পূর্ণ সনাতন ?
কেন বনেতে দিলে বনিতে,
বামেতে সোনার সীতা কি কারণ ?

লহর গান শেষ করে নকুলেশ্বর ডাক ধুয়া ধরলেন—

ও মন-মাঝিরে আমার—
দুরন্ত বিরজা নদী কিসে হবি পার॥

তারপর যথারীতি আসর বন্দনা করে পাঁচালীতে বললেন—

বন্দনা করিয়ে শেষ বক্তব্যে করি প্রবেশ
কল্পনাতে আমি হনুমান।
তুমি রাম আমার গুরু সিদ্ধি বাঞ্ছা কল্পতরু
তুমি মোর উপাস্য প্রধান॥

তুমি রাম রঘুবর অশ্বমেধ যজ্ঞ কর
ত্রিলোকে দিয়েছ নিমন্ত্রণ।
আমি কেন পড়লেম বাদ কি করেছি অপরাধ
বল শুনি রাম নারায়ণ॥
শুনতে পেয়ে পরম্পরে এই যজ্ঞ দেখিবার তরে
সেধে আমি এসেছি হেথায়।
বল বল রাম ধানুকী লক্ষ্মীছাড়া কেন দেখি
মা জানকী রয়েছেন কোথায়॥
বাম ভাগে রেখেছ কারে মা মা বলে ডেকে তারে
শত ডাকে সাড়া নাহি পাই।
কেন মা বলে না কথা কে তারে দিয়েছে ব্যথা
শশিমুখে হাসি কেন নাই॥
পাপী লোকে যজ্ঞ করে পাপ ক্ষালন করিবার তরে
তোমার নামে পাপের ক্ষালন হয়।
আগুন কাঁপে শীতের ডরে জল পিপাসায় বরুণ মরে
এ কথা কে করিবে প্রত্যয়॥
কোন্ পাপে এই যজ্ঞ কর বল রাম রঘুবর
আর এক কথা শুনতে ইচ্ছা হয়।
এক বিষ্ণু চারি অংশে জন্ম নিলে সূর্য বংশে
তোমায় কেন পূর্ণ ব্রহ্ম কয়॥
শুনি তোমার বংশের খ্যাতি কেউ তোমায় কয় অজের নাতি
কেউ তোমায় কয় ভগ্নীপতির ছেলে।
কোন্টা মিথ্যা কোন্টা সত্য খুলে বল জন্মের তত্ত্ব
আমি বড় পড়লেম গণ্ডগোলে॥
শুনতে পেলেম আর এক কথা শম্বুক শূদ্রের কেটে মাথা
রাখলে নাকি কোন্ ব্রাহ্মণের মান।
কোন্ দোষেতে শম্বুক দোষী ব্রাহ্মণেরে করতে খুসী
কোন্ বিচারে বধো শূদ্রের প্রাণ॥
এই সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে রাম দয়াময় বল মোরে
শ্রীচরণে রইল নিবেদন।

এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করে ধুয়ার ভাবে সূত্র ধরে
আরো কিছু করিব বর্ণন ॥
(ধুয়া) মনরে—হলরে মন হল বিয়ের আয়োজন।
মিছে ভাবিস কিরে বসে বসে অবোধ-মন ॥
বিয়ের আলপনা গোময় ছড়া,
যাত্রা কুম্ভ শূন্য ঘড়া,
রাহা-খরচ অষ্ট কড়া—সঙ্গে দিবে বন্ধুগণ ॥
বিয়ের ঘটক নিজে হবে নিয়তি,
কন্যা হবে মৃত্যু-কন্যা যুবতী।
অগ্রদানী পুরুত হবে,
বিবাহের মন্ত্র পড়াবে,
বিয়ের গীত সকলে গাবে—করবে হরি সংকীর্তন ॥
দান-সামগ্রী দিবে তোরে যথেষ্ট,
ছেঁড়া বালিশ ছেঁড়া পাটি আমকাষ্ঠ।
বাঁশের দোলা সাজাইবে,
জাত-বেহারায় কাঁধে লবে,
বরযাত্রী সব সঙ্গে যাবে—শ্মশান বন্ধু পরিজন ॥
বিয়ের মুখ-চন্দ্রিকার যখন হবে কাল,
জ্ঞাতি কিংবা পুত্রে ধরিবে মশাল।
শ্মশান খোলা শ্বশুর বাড়ী,
চার দিক খোলা জমিদারী,
নকুল বলে কেন দেরী—বর শয্যায় কর শয়ন ॥
মন শিক্ষা বলে নাই আর প্রয়োজন,
টপ্পার ভাবে করি কিছু আয়োজন।
তুমি গুরু আমি শিষ্য,
দেখি আজ অপূর্ব দৃশ্য,
জানিতে যজ্ঞের রহস্য—পদে করি নিবেদন ॥
সর্ব যজ্ঞেশ্বর তুমি রাম-নারায়ণ,
তুমি আবার যজ্ঞ কর কি কারণ।
জগৎ জীবে যজ্ঞ করে,

অর্ঘ্য দেয় রাম যজ্ঞেশ্বরে,

তুমি অর্ঘ্য দিবে কারে, কে সে যোগ্য মহাজন ॥

তোমার নামে জগৎ জীবে মুক্তি পায়,

তোমার বাবা মরে যে প্রেতলোকে যায়।

বল কোন্ পাপের লাগিয়ে,

ছিল সে প্রেতলোকে গিয়ে,

সীতার বালুর পিণ্ড খেয়ে—মুক্তি পায় সে কি কারণ ?

(পয়ার) আর এক কথা আমার কাছে বল দয়াময়।

চারি পুত্রের বাবা কেন বাসি মড়া হয় ॥

'পুত্র পিণ্ড প্রজায়তে' মুনিগণের মত।

পুত্রের পিণ্ড পায়না কেন রাজা দশরথ ॥

পুত্র থুইয়ে পিণ্ড মাগে পুত্রবধূর কাছে।

মনে বলে জন্মে তোমার গণ্ডগোল আছে ॥

লোকের কাছে আর এক কথার শুনি পরিচয়।

ভৃগুরামের বাণের বোঝা তোমার বাবা বয় ॥

তাইতো তোমার বংশের মাঝে আছে একটা খোঁটা।

লোকে বলে রাম তুমি বোঝাটানার বেটা ॥

এই পর্যন্ত এবার আমার ভাব সাঙ্গ করি।

মুসলমানে বলুন আল্লা হিন্দু বলুন হরি ॥

টপ্পা-পাঁচালী শেষ করে নকুলেশ্বর আসর ছেড়ে বাইরে এলেন। বিপক্ষ সরকার প্রসন্নবাবু আসরে প্রবেশ করলেন। তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। নকুলেশ্বর তাঁর কাছে ছেলেমানুষই বটে। তবে তাঁর বাক্‌চাতুর্য ও নির্ভিকতা দর্শনে শ্রোতৃমণ্ডলী খুবই আনন্দিত হলেন এবং বিপক্ষ সরকারের জবাব শোনার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সরকার মশাই হাত জোড় করে সকলকে প্রণাম করে ডাক-ধুয়া ধরলেন—

পাগলা মনরে আমার—

বিরজার কুলে থেকে না জানো সাঁতার ॥

তাঁর দলের দোহারপত্রে বার পাঁচেক ঐ ধুয়াখানি গেয়ে ছেড়ে দিতেই সরকার মশাই ডাক-ছড়া অর্থাৎ ত্রিপদী ছন্দে পাঁচালী আরম্ভ করলেন—

নমঃ নমঃ নারায়ণী নমামি মা বীণাপাণি
নিজগুণে কর তুমি দয়া।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজনস্তুতি
কৃপা করে দাও পদছায়া॥
কালিদাস মূর্খ ছিল তোমার সাধনা কৈ'ল
হলেন তিনি পণ্ডিত প্রধান।
শ্রেষ্ঠ কবি বলে তাঁরে সকলেই মান্য করে
দশমুখে শুনি যশোগান॥
মূর্খ বলে দয়া করে থেকে রসনার উপরে
নিজগুণে কর বাক্য দান।
বন্দনার ভাব দিলেম ছেড়ে টপ্পার ভাবে এ আসরে
আমি হলেম রাম ভগবান॥
তুমি হও পবনের পুত্র পবিত্র তোমার চরিত্র
যজ্ঞ দেখতে এলে অযোধ্যায়।
যজ্ঞ করি কি কারণে শুনতে বাঞ্ছা হল মনে
শোন বলি যজ্ঞের পরিচয়॥
পিতৃসত্য পালিবারে গিয়েছিলেম বনান্তরে
সঙ্গে নিয়ে জানকী লক্ষ্মণ।
লঙ্কাপতি দশগিরি ছদ্মযোগী মূর্তি ধরি
করেছিল জানকী হরণ॥
সেই সীতা উদ্ধার করিতে মিত্রতা সুগ্রীবের সাথে
তুমি তো জান হনুমান।
বানর সৈন্য সহায় করে গিয়ে সেই লঙ্কাপুরে
বধেছিলাম রাবণ রাজার প্রাণ॥
রাবণ হয় ব্রাহ্মণের পুত্র গলায় ছিল যজ্ঞসূত্র
সেই রাবণকে করিলে নিধন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে ধরে. সেই পাতক মোচনের তরে
করেছি এই যজ্ঞের আয়োজন॥
যজ্ঞের অর্ঘ্য দিব কারে কুল গুরু বশিষ্ঠেরে
যজ্ঞের অর্ঘ্য করব সম্প্রদান।

গুরু হলেন জগৎশ্রেষ্ঠ গুরু তুষ্টে জগৎ তুষ্ট
গুরু কৃষ্ণ গুরু ভগবান ॥
সীতা সতী কোথায় আছে সত্য বলি তোমার কাছে
সে রয়েছে বাল্মীকির বনে।
লোকনিন্দা শুনে কানে সীতারে দিয়েছি বনে
প্রজারঞ্জন করিবার কারণে ॥
দুর্মুখ নামে ধোপার ছেলে সীতারে অসতী বলে
স্বকর্ণে তাই করেছি শ্রবণ।
সেই কলঙ্ক ঘুচাইতে বনবাসে দিলেম সীতে
করিতে তার কলঙ্ক মোচন ॥
সস্ত্রীক না হইলে পরে এ যজ্ঞ করিতে নারে
বলে যত মুনি ঋষিগণ।
লক্ষ্মী সীতার পরিবর্তে সোনা দিয়ে সীতা গড়তে
যুক্তি দিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥
তাঁর বাক্য অনুসারে স্বর্ণ সীতা নিলেম গড়ে
সস্ত্রীক যজ্ঞ পূর্ণ করতে চাই।
তোমার সনে কয়না কথা তাইতে তোমার মনে ব্যথা
প্রতিমার তো বাক্যশক্তি নাই ॥
এক বিষ্ণু চতুরাংশে জন্ম নিলেম সূর্য বংশে
আমি কিসে পূর্ণ ব্রহ্ম হই।
লক্ষ্মণ সীতা ভরত সাথে রাম নাম হ'ল এ জগতে
রাম শব্দে একা আমি নই ॥
এক দীপে লক্ষ দীপ জ্বালে মূল প্রদীপের কোন কালে
কভু কি আর জ্যোতি নষ্ট হয়।
তেমনি আমরা অংশে অংশে জন্ম নিলেম সূর্য বংশে
রাম নাম পূর্ণ জ্যোতির্ময়।
আমি ভগ্নীপতির ছেলে একথা কয় গাছ পাগলে
অপুত্রক যজমান যদি রয়।
পুরুতে যজমানের ঘরে গর্ভাধানের মন্ত্র পড়ে
তাতে যদি ভার্যার গর্ভ হয় ॥

সেই গর্ভে ছেলে হলে পুরুতকে কি বাবা বলে
আমার বাবা দশরথ রাজন।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়ে চিতে
ঋষ্যশৃঙ্গে করে আনয়ন॥
ঋষ্যশৃঙ্গের মন্ত্রের জোরে চরুর থালা নিয়ে করে
উঠেছিলেন যজ্ঞ দেবতা।
সেই চরু তিন মাতা খায় তাইতে চারি পুত্র পায়
ভগ্নীপতি কেন হবে পিতা॥
শম্বুক শূদ্র অহঙ্কারে শূদ্র হয়ে বেদ পড়ে
শুদ্ধাশুদ্ধ নাইকো তাহার জ্ঞান।
নষ্ট করে বেদের বিধি তার মাথা না কাটি যদি
রক্ষা হয়না বেদ ব্রাহ্মণের মান॥
বেশী কথা কিসের তরে আর বলিব এ আসরে
এ পর্যন্ত করি সমাপন।
এ প্রবন্ধ দিয়ে ছেড়ে এখন একটি ধুয়া ধরে
আরো কিছু করিব বর্ণন॥

(ধুয়া) ঝাঁপ দিয়ে রসের সাগরে, কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে রে—
রসিক যারা পায়রে তারা, অরসিকে পাবে না রে॥

রতন থাকে অগাধ জলে,
ডুবুরীতে ডুবে তোলে,
তা কি মিলে যার তার কপালে।
ভবে কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক হলে—
রতন মিলে করে করে রে॥

শিষ্য তুমি হে মারুতি,
আমি গুরু রঘুপতি,
করোনা আজ গুরুর অখ্যাতি।
রেখে গুরুপদে মতিগতি—
স্তুতি কর ভক্তি ভরে॥

বানর কুলে নিলে জন্ম,
জাননা রাজনীতির মর্ম,
প্রজারঞ্জন হয় রাজার ধর্ম।
তাইতে রক্ষা করতে রাজার ধর্ম—
কান্তারে দিলেম কান্তারে ॥
ব্রহ্মহত্যার পাপ ঘুচাতে,
মুনিগণের যুক্তি মতে,
যজ্ঞ করি এই অযোধ্যাতে।
তাইতে সস্ত্রীক যজ্ঞ পুরাইতে—
সোনার সীতা নিলেম গড়ে ॥
শোন হে পবন নন্দন,
গুরুবাক্য কর পালন,
যজ্ঞ পূর্ণ না হয় যতক্ষণ।
কর অতিথিদের চরণ সেবন—
গুরুবাক্য অনুসারে ॥

(পয়ার) তুমি আমার প্রিয় শিষ্য বীর হনুমান।
গুরুপদে যদি করে থাক আত্মদান ॥
গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে বাক্ বিতণ্ডা ছাড়।
যোগ্য শিষ্যের মত আমার যজ্ঞ পূর্ণ কর।
অযোধ্যার এই রাজসভা বনবাদাড় তো নয়।
রাজসভাতে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় ॥
এই পর্যন্ত বলে আমি ভাব সাঙ্গ করি।
ভক্তগণে সবে মিলে বলুন হরি হরি ॥

এই বলে প্রসন্ন সরকার মহাশয় টপ্পা পাঁচালী শেষ করে গেলেন।

নকুলেশ্বর সরলাকে বললেন—আমরা যে টপ্পার লহরটি গেয়ে পাঁচালী আরম্ভ করেছিলাম ওরা তো সে লহর গানটির জবাব দিল না। শুধু পাঁচালীতেই জবাব বলে গেল। এখন আমরা কি করব?

সরলা—ওদের হয়তো টপ্পার লহর গানের সুর জানা নেই। অথবা সরকার মশাই লহরটির উত্তর তৈরী করেননি। শুধু পাঁচালীতেই জবাব সেরে গেলেন। তুমিও শুধু পাঁচালী বলবে; লহর গানের দরকার নেই।

নকুলেশ্বরকে নিয়ে সরলা আবার আসরে প্রবেশ করল। নকুলেশ্বর সভাস্থ সকলকে প্রণাম জানিয়ে ডাক ধুয়া দিলেন—

আজ কেন এমন ধারা লক্ষ্মীছাড়া রঘুমণি।
কেন দিবাভাগে শিবা ডাকে
রাত্রে শুনি কাকের ধ্বনি॥

(ডাক ছড়া) দ্বিতীয়ে বন্দনা করি মহামায়ার চরণ-তরী
তরিতে তরণী ঐ পায়।
তব নাম নিলে পরে আপদ বিপদ হরে
নিরুপায়ের ঘটে সদুপায়॥

আমি কল্পনায় হয়ে মারুতি গুরু রঘুনাথের প্রতি
করেছিলাম আত্ম নিবেদন।
তুমি হয়ে যজ্ঞেশ্বর কি কারণে যজ্ঞ কর
বল রাম রাজীবলোচন॥

শ্রীরামচন্দ্র উত্তর করে হত্যা করে লঙ্কেশ্বরে
ব্রহ্মহত্যার পাতক লাগে গায়।
সেই পাতক ঘুচাবার তরে আসিয়ে অযোধ্যাপুরে
যজ্ঞ করি মুনির ব্যবস্থায়॥

বল রঘুনাথ আমারে ব্রহ্মহত্যা বলে কারে
ব্রহ্ম বস্তু অমৃত অক্ষয়।
অস্ত্রে নাহি কাটতে পারে রৌদ্রে নাহি শোষে তারে
অগ্নিতে যা দগ্ধ নাহি হয়॥

আত্মা হল ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্ম বস্তু অজ নিত্য
ধ্বংস নাহি হয় কদাচন।
তবে কারে হত্যা করে ব্রহ্মহত্যার পাপে ধরে
বল রাম রাজীবলোচন॥

দুর্মুখ ধোপার বাক্য শুনে সীতাকে দিয়েছ বনে
শুনে বড় প্রাণে ব্যথা পাই।
যেদিন তারে লঙ্কাপুরে দিলে আগুনের ভিতরে
আগুন যারে স্পর্শ করে নাই॥

তোমার বাবার আত্মা এসে সাক্ষী দিল তোমার পাশে
সীতার মত সাধ্বী সতী নাই।
বাবার সাক্ষী ফেল পড়িল ধোপা বাবা বেশী হল
কথা শুনে আমরা লজ্জা পাই।
বাবার ছেলে ভবে যারা বাবার কথা মানে তারা
ধোপার কথা করেনা প্রত্যয়।
তোমার মত কুলীন কেবা শ্রেষ্ঠ হল ধোপা বাবা
এই দোষেই বনাই'র ছেলে কয়।
সস্ত্রীক যজ্ঞ পুরাইতে বামে রাখলে সোনার সীতে
যুক্তি দিল বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
বশিষ্ঠ এক বেশ্যার পুত্র তার আদেশ শুনিবা মাত্র
সোনার সীতা করেছ গঠন॥
সোনার সীতা গড়াইলে সীতার কার্য যদি চলে
তবে রাম আর ভাবনা কি কারণ।
সাত শত মা রয় বিধবা গড়াও একটা সোনার বাবা
হোক তাদের কামনা পূরণ॥
মা তোমার সাত শত রাঁড়ী কৈ পাবে এত খেসারী
শঙ্খ শাড়ী সব পড়েছে বাদ।
পুরাতে তাদের মনোরথ গড়ে দাও সোনার দশরথ
পূরবে তাদের কাম কামনার সাধ॥
অংশ রূপে জন্ম নিলে পূর্ণ ব্রহ্ম কিসে হলে
তার উত্তরে বললে নারায়ণ।
এক দীপে লক্ষ দীপ জ্বলে মূল প্রদীপের কোন কালে
জ্যোতি নষ্ট হয়না কদাচন॥
মূল প্রদীপের অংশ হতে যত দীপ জন্মে জগতে
সকলেই অন্ধকার ঘুচায়।
রাম নামে পাতক হরে ভরত লক্ষ্মণ বললে পরে
পাপের ক্ষালন হয়না কোন কথায়॥
এক টাকারে চার ভাগ করে এক এক ভাগে সিকি পড়ে
সকল সিকি সমান মূল্য হয়।

এক সিকিতে যে কাজ চলে অন্য সিকিতে না হলে
আসল নয় তা মেকী সিকি কয়॥
শম্বুক শূদ্র বেদ পড়েছে বেদ ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে
তাইতে নাকি কেটেছ তার মাথা।
জন্ম নিয়ে শূদ্রের ঘরে সেও ব্রাহ্মণ হতে পারে
সাক্ষী আছে সেই ভৃগু সংহিতা॥

যথা—

১। ব্রাহ্মণাপতনীয়েছ বর্তমান বিকর্মস্থ।
দাম্ভিক দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেন সাদৃশো ভবেৎ॥

২। যস্ত শূদ্রোদমে সত্যে ধর্মে চ সততোত্থিতা।
তং ব্রাহ্মণ মহং মন্যে বৃত্তে নাহি ভবেদ্বিজ॥

অর্থাৎ—(১) দুষ্কর্মান্বিত দাম্ভিক কদাচারী ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য এবং (২) সত্য ধর্মে রত জিতেন্দ্রিয় শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করি, কেননা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্যই সৎবৃত্তি অবলম্বন।

এভাবে নকুলেশ্বর বিপক্ষ সরকারকে তর্কজালে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। শ্রীরামচন্দ্ররূপী বিরোধী কবিয়ালের অনেক যুক্তিহীন উক্তির জোর প্রতিবাদ ও তজ্জন্য যথোচিত কবিত্ব সুলভ তিরস্কার করে ধুয়া দিলেন—

দিন হারায়ে দীনবন্ধু এখন তোমায় পড়ে মনে।
আমার থাকতে সুদিন, তোমায় সে দিন,
চিনি নাইকো অভিমানে॥
ভূমিতে হয়ে ভূমিষ্ঠ,
জননীর কোল পেয়ে মিষ্ট,
তুষ্ট ছিলেম স্তন্য পানে।
করি বাল্যকালে ধূলা খেলা—
যত বাল্য-খেলার সাথীর সনে॥ ... (এখন তোমায়—)
কৈশোরে কিশোরীর বশে,
কাল্ কাটালেম রঙ্গ রসে,
হাস্যেলাস্যে নাচ গানে।
করি যৌবন কালে অর্থ চিন্তা—
তবু চাইনা পরমার্থ ধনে॥ ... (এখন তোমায়—)

বার্ধক্যে এসেছে জরা,
হয়েছি তাজ ঘাটের মড়া,
ডাক দিয়েছে কাল শমনে।
অধম নকুল বলে এ নিদানে—
আমার বন্ধু নাই গোবিন্দ বিনে॥ ··· (এখন তোমায়—)
কল্পনায় আমি মারুতি,
তুমি শ্রীরাম রঘুপতি,
মিনতি করলেম চরণে।
তুমি প্রজারঞ্জন করবে বলে—
নাকি সীতারে দিয়েছ বনে॥ ··· (এখন তোমায়—)
গণ্যমান্য প্রজা যারা,
সীতাহারা হয়ে তারা,
কান্না করে নিশিদিনে।
তুমি গর্ভবতী সীতা সতী—
একটা ধোপার কথায় দিলে বনে॥ ··· (এখন তোমায়—)
মাতা হলে অপরাধী,
করতে পার দণ্ড বিধি,
রাজনীতি আইনের বিধানে।
তুমি কোন্ বিচারে দণ্ড দিলে—
ও তার নির্দোষী গর্ভের সন্তানে॥ ··· (এখন তোমায়—)

নকুলেশ্বর এরকম বহু বহু পদযোজনা করে বিপক্ষ সরকারকে এমন ভাবে আক্রমণ করলেন যে তিনি খুব বিব্রত হয়ে পড়লেন। একে তো নকুলেশ্বর ছেলে মানুষ। তার ওপর আসরে উঠে নির্ভিকচিত্তে নেচে নেচে পদযোজনা করার ক্ষমতা দেখে শ্রোতৃমণ্ডলী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সকলে তাঁকে আশীর্বাদ করতে ও সাধুবাদ জানাতে লাগলেন।

বিপক্ষ সরকার মশাই'র কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী তেমন ভাল ছিল না। হয়তো সেই জন্য তিনি আর আসরে আসতে চাইলেন না। তাঁর দলের ধরতা এসে বলল—আমাদের সরকার মশাইর খুব মাথা ধরেছে। তিনি আর আসরে আসবেন না। অগত্যা নকুলেশ্বর আসর ভেঙ্গে দিয়ে বের হয়ে এলেন।

যারা আগে নকুলেশ্বরকে ছেলেমানুষ বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিলেন, গান

শেষ হলে তারাই বাসাঘরে এসে তাঁকে শতশত ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—আমরা সকলে তোমাকে আন্তরিক আশীর্বাদ করছি—তুমি দিগ্বিজয়ী কবি হও।

নকুলেশ্বর হাঁ না কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলেন। ক্ষণেকপরে কর্তৃপক্ষ এসে বলল—রান্না শেষ হয়েছে, আপনারা স্নানাহার করুন।

স্নান সেরে সরলা ও নকুলেশ্বর আহার করতে লাগলেন। সখের দলের দলপতির কাছে সরকারের আদর যেমন কুলীন জামাইর মতো। বাংলাদেশ মাছ দুধের দেশ। দু'তিনটি পুকুর, দু'একটি দুগ্ধবতী গাই না আছে এমন গৃহস্থ নেই। পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, ক্ষেতের তরিতরকারী—এক কথায় মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ঘরেই আছে প্রচুর পরিমাণে। অতএব আহারের যা ব্যবস্থা করেছে তা বর্ণনাতীত।

খাওয়াদাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সরলা বাড়ীর কর্তাকে বলল—এবার আমাদের ঘরে পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

কর্তা—যাবেন তো বটেই, তবে আপনাদের যথোচিত আদর যত্ন করতে পারলাম না। ঘরে গিয়ে নিন্দামন্দ তো নিশ্চয়ই করবেন। তবু আবার প্রয়োজন হলে যেন আপনাদের পাই। এই বলে বিদায়ের টাকা কয়টি সরলার হাতে দিয়ে বললেন—নকুলবাবু তো এ বায়না অস্বীকারই করেছিলেন; আপনার উৎসাহ না পেলে কিছুতেই আসতেন না এবং আমরাও এ আনন্দ পেতেম না। আপনার জন্যই সব হলো। আপনাকে দেবার মতো আমাদের কিছু নেই—এই সামান্য পুরস্কার গ্রহণ করুন! এই বলে একখানা শাড়ী কাপড় সরলাকে বক্শিশ দিয়ে বললেন—আপনি না এলে নকুলবাবুর ধুয়ায় দোহারী করা আমাদের দ্বারা হতো না।

সরলা আনন্দ সহকারে সেই দান গ্রহণ করল। কর্তা ব্যক্তি বললেন—আপনাদের নৌকা মাঝি ঠিক হয়েছে; চলুন পৌছে দিয়ে আসি।

সরলার মুখে আসরের আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার কথা শুনে নকুলেশ্বরের মার আনন্দ আর ধরে না। তিনি বললেন—আমার আশা ছিল ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলব। তা তো আর হলো না। যদিও বহু কষ্টে ওকে কলেজের দরজা পর্যন্ত পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ও কলেজে ভর্তি না হয়ে কবির দলে ভর্তি হওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহে তার গুরুদেব কুঞ্জবাবুকে নিয়ে বাড়ী এসে আমার অনুমতি চাইল। আমি অনেক রকম বুঝিয়েও যখন ওর মত পরিবর্তন

করতে পারলাম না তখন বাধ্য হয়ে কুঞ্জবাবুর হাতে ওকে সঁপে দিই। তাঁকে বলেছিলাম, আজ হতে এ ছেলে আমার নয়, আপনার। আপনার নাম যেন রক্ষা করতে পারে। এতদিনে বোধ হয় আমার সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। আমি কায়মনে আশীর্বাদ করি, ও যেন একজন নামজাদা কবি হয়ে সকলের মুখ উজ্জল করতে পারে।

তখন সরলা বলল—মা, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে এবার আমরা ঝালকাঠি রওনা হই।

মা বললেন—কথাবার্তায় এবং তোমার ব্যবহারে তোমাকে বুদ্ধিমতী ও নকুলের হিতকামীই মনে করি। কুঞ্জবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত ওর সম্পূর্ণ ভার আমি তোমায় দিলাম। তিনি এলেই তাঁর কাছে পৌছে দেবে। কিন্তু সাবধানে সর্বদা লক্ষ্য রাখবে যেন ও কোন ক্রমে পথভ্রষ্ট না হয়।

মাতাঠাকুরানীর কাছে আদেশ পেয়ে সরলা ও নকুলেশ্বর উভয়েই মাকে প্রণাম করে ঝালকাঠি অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সরলার তত্ত্বাবধানে নকুলেশ্বর

নকুলেশ্বরকে নিয়ে সরলা ঝালকাঠি বন্দরে নিজ বাড়ী এলেন। সরলার অবস্থা বেশ ভাল। প্রচুর সোনাদানা এবং কিছু নগদ টাকা পয়সা তো আছেই তাছাড়া ঝালকাঠি টাউনে আমতলা রাস্তার উপর বিঘা দেড়েক জমির উপর তার বসতবাড়ী। বাড়ীতে আম কাঁঠাল নারকেল সুপারী বাগান। তার মাঝে মনোরম একখানি চৌ-চালা টিনের ঘর। নীচে শাল কাঠের তক্তার পাটাতন করা। ঝালকাঠিতে সে সময় ঐ ধরনের টিনের ঘরেরই খুব প্রচলন ছিল। ঘরে নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী জিনিষপত্র ছাড়া তবলা বাঁয়া এবং একটি অর্গান হারমোনিয়ামও ছিল।

ঘরের পেছনে বাগানের মধ্যে ছোট একটি ঘাট বাঁধা পুকুর। মোটামুটি সব দিক দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি শান্ত পরিবেশ নকুলেশ্বরকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। বাড়ীতে সরলার বুড়ো মা এবং একজন ঝি ছাড়া আর কোন পরিজন ছিল না।

নকুলেশ্বরকে নিয়ে বাড়ী আসামাত্র তার মা বললেন—এসেছিস্ সরি! অনেক দিন যাবত তোর পথ চেয়ে বসেছিলাম। কবে আসবি, কবে তোকে দেখব এইভাবেই দিন গুণে আমার সময় কেটেছে। এখন প্রাণটা একটু শান্ত

হলো। আচ্ছা মা, তোর সঙ্গে এ ছেলেটি কে? বেশ সুন্দর ছেলে ত। ওকে তো আমি চিনতে পারলাম না।

সরলা—ওকে তুমি চিনবে কি করে। ও যে আমাদের দলপতি কুঞ্জ দত্ত মশাই'র প্রিয় ছাত্র—এক রকম পুত্রই বলা চলে। ও যে খুব ভাল কবি হয়ে উঠেছে। ওর গান তো তুমি শোননি। একবার শুনলে আর বাহবা না দিয়ে পারবে না। একদলে থাকি এক আসরে কাজ করি বলে ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। ওর গুণে ব্যবহারে এবং সৎ চরিত্রের জন্য আমি ওকে খুব ভালবাসি। কবির আসরে ও এখন আমার মরাবাঁচার কলকাঠি। আমি যদিও অনেক দিন পর্যন্ত কবি গাই, আর ও নূতন এসেছে, তবু ওই এখন আমাদের মাথার উপরে। ও পেছন থেকে যা বলে দেবে, আমাকে গাইতে হবে। আমরা দোহার আর ও যে 'সরকার'—দলপতির প্রতিনিধি।

মা বললেন—বেশ বেশ, ভাল ছেলে, সোনার ছেলে—এই বলে নকুলেশ্বরের মাথায় হাত দিতেই নকুলেশ্বর তাঁকে প্রণাম করে পদধূলি নিলেন।

মা—বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘজীবী হও। কবি সমাজে সবার উপর স্থান হোক্ তোমার।

তারপর সরলাকে লক্ষ্য করে বললেন—তা তোরা তো এলি, তোদের দলপতি আসেনি?

সরলা—না, মা। আমাদের দল তো আসেনি! আমরা দু'জনই এসেছি।

মা—সে কিরে! দল ফেলে চলে এলি কেন? তবে কি দলপতির সঙ্গে রাগারাগি করে দল ভেঙ্গে চলে এলি? কি সর্বনাশ, তা হলে কুঞ্জবাবু আদালত করবে যে।

সরলা বললেন—না মা, আমরা রাগ করে দল ভেঙ্গে আসিনি। এই ছেলেটির সাংঘাতিক অসুখ করেছিল। বাঁচবার আশা ছিল না। কুঞ্জবাবু তখন বিপদে পড়লেন—অনেকগুলি বায়না নেওয়া হয়েছে। তিনি সে সব গান নষ্ট করে আসতে পারেন না। এই রোগীকেও নৌকায় রেখে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নিরুপায় হয়ে ওর সম্পূর্ণ ভার আমার হাতে সঁপে দিয়ে বললেন—সরলা, ছেলেটি আমার প্রাণের চাইতে প্রিয়। একে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। তুমি এর সেবা শুশ্রূষা আদর যত্ন করবে এবং নিজ দায়িত্বে ওকে নিয়ে ওর মায়ের কোলে পৌঁছিয়ে দেবে। তোমার সঙ্গে আমার ছোট ভাই কেশব যাবে; কিন্তু শত হলেও সে পুরুষ মানুষ; রোগীর সেবাযত্ন তার দ্বারা

তেমন হবে না। তাই তোমার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি এই মরণাপন্ন রোগী নিয়ে ওদের বাড়ী যাই। সকলের প্রাণপণ চেষ্টায় এবং ওর পিতামাতার আশীর্বাদে ওর পুনর্জন্ম হয়েছে বলা চলে।

সরলার মা—বেশ বেশ। ভগবান ওর মঙ্গল করুন। তা তুই যে ওকে নিয়ে এলি ওর মা বাবা কোন আপত্তি করেন নি ?

সরলা—না মা, আপত্তি করবে কেন? বরং আনন্দের সঙ্গেই আমার সঙ্গে আসতে দিয়েছেন। এখানে থেকে ও সব দলের গান বাজনা শুনবে এবং অন্যান্য সরকারের পাঁচালী শুনে নিজেও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে। এ সময় গ্রামে একা বসে থাকলে ও এতদিন যা শিখেছে সব যে ভুলে যাবে। কবির দলের 'সরকার' হতে গেলে ক্রমাগত চর্চার উপর থাকতে হয়। না হলে উন্নতি না হয়ে অবনতি হওয়ার আশঙ্কা। সেজন্য ওর মা বাবা বিনা আপত্তিতে ওকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমিও খুব আগ্রহ করে নিয়ে এসেছি।

সরলার মা—তা বেশ করেছিস, কিন্তু দেখিস ভদ্রলোকের ছেলে, কোন রকম যেন অনাদর অযত্ন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিস। নে, এখন ওর স্নানাহারের ব্যবস্থা কর।

সরলা হাসতে হাসতে বলল—সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। সে দায়িত্ব আমি নিয়েছি বলেই তো ও আমার সঙ্গে এসেছে। তুমি যাও, রান্নার জোগাড় করগে।

মাকে একথা বলে বিদায় দিয়ে সরলা সকৌতুকে নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল—কি হে সরকার মহাশয়, আপনার আহারাদির ব্যবস্থা কি হোটেলে ঠিক করবো, না আমার এখানেই চলবে ?

নকুলেশ্বরের জাতির বা ছুৎমার্গের গোঁড়ামী কোনদিন ছিল না। বিশেষতঃ সরলাকে লোকে শেখ সরলা বলে ; কিন্তু সে সত্যিই মুসলমানের কন্যা নয়। এক মুসলমান রাজমিস্ত্রী রাস্তার পাশে মরা মায়ের বুকের উপর একটি মেয়ে পেয়ে সযত্নে এনে সরলার মার হাতে অর্পণ করে। সেই সরলা। মুসলমান মিস্ত্রী এনে দিয়েছে বলে লোকে শেখ সরলা বলে। যা হোক, নকুলেশ্বর হিন্দু সমাজের জাতির গোঁড়ামীকে আশৈশব ঘৃণা করেন। সরলার প্রশ্নের উত্তরে তাই বললেন—দেখুন আমি তো ওসব জাতাজাতি কোনদিন পছন্দ করি না। কুমিল্লা জিলার গৌরীপুর ঘাটের ঘটনার কথা বোধ হয় আপনার মনে আছে। আমি মানুষের হাতে অন্নজল গ্রহণ করব। জাত ধুয়ে তো জল খেতে আসিনি।

অতএব আমার আহারাদির ব্যবস্থা আপনার এখানেই হবে। অন্য কিছুর প্রয়োজন হবে না।

নকুলেশ্বরের কথায় সরলা খুব সন্তুষ্ট হল এবং সেইদিন থেকে তার থাকা খাওয়ার ভার সরলাই গ্রহণ করল।

পরদিন সকালে একটা অর্গান হারমোনিয়াম দিয়ে সরলা বলল—সকাল বিকাল হারমোনিয়ামের সঙ্গে সুর রেওয়াজ করবে। অবসর সময় তোমার যা মনে হয় লিখবে। আপন মনে পাঁচালী বলবে এবং সর্বদা ঐ চিন্তা করবে। নতুবা সব ভুলে যাবে। লোকে বলে "অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা" অর্থাৎ অভ্যাস না থাকলে জানা বিদ্যাও বিষের মতো হয়। সর্বদা চর্চায় না থাকলে কোন বিদ্যায় উন্নতি করা যায় না, মনে থাকে যেন।

সরলা মাষ্টার মশাই'র মতো যত উপদেশ দিল নকুলেশ্বর সুবোধ বালকের মতো নীরবে সব শুনে অন্য কোন উত্তর না দিয়ে লঘু স্বরে বললেন—আচ্ছা। তিনি পরম আনন্দে থেকে নিয়মিত কাব্য-গীত চর্চা করতে লাগলেন।

উমেশ-যামিনী সকাশে

এভাবে কিছুদিন গেল। একদিন সরলা বাজার থেকে ঘরে এসে নকুলেশ্বরকে বলল—ওগো শুনেছ, উমেশ সরকার ঢাকার 'ফিরা' শেষ করে দল নিয়ে ঝালকাঠি ফিরে এসেছে।

নকুলেশ্বর—তবে আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে গুরুদেবের সংবাদটা জেনে আসি।

এই বলে নকুলেশ্বর উমেশ সরকারের বাড়ী গেলেন। তাকে দেখেই দলের পরিচালিকা 'কালা' যামিনী খুব আদর করে বললেন—এসো এসো ভাই, বসো। তা কেমন আছ? বেশ ভাল আছ ত?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ দিদি, আপনাদের আশীর্বাদে ভালই আছি।

যামিনী—এখানে কোথায় থাক? তোমার গুরুদেব তো ঝালকাঠিতে নেই? তবে কার কাছে আছ? কোন আত্মীয়-স্বজন আছে নাকি?

নকুলেশ্বর—না দিদি, তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন এখানে নেই। আমাদের দলের গায়িকা সরলার বাড়ীতে আছি।

যামিনী—তা বেশ করেছ।

নকুলেশ্বর—উমেশ দাদাকে তো দেখছি না; তিনি কোথায়?

যামিনী—তার শরীরটা ভাল নয়। তিনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। বসো, এক্ষুনি আসবেন।

কথা বলতে বলতেই উমেশ সরকার ঔষধ নিয়ে ফিরে এলেন।

নকুলেশ্বর তাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—শুনলাম আপনার নাকি শরীর ভাল নেই ?

উমেশ সরকার—হ্যাঁ ভাই, আজ দুই দিন যাবত শরীরটা একটু অসুস্থ। তার মধ্যে আবার একটা মুস্কিল বাধিয়ে বসেছি।

নকুলেশ্বর—আবার কি মুস্কিল হলো ?

উমেশ—ঝালকাঠি আসামাত্র আমার দলের পরিচালিকা যামিনীর দীক্ষাগুরু বল্লভ গোসাই এসে ধরেছেন আগামী পরশুদিন তার আখড়া বাড়ীতে এক পালা কবিগান গাইতে হবে। যামিনীও স্বীকার করেছে। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা তাতে আমি গান করতে পারব কিনা সন্দেহ। বিপক্ষে থাকবেন শরৎ সরকার।

উমেশ সরকারের কথা শুনে যামিনী বলল—তুমি এতো ঘাবড়াচ্ছ কেন ? এ অসুখ কি আর থাকবে ? সেরে যাবে। আর একান্ত যদি না-ই সারে তবে আমার এই ভাই নকুলেশ্বরকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবো।

উমেশ সরকার হাসি মুখে বললেন—বেশ, বেশ, সে তো খুব ভাল কথা। নকুলেশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বললেন—কেমন ভাইটি ! যামিনীর এ প্রস্তাবে রাজী আছ তো ?

নকুলেশ্বর—আপনি কি বলছেন ? আমার দ্বারা কি তা সম্ভব ? আমি কিছু জানি না। আমার মাত্র হাতে খড়ি। এ অবস্থায় এত বড় গুরু দায়িত্ব বইবার শক্তি আমার নেই। মিছামিছি আমাকে লজ্জা দেবেন না।

যামিনী—আচ্ছা সে দেখা যাবে। তুমি কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের ছাত্র হয়ে তোমার এত ভীত হওয়া তো উচিত নয়। সে যাক, তুমি সন্ধ্যার পর সরলাকে নিয়ে একবার আসবে, কেমন। কথা দাও, আসবে ?

নকুলেশ্বর—আচ্ছা আসবো। এখন আমার গুরুদেবের খবর কি বলুন।

যামিনী—খবর ভাল। তাঁর কয়েক পালা গানের বায়না নেওয়া আছে। সেই কয় পালা শেষ করেই তিনি দল নিয়ে চলে আসবেন শুনেছি।

শুনে নকুলেশ্বরের খুব আনন্দ হলো। উমেশ-যামিনীকে প্রণাম করে বললেন—তবে এখন আমি আসি।

যামিনী—আচ্ছা এসো ভাই। সন্ধ্যাকালে সরলাকে নিয়ে আসবে কিন্তু।

নকুলেশ্বর সরলার বাড়ী ফিরে এলেন। সরলা জিজ্ঞাসা করল—কি, তোমার গুরুদেবের কোন সংবাদ পেলে?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ পেয়েছি। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই 'ফিরা' শেষ করে চলে আসবেন।

সরলা—বেশ বেশ। তবে তো খুব আনন্দের কথা কেমন!

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ আনন্দের কথা তো বটেই, তবে একটা নিরানন্দের সংবাদও আছে।

সরলা—নিরানন্দ সংবাদ আবার কিসের। কোন দুঃসংবাদ নয়তো!

নকুলেশ্বর—না না, দুঃসংবাদ নয়। আগামী পরশু দিন বল্লভ গোঁসাই-র আখড়ায় এক পালা কবি গান গাইবার জন্য উমেশ সরকার বায়না নিয়েছেন। হঠাৎ তার শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমাকে ধরেছেন তাঁর সেই ঠেকা কাজ চালাবার জন্য।

সরলা—সে তো সুখের কথা, আনন্দের কথা! তা তুমি কি বলে এলে?

নকুলেশ্বর—আমি রাজী হই নি। বলেছি, আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

সরলা—না, তা সম্ভব হবে কেন? ঘোমটা দিয়ে বউ সেজে ঘরের কোণে বসে থাকলেই তো কবি হতে পারবে! এ কাজে 'না' করতে তোমার লজ্জা হলো না! মনে রেখো তুমি কার শিষ্য এবং কি কাজ শিখবার জন্যে এসেছ।

নকুলেশ্বর—সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার মনের অবস্থা আপনি বুঝবেন না। আমি কিছু জানি না, শুনি না। গুরুদেব উপস্থিত নেই। এ অবস্থায় ঝালকাঠি টাউনের উপর কবির আসরে গিয়ে যদি অপদস্থ হই, তবে গুরুদেবকে আর মুখ দেখাতে পারব না।

সরলা—আর কবির আসরে অপদস্থ হওয়ার ভয়ে পিছিয়ে আসায় বুঝি গুরুদেবের মুখ খুব উজ্জ্বল হবে? যাক তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমি উমেশ সরকারের বাড়ী গিয়ে যা বলতে হয় বলে আসব।

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ ভাল কথা, যামিনী দিদি আপনাকে নিয়ে সন্ধ্যার পরে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

সরলা—যাব বই কি, নিশ্চয়ই যাব। এখন যাও, লক্ষ্মী ছেলের মতো স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করগে।

ঝালকাঠি বল্লভ গোঁসাই'র আখড়ায় কবিগান

সন্ধ্যার পরে সরলা নকুলেশ্বরকে নিয়ে উমেশ সরকারের বাড়ী গেল। যামিনী সরলাকে বলল—বসো ভাই সরলা, আমি খুব ঠেকায় পড়ে তোমাকে আসতে বলেছি।

সরলা—আমায় কি করতে হবে বলুন।

যামিনী তার গুরুদেবের বাড়ীতে কবিগানের আয়োজন ও উমেশ সরকারের অসুস্থতার কথা সবিস্তারে জানিয়ে বলল—পূজার পরে ঝালকাঠিতে এই প্রথম কবিগান। নিমন্ত্রণপত্র বিলি হয়ে গেছে। তারিখ পরিবর্তন করতে গেলেও গুরুদেব রাগ করবেন এবং নির্দিষ্ট দিনে গান না হলে গুরুদেবের জাতমান থাকে না। তাই বিপদে পড়ে তোমাকে একটা অনুরোধ করছি। তোমাদের এই 'ডাক সরকার' শ্রীমান নকুলেশ্বরকে দিয়ে আমার এই গানটা রক্ষা করে দিতে হবে। আর তুমিও এই গানে আমার দলের হয়ে গান করবে। তুমি সঙ্গে না থাকলে ও কিছুতেই স্বীকার করবে না।

সরলা—সেজন্য আপনার কোন কিছু ভাবতে হবে না। ওর স্বীকার অস্বীকারে কিছু যায় আসে না, আমি সে ব্যবস্থা করবো। এই বলে যামিনীকে কথা দিয়ে তারা দুজন নিজ আবাসে ফিরে এলেন।

পরদিন সকালে নকুলেশ্বর গলা রেওয়াজ করার পর সরলাকে বললেন—আচ্ছা আপনি যে এত বড় একটা দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এলেন তা আমার দ্বারা উদ্ধার হবে বলে কি আপনার মনে হয়? বিশেষতঃ শরৎ সরকার এক দেশ বিখ্যাত কবিয়াল; তার সামনে দাঁড়িয়ে টপ্পা পাঁচালী বলার মতো শিক্ষা বা সামর্থ্য কি আমার আছে?

সরলা—নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে কেউ কখনো কবি হতে পারে না। চাই তার সঙ্গে মনোবল ও গুরুকৃপা। নিজে কর্তা হতে না গিয়ে গুরুপদে সে কর্তৃত্ব সমর্পণ করে নির্ভয়ে কাজ করে যাবে; যশ অপযশের মালিক তিনি—ইত্যাদি নানা প্রকার উৎসাহ বাক্যে নকুলেশ্বরকে উৎসাহিত করল।

গানের দিন সন্ধ্যার পূর্বে উমেশ সরকার সরলাকে বলে পাঠালেন যে নকুলেশ্বরকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে আহারাদি সেরে সেখান থেকেই একত্রে গানের আসরে যেতে হবে। যথা সময়ে উমেশ সরকারের বাড়ী গিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সকলে গানের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন।

রাত নয়টার মধ্যে বিরাট আসর জমে উঠল। ঠাকুর মন্দিরের সামনে

বিরাট আটচালা ঘর। তার মধ্যে আসর বসেছে। আরতির কাঁসর ঘণ্টা থামার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ সরকার মহাশয়ের দল আসরে প্রবেশ করল।

কালা যামিনী এসে নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল—ভাইটি, তুমি কি প্রশ্নের ভাগে থাকবে, না উত্তরের ভাগে থাকবে। যদি প্রশ্নের দিকে থাকতে চাও, তবে আমাদের দলকে আগে আসরে যেতে হবে। ওরা আগে কি প্রশ্ন করে না করে তার ঠিক নেই।

নকুলেশ্বর—ওরা যখন আসরে গিয়েছে তখন আর ওলট-পালট করা উচিত হবে না। প্রশ্নের চাইতে জবাবের আসরে থাকারই কৃতিত্ব বেশী। তাই আমি জবাবের আসরেই থাকব। গুরু যা করেন তাই হবে।

নকুলেশ্বরের কথা শুনে সরলা একটু টিপ্পনী কেটে বলল—বাঃ বাঃ, এই তো চাই। মহাশয়ের সাহস আছে তবে বলতে হবে!

নকুলেশ্বর—এটা সাহস অসাহসের কথা নয়। তবে কি জানেন—রুই মাছ ধরতে গিয়ে ধীবর বঁড়শীতে টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে বসে থাকে। মাছ এসে টোপ গিলেই সূতা নিয়ে দেয় ছুট্। তার যেদিকে মন চায় মাছ সেই দিকেই ছোটে, তখন তাকে বাগে আনতে ধীবরের খুব বেগ পেতে হয়। ঠিক মতো সূতা দিতে না পারলে মাছ তোলা তো দূরের কথা ধীবরের বঁড়শী সুদ্ধ নিয়ে মাছ পালিয়ে যায়। এও ঠিক তেমনি অবস্থা। প্রশ্নকর্তা একটি প্রশ্নের টোপ ফেলে বসে থাকে উত্তরদাতাকে আটকাবে বলে। কিন্তু উত্তরদাতা তার মনোমত প্রশ্নের জবাব দিয়ে বসেন। এমন ভাবে উত্তর করেন যে প্রশ্নকর্তাকে তার নিজের প্রশ্নের খেই হারিয়ে গিয়ে উত্তর দাতার পেছনে পেছনে ছুটতে হয়। এটা কি কম আনন্দের কথা! তাই গুরুদেব বলেছেন প্রশ্নের চেয়ে জবাবের আসরে থাকাই আমি ভাল মনে করি।

নকুলেশ্বরের কথা শুনে সরলা ও যামিনী খুব আনন্দিত হলো। উমেশ সরকার আসরে যেতে পারবেন না বটে, তবে তিনি এসে বাসাঘরে বিছানা পেতে শুয়েছিলেন। তিনি বললেন—তোমার দৃঢ় মনোবল দেখে আমি সুখী হলাম। গুরুদেব তোমার মান সম্মান রক্ষা করবেন।

শরৎ বৈরাগী বনাম নকুলেশ্বর

জীবনে এই প্রথম নকুলেশ্বর গুরুদেবের সাহচর্য ও পরামর্শ ছাড়া এত বড় গানের আসরে এবং পূর্ববঙ্গে কবিগানের অন্যতম পীঠস্থান ঝালকাঠি বন্দরের

বুকে স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করে গান গাইতে প্রস্তুত হলেন। শরৎ সরকারের দল সমবেত যন্ত্র সঙ্গীত সমাপনান্তে যথারীতি বন্দনা-ডাক গান গেয়ে একখানি "সৃষ্টি রহস্য মালসী" গান ধরল—

মা তুই সৃষ্টি স্থিতি বিধায়িত্রী চণ্ডীতে প্রমাণ।
ও তুই জলচর আর স্থলচর, সৃষ্টি করলি বহুতর,
তাঁর ভিতর তোর মনুষ্য প্রধান॥
শুনি আহার নিদ্রা মৈথুন কাজে,
পশু আর মানুষের মাঝে,
পার্থক্য তো বেশী নয়;
তবে মানুষ কিসে শ্রেষ্ঠ হয়?
বিবেক বুদ্ধি ধর্ম বলে, মানুষ শ্রেষ্ঠ এ ভূতলে,
ধর্ম শূন্য মানুষ হলে, তারে পশু বলে সবে কয়॥
ধর্ম শূন্য হলে পরে পশু বলে তারে,
তবে জেনে শুনে কোন্ বিচারে,
মানুষ যায় অধর্মের পথে।
ইচ্ছাময়ী তুই মা তারা, মানুষ কি তোর ইচ্ছা ছাড়া,
চলে এ জগতে॥
কেউ চুরি ডাকাতি করে, বন্দী থাকে গারদ ঘরে,
কেহ তারে বন্দী করে লয়।
কেহ কারো কাঁধে চড়ে, কেউবা তারে কাঁধে করে,
এ পার্থক্য কার ইচ্ছাতে হয়॥
কেহ গিয়ে স্বর্গে চড়ে, কেহ গিয়ে নরকে পড়ে,
বিচারের ভার কার উপরে,
কলকাঠি তো তোরই হাতে॥

ইত্যাদি পদযুক্ত মালসী গানটি শেষ করে শরৎ সরকারের দল আসরের বাইরে চলে এলো।

কালা যামিনী তার দল নিয়ে আসরে প্রবেশ করল। সরলা আজ একদিনের জন্য এই দলে প্রধান গায়িকা হিসাবে গাইবে। সে যামিনীকে বলল—দিদি, আমাদের নকুলেশ্বর একখানা ডাক-গান তৈরী করেছে সেই গানটা গাইব কি?

যামিনী—তা আবার আমার কাছে জিজ্ঞাসা কর কেন ? তুমিই তো আগে গাইবে, পেছনে শুনে শুনে সবাই গাইতে পারবে। গাও তবে সেই গানখানাই গাও, শুনি কেমন রচনা হয়েছে।

আসরে নমস্কার করে সরলা উঠে সম্মুখে দাঁড়ালেন ; নকুলেশ্বর পেছন থেকে গানের পদগুলো বলে দিতে লাগলেন—

ওহে গৌর হরি, নদীয়া বিহারী,
এসো হে কীর্তন মাঝে।
এ আসরে এসে, নব ভাবাবেশে,
নাচ কীর্তনিয়া সাজে॥ ইত্যাদি

ডাক-গান গাওয়া শেষ হলে সরলা যামিনীকে বলল—যামিনীদি, আমাদের ডাক-গান তো শুনলেন—এখন মালসী গান কি গাইব বলুন।

যামিনী—একটা 'জল প্লাবনের মালসী' গান আছে সেটাই গাইব। এই বলে কালা যামিনী দাঁড়িয়ে গান ধরল—

এবার বঙ্গদেশে কি রঙ্গ তুই করলি শঙ্করী।
হলো মেঘনা-পদ্মায় জলোচ্ছ্বাস,
সবাই করে হা হুতাশ,
কি সর্বনাশ প্রলয়ঙ্করী॥
দেখি মেঘনা পদ্মার সাথে সাথে,
সমুদ্রও উঠলো মেতে,
এক লাগাড়ে দিন পাঁচ সাত ;
হলো জলের কি ভীষণ উৎপাত।
যত ঘর বাড়ী সব নদীর চরে,
জলের স্রোতে ভেঙ্গে পড়ে
দৌলত খাঁ টাউনের উপরে—
জল হয়েছে চৌদ্দ হাত॥
অমাবস্যার সঙ্গে যেমন ভরণী যোগ আসে,
তেমনি মেঘনা পদ্মার সঙ্গে মিশে,
সমুদ্রেও জল ডেকেছে।
কি প্রচণ্ড ঢেউয়ের খেলা,
এত বড় ধ্বংসলীলা, কে কবে দেখেছে॥

জলের স্রোতে ভেসে ভেসে,
কত বাঘ মানুষ একত্রে এসে,
একই বৃক্ষে নিয়েছে আশ্রয়,
তাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি—কেবা কারে খায়।
প্রলয়ঙ্কর বন্যার জলে, এই শিক্ষা পেলেম সকলে,
হিংস্রকেও হিংসা ভোলে, আসন্ন কাল এলে কাছে।
চিল ভেসে যায় জলের স্রোতে, মাছ উঠেছে গাছে॥

গেল ক্ষেতখামার সব জলের তলে,
তার উপরে জাহাজ চলে, জলে স্থলে একাকার;
এখন নদীডাঙ্গা চেনা ভার।
প্রাণ বাঁচাতে কারো ছেলে,
ধরে মরা মায়ের গলে,
প্রবল স্রোতের টানে ভেসে চলে,
পায় না কোন কূল কিনার॥———ইত্যাদি বহু পদ যোজনা করে রচিত জল-প্লাবনের মালসী গানটি গেয়ে কালা যামিনী দল নিয়ে বের হয়ে এল।

শরৎ সরকারের দল পুনঃ আসরে গিয়ে প্রথানুযায়ী সখী-সংবাদ গান না গেয়ে শ্রোতাদের কাছে সরাসরি টপ্পা পাঁচালী আরম্ভ করবেন কি না জানতে চাইলেন। সভার শ্রোতৃবৃন্দ সে প্রস্তাবে রাজী হলেন। শরৎ সরকার টপ্পার লহর আরম্ভ করলেন। শরৎ সরকারের মনের উদ্দেশ্য ছিল সেদিন উমেশ সরকারকে মহাদেবের ভূমিকায় খাড়া করে কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণ মারফৎ রঙ রহস্য করা। তাই তিনি প্রশ্নচ্ছলে বললেন—

অদ্য আমি শরৎ, তুমি উমেশ কবির কল্পনায়।
তুমি ত্যাগ করে কৈলাস কাশী,
কি দুঃখে হয়ে উদাসী,
হয়েছ শ্মশানবাসী, চিতা ভস্ম গায়॥

তোমার ঘরের সতী ভগবতী,
কি জন্যে তার সঙ্গেতে নাইকো মিশ?
কালো যামিনীর সঙ্গে কোন রঙ্গে, আছ অহর্নিশ?

তুমি নিষ্কামী ত্রিপুরারি,
কেন যাও কুচ্‌নী বাড়ী,
কে তোমায় দিল পরামিশ ?
বল, বাপ-ভাতারী মন্ত্র পড়ে,
কি জন্য ওঝায় নামায় সাপের বিষ ?

এই প্রশ্ন উত্থাপন পূর্বক টপ্পার লহর গান শেষ করে শরৎ সরকার ধুয়া ধরলেন—

কও তোমার একি রঙ্গ ভাঙ্গড় ভোলা।
কেন ভূত প্রেতিনী সঙ্গে করে,
পড়ে থাক শ্মশানখোলা॥
ত্যাগ করে সোনার কাশী, কেন হও শ্মশানবাসী,
লোকে বলে বৈরাগী হয় শিব সন্ন্যাসী।
ঘরে অন্নপূর্ণা যার মহিষী—
তার কাঁধে কেন ভিক্ষার ঝোলা ?
বাঘের ছাল অঙ্গে পরা, বিষধর সর্পে ঘেরা,
মড়ার মাথার খুলি কেন হস্তে ধরা ?
খেয়ে সিদ্ধি গাঁজা ভাং ধুতুরা—
নেশায় বল বোঁভোম্ ভোলা॥
বিচার নাই ডোম আর হাড়ী, ত্যাগ করে ঘরের নারী,
কেন নিত্য পড়ে থাক গিয়ে কুচনী বাড়ী ?
যদি ঊর্ধ্বরেতা ত্রিপুরারি—
অঙ্গে কেন কামের জ্বালা ?
শুনতে পাই আর এক কথা, যিনি আস্তিকের মাতা,
তুমি নাকি সেই মনসার জন্মদাতা।
ও সেই কন্যা দেখে জন্মদাতা—
কেন কামভাবে হলে বিহ্বলা ?
সাপে দংশিলে পরে, যেতে হয় ওঝার ধারে,
তারা মন্ত্র পড়ে সাপের বিষ নামাতে পারে।
কেন বাপ-ভাতারী মন্ত্র পড়ে—
ওঝায় বিষ নামাবার বেলা ?—ইত্যাদি

অনেক কথা বলে শরৎ সরকার ধুয়া শেষ করে চলে গেলেন। এখন নকুলেশ্বরকে আসরে যেতে হবে। তিনি যামিনীকে ডেকে বললেন—দিদি, শরৎবাবু তো ব্যক্তিগত নাম ধরে উমেশের কাছে প্রশ্ন করেছেন—আমার নাম তো উমেশ নয়,—আমি কি ভাবে জবাব করবো। আপনি দলের পরিচালিকা। আপনি একটু শ্রোতাদের কাছে উমেশ দাদার অসুস্থতার কথা বলুন। আর আমি যে তার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবো একথাটাও সকলকে জানিয়ে দিলে ভাল হয়। নতুবা আসরে একটা হৈ চৈ হতে পারে।

যামিনী তৎক্ষণাৎ আসরে উঠে হাত জোড় করে বলল—আসরে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী এবং আমার ভক্তিমতী মায়েরা! আপনাদের কাছে আমার একটি নিবেদন—আমাদের দলের দলপতি শ্রীযুক্ত উমেশ সরকার খুব অসুস্থ; আসরে কাজ করার মতো শক্তি নেই। অতএব তাঁর পরিবর্তে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ঝালকাঠির বিখ্যাত কবিয়াল শ্রীকুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র শ্রীমান নকুলেশ্বর আসরে গান করবেন। আপনারা সকলে তাকে আশীর্বাদ করে তার উৎসাহ বর্ধন করবেন এই আমার প্রার্থনা।

সভাস্থ সকলে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আঠার উনিশ বছরের ছেলেমানুষ। গায়ের রঙ ফুটফুটে ফর্সা। তার উপর একটি গরদের পাঞ্জাবী পরে একখানা গরদের চাদর কাঁধে ফেলে যখন আসরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, মনে হল যেন বিয়ের আসরে সেজেগুজে বর এসে দাঁড়িয়েছে।

আসরের চতুর্দিক থেকে হাততালি দিয়ে সকলে নকুলেশ্বরের আগমনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। নকুলেশ্বর তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আসরে বসে মাথা নত করে আসরের সকলকে এবং গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন এবং সরলাকে টপ্পার জবাব গাইবার আদেশ দিয়ে পদ-যোজনা করতে লাগলেন—

অদ্য উমা+ঈশ উমেশ আমি, তুমি শরৎচাঁদ।
শুনি অত্রির সেই নেত্রমলে,
তুমি জন্মেছ ভূতলে,
তাইতে কেতরচাঁদ তোমায় বলে, লোকে অপবাদ॥
আমি অমানিশার নিশাকালে,
শ্মশানে ধ্যানে রই আত্মহারা।
সেই তো কালো যামিনী, থাকিনা যামিনী ছাড়া॥

আমি কুচুনীর ঘরেতে যাই, চৌষট্টি নেশা জন্মাই,
তারাই মোর সাধনের গোড়া।
বলে মনসারে বাপ-ভাতারী,
তোমার ন্যায় জারজ সন্তান হয় যারা॥

এই বলে টপ্পার জবাব শেষ করে নকুলেশ্বর ধুয়া দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় কালা যামিনী নকুলেশ্বরের কানে কানে বললেন—ভাইটি, শরৎ সরকার তো উমেশ আর কালো যামিনীকে নিয়ে খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ করে গেলেন। তাঁর দলের পরিচালিকার নাম কিন্তু 'রাঙা' যামিনী। ঝালকাঠি শহরে যামিনী নামে আমরা দুইজনই আছি। আমি কালো আর সে ফর্সা—তাই লোকে কালা যামিনী ও রাঙা যামিনী বলে। যদি সম্ভব হয় তবে আকারে ইঙ্গিতে একটু খোঁচা দিয়ে দিও।

কালা যামিনীর কথা শুনে নকুলেশ্বর খুব উৎসাহ পেয়ে ধুয়া ধরলেন

(ঝাঁপতাল)

বল ওহে শরৎচন্দ্র, জন্ম তোমার কার উদরে?
শুনি পিতা তোমার অত্রি মুনি, মাতা কেবা কও আমারে॥
ক্ষেত্রে বীজ বুনিলে পরে, শস্য জন্মে ক্ষেত্রের জোরে,
ক্ষেত্র নিজে এ সংসারে, কোথায় চাষ করে।
রজে বীজে ঐক্য হলে,
জন্মে কন্যা জন্মে ছেলে,
পুত্র জন্মে নেত্রমলে,
কে শুনেছে এ সংসারে।
অন্নপূর্ণা আমার নারী, আমি কেন ভিক্ষা করি,
গোবিন্দ প্রেমের ভিখারী করেছেন মোরে॥
গুরু কৃপা লাভের লাগি,
আমি সেজেছি বৈরাগী,
ভোগ ছেড়ে হয়েছি ত্যাগী,
থাকব না ভোগের বাজারে॥
কৈলাশ কাশী পরিহরি, শ্মশানে দিই গড়াগড়ি,
বৈষ্ণবের ভাব গ্রহণ করি, ভোগবিলাস ছেড়ে।

শ্রেষ্ঠ ফুলের গেঁথে মালা,
সাজাই বনমালীর গলা,
মহানন্দে পাগলা ভোলা—
হাড়ের মালা থাকি পরে ॥

শ্রেষ্ঠ ভূষণ শ্যামকে দিয়ে রাজরাজেশ্বর সাজাইয়ে,
ব্যাঘ্র চর্ম অঙ্গে নিয়ে বেড়াই সংসারে।
চর্ব চোষ্য খাদ্য যত,
কৃষ্ণ নামে নিবেদিত,
ভাং ধুতুরা অবিরত
খেয়ে থাকি নেশার ঘোরে ॥

সর্বত্যাগী না হইলে গোবিন্দ প্রেম নাহি মিলে,
তাইতে শিব সর্বস্ব ফেলে শ্মশানে ফিরে।
হস্তে নিয়ে মড়ার খুলি,
স্কন্ধে নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি,
বো ব্যোম বো ব্যোম শব্দ তুলি
ডাকি সে পরমেশ্বরে ॥

বিচার নাই ডোম আর হাড়ি ঘুরে বেড়াই সবার বাড়ী,
অপরূপের স্বরূপ হেরি সবার ভিতরে।
জন্মাতে চৌষট্টি নেশা,
কুচ্‌নী বাড়ী যাওয়া আসা,
ভজনের চৌষট্টি দশা—
চৌষট্টি নেশার ভিতরে ॥

মনসা আস্তিকের মাতা জরৎকারুর হয় বণিতা,
তার নামে ঐ কুৎসা কথা বলে ইতরে।
আমার কন্যা বিষহরি,
আমি তারে বক্ষে ধরি,
তারে বল বাপ্‌ ভাতারী—
জন্ম দোষে কর্ম ফেরে ॥

উমেশ কালো যামিনীতে, মিলন হলেম মতে মতে,
তাই নিয়ে আজ খোঁটা দিতে, এলে আসরে।

শরতের জ্যোৎস্না রজনী,
নামটি যার 'রাঙা' যামিনী,
কি সম্পর্ক বল শুনি—
রও 'রাঙা' যামিনীর ঘরে ॥

কেন সে যামিনী ফেলে গুরুপত্নীর ঘরে গেলে,
বুধের জন্ম দিয়ে এলে তারার উদরে ॥
বৃহস্পতি জেনে যোগে,
তোমায় শাপ দিয়েছে রাগে,
যক্ষা রোগে মরবে ভুগে,
গুরু দার হরণের তরে ॥

যক্ষা রোগের ডরে ডরে ছুটে এসে কৈলাসপুরে,
রক্ষ মাং বলে আমারে বললে কাতরে।
দুরন্ত যক্ষার কবলে,
তোমাকে বাঁচাব বলে,
অর্ধচন্দ্র রেখে ভালে—
রক্ষা করলেম যক্ষার করে ॥

গুরু পত্নী করে হরণ, করলে যে পাপের আচরণ,
সে কলঙ্ক করতে মোচন বলো কে পারে।
ঘুচালেম রোগের আতঙ্ক,
তবু গেলনা কলঙ্ক,
শশাঙ্কের অঙ্গে মৃগাঙ্ক—
গুরু পত্নী হরণ করে ॥

এই ভাবে নকুলেশ্বর অনেক পদ যোজনা করে ঘণ্টা দুই ধরে ধুয়া সহযোগে পাঁচালী বক্তৃতা শেষ করলেন। পূর্ব বাংলার কবিয়ালরা উপস্থিত ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অনুযায়ী পদ রচনা করে গান করেন। পূর্বে কোন চিন্তা ভাবনা করে লিখে নেন না। কাজেই তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা পাঁচালী এক টেপ রেকর্ড ভিন্ন কাগজ কলমে ধরে রাখার সাধ্য বোধ হয় স্বয়ং গণপতিরও নেই।

জোটের পাল্লা—শরৎ বৈরাগী নাকাল

যাক সে কথা। নকুলেশ্বরের পাঁচালী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্য হতে এক ভদ্রমহিলা উঠে বললেন—এখন আমরা দুই "সরকারের" একত্রে জুড়ির পাল্লা শুনতে চাই। বিষয়টি হবে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ লীলা। নকুল সরকার রাখাল হয়ে মা নন্দরানী-রূপী শরৎ সরকারের কাছে গোপালকে গোষ্ঠে যেতে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করুক।

সভার সকল শ্রোতা সেই মত সমর্থন করলেন ; নকুলেশ্বর উঠে ধুয়া দিলেন—

সাধে কি তোর গোপালে চাই মা—শোনগো যশোদে।
মা তোর গোপাল বিনে গোচারণে, মোদের বন্ধু নাই মা—
—শোনগো যশোদে॥

দূর বনে যদি যায় ধেনু, মা তোর জীবনের কানু,
বাঁশী স্বরে ফিরায় ধেনু, বনে অন্ন পাইমা
—শোনগো যশোদে॥

এক নারী সিংহেতে চড়ে, আসে বনের ভিতরে,
আদর করে গোপালেরে, বক্ষেতে ধরে।
ননী খাওয়ায় দশ করে, আমরা দেখতে পাইমা—
—শোনগো যশোদে॥

শরৎ সরকার মহাশয় উঠে নন্দরানী হয়ে পদ দিলেন—

অদ্য রজনী ঘোরে, দেখলেম স্বপ্নের ভিতরে,
কংস চরে যেন আমার কানাইকে মারে।
তাইতে বনে দিতে কানাইয়ারে মনে ইচ্ছা নাই মা—
—শোনগো যশোদে॥

শরৎ সরকার যেই মাত্র এই পদটি গেয়েছেন নকুলেশ্বর অমনি ধুয়া ছেড়ে দিয়ে হাত জোড় করে শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বললেন—আমার মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী ! আপনারা জানেন পূজনীয় শরৎ সরকার মহাশয় একজন নামজাদা কবি এবং মহৎ ব্যক্তি। আমি শুনেছি শাস্ত্রে বলে—

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপটব।
মহতের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

অর্থাৎ ভ্রম অর্থে ভুল, প্রমাদ অর্থে যা সেখানে খাটেনা তাই বলা, বিপ্রলাপ

অর্থ লোক ঠকাবার ইচ্ছা, আর করণাপটব অর্থ কানের অপটুতা, অর্থাৎ এক বললে আর শোনা ইত্যাদি চারটি দোষ মহতের বাক্যে থাকেনা। কিন্তু আজ আমার পূজনীয় শরৎ সরকার মহাশয় যেন সেই প্রমাদের বশবর্তী হয়ে যা খাটেনা তাই খাটিয়ে আপনাদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছেন। লক্ষ্য করুন—আমি রাখাল হয়ে মা যশোদার কাছে গোপালকে বনে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করি বলে আমার ধুয়াটার শেষ দিকে মিলে বললাম—'কানাই নিতে চাই মা, বনে অন্ন পাইমা,' ইত্যাদি। কিন্তু শরৎ সরকার মাহাশয় যে শেষ মিলে বললেন—'বনে দিতে কানাইয়ারে মনে ইচ্ছা নাই মা'—এই 'মা' শব্দটি তিনি কার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করলেন। আমরা রাখাল হয়ে নন্দরানী মাকে মা বলে সম্বোধন করছি। তিনি নন্দরানী হয়ে মিল দেওয়ার গরজে কাকে 'মা' বললেন দয়া করে একটু জিজ্ঞাসা করুন।

নকুলেশ্বরের কথা শুনে শ্রোতাদের যেন চৈতন্য হলো। ঝালকাঠির বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রোতা দুর্গাপ্রসন্ন ডাক্তার শরৎ সরকারকে ডেকে বললেন—হাঁরে ও শরৎ, নকুল রাখাল আর তুমি যশোদা। রাখাল তো তোমাকে মা সম্বোধন করে ধুয়া দিয়েছে ; তুমি মা হয়ে কাকে 'মা' বলে ধুয়ার মিল দিলে ?

শরৎ সরকার যদিও খুব লজ্জিত হলেন, তবু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বললেন —দেখুন এখানে কোন সম্পর্কের কথা নয়, মিল নিয়ে কথা। সে যখন ধুয়ার মিলে 'মা' রেখেছে আমারও ত 'মা' বলে মিল দিতে হবে।

নকুলেশ্বর—আচ্ছা মাননীয় সরকার মহাশয়, মিলের গরজে কি লিঙ্গালিঙ্গ ভুল করে সম্পর্কের তোয়াক্কা না করে ছেলেকেও 'মা' বলতে হবে ? ধরুন কেহ যদি আয়ান মামা হয়ে ভাগিনেয় কৃষ্ণকে বলে যে—

'আজ আমার বিয়ের কালে, আয় কোলে আয় কৃষ্ণ বাবা।'

তখন উত্তরে কৃষ্ণ কি মামাকে বলবে—

'তোমরা দুই ধারেতে দু'জন বস, মাঝখানেতে বসব বাবা।' মাতুল মশাই ভাগিনেয়কে 'বাবা' বলে মিল দিয়েছে বলে মিলের গরজে ভাগনে মশাই মামাকে 'বাবা' বলবে নাকি ? মিলের শেষে 'বা' আছে বলেই যে বাবা বলতে হবে এ কথার কোন অর্থ হয়না। আমি হলে বলতেম—

(১) তোমরা দুই ধারেতে দুই জন বস,

মাঝখানে আমায় বসাবা। অথবা—

(২) মামা তোমার মাথার বিয়ের মুকুট,

আমার মাথায় তুলে দিবা। ইত্যাদি—

বা-অন্ত শব্দ দিলেই তো ধুয়ায় মিল হয়ে গেল। মামাকে বাবা বলতে যাব কেন? তেমনি আমার গোষ্ঠের পালায় ধুয়ায় 'মা' মিল আছে বলেই কি ছেলেকে মা বলতে হবে? ওখানে বলা উচিত ছিল যে—

(১) আজ নিশিতে কুস্বপ্ন দেখে, দুশ্চিন্তার নাই সীমা।

(২) আজ তোরা সবে যা গে বনে—কানাইকে কর ক্ষমা।

(৩) আজ কানাইকে যেতে বলেছে, ওর সে আয়ান মামা।

সীমা, ক্ষমা, মামা এইসব শব্দান্তক মিল না দিয়ে রাখালকে মা ডাকা যে কোন্ দেশী কবিত্ব তা শরৎ বাবুই জানেন। আমার গুরুদেব আমাকে ও রকম শিক্ষা দেন নি।

নকুলেশ্বরের এই যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে শরৎবাবু খুব লজ্জিত হলেন। হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্যে আসরটি ভেঙ্গে গেল। পথে পথে অগণিত শ্রোতার মুখে নকুলেশ্বরের জয় জয়কার শুনতে শুনতে নকুলেশ্বরকে নিয়ে সরলা বাড়ী ফিরে এলো। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সরলা নকুলেশ্বরকে বলল—কি, কেমন মনে হল? গুরুদেবের মুখ রক্ষা হয়েছে তো? সাবধান! আর কখনো কবির আসরে যেতে ভয় করবেনা। গুরুনাম নিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে আসরে যাবে। দেখবে তাঁর কাজ তিনিই করবেন; তুমি উপলক্ষ মাত্র।

এই গানের কথা শ্রোতাদের মুখে মুখে সমগ্র ঝালকাঠি শহরে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ বলল—দেখেছ ছেলেটার সাহস; এতবড় একজন নামকরা সরকারকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল না। আবার কেউ বলল—হবে না কেন? শিষ্যটি কার তা তো দেখতে হবে। ঐ কুঞ্জ দত্ত মশাই সামান্য একজন ধরতা হিসেবে বিধু সরকারের দলে গান করতে এসেছিল। কিছু দিনের মধ্যে অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায় বলে বিধু সরকারের প্রধান শিষ্যরূপে পরিচিত ও পরিগণিত হয়েছিলেন। আর এখন ত তিনি দিগ্বিজয়ী সরকার। তাঁর কাছে যখন ও শিক্ষা পাচ্ছে দেখবে অল্প দিনের মধ্যে ও একজন শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের স্থান অধিকার করবে।

কুঞ্জবাবু ঝালকাঠি আসামাত্র লোকের মুখে মুখে নকুলেশ্বরের কৃতিত্বের কথা শুনলেন। ঝালকাঠির স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাচীন আদর্শ কবি শরৎ বৈরাগীর

বিরুদ্ধে কবির আসরে অবতীর্ণ হয়ে নির্ভিক চিত্তে কিভাবে বাক্যযুদ্ধে জয়লাভ করেছেন তা শুনে কুঞ্জবাবুর আনন্দের সীমা রইল না।

নকুলেশ্বর এসে গুরুপদে প্রণাম করতেই কুঞ্জবাবু তার মাথায় হাত রেখে বললেন—কিরে নকুল! শরৎ সরকারকে নাকি খুব অপদস্থ করেছিস?

নকুলেশ্বর—না বাবা, ওসব মিথ্যা কথা। আমি কিই বা জানি যে শরৎ সরকারের মতো 'সরকারকে' অপদস্থ করবো। তবে আসরে প্রশ্নোত্তরের সময় যেভাবে যে ভাষা প্রয়োগ করার পদ্ধতি আপনার কাছে শিখেছি আমি শুধু তাই অবলম্বন করেছি। নিজের ব্যক্তিত্বে কিছুই করিনি।

কুঞ্জবাবু—বেশ বেশ। শুনে সুখী হলাম। সর্বদা স্মরণ রাখবে মানী লোকের অপমান করা কবির ধর্ম নয়। কবির আসরে কাব্যরসের সৃষ্টি করে শ্রোতার মনোরঞ্জন করে বাহবা অর্জনই হচ্ছে কবির ধর্ম। কারো মনে ব্যথা দিয়ে কোন কথা বলবে না। উপস্থিত বুদ্ধির কৌশলে কল্পনার জাল সৃষ্টি করে বিপক্ষ কবিকে বন্দী করে যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

নকুলেশ্বর—আপনার আদেশ যেন পালন করে চলতে পারি, এ আশীর্বাদ করবেন।

কুঞ্জবাবু—তোমার বাসনা পূর্ণ হোক। যাক, ঝালকাঠি এসে এতদিন কোথায় ছিলে?

নকুলেশ্বর—সরলার বাড়ীতেই ছিলাম। আমার যতদিন অসুখ ছিল তিনি আমাদের বাড়ীতে থেকে প্রাণপণে আমার সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। অসুখ ভাল হবার পর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঝালকাঠি এসেছেন। এতদিন তার বাড়ীতেই আমার থাকা খাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কুঞ্জবাবু-বেশ, বেশ। সরলা তোমাকে স্নেহ করে। ওর প্রাণে দয়া মায়া আছে জেনেই তোমার অসুখের সময় ওকে সঙ্গে দিয়ে তোমাকে তোমাদের বাড়ী পাঠিয়েছিলাম।

নকুলেশ্বর—মা তো আমার জ্বরের অবস্থা দেখে খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। সরলাই মাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওর অসুখ না সারা পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো। ও দিনরাত আমার জন্য যা করেছে বোধ হয় জীবনেও সে ঋণ শোধ করতে পারব না।

কুঞ্জবাবু—আরো কিছুদিন তুমি ওর বাড়ীতেই থাক। আমি অনেকদিন হলো বাড়ী ছেড়ে এসেছি। এখন একবার বাড়ী যাওয়া দরকার। দু চার

দিনের মধ্যেই বাড়ী যাব। এখানে যামিনী রইল। কোন বায়না এলে তা ধরবে। আমি দশ পনের দিন পরেই ফিরে আসব।

কুঞ্জবাবু এই বলে সাময়িকভাবে দল বন্ধ করে বাড়ী চলে গেলেন। নকুলেশ্বর সরলার বাড়ীতেই আছেন। চার পাঁচ দিন পর খুলনা জেলার ন'পাড়া পীলজং থেকে একটি গানের বায়না কুঞ্জবাবুর মোকামে এলো—বারোয়ারী কালীপূজা উপলক্ষে সেখানে কবিগান করার জন্য।

খুলনা ন'গাঁও পীলজং-এর বায়না

মাঘ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত খুলনা, ফরিদপুর, যশোহর—এই তিনটি জেলায় অজস্র বারোয়ারী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এবং সে সব পূজার প্রধান অঙ্গই হলো কবিগান। কবিগান না হলে নাকি পূজার অঙ্গভঙ্গ হয়। মা কালী না কি সে পূজা গ্রহণ করেন না—এই ছিল পূজানুষ্ঠানকারীদের ধারণা। কাজেই কবিগানের দল বায়না না করে পূজার দিন স্থির করা হতো না।

বায়না করতে যে ভদ্রলোক এসেছেন তার নাম সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। কুঞ্জবাবুর নাকি কি আত্মীয় হন। তিনি এসে যখন শুনলেন কুঞ্জবাবু দল বন্ধ রেখে বাড়ী চলে গেছেন তখন খুব নিরুৎসাহ হয়ে দলের কর্ত্রী অধরমণির কাছে বললেন—বড় আশা করে এসেছিলাম কুঞ্জবাবুকে বায়না করতে। এবার আমাদের পূজা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খুব জাঁকজমকে পূজা করবেন। কমিটির একপক্ষ ফরিদপুরের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল মনোহর সরকার মহাশয়কে বায়না করেছেন। অন্য পক্ষ আমাকে পাঠিয়েছে কবি-সিংহ কুঞ্জ দত্ত মহাশয়কে বায়না করবার জন্যে। ভেবেছিলাম এবার বাঘ-সিংহের লড়াই দেখবো, কিন্তু ভাগ্যে হলো না।

অধরমণি বললেন—আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হচ্ছেন কেন? আপনাদের গানের তারিখ কবে? আমাদের দলপতি দশ পনের দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন।

সুরেনবাবু—মাঘ মাসে আমাদের গান। আগেই বায়না করা দরকার, তাই এসেছি।

অধরমণি—তবে আপনি নিশ্চিন্ত মনে বায়না করে যেতে পারেন। যামিনী নন্দীকে বললেন—এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে বায়না রাখ।

যামিনী নন্দী খরচখরচা হিসেব করে বলল—আপনাদের ন'পাড়া পীলজং এক পালা গানে খোরাকী যাতায়াত ব্যয় বাদে দুই শ' এক টাকার কমে বায়না নেওয়া যায় না।

সুরেনবাবু—টাকার জন্তে ভাবছেন কেন? আমরা তাই দেব। তবু যে এবার আমাদের কমিটির আশা পূর্ণ হবে সেটাই সুখের কথা। এই বলে তারিখ নির্দিষ্ট করে সুরেনবাবু চুক্তিপত্রে লিখে নিয়ে চলে গেলেন।

বিকাল বেলা যামিনী নন্দী সরলার বাড়ী গিয়ে নকুলেশ্বরকে বলল—তোমার গুরুদেব তো দল বন্ধ করে বাড়ী চলে গেছেন। এদিকে আমি যে এক পালা গানের বায়না নিয়ে বসেছি।

নকুলেশ্বর—কোথায়?

যামিনী—খুলনা জেলায় ন'পাড়া পীলজং ঘোষবাবুদের বারোয়ারী খোলায়।

নকুলেশ্বর—বিপক্ষে কোন্ দল থাকবে?

যামিনী—ফরিদপুরের বাবা কবি মনোহর সরকার।

নকুলেশ্বর—গানের তারিখ কবে?

যামিনী—৮ই মাঘ রাত্রে গান।

নকুলেশ্বর—গুরুদেব তো এইমাত্র দেশে গেলেন। যদি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে না আসেন তবে কি করবেন?

সরলা এতক্ষণ চুপ করে দুই জনের কথোপকথন শুনছিল। হঠাৎ নকুলেশ্বরের দিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল—সরকার মশাই যেন ভারী দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন! এমন মেয়েলী মন নিয়ে কি আর 'সরকার' হওয়া যায়? মনে একটু সাহস বল রাখতে হয়।

নকুল—আমি যে কেন চিন্তা করছি আপনি তা বুঝবেন না। শুনেছি খুলনা জেলা কবিগানের রসজ্ঞ গায়ক ও শ্রোতার জন্য প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ বিপক্ষে ফরিদপুরের জাঁদরেল কবি মনোহর সরকার মহাশয়কে বায়না করেছে। এমতাবস্থায় বাবা যদি সময়মত না আসেন তবে যামিনীদা যে বড় বিপদে পড়বেন। কেমন করে দল নিয়ে যাবেন। 'সরকার' পাবেন কোথায়?

সরলা হাসতে হাসতে বলল—সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। অন্য 'সরকার' না পাওয়া গেলে আমি নিজেই সরকারী করবো, কি বলেন যামিনীদা! যামিনী নন্দী নকুলেশ্বরকে লক্ষ্য করে বলল—তা তো বটেই, সরকারী শিখতে এসেছ, মনে এতো দুর্বলতা রাখলে চলবে কেন? সরলা তো ঠিকই বলেছে, মেয়েলী মন নিয়ে 'সরকার' হওয়া যায় না, কবি হওয়া যায় না। মনে সর্বদা উদ্যম উৎসাহ উদ্দীপনা থাকা চাই; ভয় করলে চলবে কেন?

সরলা—আপনি জানেন না যামিনীদা, এ লোকটাকে বিধাতা পৌরুষহীন

পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। লোকে বলে উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ; কিন্তু এ লোকটার যেন উদ্যোগ বলতে কিছু নেই। সেদিন শরৎ সরকারের সঙ্গে এক পালা গান করতে হবে শুনেই তিনি একেবারে হতচৈতন্য। কিছুতেই সে রাজী হতে চায় না। শেষে আমি কত ভূতের ঝাড়া সরষে-পড়া দিয়ে তার সে কাপুরুষতা-ভূতটাকে তাড়িয়েছিলাম বলে ঝালকাঠিতে আজ দশ জনের মুখে মুখে ওর সুনাম সুখ্যাতি। কই, আমার নাম তো কেউ করে না!

যামিনী—যাক, ভাবনার কোন কারণ নেই। আজই আমি কর্তাবাবুর কাছে পত্র দিয়ে গানের সংবাদ জানিয়ে দিলে সময়মতো তিনি নিশ্চয় এসে পৌছবেন।

যামিনীকান্ত বাসায় গিয়ে কুঞ্জবাবুর কাছে পত্র দিলেন। কুঞ্জবাবু পত্র পেয়ে গানের চার পাঁচ দিন পূর্বে ঝালকাঠি এসে যামিনী নন্দীকে বললেন—কোথায় বায়না নিয়েছ দেখি!

যামিনী নন্দী চুক্তিপত্রের বই বের করে কুঞ্জবাবুর হাতে দিল। বায়না কারক সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম দেখেই কুঞ্জবাবু বললেন—যামিনী, তুমি খুব ভুল করেছ। এ গানে তো আমার যাওয়া হবে না। এ যে আমার শ্বশুরের দেশ; বিশেষত ঘোষবাবুরা আমার আত্মীয়। তাদের আসরে আমি কবিগান করতে পারব না।

যামিনী—সে কি কথা! আত্মীয়ের বাড়ীতে গান করতে দোষ কি?

কুঞ্জবাবু—তুমি জাননা যামিনী, আমার বিবাহের অনেক পরে আমি গান করতে আরম্ভ করি। হয়তো লোকমুখে তারা শুনেও থাকবে যে আমি কবিগান করি। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কবিগান করতে পারব না। তুমি টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারে বায়নার টাকা ফেরৎ দাও।

যামিনী—ফেরৎ দেওয়াটা কি উচিত হবে? তারা জানে যে আপনি কবিগান শিক্ষা করে উত্তম কবিয়াল বলে পরিচিত হয়েছেন। তাই তারা সকলে পরামর্শ করে ফরিদপুরের বাঘা কবি মনোহর সরকারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য আপনাকে বায়না করেছেন। এ অবস্থায় আপনি না গেলে তাদের বড় মুখ ছোট হয়ে যাবে যে!

কুঞ্জবাবু—তবে তুমি আমাকে কি করতে বল?

যামিনী—আমি বলি কি বায়নাটা ফেরৎ না দিয়ে দল নিয়ে চলুন সেখানে

যাই। আপনি যদি আসরে যেতে লজ্জা পান, আপনার শিষ্য-পুত্র শ্রীমান নকুলেশ্বর আছে। আপনি পেছনে থেকে তার দ্বারা কাজ করাবেন।

কুঞ্জবাবু—তুমি যেমন পাগল! মনোহর সরকারের নামে খুলনা ফরিদপুরের অন্যান্য কবিয়াল সকলেই থর কম্পমান। তার বিপক্ষে দাঁড়াবে একটা হাতে-খড়ি দেওয়া ছেলে! মনোহর সরকার একটা মুখ ভেংচি দিলে ও পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।

যামিনী—আপনি ও ছেলেটাকে যত হাল্কা মনে করেন ও তত হাল্কা নয়। এই কয়েকমাসে ওর যা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি তাতে আমার মনে হয় ওর মধ্যে একটা গুপ্ত-শক্তি নিহিত আছে। ও ভয় পাবার মত ছেলে নয়।

কুঞ্জবাবু—তা তুমি যাই বল যামিনী, আমি ওর ওপর নির্ভর করে দল নিয়ে যেতে পারিনা। শেষে আমাকে নিয়েই টানাটানি পড়বে। আচ্ছা, তুমি যাও—নকুলকে ডেকে আন তো।

যামিনী নন্দী সরলার বাড়ী গিয়ে নকুলেশ্বরকে বললেন—নকুল, তুমি যা বলেছ তাই হয়েছে। ন' পাড়ার বায়না তো রক্ষা করা গেল না।

নকুলেশ্বর—কেন? গুরুদেব আসেন নি বুঝি।

যামিনী—এসেছেন বটে। কিন্তু তিনি সে আসরে গান করতে পারবেন না। সেটা তাঁর শ্বশুরের দেশ। ঘোষবাবুরা তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাদের মাঝে তিনি কবিগান করতে অনিচ্ছুক।

নকুলেশ্বর—এখন তবে কি সিদ্ধান্ত করলেন?

যামিনী—বায়না ফেরৎ দিতে বলেছেন।

সরলা—কর্তাবাবুর কথা মতো আপনিও বায়না ফেরৎ দেওয়া স্থির করলেন নাকি?

যামিনী—কি আর করব? আমি ত আর সরকার নই যে আসরের কাজ চালিয়ে দেব। বায়না ফেরৎ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তবে তিনি একবার নকুলেশ্বরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই আমি নকুলকে নিয়ে যেতে এসেছি।

সরলা—ওকে একা নিয়ে গেলে কোন কাজ হবে না। গুরুর লজ্জা আর চেলার ভয় মিলে সব পণ্ড হবে। চলুন আমিও যাব। দেখি কি হয়।

সরলা, নকুলেশ্বর ও যামিনী নন্দীকে নিয়ে কুঞ্জবাবুর বাড়ী গেলেন। কুঞ্জবাবু বললেন—দেখতো সরলা, যামিনী কি একটা অনর্থ বাধিয়ে বসেছে।

আমার অজ্ঞাতে আমার শ্বশুরের দেশে একটা বায়না নিয়ে বসেছে। এখন কি করি বল দেখি!

সরলা—আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দাঁড়াতে যদি আপনার লজ্জা হয়, তবে নকুলেশ্বরকে দিয়ে কাজ করাতে পারেন। আপনি স্বয়ং আসরে দেখা না দিয়ে আড়াল থেকে ওকে যুক্তি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন।

কুঞ্জবাবু—যামিনীও ঐ কথাই বলে। কিন্তু তোমরা যে যাই বল, আমার মনে বিশ্বাস হয় না যে ও মনোহর সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমানে বাদ প্রতিবাদ করতে পারবে?

সরলা—আপনি ওর কাছেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না, ও কি বলে?

কুঞ্জবাবু—কিহে নকুল, শুনলে তো সব। এই গানে আমি আসরে যাব না। তুমি মনোহর সরকারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পাল্লা দিতে পারবে?

নকুলেশ্বর—আপনি যদি অনুমতি করেন আমি বাঘের সামনে যেতেও ভয় করিনা। আমি তো আমার ব্যক্তিত্বে কাজ করবো না, আপনি যা বলাবেন তাই বলবো, যা করাবেন তাই করবো। আমার আবার ভয় কি?

নকুলেশ্বরের কথা শুনে কুঞ্জবাবু খুসী হয়ে বললেন—কেবলমাত্র গুরুর উপর ভরসা করলে চলবে না, নিজের উপরও আস্থা থাকা চাই।

যা হোক, নির্দিষ্ট তারিখের আগের দিন ঝালকাঠি হতে দলসহ পান্‌সী নৌকায় করে খুলনা জিলার ন'পাড়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

গানের দিন বেলা দশটায় নৌকা গিয়ে ন'পাড়ার ঘাটে পৌছল। কুঞ্জবাবু বললেন—দেখ নকুল, আত্মীয় স্বজনের ঘাটে এসে আমার তো নৌকায় থাকা শোভা পায় না। আমি কুটুম্ববাড়ী চললাম। দলের ভার যামিনী আর তোমার উপর রইলো। চাকর মাঝি নিয়ে ঘোষবাবুদের বাড়ী গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলেই তারা চাল, ডাল-তেল, নুন সব দিয়ে দেবেন। তোমরা পান্‌সীতে এনে রান্না করে খেয়ে বিশ্রাম কর। রাত দশটায় গান আরম্ভ হবে। গানের পূর্বে যদি আমি না আসি আমার জন্য অপেক্ষা না করে নির্দিষ্ট সময় গান শুরু করবে।

নকুলেশ্বর—সেজন্য আপনার ভাবতে হবে না। আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব আমি তার ত্রুটি করব না। তবে লক্ষ্য রাখবেন যেন অকূলে ডুবে না মরি।

কুঞ্জবাবু চলে গেলেন। নকুলেশ্বর তাঁর নির্দেশ মতো ঘোষবাবুদের সঙ্গে

দেখা করে দ্রব্যসামগ্রী এবং জিনিষপত্র এনে রান্নার জোগাড় করে দিলেন। রান্না করে আহারাদি সারতে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। সকলে একটু বিশ্রাম করলেন। সন্ধ্যার পরে নকুলেশ্বর যামিনী নন্দীকে বললেন—দাদা, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে ?

যামিনী—অবেলায় খাওয়া হয়েছে। রাত্রে আর রান্নার প্রয়োজন হবেনা। জলখাবারের ব্যবস্থা করলেই চলবে।

সন্ধ্যার পরেই মনোহর সরকারের দলও এসে পৌছল।

পীলজং কালীবাড়ীর গান

ঘোষবাবুদের কালীবাড়ীটা নদীর পাড়ে চামারে নামক একটা শ্মশানে। এটা তাদের পূর্বে পুরুষদের ব্যবস্থা। সেখানেই কবিগান হয়। নকুলেশ্বর স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা মশাই, বাবুদের বাড়ীতে নাটমন্দির থাকতে এই শ্মশান খোলায় গানের ব্যবস্থা কেন ?

সে ভদ্রলোক বললেন—আগের দিনে খেউড় কবি হতো। অশ্রাব্য ভাষায় আদিরস প্রধান আলোচনা হতো বেশী। মেয়েরা তো দূরের কথা পিতাপুত্রে একত্র হয়েও সে গান শুনতে যেতেন না। লোকে বলতো—'কবি শোনে খবিশে' (নোংরা প্রবৃত্তির লোক)। সে জন্যই এই জনমানব শূন্য শ্মশানে কবিগানের আসর বসতো। সেই থেকে এই প্রথাই চলে আসছে।

শুনে নকুলেশ্বর আর কোন উত্তর দিলেন না। তিনি মনে মনে একটু লজ্জিত হলেন। কারণ সে জাতীয় নীচ কবি তিনি তখন পর্যন্ত শোনেন নি। ততদিনে কবি-গুণাকর হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের কবিগান থেকে অশ্লীল রসের অবসান ঘটে নির্মল কাব্যরসের প্রসার ঘটেছে।

সেই শ্মশানে মা কালীর মন্দিরের সামনে সামিয়ানা খাটিয়ে আসর করা হয়েছে। এই পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসেছে। তাগা চুড়ি থেকে সুরু করে পাঁপর ভাজা, ফুলুরী ভাজা, মিঠাই মণ্ডা, মনোহারী এমন কি দু' একখানা কাঁস-পিতলের দোকানও এসেছে। পান বিড়ি সিগারেটের তো কথাই নেই। সবচেয়ে ডাব নারিকেল ও পাঁপর ভাজার আধিক্যই বেশী। একদিনের উৎসব উপলক্ষে এত বড় বিরাট মেলা বড় একটা দেখা যায় না। কবিগান উপলক্ষে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে মেলার জমজমাট আরো বেশী।

রাত নয়টার মধ্যে বিরাট আসর বসে গেছে। ঐ আসর দেখে নকুলেশ্বরের

বুকের ভেতর ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে গেছে। তিনি যামিনীকান্তকে বললেন—দাদা, আসরের অবস্থা দেখেছেন! যামিনী—আসর তো হবেই। লোকে শুনেছে ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ কবি মনোহর সরকারের সঙ্গে ঝালকাঠির শ্রেষ্ঠ কবি কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের কবির লড়াই। সিংহ-বাঘের যুদ্ধ দেখতে কার না আগ্রহ হয় বল!

নকুলেশ্বর—তা তো হয়; কিন্তু গুরুদেব তো আমার উপর ভার দিয়ে কুটুম্ব বাড়ী গিয়েছেন। এখন আমি কি করি। সিংহ বাঘের যুদ্ধ দেখতে এসে লোকে যদি দেখে যে বাঘের পরিবর্তে খেঁকশিয়াল এসেছে লড়াই করতে তখন তারা কি বলবে?

নকুলেশ্বরের কথা শুনে সরলা বলল—যামিনীদা, এ লোকটার এই একটা বড় দোষ। নদীতে তুফান দেখে কিনারেই নৌকা ডুবাতে চায়। এত ভয় থাকলে কবি শিখতে এসেছ কেন? যাও, বাড়ী গিয়ে চুড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে ঘরের কোণে বসে থাক।

নকুলেশ্বর সরলার এ জাতীয় তিরস্কার আগেও শুনেছেন। প্রথম প্রথম একটু ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু তা তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কেননা তিনি ভেবে দেখেছেন যে সরলার তিরস্কার শেষে পুরস্কারে পরিণত হয়েছে। সেজন্য এখন ক্ষুব্ধ হওয়া তো দূরের কথা বরং উল্টে তাতে সাহসের সঞ্চার হয়। তাই তিনি বললেন—আমি ছেলেমানুষ, আমার সুনাম দুর্নামের ভয় কি! দুর্নাম হলে আপনাদের সকলেরই হবে। গুরুদেবেরও মুখ দেখাবার স্থান থাকবে না। যাক ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। এখন রাত প্রায় দশটা বাজে। আর দেরী না করে তৈরী হোন; দশটার সঙ্গে সঙ্গে আসরে ঢোল পাঠাতে হবে।

সরলা হাসি মুখে বলল—বেশ, বেশ! এই তো চাই। ভয় কি? আমরা তো রয়েছি। আর তোমার গুরুদেবও নিশ্চিন্ত মনে কুটুম্ববাড়ী ঘুমিয়ে থাকবেন না। আশেপাশে থেকে তোমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। গুরুনাম নিয়ে আসরে নামলে তিনিই তোমার মানসম্মান রক্ষা করবেন।

রাত দশটায় সরলা দলসহ আসরে গিয়ে কনসার্ট দিয়ে নকুলেশ্বরের রচিত নিম্নোক্ত ডাক গান আরম্ভ করল—

কি দিয়ে পূজিব মা, তোমার ও রাঙ্গা চরণ দুখানি।
আমার স্বভক্তি-কুসুম, আসক্তি-কুমকুম,
হারায়ে ফেলেছি জননী॥

সাজায়ে ছিলেম মা বাসনার নৈবেদ্য,
কুচিন্তা-পিশাচী করেছে অশুদ্ধ,
শ্রীচরণে দিতে ভক্তি-রক্ত পদ্ম—
বাধ সাধে মায়া-নাগিনী ॥
বিবেগ-বৈরাগ্য গঙ্গা-বিল্বদল,
দুর্ভাগ্য-ডাকিনী হরেছে সকল,
এখন আছে শুধু নয়নের জল—
স্বগুণে লহগো ভবানী।
—ও রাঙ্গা চরণ দু'খানি ॥
(অন্তরা) কি দিয়ে পূজিব মাগো কি আছে আমার।
আসন নিয়ম যোগ প্রাণায়াম,
হারায়েছি শমদম ষোড়শ উপচার ॥
প্রেম-গন্ধ ধূপ গেল পাপাগুনে পুড়িয়া
সুগন্ধ গেল তার কুবাতাসে উড়িয়া,
প্রবৃত্তি দিয়ে শ্রীমূর্তি গড়িয়া—
মোহ-মদে মত্ত হয়ে ভেঙ্গেছি আবার ॥
মায়া-কুহকিনী সেজে কি খেলা খেলালে,
জপ-তপ-আরোপ সকলি ভুলালে,
এ দীন নকুলে অকূলে ভাসালে
কূলে যেতে দে আমারে শিখায়ে সাঁতার ॥

এভাবে ডাক ও পরে একটা মালসী গানে মায়ের বন্দনা সেরে নকুলেশ্বর দল নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মনোহর সরকারের দল আসরে প্রবেশ করল। ঢুলী ও কাঁসীওয়ালা নেচে নেচে একদম খুব জমাট করে বাজনা দিয়ে ডাক ও মালসী গানে মায়ের বন্দনা আরম্ভ করল।

হরি বল তরী খোল আমার মন-বেপারী—
দেখ তরী চলে কি না চলে।
এই যে হরি নামের তরী, শ্রীগুরু কাণ্ডারী,
'চলবে তরী হরি নামের বলে ॥
মাতৃরজে পিতৃবীজে, গুরু দিলেন তরী সেজে,
বোঝাই আছে তরীর মাঝে, পঞ্চত্ব মালে।

এই গুরুদত্ত মাল, তাই রাখি সামাল,
ডুবাসনে যেন মাল ঘোলা জলে ॥
এই যে নৌকার দাঁড়ি মাঝি,
মাল্লা ছ'জন বড়ই পাজি,
আপনা হতে হবে রাজি, সাধু সঙ্গ হলে।
তাই তারক ভেবে কয়, ইহাই যদি হয়,
গুরুপদ ভাব হৃদকমলে ॥

(অন্তরা) কলিতে অন্য গতি নাই, গতি নাই নাই নাই।
এলেন জীব তরাতে নদীয়াতে গৌর আর নিতাই ॥
হরি নাম সঙ্কীর্তন মহাযজ্ঞ, প্রেমামৃত যজ্ঞের অর্ঘ্য,
ভক্ত বর্গ পান করে সবাই।
দিয়ে নামযজ্ঞে প্রাণাহুতি, পারে চল যাই ॥
সত্যযুগে মানবের লীলা, বর্তমানে নাস্তযের খেলা,
কেউ পাগল, কেউ বৃক্ষতলায় ঠাঁই।
ভেবে মনোহর কয় স্বরূপেতে রূপদর্শন পাই ॥

ডাক-গান শেষ করে দল মনশিক্ষা মালসীগান গান গাইতে লাগল—

তারা, জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে, মা তোর কোলে পেলাম কত সুখ।
কত সুমিষ্ট রস খেয়েছি, শান্তির কুটীর পেয়েছি—
মাগো তোর দয়ায় সুখে আছি—
দেখিয়েছি ভবে পুত্রকন্যার মুখ ॥
মাগো বাল্য আর যৌবনারম্ভে, ছিলাম মা তোর কোলে,
শেষে মোহ-মায়ার কোলে দিয়ে, কোল-ছাড়া করিলে,
আমার আর কি সেদিন আসবে ফিরে,
বসব মা তোর কোলের 'পরে,
আধো আধো মধুর স্বরে—
আর কি ডাকবো মা বোল বলে ॥
আমায় সুখে দুখে রেখে তারা দেখিস কৃপানেত্রে,
এখন ফেলে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে, ভুলে গেলি পুত্রস্নেহ।
এত ভালবাসিস তারা, তবে কেন সারাৎসারা,
জীর্ণ জরা করলি আমার দেহ ॥—ইত্যাদি

ডাক-মালসী শেষ করে মনোহর সরকার মশাই তাঁর চিরাচরিত নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কবিগানের দলে মেয়েলোক দেখলে মনোহর সরকার তাদের নিন্দা না করে থাকতে পারতেন না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কুঞ্জবাবুর দলে গায়িকাদের দেখে গায়ে পড়ে একটি রং ফুকার করে বসলেন—

কুঞ্জবাবুর দল এসেছে, তিনটি মেয়ে সভায় নাচে,
রূপে করে ঝলমল, ওরা মেয়ের বলে করে বল।
যে কয়েকটা পুরুষ আছে, থেকে মেয়ের পাছে পাছে,
ওদের পুরুষত্ব ঘুচে গেছে, সবাই বলে মেয়ে-দল॥

এভাবে কুঞ্জবাবুর দলকে একটু খোঁচা দিয়ে মনোহর সরকার দল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ এরকম বিদ্রূপাত্মক 'রং ফুকার' শুনে নকুলেশ্বর সরলাকে বললেন—কেমন শুনলেন তো! মনোহরবাবু কেমন বিদ্রূপ করে গালাগালি দিয়ে গেলেন। মেয়ে নিয়ে দল করেছি বলে আমরা পুরুষকয়টাও নাকি পুরুষত্ব হারিয়ে মেয়ে হয়ে গেছি।

সরলা—মেয়েনিন্দা করা ওঁর চিরদিনের স্বভাব। মেয়ে-দল দেখলেই যেন ওঁর গায়ে জ্বালা ধরে। তুমি যদি পারো তবে আচ্ছা করে এর একটা জবাব দাও দেখি।

'রং ফুকার' শোনার সঙ্গে সঙ্গেই নকুলেশ্বর মনে মনে জবাবের ফুকার ঠিক করে রেখেছেন। তিনি বললেন—আচ্ছা চলুন তো আসরে, দেখি গুরু কিছু বলতে শক্তি দেন কিনা—এই বলে দল নিয়ে আসরে গিয়েই নকুলেশ্বর মনোহর সরকারের সেই রং ফুকারের জবাব দিতে আরম্ভ করলেন—

(১) বললে, মোদের দলে মেয়ে আছে, আমরা থাকি মেয়ের পাছে,
চিরদিনই মেয়ের জয়, বিশ্ব মেয়ের গুণে সৃষ্টি হয়।
গৃহ হয় গৃহিনীর জন্য, একা সেই গৃহিনী ভিন্ন,
থাকতে ধনেরত্নে গৃহপূর্ণ, তবু গৃহ শূন্য কয়॥

(২) বললে, মেয়ে আছে মোদের দলে, আমরা চলি মেয়ের বলে,
জ্ঞানের কর্তা মৃত্যুঞ্জয়, সেও মেয়ের পদে শরণ লয়।
শতস্কন্ধ বধের কালে, রাম চলেছেন মেয়ের বলে,
সেদিন সিতা না অসিতা হলে, শতস্কন্ধ হয় না ক্ষয়॥

(৩) বললি, মোদের দলে মেয়ে আছে, অঙ্গভঙ্গি করে নাচে,
তাই দেখে আজ করে রোষ, বুঝি দেখালি আজ মেয়ের দোষ।
মেয়ের পেটে জন্ম পেলি, মেয়ের দুগ্ধে প্রাণ বাঁচালি,
নইলে তুই কি বড় হয়েছিলি, চুষে বাপের……॥

এভাবে তিন খানা ফুকারের মাধ্যমে মনোহর সরকারের রং ফুকারের জবাব দিয়ে নকুলেশ্বর শ্রোতাদের কাছে আদেশ চাইলেন—এখন আপনারা কি গান শুনতে চান ?

শ্রোতারা বললেন—আমরা এখন আর গান শুনবো না। মায়ের বন্দনা তো হয়ে গেছে এখন টপ্পা-পাঁচালী সুরু হলেই আমরা সুখী হবো।

নকুলেশ্বর বনাম মনোহর সরকার

নকুলেশ্বর আর কালবিলম্ব না করে সরলাকে বললেন—উঠুন, টপ্পার লহর গাইতে হবে। সরলা উঠে দাঁড়ালে নকুলেশ্বর টপ্পার লহর বলতে আরম্ভ করলেন—বিষয়টি হল দ্রুপদ রাজ্যে লক্ষ্য ভেদ করে অর্জুনের দ্রৌপদী লাভের পর পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ সভায় দ্রুপদ রাজার কাছে ধৌম্য পুরোহিতের প্রশ্ন—

তুমি কল্পনাতে দ্রুপদ, আমি ধৌম্য পুরোহিত।
অদ্য এলেম তোমার বাড়ীতে, বিবাহের মন্ত্র পড়িতে
খাঁটি বর নির্বাচন করিতে, ঘটল বিপরীত॥
তোমার একটি কন্যা যাজ্ঞসেনী,—
অদ্য তার করলে বিয়ের আয়োজন ;
বরের আসনে দেখি, বর বসে আছে পঞ্চজন।
তোমার এক কন্যা পঞ্চবরে,
দান করবে কেমন করে—
কে তারে করিবে গ্রহণ ?
ওরা কে কার পুত্র, কে কোন্ গোত্র,
কোন্ নামে করব মন্ত্র উচ্চারণ ?

এই বলে লহরখানা শেষ করে নকুলেশ্বর ত্রিপদী ডাকছড়া আরম্ভ করলেন—

নামটি আমার ধৌম্যমুনি তুমি দ্রুপদ নৃপমণি
মহামানী সর্বলোকে কয়।

তোমার কন্যার বিয়ের তরে ডেকে এনেছ আমারে

পৌরোহিত্য করাবার আশায়॥

আমি তোমার পুরোহিত করবো তোমার পুরের হিত

অহিত কর্ম করব না কখন।

অদ্য এসে সভাস্থলে পড়ে গেলাম গণ্ডগোলে

হিত অহিত হলেম বিস্মরণ॥

যাজ্ঞসেনী তোমার কন্যে রূপেগুণে মহী ধন্যে

অদ্য তার বিয়ের আয়োজন।

কন্যা বসে সভাস্থানে চেয়ে দেখি তার দক্ষিণে

বরাসনে বর বসা পাঁচজন॥

ওরা কে কোন্ জাতি কার পুত্র বল ওদের গোত্রের সূত্র

সব চরিত্র জেনে নিতে হয়।

সম্প্রদানের মন্ত্র পড়তে নামে নামে হবে ধরতে

জানা লাগে বংশ-পরিচয়॥

সম্প্রদান করিবার কালে পড়ে যাবে গণ্ডগোলে

কার হাতে করিবে অর্পণ।

একজনারে দিতে যাবে অপর জনা হাত বাড়াবে

হয়ে যাবে দ্বন্দ্বের আয়োজন॥

তাইতে বলি মহারাজ বুঝে শুনে কর কাজ

নইলে লাজ পাবে এ সভায়।

এই পর্যন্ত ক্ষান্ত করে জবাবের সূত্র ধরে

পরে আরো জানাব তোমায়॥

এইভাবে নকুলেশ্বর পাঁচালী শেষ করে চলে গেলেন। মনোহর সরকার দল নিয়ে আসরে প্রবেশ করে সর্বাগ্রে নকুলেশ্বরের রং ফুকারের জবাবের প্রতিজবাব দিলেন—

বললে, জ্ঞানের কর্তা ত্রিপুরারি,

মেয়ের চরণ আশ্রয় করি,

সাধন সিদ্ধি করে লয়;

সে তো ঝালকাঠির নটী নয়।

সরি, ভূতি, সরোজিনী,
তাদের মতো নয় শিবানী,
যেমন কোথায় সে রাণী ভবানী—
কোথায় বাইস্থা তেলীর মায়॥

রং ফুকারের জবাব দিয়ে মনোহর সরকার টপ্পার লহরের জবাব দিতে আরম্ভ করলেন—

তুমি কল্পনাতে ধৌম্যমুনি, আমি হই দ্রুপদ।
অদ্য দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, প্রকাশ্য সভার ভিতরে,
লক্ষ্যভেদের পণ করে, ঘটালাম বিপদ॥
যখন লক্ষ্য বিঁধে পার্থ বীরে—
দ্রৌপদী নিয়ে মায়ের কাছে যায়;
পাঁচজনে ভাগ করে খাও—
ফলজ্ঞানে আদেশ দিলেন মায়।
আবার পতিং দেহি পঞ্চবার,
শিবের কাছে মাগে বর,
সেই বরে সে পঞ্চ পতি পায়।
ওরা পাণ্ডুপুত্র সুপবিত্র,
সেই সূত্রে দ্রৌপদী বসেছে বাম॥

মনোহর সরকার টপ্পার লহরটি শেষ করে ত্রিপদী ডাক-ছড়ায় বলতে লাগলেন—

তুমি ধৌম্যমুনি নামটি ধরে এসেছ দ্রুপদ নগরে
পৌরোহিত্য করাবার কারণ।
আমার কন্যা দ্রৌপদীরে বিয়ে দিচ্ছি পঞ্চবরে
তাইতে তোমার চিত্ত উচাটন॥
লক্ষ্য বিঁধে পার্থ ধীরে দ্রৌপদীরে সঙ্গে করে
গিয়ে বলে কুন্তী দেবীর ঠাঁই।
অদ্য আমরা ভিক্ষার তরে গিয়ে সে দ্রুপদ নগরে
ভাগ্যে একটি অপূর্ব ফল পাই॥
ফলের কথা শুনে কানে কুন্তীদেবী আনমনে
ডেকে বলে আমার কথা লও।

ফল পেয়েছ ভিক্ষা করে মিলে পঞ্চ সহোদরে
সমভাবে ভাগ করিয়ে খাও ॥
আবার আমার যাজ্ঞসেনী পূজা করে ত্রিশূলপাণি
পতিং দেহি বলে পঞ্চবার।
ডেকে বলেন পশুপতি হবে তোমার পঞ্চপতি
তুষ্ট হয়ে আমি দিলেম বর ॥
মাতৃবাক্য শিবের বাক্য দুই বাক্যে হল ঐক্য
ভাগ্যলিপি খণ্ডান না যায়।
সেই বাক্য অনুসারে আমার কন্যা দ্রৌপদীরে
বিচারে তাই পঞ্চবর পায় ॥
ওরা হল পাণ্ডুপুত্র সকলে বৈয়াগ্র গোত্র
সচ্চরিত্র পবিত্র সজ্জন।
কন্যা দিব পঞ্চপাত্রে ঐ নামে ঐ গোত্রে
কর তুমি মন্ত্র উচ্চারণ ॥
তুমি আমার বাক্য ধর ত্বরা করে মন্ত্র পড়
বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
এই পর্যন্ত দিয়ে ছেড়ে ধুয়ার ভাবে সূত্র ধরে
আরও কিছু করিব বর্ণন ॥

ধুয়া,—

শোন হে ধৌম্যমুনি, তুমি গুণী এ সংসারে।
তন্ত্র ধর মন্ত্র পড়, কাজ কি বাক্‌বিতণ্ডা করে ॥
আমি হই দ্রুপদ রাজা, সকলে করে পূজা
দুষ্ট লোকে দিয়ে সাজা, শিষ্টে পালি সমাদরে।
আমার কন্যার বিবাহ, তুমি কর নির্বাহ,
যা কিছু দক্ষিণা চাহ, দিব তোমায় অকাতরে ॥
শিবের বর মাতৃবাক্য, দুই বাক্য করে লক্ষ্য,
পড়ে সম্প্রদানের বাক্য, কন্যা দিব পঞ্চ বরে।
জানতে চাও বংশের সূত্র, ওরা হয় পাণ্ডুপুত্র,
সকলে বৈয়াগ্র গোত্র, সুপবিত্র চরাচরে ॥

মনোহর সরকার মহাশয় ভাল বক্তা ছিলেন; কিন্তু কণ্ঠস্বর ভাল ছিল না

বলে ধুয়া দিয়ে বেশী সময় ছড়া পাঁচালী বলতেন না। সেজন্য অল্প কথা বলেই তিনি পাঁচালী শেষ করে চলে গেলেন।

নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর জন্য অপেক্ষা করলেন। ভেবেছিলেন মনোহরবাবুর আসর শেষ হলে সকলে কুঞ্জবাবুকেই চাইবেন। কারণ তাঁর নামে বায়না নেওয়া হয়েছে। তিনি আসরে না গেলে শ্রোতারা হৈ চৈ করে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে পারে। এই ভেবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখলেন যে কুঞ্জবাবু এলেন না, তখন বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় আসরে প্রবেশ করলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ বললেন—ছেলেটার সাহস তো বড় কম নয়! মনোহর সরকারের পাঁচালীর পরে আবার ও আসরে এসেছে! কেহ বললেন—ওর মুখস্থ করা যা ছিল, তা তো গত আসরেই শেষ হয়ে গেছে। এবার আর কি বলবে? আবার কেউ বললেন—আরে দেখই না কি করে?

নকুলেশ্বর কিন্তু নির্ভীক। মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই। হাসি মুখে সরলাকে বললেন—উঠুন ত! রং ফুকারের জবাবটা তো দিতে হয়। সরলা উঠে দাঁড়ালে, নকুলেশ্বর বলতে লাগলেন—

১। আছে তিনটি মেয়ে মোদের দলে,
ঝালকাঠির নটী বলে, দিয়ে গেলি তুলনা;—
রাধা নটীর নামটি ভুলো না।
চণ্ডী পূজা করতে খাঁটি,
লাগে নটীর দ্বারের মাটি,
ও তোর মা মাসি আর খুড়ি জ্যেঠী—
মাটি দিলে চলে না॥

২। যারা নৃত্য গীতে থাকে খাঁটি,
তারাই হয় নট আর নটী,
নাচে গানে মজায় মন;
আছে রাস-নৃত্যে তার নিদর্শন।
কৃষ্ণ নট আর রাধা নটী, নৃত্যগীতে পরিপাটি,
ও তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী মাথাকুটি—
সেই নটীর পায় লয় শরণ॥

৩। প্রচুর অর্থ সম্পদ থাকতে হাতে,
বাইস্থার মাও রানী হতে,

পারে সেই অর্থের বলে,
ছোট বড় হয় কর্মের ফলে।
ভক্তিতে রাম গুহকেরে,
নিতা বলে বক্ষে ধরে,
তার তুল্য কি হতে পারে—,
মারাল খোঁজা চাঁড়ালে॥

('মারাল' শব্দের অর্থ বর্ষাকালে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে জিয়ল মাছের যাতায়াতের পথ। চাঁড়ালেরা ঐ মারাল খুঁজে 'চাই' পেতে মাছ ধরে।)

মনোহর সরকারের উপর আক্রোশ করে নকুলেশ্বর ফুকারের যে জবাব দিলেন তাতে চতুর্দিকে হাততালি ও বাহবা পড়ে গেল। রং ফুকার শেষ করে নকুলেশ্বর টপ্পার লহর ধরলেন—

বললে, পাণ্ডুপুত্র সুপবিত্র, ওরা পঞ্চজন।
শুনি মৃগ ঋষির শাপের দায়,
পাণ্ডু তো ক্লীবের স্বভাব পায়,
তবে কুন্তী মাদ্রী কার দ্বারায়, জন্মাল নন্দন?
জানি পঞ্চলিঙ্গে ভবেৎ বেশ্যা,
দ্বিলিঙ্গে দ্বিচারিণী বলে তায়।
বেশ্যা না দ্বিচারিণী উহাদের, কুন্তী মাদ্রী মায়?

ওরা জারজ পঞ্চ সহোদর,
যাজ্ঞসেনীর হবে বর,
বিয়ের পর গোল বেধে না যায়?
বলো দায়ভাগের ভাগ অনুসারে—
বিচারে কে কতটুক অংশ পায়?

এই বলে টপ্পার লহর শেষ করে নকুলেশ্বর ডাক ধুয়া দিলেন—

বাহ বা যেমন মায়ের তেমন ছেলে
তেমনি তাদের বিয়ের প্রথা।
যেমন হাড়ীর মেয়ে মুচীর ছেলে
যোগ্যে যোগ্যে কুটুম্বিতা॥

বাগ্বাদিনী বাগেশ্বরী তোমার চরণ শিরে ধরি
করজোড়ে করি নিবেদন।
ধৌম্য মুনি নামটি ধরে আসিয়ে দ্রুপদ নগরে
হল আমার ভাগ্য বিড়ম্বন॥
কুন্তী মাদ্রী পাক্কা সতী পাঁচ দেবতায় করে পতি
নিল পঞ্চ পুত্র জন্মাইয়া।
উধার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে পাণ্ডুর নামের মার্কা মারে
চোরের নৌকায় সাধুর নিশান দিয়া॥
পাঁচ দেবতায় কর্ম করে পাণ্ডু কেবল ধামা ধরে
তোমার বরের বংশটি মন্দ না।
পাণ্ডু বংশ বলে রটাও দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মেটাও
চামচিকার ছাও নাম পেল চন্দনা॥
পড়ে পঞ্চ ভূতের পাকে মেয়ে তোমার থাকবে সুখে
দেবর ভাসুর লাগবেনা বিচার।
দেহ ক্ষেত্র চাষের তরে দায় ভাগের ভাগ অনুসারে
কোন্ অংশে কার থাকবে অধিকার॥
লাঙ্গল জোয়াল বলদ লইয়া চাষ আবাদ করিতে গিয়া
হয় না যেন দ্বন্দ্বের আয়োজন।
রেকর্ড পর্চা করে নিও দাগ নম্বর ঠিক করে দিও
এক জমিতে চাষী পঞ্চজন॥
(পয়ার) পঞ্চবর বসেছে সেজে, গোল বাধিবে দানের কাজে,
শশা কলা কুমড়া নয় যে, কেটে কেটে ভাগ লাগাবে।
বিশেষ ভাবে বহন করে, বিবাহ বলে কয় তারে,
বহনের ভার দিবে কারে, কে কতটুক ভাগে পাবে॥
আমার হৃদয় তুমি নিলে, তোমার হৃদয় আমায় দিলে,
এই মন্ত্র বলিবার কালে, পাঁচটা হৃদয় কোথায় পাবে?
সতীর পতি মরে গেলে, বিধবা হয় এই ভূতলে,
পাঁচজনের একজন মরিলে, কোন্ অঙ্গ বিধবা হবে?

এইভাবে অসংখ্য প্রশ্নের অবতারণা করে নকুলেশ্বর এমন বেড়াজালের সৃষ্টি করলেন যে, সে জাল ছিন্ন করে মনোহরবাবুর বের হয়ে আসা অসাধ্য

হলো। তিনি যে সব উত্তর দিলেন তা শ্রোতাদের মনঃপূত হল না। তার উপর ছেলে মানুষের কণ্ঠস্বরের কাছে বার্ধক্যের কণ্ঠ স্বাভাবিক হার মানিতে বাধ্য। মনোহর সরকার মহাশয়ের বক্তা হিসেবে বিশেষ সুনাম ছিল; কিন্তু কণ্ঠস্বর মোটেই ভাল ছিল না। পাঁচ ছ' পর্দার উপর তাঁর সুর উঠত না। আর নকুলেশ্বর বার পর্দায় সুর দিয়ে মাজায় গরদের চাদর বেঁধে নির্ভিকচিত্তে নেচে নেচে কূটতর্কের অবতারণা করে শ্রোতাদের মন জয় করে ফেললেন। আসরের শ্রোতারা তাঁর সাহসের তারিফ করতে লাগলেন। ন'পাড়ার বড় জমিদার হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয় আসরে এসে নকুলেশ্বরকে এক জোড়া ধুতি ও চাদর দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। গানের আসর ভেঙ্গে গেল।

গানের শেষে সকলে এসে নকুলেশ্বরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, গত দুর্গাপূজা থেকে তিনি কুঞ্জবাবুর দলে ভর্তি হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। নিজের ছেলের মতো স্নেহ যত্ন সহকারে যা শিক্ষা দিয়েছেন, এ তারই পরিণতি। নকুলেশ্বরের এই পরিচয় শুনে সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন—যার সুশিক্ষার গুণে অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রের মধ্যে এই সিংহবিক্রম, তার গুরুর মধ্যে যে কত শক্তি, কত কবিত্ব নিহিত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভাষা প্রয়োগে শালীনতা—গুরুর উপদেশ

আসর থেকে দলসহ নৌকায় ফিরে নকুলেশ্বর দেখেন তাঁর গুরুদেব নিজের কামরায় বসে তামাক খাচ্ছেন। তিনি গিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে বললেন—আপনি কখন এলেন?

কুঞ্জবাবু—কেন, তোমরা গান আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে তো আমি এসেছি।

নকুলেশ্বর—কৈ, আমাদের সঙ্গে ত দেখা করলেন না!

কুঞ্জবাবু—আমি ইচ্ছা করেই দেখা করিনি।

নকুলেশ্বর—কেন?

কুঞ্জবাবু—আমি দেখা করলে তোমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যেত। নিজের মনের উদ্যম নিয়ে কাজ করতে পারতে না। সর্বদাই তোমার মনে একটা দ্বন্দ্ব থাকত—এই বুঝি ভুল হল, এটা বুঝি ঠিক হল না—ইত্যাদি ভয়ে তোমার মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যেত। সেইজন্য আমি একটু অন্তরালে থেকে তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। যখন দেখলাম আসরের চোদ্দ আনা শ্রোতাই

তোমার পক্ষে জয় দিচ্ছেন, তখন আর আমার আনন্দের সীমা ছিলনা। কিন্তু একটি কারণে আমি খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছি।

নকুলেশ্বর—সে কারণটি কি ?

কুঞ্জবাবু—কারণ আর কিছু নয়—তুমি যে মনোহর সরকার মহাশয়ের রং ফুকারের জবাব দিয়েছ, যুক্তি তর্কের বিচারে তা ভালই হয়েছে। কিন্তু মনোহর সরকার একজন গণ্যমান্য নামজাদা ব্যক্তি। খুলনা, ফরিদপুর, যশোহর জেলায় তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি কত! বিশেষতঃ তিনি তোমার চাইতে বয়সে অনেক বড়; তোমার পিতার বয়সী। তাঁর সঙ্গে পাল্লা করতে একটু ভদ্রভাবে ভাষা প্রয়োগ করা উচিত ছিল। শেষ ফুকারে খুব উত্তেজিত হয়ে 'তুই তামারি' করে আক্রোশ করা তোমার উচিত হয়নি। পূজনীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হলে কোন অসম্মানজনক কথা বলা কবির ধর্ম নয়। অভিনয় ক্ষেত্রে পিতা হয়ে পুত্রের কাছে, শিষ্য হয়ে গুরুর কাছে প্রশ্ন করতে হয়। কিন্তু সম্বন্ধ বিচার করে যদি কাব্য রসের সৃষ্টি করতে না পারে তবে কবির কাব্য প্রতিভার কোন মূল্য নেই। বরং মাননীয় ব্যক্তির মানহানিজনক কথা বলে তাঁর মনে ব্যথা দেওয়ার ফলে তাঁর অভিশাপে যশঃ প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যায়। এইকথা যেন সর্বদা মনে থাকে।

কুঞ্জবাবু এভাবে নকুলেশ্বরকে তিরস্কার করছেন শুনে সরলা বলল—আপনি শুধু এক পক্ষ দেখে বিচার করলে চলবে কেন? দুই পক্ষ দেখে বলুন। আপনার শিষ্যটি না হয় ছেলেমানুষ, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান না থাকতে পারে। কিন্তু আপনার মাননীয় মনোহর সরকার মহাশয় তো আর ছেলেমানুষ নন। তিনি আসরে এসেই মেয়েদের প্রতি গালিগালাজ শুরু করলেন কেন? আমরা ওঁর কি করেছি? গায়ে পড়ে গালাগাল দিয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে মান্য রেখে কথা বলতে হবে কেন? তিনি তো তাঁর নিজের মান নিজেই নষ্ট করার পথ করে দিয়েছেন। আপনার ছাত্র তো ভালই করেছে।

সরলার কথা শুনে কুঞ্জবাবু বললেন—না সরলা, আমি তোমার কথা সমর্থন করতে পারি না। একজন অন্যায় করেছে বলে আমিও করব, এটা কোন বুদ্ধিমানে বলে না।

সরলা—তবে কি জবাবটা না দিলে ভাল হত ?

কুঞ্জবাবু—না, জবাব দিবে না কেন? তবে একটু ভদ্রভাবে দিলে সুখী হতাম। 'তুই তামারি' না বলে, যদি 'বললি' না বলে 'বললে' বলতো তবে দোষ ছিল কি? যেমন—

বললে, মোদের দলে মেয়ে আছে,
অঙ্গভঙ্গি করে নাচে,
তাই দেখিয়া করে রোষ,
কেন দেখাতে চাও মেয়ের দোষ।
মেয়ের পেটে জন্ম নিলে,
মেয়ের দুগ্ধে প্রাণ বাঁচালে,
বুঝি, তুমি বড় হয়েছিলে,—
চুষে বাপের········।

এভাবে ফুকারের জবাবটা করলে ভাবের তো কোন পরিবর্তন হতো না। শুধু 'বললি'র জায়গায় 'বললে' দিলে; অর্থাৎ প্রথম পুরুষের স্থলে মধ্যম পুরুষে জবাব দিলে ভদ্রভাবেই গালি দেওয়া হতো। 'এ' কারের স্থলে 'ই' কারটা বসিয়ে নিজের মনের ক্রুদ্ধ ভাবটা প্রকাশ না করলে কি জবাব হতো না?

সরলা আর কোন কথা বলার পূর্বেই নকুলেশ্বর বললেন—আমার ভুল হয়েছে। ভবিষ্যতে আর এমন ভুল কখনো হবেনা।—এই বলে কুঞ্জবাবুর পদধুলি নিলেন। কুঞ্জবাবু তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আশীর্বাদ করি তুমি কবি-সম্রাট হও।

কবির-হাট বাগেরহাটে

ন'পাড়া ঘোষবাবুদের গান শেষ করে কুঞ্জবাবু বললেন—চল, আমরা এখন বাগেরহাটে যাই।

নকুলেশ্বর—কেন, সেখানেও কি বায়না নিয়েছেন নাকি?

কুঞ্জবাবু—না, বায়না নয়। বাগেরহাটে এ সময় অর্থাৎ মাঘ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সকল কবির দলের থাকবার একটা ঘাট আছে। সেই ঘাটে গিয়ে নৌকা বাঁধলেই আশেপাশে দূর দুরান্তর স্থান থেকে বায়নাদার এসে বায়না করেন। সেজন্য এখন আমাদের সেই বাগেরহাটে গিয়ে নৌকা বাঁধা উচিত।

যথা সময় নৌকা এসে বাগেরহাটে পৌঁছল। সেখানে খুলনা ফরিদপুরের ছোট রজনী, বড় রজনী, মহিম বিশ্বাস ইত্যাদি আরও কয়েকজন কবির দল নৌকা বেঁধে ছিল।

বাগেরহাটে আসা অবধি পরপর বায়না হতে লাগল। নকুলেশ্বর এখন আর আগের মতো বোকা নকুলেশ্বর নন। তিনি বেশ পূর্ণ উদ্যমে বিভিন্ন দলের

সরকারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান করছেন। কুঞ্জবাবুকে আর বেশী পরিশ্রম করতে হয়না। তিনি দু'একখানা গানের জবাব করতে আসরে যান। পাঁচালী বলার কাজ নকুলেশ্বরের উপরেই ন্যস্ত হলো। কারণ শ্রোতারাই কুঞ্জবাবুর কাছে অনুরোধ করতেন যেন টপ্পা-পাঁচালীটা তাঁর ছেলেকে দিয়েই বলান। তারা নকুলেশ্বরকে কুঞ্জবাবুর ছেলে বলেই জানতেন।

একে তো ছেলেমানুষ। সুন্দর ফুটফুটে রং, কার্তিকের মতো চেহারা। তার উপর সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে কাঁধের উপর চাদর দিয়ে নকুলেশ্বর আসরে এসে দাঁড়ালে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সুললিত কণ্ঠস্বর, সুমধুর বাচন ভঙ্গীতে সকলের মন মুগ্ধ করার ক্ষমতা নকুলেশ্বর অল্প সময়েই অর্জন করেছিলেন। ফলে অতি অল্পদিনেই তিনি অসীম জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। গানের পর গান চলতে লাগল। বৈশাখের মাঝামাঝি অত্যধিক গরম পড়ার জন্য কুঞ্জবাবু আর বায়না গ্রহণ না করে দল বন্ধ করে ঝালকাঠি ফিরে এলেন।

নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন আমাকে কি করতে হবে?

কুঞ্জবাবু—এখন একবার মা বাবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে এসো। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে চলে আসবে। বেশী দেরী না হয় যেন।

নকুলেশ্বরের পরম হিতৈষিণী কবি-জীবনের উৎসাহদাত্রী সরলা বলল—বাড়ী যাবে তো যাও, তবে সংসার জগতে বদ্ধ হয়ে কবি-জগৎটা ভুলে যেও না। মনে রেখো, কাব্য সাধনা কবি হওয়া কঠিন কাজ। এ একটা সাধনার রাজ্য। সব সময় ঐ কবির ধ্যান জ্ঞান চর্চার মধ্যে থাকা দরকার। ফাঁকতালে একাজে সিদ্ধি লাভ হয়না। কাজেই বাড়ীতে বসে সময় না কাটিয়ে সত্বর চলে আসবে।

নকুলেশ্বর বাড়ী গিয়ে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করে দশ বারো দিন পরেই আবার ঝালকাঠি চলে এলেন।

কুঞ্জবাবু বললেন—এখন আমি একবার বাড়ী যাব। তুমি এখানে বসে সর্বদা গান বাজনার চর্চা করবে; আর ঐ আলমারীর ভিতরে নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ আছে, সেগুলি বের করে নিয়মিত পড়বে। আবার যত্ন করে রেখে দেবে। মনে রেখো—শোনা কথায় কবি হওয়া যায়না। কবিয়ালের বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা দরকার। স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকের একটা সীমা থাকে, কিন্তু এই স্কুলের পাঠ্য পুস্তক সীমাহীন। বাল্যশিক্ষার 'খরতর বরশর' হতে শুরু করে কেতাব

কোরাণ বাইবেল উপনিষদ সকল গ্রন্থের জ্ঞান থাকা দরকার। তবে অনন্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করা অসম্ভব হলেও যতদূর সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। কোন 'সরকারের' মুখে একটা কথা শুনলেই সেটা বেদবাক্য মনে করবে না। খোঁজ করে দেখবে তা শাস্ত্রগ্রন্থে আছে কিনা। যদি না থাকে তবে সেই ভুল পথের অনুসরণ করে তুমিও ভুলের গর্তে পা পাড়াবে। সন্ত তুলসীদাস বলেছেন—

গুরু লোভী শিষ্য লালচি
দোনো খেলে যাও।
দোনো বপুরা ডুব মরেজে।
চড়্হে পাত্থরকা নাও॥

অর্থাৎ যে গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য একান্ত বিষয়ভোগী তারা উভয়েই পাথরের নৌকার আরোহীর মতো। ভবসাগর পার হতে গিয়ে ডুবে মরে। তেমনি ভুল গুরুর ভুল উপদেশ অনুসরণ করে চললে গুরু শিষ্য উভয়েই লজ্জা সাগরে নিমজ্জিত হয়। অর্থাৎ পণ্ডিত সমাজে লজ্জা পায়। "যার যত দেখা, সে তত পাকা"—এই কথাটা মনে রেখে বিবিধ শাস্ত্র অনুশীলন করবে।

কুঞ্জবাবুর সকল কথা শুনে নকুলেশ্বর বললেন—আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার এই মহান উপদেশ আমি যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে পারি।

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরের হাতে আলমারীর চাবিকাঠি দিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে গেলেন।

দলের পরিচালিকা অধরমণির কাছে থেকে নকুলেশ্বর নিবিষ্ট মনে কুঞ্জবাবুর আলমারীতে রক্ষিত বিবিধ ধর্মশাস্ত্র পুরাণ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন এবং হারমনিয়ামে সুরসাধা আরম্ভ করলেন। কুঞ্জবাবুর দলে নকুলেশ্বরের শিক্ষানবিশীর প্রথম বৎসর শেষ হলো।

কবিয়াল
কবিগান

ক্রমবিকাশ
স্বাতন্ত্র্য
পরিপূর্ণতা

বর্ষ শেষ-বর্ষারম্ভ

এবার দ্বিতীয় বর্ষের প্রস্তুতি শুরু হলো। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পূর্বে কুঞ্জবাবু ঝালকাঠি এলেন। নূতন দলের পত্তন করতে হবে।

কুঞ্জবাবু বললেন—যদিও আমার দোহারপত্র প্রয়োজন হবেনা তথাপি রথযাত্রার দিন নূতন হালখাতা করে সকলকে অগ্রিম টাকা দাদন দিয়ে দলিল করতে হবে। আর তাদের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

নকুলেশ্বর এই হালখাতার উৎসব আগে আর কখনো দেখেন নি। তিনি বললেন—কখন কি করতে হবে আমাকে আদেশ করবেন। আমি আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবো।

কুঞ্জবাবু—পঁচিশ ত্রিশ জন লোকের আহারের ভালো বন্দোবস্ত করতে হবে। সেই অনুপাতে যা কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন, ফর্দ অনুযায়ী তুমি যামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সব করবে।

নকুলেশ্বর গুরুদেবের আদেশমত যা কিছু দরকার সব জোগাড় করতে লাগলেন। এদিকে রথযাত্রার দিনও ঘনিয়ে এল। আর মাত্র তিন চার দিন বাকি। নকুলেশ্বর গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—দলের সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হবে না ?

কুঞ্জবাবু-নূতন দোহারপত্র হলে নিমন্ত্রণ করা প্রয়োজন হতো। আমাদের নূতন কেউ নেই যে নিমন্ত্রণ করব। ওরা সব রথযাত্রার দিন সকালে এসে উপস্থিত হবে। তবে একটি বেহালা বাদককে নূতন নিতে হবে। তার কাছে এক খানা পত্র লিখে দাও। তার নাম রোহিনী ঘটক, পোঃ+গ্রাম-কোটালি-পাড়া, জেলা ফরিদপুর।

নকুলেশ্বর তখনই পত্র লিখে ডাকে ফেলে এলেন। নির্দিষ্ট তারিখে দোহারপত্র সব এসে পৌছল। ঝালকাঠি বন্দর বিশেষ সরগরম হয়ে উঠল। কারণ শুধু একটা দলের লোকজনই তো নয়, আট দশটা কবির দল—সকল দলেই ঐ তারিখে হালখাতা ও দাদন দেওয়া হবে। কাজেই বিস্তর লোকের সমাগম। তার উপর বিরাট মেলা মিলেছে। সব মিলিয়ে যেন একটা আনন্দের হাট বসেছে। পত্র পেয়ে বেহালাবাদক রোহিনী ঘটকও খুব সকালেই এসে গেল। তখন কুঞ্জবাবু বললেন—ঘটক মহাশয়, আপনি ব্রাহ্মণ, রান্নাটা আপনাকেই করতে হবে।

ঘটক মহাশয়—শুধু আজকের রান্না, না সব সময় দলের রান্নাও করতে হবে।

কুঞ্জবাবু—দলের রান্নাও যদি করতে পারেন তো খুব ভাল হয়। অন্য পাকের ঠাকুর সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন হবে না। আপনি বেহালা বাজনা ও রান্না দুই কাজই করবেন। সেভাবে আপনাকে বেতনও দেওয়া হবে। সম্প্রতি আজকের রান্নার কাজটা আপনারই করা দরকার।

রোহিনী ঘটক সানন্দে রান্নার কাজে প্রবৃত্ত হলো। বেলা দু'টা আড়াইটার মধ্যেই ভোজন পর্ব শেষ হয়ে গেল। এমন সময় সরলা নকুলেশ্বরকে বলল—চলুন সকলকে নিয়ে রথের মেলাটা দেখে আসি। সরলার এ প্রস্তাবে সকলেই রাজী হলেন এবং রথের মেলা দেখতে বের হলেন।

মেলায় সার্কাস, পুতুল নাচ, রাধাচক্র, ঘোড়াচক্র, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা রকম আনন্দ উৎসবের আয়োজন ছিল। মিঠাই, মোণ্ডা, অন্যান্য বিবিধ খাবারের দোকানের কথাই নেই। সব কায়েম হয়ে দোকান পেতে বসেছে। কারণ মেলা চলবে সাত দিন—ফিরা রথ পর্যন্ত।

সরলার আন্তরিকতা—শ্রদ্ধা ভালবাসার নিদর্শন

সকলের ট্যাঁকেই টাকা আছে; কারণ দু'তিন মাসের অগ্রিম বেতন দাদন নিয়েছে। যে যার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনছে। সরলা নকুলেশ্বরের হাত ধরে বলল—চলুন আমার সঙ্গে। ভাল একটা কাপড়ের দোকানে যাই। আমার কিছু কেনাকাটার আছে।

নকুলেশ্বর—শাড়ী কিনবেন বুঝি?

সরলা—দেখি, চলুন তো আগে দোকানে—এই বলে তারা দুজন ঝালকাঠির বৃহত্তম বস্ত্র ব্যবসায়ী অভয় সাহার দোকানে গেলেন। অভয় সাহা সাগ্রহে বলল—বসুন বসুন, কি চাই আপনাদের?

সরলা—ভাল একজোড়া ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবী একটি এবং একখানা গরদের চাদর দিন।

নকুলেশ্বর সরলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এসব কার জন্য কিনছেন?

সরলা—আমার একটি বন্ধু আছে, তার জন্য।

নকুলেশ্বর—কৈ তাকে তো কখনো দেখি নি! সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন? তার পছন্দমত দেখে নিতেন।

সরলা—(একটু মুচকি হেসে) সঙ্গেই নিয়ে এসেছি। আপনিও তো পুরুষ মানুষ! পুরুষের ব্যবহারের জিনিস পুরুষেই ভাল পছন্দ করতে পারে। আপনি পছন্দ করে কিনলেই তার পছন্দ হবে। দেখুনতো আপনার পছন্দ হয় কিনা।

দোকানদার রেলী ব্রাদার্সের উৎকৃষ্ট ধুতি ও জামা চাদর অনেকগুলি এনে দিল। সরলা নকুলেশ্বরকে বলল--দেখুন কোনটা আপনার পছন্দ হয়।

নকুলেশ্বর—আমার পছন্দ করা জিনিস হয়তো আপনার বন্ধুর পছন্দ নাও হতে পারে। কারণ ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। আপনি নিজেই দেখে নিন্।

কাপড় জামা চাদর সরলা নিজেই দেখে শুনে বেছে নিল। দোকানদারের দাম মিটিয়ে দিয়ে বাইরে এসে সরলা হেসে হেসে বলল—আপনি আমার বন্ধুটিকে দেখতে চান ?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখব। আমি তো তারে কখনো দেখিনি।

সরলা—দেখেছেন তাকে অনেকদিন, কিন্তু চিনতে পারেন নি। কারণ আমি তাকে চিনতে দিইনি। আজ আর গোপন রাখতে পারলাম না—এই বলে সরলা নকুলেশ্বরের হাত দু'খানা ধরে কাপড়ের প্যাকেটটি তার হাতে দিয়ে বলল—এই আমার সেই প্রাণ প্রিয়তম বন্ধু। বন্ধুর সামান্য দান গ্রহণ করুন।

নকুলেশ্বরের উপর সরলার একটা আন্তরিক ভালবাসা ছিল। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো সে ভালবাসা অন্তরে অন্তরেই প্রবাহিত হচ্ছিল। মুখ ফুটে সরলা সে কথা কখনো প্রকাশ করেনি। কারণ নকুলেশ্বরের আত্মোন্নতির পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে এই ভয়ে মনের কথা মনে চেপে রেখে নকুলেশ্বরের উন্নতির পথে উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়ে এসেছে। আজকের এই কাপড় জামা দানের ঘটনা সেই গোপন ভালবাসার একটু বাহ্য অভিব্যক্তিমাত্র। তাই কোন্ ধুতি কোন্ জামা চাদরে গানের আসরে নকুলেশ্বরের ভাল মানানসই পোষাক হয় তাই সে বেছে কিনেছে।

সরলার এই আকস্মিক ব্যবহারে হতভম্ব নকুলেশ্বর বললেন—ছিঃ, ছিঃ! এ আপনি কি করলেন? আমার মতো একটা অপদার্থের জন্য এতগুলো টাকা বাজে খরচ করলেন কেন বলুন তো ?

সরলা—আপনি অপদার্থ না সুপদার্থ, আর আমার এই অর্থ ব্যয় অনর্থক না সার্থক তা আপনি বুঝবেন কি করে। আপনার গুরুদেবের মুখেই তুলসীদাসের একটা দোহা শুনেছি—

"চিদানন্দ ঘট্‌মে বইসে বুঝত তাঁহা নিবাস
সোই মৃগঙ্গ মৃগনাভিমে ঢুঁরত ফিরত সুবাস ॥"

অর্থাৎ যেমন মৃগমদ কস্তুরী মৃগনাভিতে বিদ্যমান থাকতেও মৃগগণ তার অন্বেষণ করতে করতে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেরূপ চিদানন্দ ব্রহ্ম নিখিল মনুষ্য হৃদয়ে বিরাজ করলেও ভ্রমান্ধ মনুষ্যগণ তার অন্বেষণে নানা তীর্থে ধাবিত হয়। কিন্তু নিজের ভিতর খোঁজে না। আপনিও তেমনি কস্তুরী মৃগ। আপনার ভিতরে যে কবিত্বরূপ কস্তুরী সঞ্চয় হচ্ছে আপনি তার সুগন্ধ না বুঝলেও বঙ্গবাসী গুণগ্রাহী রসিকবৃন্দ একদিন ঐ গন্ধে উন্মত্ত হবে। আমি সামান্য স্ত্রীলোক। বেশী কিছু বুঝি বা না বুঝি, তবে এটুকু বুঝি যে আমার এ দান অপদার্থে করিনি, সৎপাত্রেই করেছি; অনর্থক হয়নি, দানের পরম সার্থকতাই হয়েছে।

নকুলেশ্বর—গুরুদেব যদি জিজ্ঞাসা করেন যে এগুলি কোথায় পেলে, তখন কি বলব?

সরলা—আপনার কিছুই বলতে হবেনা, আমিই যা বলতে হয় বলবো। এখন চলুন বাড়ী যাই।

এই বলে সরলা কুঞ্জবাবুর বাড়ী এলেন। কুঞ্জবাবু বললেন—কিরে সরি, কেমন দেখলি? মেলা বুঝি খুব জমেছে?

সরলা—তা আর বলতে! কত রকম জিনিসপত্র, কত আনন্দ উৎসবের সমাবেশ! একবার নিজে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এই বলে সরলা সেই কাপড়ের প্যাকেটটি নিয়ে কুঞ্জবাবুকে দেখাল।

কুঞ্জবাবু—ওটা কিরে সরলা? ঠোঙ্গার উপর দেখি অভয় সাহার দোকানের ছাপ। শাড়ী কিনেছিস বুঝি?

সরলা—না বাবা, শাড়ী নয়।—এই বলে প্যাকেট খুলে ধুতি চাদর জামা বের করে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল—দেখুন তো কেমন হয়েছে?

কুঞ্জবাবু—বেশ ভাল হয়েছে। এ তো অনেক টাকার কাপড় জামা। কার জন্য কিনেছিস রে?

সরলা হাসিমুখে দীপ্তকণ্ঠে বলল—আপনার এই ছেলেটির জন্য। আসরে যাবার সময় সাধারণ জামাকাপড় পরে গেলে কি মানায়? সে এখন আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে জনপ্রিয় আসন লাভ করেছে। যা তা পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আসরে গেলে আমাদের সকলের এমন কি আপনারও লজ্জা পেতে হয়। আর আপনার ছেলেটি এমন লাজুক, মুখ ফুটে আপনার কাছে

চাইতে পারে না। আর আপনিও তো না চাইলে দিবেন না। তাই আমি ওর আসরের জন্য এইগুলি কিনে দিয়েছি।

কুঞ্জবাবু কি জানি একটা ভাবলেন। পরে বললেন—না না বেশ করেছিস্। তবে একটু লক্ষ্য রাখিস ছেলেটা অতিরিক্ত বিলাসপ্রিয় হয়ে না পড়ে। তাহলে কিন্তু ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

কুঞ্জবাবুর এই কথাটার মধ্যে যে একটা অদৃশ্য ইঙ্গিত লুকানো আছে সরলা এবং নকুলেশ্বরের তা বুঝতে বাকী রইল না। তথাপি সরলা বলল—সে জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ছেলে সে জাতের ছেলেই নয়।

* * *

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঝালকাঠি আজ আনন্দ মুখর। প্রত্যেক কবি-দলপতির বাড়ীতেই গান বাজনার আসর বসেছে। নূতন পুরাতন দোহারপত্র সকলেই যার যার অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্ব প্রকাশ করছেন। সন্ধ্যা দীপ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ঝালকাঠি বন্দরটি যেন গন্ধর্ব নগরীতে পরিণত হয়েছে।

কুঞ্জবাবুর বাড়ীতেও গান বাজনা চলছে। সকলে নকুলেশ্বরকে একখানা গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলে নকুলেশ্বর বললেন—আমি তো গান জানিনা এ বিষয়ে এখনো আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কি গান গাইব? তবে আজ এই রথের মেলায় ঘুরে ঘুরে আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছে, আপনারা যদি বলেন সেই ভিত্তিতে রচিত গানটি শুনাতে পারি।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—বেশ বেশ, তাই শোনাও। নকুলেশ্বর হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন—

বসেছে রথের মেলা এই যে মানবগঞ্জের হাটে।
কেহ বেচে কেহ কিনে, কেহ কারো পকেট কাটে॥

কেহ কিনে মাটির খেলা,
কেহ কিনে পুঁতির মালা,
কেউ চড়ে নাগরদোলা—
কত রঙ্গের মজা লোটে।

কেহ কর্ম ফলে জুয়া খেলে
সব হারায়ে মাথা কোটে॥

কেউ কিনে হাঁড়ি কুড়ি,
কেউ কিনে কাঁচের চুড়ি,
কেউ কিনে গুড় আর মুড়ি—
ছায়ায় বসে জাবর কাটে।
কেউ বা চুরি করে ধরা পড়ে
বেদম মার খেয়ে দম ফাটে॥
কত রঙ্গিনী নারী,
মিলিয়ে সারি সারি,
পরে তারা পাটের শাড়ী—
ঘুরে বেড়ায় মেলার মাঠে।
যত লোচ্চা দলে কায়দা পেলে
গোলে মালে চিমটি কাটে॥
খাঁটি রথযাত্রী যারা,
রথ দেখে ভাবে তারা,
দেহ রথ জীর্ণ জরা—
কালের ঘুণ লেগেছে কাঠে।
রথের ভাঙ্গা মেলায় শেষের বেলায়
ভবের ধূলায় পড়বে লুটে॥
দেখে এই রথের মেলা,
অসংখ্য রঙের খেলা,
সাঙ্গ হয়েছে বেলা—
দিবাকর বসেছে পাটে।
অধম নকুল বলে আয় সকলে
যেতে হবে পারের ঘাটে॥

রথের পর্ব শেষ হয়ে গেছে, নকুলেশ্বর এখন নিশ্চিন্ত মনে গুরুপাটে বসে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং গান মুখস্থ করা নিয়েই ব্যস্ত। শ্রাবণের মাঝামাঝি নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুকে বললেন—এ সময় আমি একবার বাড়ী গেলে ভাল হয় না ?

কুঞ্জবাবু বললেন—হ্যাঁ, তাই যাও; কিন্তু ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে ঝালকাঠি চলে আসবে। ভাদ্রমাসের শেষভাগেই তো দল নিয়ে ঢাকা রওনা হতে হবে। নৌকার জন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষাদি কেনাকাটা, নৌকাটা বেশ

করে মেরামত এবং ভাল করে রং করে নিতে হবে। আমি অধরমণির কাছে টাকাপয়সা রেখে যাব। তুমি ফিরে এসে যামিনীকে নিয়ে মাঝিদের মত মতো প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে দেবে।

নকুলেশ্বর গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করে বাড়ী চলে গেলেন। গ্রামে যাওয়ামাত্র গ্রামবাসীদের মনে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। প্রত্যেক রাত্রে বাড়ী বাড়ী হরির লুটের আসর বসতে লাগল—উদ্দেশ্য নকুলেশ্বরের মুখে একটু পাঁচালী শোনা। নকুলেশ্বরও সানন্দে সে সব উৎসবে যোগ দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—নিজের কাব্য চর্চা, আর সে সঙ্গে গ্রামবাসীদের আনন্দ দান। নকুলেশ্বরের পাঁচালী শুনে গ্রামের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নকুলেশ্বরকে একখানি দাশরথী রায়ের পাঁচালী দিয়ে বললেন—আমি তোমাকে এই পুঁথিখানা পুরস্কার দিলাম। তোমার বেশ কাজে লাগবে। নকুলেশ্বর সানন্দে বইখানা গ্রহণ করে দেখলেন সত্যিই তার ভেতরে পাঁচালীর ছন্দ শিখবার মত বহু বহু রসাল রচনা আছে। তিনি আনন্দ সহকারে বইখানা পাঠ করে কিছু কিছু মুখস্থ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এভাবে বিশ-পঁচিশ দিন আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যেই কেটে গেল। ভাদ্র-মাসের প্রথম সপ্তাহে নকুলেশ্বর তাঁর মায়ের কাছে বললেন—মা আমার আর বাড়ীতে দেরী করা উচিত নয়। গুরুদেব বলে দিয়েছেন ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহে ঝালকাঠি যেতে। অনেক কাজ আছে। তিনি এখন ঝালকাঠি নেই। আমার উপর কাজের ভার দিয়ে গেছেন। আমি এখন না গেলে তাঁর আদেশ অমান্য তো হবেই কাজও নষ্ট হবে।

ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহেই নকুলেশ্বর মাতৃ আশীর্বাদ নিয়ে ঝালকাঠি এসে পৌছলেন। অধরমণি বলল—তোমার গুরুদেব যা বলে গেছেন স্মরণ আছে তো? আমার কাছে টাকা পয়সা রেখে গেছেন। তুমি নৌকার মাঝিকে ডেকে এনে যামিনীকে নিয়ে নৌকার প্রয়োজনীয় সব জিনিষের একটা ফর্দ করে লও। আট দশ মাস নৌকায় থাকতে হবে, মাঝিদের দরকারী কোন জিনিসের যেন অভাব না হয়।

নকুলেশ্বর মাঝিকে ডেকে যামিনী নন্দীকে নিয়ে নৌকার দড়ি, কাছি, গুণদড়ি এবং লগী, মাস্তল ইত্যাদি সব জিনিসের একটা তালিকা করে নিয়ে সব সংগ্রহ করে রাখলেন। নৌকা মেরামত, রং ইত্যাদি সব কাজ কুঞ্জবাবু আসার পূর্বেই শেষ করে নিলেন।

ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহে কুঞ্জবাবু এসে সব দেখেশুনে খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন—এখন দোহারপত্রদের কাছে পত্র দাও, ২৯শে ভাদ্র নৌকা ঢাকায় রওনা হবে। সকলে ঠিক সময় মতো যেন উপস্থিত হয়। পত্র দেওয়া হলে সবাই এসে উপস্থিত হলো। শুধু কুঞ্জবাবুর দলই নয়, ঝালকাঠির সাত-আটটি কবির দল সবই ঐ তারিখে রওনা হবে। সকল দলপতির বাড়ীতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

২৯শে ভাদ্র ১৩২০ বঙ্গাব্দে সন্ধ্যায় সকল দল একত্র হয়ে স্থানীয় কালী-বাড়ীতে মহল্লা দিয়ে নৌকায় উঠবে। মহল্লা অর্থে প্রত্যেক দলের কবিগানের মরশুম শুরু হবার প্রাক্কালে ৺কালীমাতাকে একটু গান শুনিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া। কার দল কেমন হল, কোন দলে কোন গায়ক-গায়িকা গেল তা দেখাশোনার জন্য স্থানীয় বহু লোক কালীবাড়ীতে উপস্থিত। সকল দলে একটু একটু করে গান শোনাতে রাত দু'টো বেজে গেল।

মহল্লা শেষ করে সকলে গিয়ে যার যার নৌকায় উঠল। নৌকায় উঠে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে আট দশ মাসের জন্য কায়েমী সত্ত্ব করে নিল। দাঁড়িমাঝিরা আগেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। দলপতির আদেশ পাওয়ামাত্র 'বদরগাজী' বলে নৌকার পাড়া খুলে দিল। দেখে মনে হলো যেন চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসিয়ে বাণিজ্যে চলেছেন।

জাজিরার চরে প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মাঝে

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে শিকারপুর বাজারের ঘাটে গিয়ে সব দল নৌকা বেঁধে হাটবাজার সেরে আবার নৌকা খুলে দিল। রান্না খাওয়া নৌকাতেই হবে। নৌকায় উঠে দোহারপত্রের আর অন্য কোন কাজ নেই—শুধু গান-বাজনা করা আর নূতন গানের তালিম দেওয়া। মাঝিমাল্লাদের প্রাণপণ চেষ্টা, ছয় দিনের মধ্যে ঢাকার ঘাটে পৌঁছতেই হবে। তিন চার দিন সমানে নৌকা চালাবার পরের ঘটনা নকুলেশ্বর লিখে রাখলেন—

পহেলা দোসরা গেল তেসরা আশ্বিন,
সকাল হতে মেঘলা আকাশ দুর্যোগপূর্ণ দিন।
গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ে লেউলিয়া বাতাস,
মাঝি বলে এটা কিন্তু ঝড়ের পূর্বাভাস।

কুঞ্জবাবু বলেন তোমরা নৌকার পাড়া তোল,
সন্ধ্যার আগে চেষ্টা করে পদ্মাপারে চল।
মাঝিমাল্লা নৌকা খুলে কষে ধরল দাঁড়,
বামুন চাকর রান্নাবান্নার করিল জোগাড়।
কোনমতে খাওয়ার পালা মিটেমাটে গেল,
সন্ধ্যাকালে নৌকাখানা পদ্মার কাছে এল।
মাইলখানেক দূর থেকে করতেছি শ্রবণ,
পদ্মা নদীর কান ফাটানো প্রলয় গর্জন।
যেতে আর সাহস হল না পদ্মা নদীর ধারে,
নৌকা লঙ্গর করা হল জাজিয়ার চরে।
চরের মাঝে আছে অনেক চরচাষীদের ঘর,
ছেলেমেয়ে গরুবাছুর—আছে বহুতর।
হ্রদের মত একটা স্থানে নৌকা সারি সারি,
কবি, যাত্রা, ঢপ, কীর্তন, মহাজন, বেপারী।
সন্ধ্যার পরে শুরু হল প্রলয় ঝড়ের পালা,
ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রলয় শব্দে কানে লাগে তালা।
হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে রাত দুপুরে,
কুঞ্জবাবুর নৌকাখানার ছাদটা গেল উড়ে।
তার উপরে মুষলধারে পড়ে বৃষ্টিধারা,
দোহারপত্র ভিজেবুড়ে হল জ্যান্তে মরা।
কারো মুখে নাইকো ভাষা সকলেই নীরবে,
সকলেরই স্থির সিদ্ধান্ত জীবনান্ত হবে।
কুঞ্জবাবু বলেন তোমরা প্রাণে ধৈর্য ধর,
নিদান বন্ধু দীনবন্ধু তাঁরে স্মরণ কর।
সবে মিলে শুরু হল নামকীর্তন করা,
প্রাণের ডাকে অভাগারও চক্ষে বহে ধারা।
নাম নিয়ে কেঁদে কেটে প্রভাত হল রাতি,
ভোরের সঙ্গে থেমে গেল ঝড়ের মাতামাতি।
প্রলয় ঝড়তো থেমে গেছে সাহস এল বুকে,
অন্তরে এক ঝড় উঠিল চরের দৃশ্য দেখে।

কোথায় গেল ঘরবাড়ী আর কোথায় জনগণ,
কোথায় গেল পাইকারী বেপারী মহাজন।
সকল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রলয় ঝড়ে,
শুধু গানের নৌকাগুলি ঠেকে আছে চরে।
নকুল গিয়ে প্রশ্ন করে গুরুদেবের কাছে,
প্রলয় ঝড়ে কেমন করে আমরা গেলাম বেঁচে।
গুরু বলেন কথায় বলে ভক্তের ভগবান,
জনম ভরে করি মোরা কৃষ্ণ গুণগান।
ভক্তিতে বা অভক্তিতে নাম নিলে অধরে.
নামাভাসে প্রভু এসে তাহাকে উদ্ধারে।
হরিবলে চক্ষের জলে ভাসতে যদি পারে,
দীনের বন্ধু দীনবন্ধু তারে দয়া করে।
নামের মতন এমন রতন নাই এ ভূতলে,
যা কর তা কর, কিন্তু নাম যেও না ভুলে।
নকুল বলে প্রত্যক্ষ যা দেখিলাম নয়নে,
বিপদবারণ এই হরিনাম ভুলব না জীবনে।
সকালবেলা সবে মিলে নৌকা নামাইল,
পদ্মা পাড়ি দিবে বলে তৈরী হয়ে নিল।
'গঙ্গা মাইকী জয়' বলিয়ে নৌকা দিল ছেড়ে,
পদ্মার কাছে গিয়ে যে সব দৃশ্য চোখে পড়ে।
পানা পুকুরেতে যেমন পানা ভেসে আসে,
পদ্মার বুকে তেমনি মত মরা মানুষ ভাসে।
আবাল বৃদ্ধ নরনারী সন্তান সন্ততি,
জলের স্রোতে ভাসে কত যুবক যুবতী।
অর্থলোভী শকুনের দল ডিঙ্গি নৌকা লইয়া,
জলে ভাসা মরা ধরে পদ্মার মাঝে যাইয়া।
পুরুষ লোকের বসনভূষণ নারীর অলঙ্কার,
খুলে নিয়ে জলে মড়া ফেলে দেয় আবার।
পাড়ি দিয়ে দেখি গিয়ে লৌহজং বাজারে,
কোন ঘরের চিহ্ন নাই উড়ে গেছে ঝড়ে।

বড় বড় গুদাম ঘরের উড়ে গেছে চালা,
লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ পড়ে আছে খোলা।
ফ্ল্যাট একটা বান্ধা ছিল লৌহজং-এর ঘাটে,
প্রাণের ভয়ে অনেক লোক ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠে
প্রলয় ঝড়ে শিকল ছিঁড়ে মধ্য গাঙে নিয়া,
জন্মের মত আশ্রয় দিল জল-সমাধি দিয়া।
গোয়ালন্দের জাহাজখানা ঝড়ের বেগে উড়ে,
শুকনা ডাঙ্গায় পড়ে আছে আধা মাইল উপরে
প্রত্যক্ষ যে না দেখেছে হবে না প্রত্যয়,
মনে করবে ঠাকুর মায়ের ঝুলির গল্প কয়।
নকুল বলে মহাপ্রলয় নাম শুনেছি কানে,
প্রত্যক্ষ এই প্রলয় দৃশ্য ভুলব না জীবনে।

আগরতলা রাজবাড়ীতে কবিগান

ভোর হতে ঝড়ের তাণ্ডব শেষ হয়ে গেছে। কুঞ্জবাবু ঢাকা যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে পূজাবাড়ী রওনা হলেন। সে বৎসর তাঁর দুর্গাপূজার বায়না ছিল আগরতলা রাজবাড়ী। তিনি মাঝিদের নির্দেশ দিলেন—তোমরা ভৈরব বাজারের ঘাটে গিয়ে নৌকা বাঁধবে। আমরা দল নিয়ে ট্রেনে যাব। মাঝিরা প্রাণপণ চেষ্টা করে ভৈরব বাজার গিয়ে নৌকা বাঁধল। দল নিয়ে কুঞ্জবাবু ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় আগরতলা রাজবাড়ীতে পৌঁছলেন।

রাজবাড়ীতে গিয়ে দেখা গেল প্রকাণ্ড নাটমন্দিরের টিনের চালা ঝড়ে উড়িয়ে নিয়েছে। মণ্ডপ ঘরে প্রতিমার পরিবর্তে ঘট স্থাপন করে পূজার আয়োজন হয়েছে। এই সব দেখে শুনে নকুলেশ্বর খুব মর্মাহত হয়ে যামিনী নন্দীকে বললেন—দাদা, এবছর কোন্ কুক্ষণে যাত্রা করে এসেছি জানি না; আমার মনের সব উদ্যম উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেছে। আগরতলা রাজবাড়ীর বায়নার কথা শুনে মনে কত আনন্দ হয়েছিল—কত দেখব, কত শুনব; সে ধারণা সব ওলট-পালট হয়ে গেল। এই শ্মশানের ভগ্নস্তূপের মধ্যে কি কবিগানে আনন্দ হয়?

যামিনী নন্দী—মন খারাপ করে লাভ কি? ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ

হয়েছে। যাক, এখন ওসব দুশ্চিন্তা ছেড়ে বিপক্ষে কোন দল বায়না হয়েছে সে সব খোঁজ খবর নাও গিয়ে।

নকুলেশ্বর খোঁজ নিয়ে জানলেন ময়মনসিংহ জিলার হরিহর আচার্য মহাশয়ের দল বিপক্ষে বায়না হয়েছে। তিনি ঢাকা জেলার নরসিংদী নিবাসী কবিগুরু হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের সমসাময়িক কবি। নকুলেশ্বর গিয়ে গুরুদেবের কাছে এই সংবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, তিনি বোধ হয় খুব বড় কবি ?

কুঞ্জবাবু—বড় তো বটেই, তবে হরি আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে তুলনা হয় না ; আকাশ পাতাল পার্থক্য।

কুঞ্জ দত্ত বনাম হরিহর আচার্য

ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী তিনদিন শুধু আসরে গিয়ে একখানা ডাক গানে মায়ের বন্দনা করেই গান বন্ধ। আসরে শ্রোতা নেই, ঘরে ঘরে কান্নাকাটি। কার গান কে শোনে ?

নবমীর রাত্রে কিছু লোকজন এসে আসরে সমবেত হলে গান আরম্ভ হলো। সখী-সংবাদ গান শেষ করে কুঞ্জবাবু আসরে গিয়ে টপ্পা শুরু করলেন—

ঠাকুর চণ্ডীদাসের শিষ্য আমি নামটি ভক্তদাস।
তুমি নান্নুরের সমাজপতি, সর্বেশ্বর তর্ক ভারতী,
রাধাকৃষ্ণ মূরতি, পূজ বারো মাস ॥
হেথায় বাশুলী দেবীর মন্দিরে,—
চণ্ডীদাস পেয়েছিলেন পূজার ভার ;
রজকিনী রামিনী, সেই পূজার ষোড়শ উপাচার।
পেয়ে নিত্যাদেবীর প্রত্যাদেশ,
ব্রজ রসের ভাবাবেশ,
চণ্ডীদাস করতেছেন প্রচার।
তুমি জাতি দ্বন্দ্বে হয়ে অন্ধ—
আজ কেন সমাজ বন্ধ করো তার ?

কুঞ্জবাবু এভাবে প্রশ্ন করে দল নিয়ে বের হয়ে এসে নকুলেশ্বরকে বললেন—

এখন হরিহর আচার্য মহাশয় আসরে গিয়ে কি উত্তর করেন শুনে রাখ। দ্বিতীয় আসরে আমি আর যাব না। যা করতে হয় তুমি করবে।

নকুলেশ্বর বললেন—আচ্ছা আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন, আসরের চিন্তা করবেন না। যা করতে হয় আমি করব, আপনি আশীর্বাদ করলেই যথেষ্ট।

হরিহর আচার্যের দলের নৈপুণ্য

হরিহর আচার্য মহাশয় দল নিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন। দলের তেমন কোন পারিপাট্য নেই। গ্রাম্য সখের দলের মতো অবস্থা। একটি ঢোল আর একটি কাঁসি ছাড়া অন্য কোন যন্ত্র নেই। কাঁসিখানা ঘড়ি-কাঁসির মতো। আসরে ওটা বাজতে শুরু করলে ঐ কাঁসির সুরের সঙ্গে দোহারগণ আ—আ করে সুর মিলাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সরকার মহাশয় উঠে সখী-সংবাদ গানের জবাবের পদ বলতেই ঐ সুরে ধরতা মশাইরা গাইতে আরম্ভ করল।

নকুলেশ্বর মনে মনে তাদের তারিফ না করে পারলেন না। কেননা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে শুধু কাঁসির সুরে সুর মিলায়ে গান করা কি কম কৃতিত্বের কথা! আর ঝালকাঠির কবিয়ালদের ঢোল, কাঁসি, হারমনিয়াম, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র ছাড়া দোহাররা 'হাঁ' করতে পারে না। আসরে গিয়ে সব যন্ত্র মিলিয়ে কনসার্ট দিয়ে সুর জমানো হলে গায়ক-গায়িকারা গিয়ে গান ধরে। আর এদের সে সব বালাই নেই! কাঁসির ঠন্‌ঠন্‌ শব্দের সঙ্গে গান ধরে—একটু বেসুরাও হয় না। তাই নকুলেশ্বরের বিচারে ঝালকাঠির ওস্তাদ-দের চেয়ে ওদের ওস্তাদি অনেক বেশী। নকুলেশ্বর মনে মনে তাদের ধন্যবাদ দিলেন।

সখী-সংবাদের জবাব শেষ করে হরিহর সরকার মহাশয় টপ্পার জবাব আরম্ভ করলেন—

আমি চণ্ডীদাসের সমাজ বন্ধ করি কি কারণ?
ও সে হয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে,
ব্রাহ্মণের বেদাচার ফেলে,
অসতের সঙ্গে মিলে, হয়েছে পতন॥
ওসে রামিনী ধোপানীর সনে
করেছে অবৈধ প্রেম সম্বন্ধ;

তার এই অবৈধ কাজে
সমাজে সবে কয় মন্দ।
ছেড়ে মন্ত্র তন্ত্র গায়ত্রী,
নিয়ে সেই আশ্রয়-পাত্রী,
দিন রাত্রি করে আনন্দ।
অন্ত নষ্ট করতে সেই ব্যভিচার—
আমি তার করেছি সমাজ বন্ধ॥

হরিহর আচার্যের জবাবে নকুলেশ্বর

নকুলেশ্বর টপ্পা-গান শুনে গিয়ে কুঞ্জবাবুর কাছে পদগুলি বললেন। কুঞ্জবাবু বললেন—আমাকে শুনিয়ে লাভ কি? আমি তো আর আসরে যাব না। তুমি যা হয় একটা জবাব তৈরী করে নাও। কিন্তু সাবধান, ব্যক্তিগত আক্রোশ করে কারো মনে ব্যথা দিবার চেষ্টা করবে না। কাব্যরসের সৃষ্টি করে মানুষকে আনন্দ দান করার চেষ্টা করবে। তাতে নিজের যশও হবে, রসও হবে। যাও, এখন দল নিয়ে আসরে যাও।

নকুলেশ্বর এখন আর পূর্বের মুখচোরা নকুলেশ্বর নেই। কবিতে তাঁর উদ্যম উৎসাহ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গুরু বাক্যে তিনি দল নিয়ে আসরে গিয়ে হরিহর আচার্য মহাশয়ের টপ্পাখানার জবাব করতে লাগলেন, যথা—

বললে, ধোপানীর অবৈধ প্রেমে মজে চণ্ডীদাস।
ঠাকুর চণ্ডীদাস যে প্রেম করে,
ডুবেছে প্রেমের আকরে,
বেদবিধির পরপারে, সে প্রেমের নিবাস॥
শুনি পরকীয়া প্রেমের তরে—
শ্রীকৃষ্ণ মনে করে অভিষ্ট;
রাইকে বনে আসিতে বাঁশীতে করে আকৃষ্ট।
যদি হরণ করে পরদার,
কৃষ্ণের না হয় ব্যাভিচার,
সে তোমার সাধনার ইষ্ট।
তবে চণ্ডীদাস আর রজকিনী—
কও শুনি কোন্ বিচারে নিকৃষ্ট?

এভাবে জবাব দিয়ে সে সঙ্গে পাঁচালীতে নানা প্রকার রসের অবতারণা করলেন নকুলেশ্বর। লেখনীতে সে সব লিখে জানানো দুঃসাধ্য।

প্রথমে টপ্পার জবাবে এবং পরে ছড়া পাঁচালীতে চোখা চোখা বাক্যবাণে আচার্য মহাশয়কে জর্জরিত করে নকুলেশ্বর দল নিয়ে চলে এলেন। ছেলে মানুষের মুখে এরকম রসাল পাঁচালী ও বাদ প্রতিবাদ শুনে আসরের শ্রোতাগণ সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

হরিহর আচার্য মহাশয় দ্বিতীয় আসরে গিয়ে জবাব দিলেন বটে কিন্তু তেমন রসাল করতে পারলেন না। একে তো বৃদ্ধ মানুষ, কণ্ঠস্বরও তেমন ভাল ছিল না। কাজেই শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।

দুর্গাপূজার গান শেষ হয়ে গেল। লক্ষ্মীপূজা কালীপূজায়ও পরপর গান হল বটে কিন্তু শারদীয় উৎসব হতে শরৎ-হেমন্ত-শীতকাল পর্যন্ত মানুষের মনে যে একটা প্রবল আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হতো, সে স্রোতে অকালে ভাটা লেগেছে। সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়-বন্যায় জ্ঞাতিবন্ধুহারা মানুষের মনের আনন্দের মেলা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেছে।

নকুলেশ্বরের খাটুনী খুব বেড়ে গেছে। যেখানেই গান হয় নকুলেশ্বরের টপ্পা-পাঁচালী শোনার জন্য শ্রোতারা কুঞ্জবাবুর কাছে আবেদন করে। তিনিও নকুলেশ্বরের উপর ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্তে অবকাশ যাপন করছেন।

কথায় বলে পোড়ায় পোড়ায় সোনার রং বাড়ে। নকুলেশ্বরকেও তেমনি এক পোড়ার সম্মুখীন হতে হল।

রাঁধুনীর কাজে

দলের বেহালাদার রোহিনী ঘটক ছিলেন একটি ক্ষ্যাপার মতো মানুষ। দু'বেলা একটু সিদ্ধি সেবন করতেন। দু'টি কাজের ভার নিয়ে তিনি দলে ভর্তি হয়েছেন—দলের পাচক ঠাকুরের কাজও করবেন এবং গানের সময় আসরে বেহালাও বাজাবেন।

কালীপূজা বাড়ীতে গানের আসরে শ্রোতাদের হুকুম হলো, তারা হরি আচার্য মহাশয়ের রচিত "ডোমের গোষ্ঠ" গানখানা শুনবেন। ঐ গানখানা বারো পর্দার সুর না দিলে জমে না। দোহারপত্র সকলে রোহিনী ঘটককে বলল, বারো পর্দায় সুর বাঁধুন।

রোহিনী ঘটক আপত্তি জানিয়ে বলল—আমার পুরাতন বেহালা; বারো

পর্দায় সুর বাঁধতে গেলে বেহালার ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু দোহারপত্র তার সে আপত্তি শুনবে কেন? আসরে গান জমাট করতে হবে—যেখানে সুর দিতে বলবে সেখানেই দিতে হবে। রোহিনী ঘটক দায় ঠেকে তাদের প্রস্তাবে বাধ্য হয়ে বেহালায় সুর বাঁধতে লাগল।

যে কথা সে কাজ। বারো পর্দায় সুর বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে বেহালার ঘাড় দুমড়ে গেল। রোহিনী ঘটক কোন কথা না বলে ভাঙ্গা বেহালা নিয়ে আসর হতে বের হয়ে একেবারে নৌকায় চলে গেল। মাঝিমাল্লারা মনে করল রান্না করবার জন্য বুঝি এসেছে। তারা রান্নার সব আয়োজন করে দিল। কিন্তু কার রান্না কে করে। সে নৌকায় এসে গাঁজার কলকে বের করে এক কলকে গাঁজা ভরে খুব দম কষে নিয়ে তার বিছানা ও সব জিনিসপত্র গাঁটুরী বাঁধতে শুরু করল।

মাঝিরা জিজ্ঞাস করল—ঠাকুরদা রান্না করবেন না? দু'চার ডাকে সে মোটে উত্তর দিল না। বাঁধাছাঁদা সারা করে শিব চক্ষু হয়ে বসে রইল।

গান শেষ করে কুঞ্জবাবু নৌকায় এসে ঐ দৃশ্য দেখে রোহিনী ঘটককে জিজ্ঞাসা করলেন—একি! আসর ছেড়ে নৌকায় এসে এসব কি হচ্ছে? গাঁটুরী বেঁধেছ কেন?

রোহিনী ঘটক দুর্বাসা ঋষির মতো তর্জনী উঁচু করে বলল—গাঁটরী বাঁধবনা তো কি? এমন অসুরের দলে আমি আর চাকরী করব না। আমার হিসাব মিটিয়ে দিন, আমি এক্ষুণি চলে যাব।

কুঞ্জবাবু—সে কি! চলে যাবে কেন? আর যাবো বললেই কি যাওয়া হয়? স্থির হয়ে বস। অসুরের দল বললে কেন? দলের সবাই বুঝি অসুর; আর তুমি বুঝি স্বর্গের দেবতা?

রোহিনী—তা নয় তো কি? সুর-জ্ঞান না থাকলেই তাকে অসুর বলে। ওদের যদি সুর-জ্ঞান থাকতো তা হলে কি আর এমন সর্বনাশ হয়? বারো পর্দায় সুরের জিদ ধরে আমার ৺মায়ের যন্ত্রেরই যখন ঘাড় ভেঙেছে, এ দলে আমি আর অন্নগ্রহণ করবো না।

কুঞ্জবাবু—আরে এত রাগ করছে কেন? মায়ের যন্ত্রটি খুব পুরানো কিনা তাই ভেঙ্গে গেছে। ওটা বাদ দিয়ে একটি নূতন মায়ের যন্ত্র কিনে নাও। আমি টাকা দিচ্ছি। দল ছেড়ে যাবে কেন? দোহারগণ যে পর্দায় সুর দিয়ে গান

জমাট করতে পারবে সেখানেই সুর বাঁধতে হবে। মায়ের যন্ত্রটি পুরানো কি নূতন তারা দেখবে না। তাতেই কি তারা অসুর হয়ে গেল ?

কিন্তু চোরা নাহি শোনে কভু ধর্মের কাহিনী। কুঞ্জবাবু যতই প্রবোধ দিচ্ছেন, রোহিনী ঘটকের গরম চক্ষু আর নরম হলো না। সে বলল—আপনি আমার হিসাব দেখে দিন। আমি আর এক মুহূর্তও এ দলে থাকবো না।

নকুলেশ্বর এতক্ষণ চুপ করে উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। কুঞ্জবাবু এত অনুরোধ করার পরেও যখন ঘটক ঠাকুর রাজী হলো না, তখন আর নকুলেশ্বর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। না পারারই কথা। তার পুরানো একটা ভয়জা বেহালার পরিবর্তে কুঞ্জবাবু নূতন বেহালা কিনে দিতে চাইলেন ; তাতেও যখন রাজী হলেন না, তখন নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুকে বললেন—বাবা, আপনি ভুল করছেন। কুকুরের লেজে ঘি মালিশ করলেও তা কখনো সোজা হয় না। যাক, ওকে আর সাধাসাধি করবেন না। ওর হিসাব ফুট করে ছেড়ে দিন। ওর বজরা বেহালার কান্না ছাড়াও আমাদের গান চলবে।

কুঞ্জবাবু—আরে বেটা গান না হয় চলবে ; কিন্তু প্রাণ বাঁচা যে দায় হবে।

নকুলেশ্বর—সে আমাদের প্রাণ বাঁচাবার মালিক নাকি ?

কুঞ্জবাবু—এক প্রকার তাই ! শুধু বেহালা বাজাবার কাজ নিয়ে তো ও আসেনি ; রান্নার কাজও তার হাতে। এখন যদি ও চলে যায় তা হলে আমাদের প্রাণ বাঁচবে কিসে ? রান্না করবে কে ?

নকুলেশ্বর জিদের বসে বলে ফেললেন—আমি করব।

কুঞ্জবাবু হেসে বললেন—না রে বাছা ! এ আসরে পাঁচালী বলা নয়। এ যে বড় কঠিন কাজ। এতগুলো লোকের রান্না করা কি সোজা কথা ? অভ্যাসও যেমন লাগে, শারীরিক পরিশ্রম ও শক্তিরও প্রয়োজন।

নকুলেশ্বর—সে যা হয় হবে। আপনি ওকে বিদায় দিন। এত অনুরোধেও যখন তার বাঁকা ঘাড় সোজা হলো না তখন কি ওর পায়ে ধরতে হবে ?—এই বলে নকুলেশ্বর মাঝি মাল্লাদের নিয়ে রান্নার জায়গায় চলে গেলেন।

নকুলেশ্বরের জিদ দেখে গায়িকা সরলাও হাসতে হাসতে তাঁর সঙ্গে গেল। মাঝিরা নদীর চরে ভাল একটু উঁচু স্থান দেখে মাটি খুঁড়ে উনুন করে আগুন দিয়ে দিল। চাকর জল মসলা চাল ডাল প্রস্তুত করে দিল। নকুলেশ্বর গিয়ে পাকা রাঁধুনীর মত মোড়া পেতে বসলেন। নকুলেশ্বরের পেছনে বসে সরলা

হাসতে হাসতে বলল—এতদিন সরকার মহাশয় আমাদের পেছনে বসে আসরে পাঠ বলে দিয়ে আমাদের চালাচ্ছেন ; সেই ঋণ শোধ করবার জন্য এখন আমিই মাষ্টার মশাই হয়ে পেছনে বসে পাঠ বলে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে দোহারী করুন, কোন ভয় নেই—এই বলে সরলা নির্দেশ দিতে লাগল। নকুলেশ্বরও শান্তশিষ্ট ছাত্রের মত 'গুরুবাক্য' পালন করতে লাগলেন।

মাছ ডাল তরকারী তো গুরুমশাই'র নির্দেশে এক প্রকার হয়ে গেল। কিন্তু বিশ পঁচিশ জন লোকের ভাতের হাঁড়ি নামানো তো আর গুরুর নির্দেশে হয় না ; শক্তি সামর্থের দরকার। ভাত তো হয়ে গেছে, এখন হাঁড়িটা কি করে নামাবে নকুলেশ্বর চিন্তা করছেন।

সরলা বলল—কথায় বলে তালগাছের আড়াই হাত। ভাতের হাঁড়ি কি করে নামাবেন ?

নকুলেশ্বর—তাইতো ভাবছি। এতক্ষণ তো গুরুবাক্যে হাতাফাতা নেড়ে কাজ সেরেছি, এখন তো আর গুরুবাক্যে কুলোবে না ; শক্তি সামর্থের দরকার। এত বড় ভাতের হাঁড়ি নামানো ত আমার ক্ষমতার বাইরে।

সরলা হেসে বলল—পুরুষের পৌরুষেই সব কাজ হয়না। হাঁড়িটার মুখে মাড়গালা গামছাটা খুব শক্ত করে বেঁধে উনুন হতে হাঁড়িটা কাৎ করে গড়িয়ে দিন। দু'চার হাত গেলেই ধরে দেখবেন হাঁড়ির একপাশে একটা ছিদ্র ছিপি দিয়ে বন্ধ করা আছে। ওটা খুলে ধরে রাখলেই সব মাড় পড়ে যাবে। কোন শক্তি সামর্থের দরকার হবে না।

সরলার পরামর্শ মতো নকুলেশ্বর তাই করলেন এবং মনে মনে বললেন—লোকে বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ; কিন্তু এখন বুঝলাম স্ত্রীবুদ্ধি সব জায়গাতেই প্রলয়ঙ্করী নয়, স্থান বিশেষে শুভঙ্করী বটে। যা হোক প্রথম দিনের রসুই পর্বটা সরলার প্রেরণায় ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। এখন হতে পাচক ব্রাহ্মণের কাজটা নকুলেশ্বরের উপরেই বহাল হল।

পুনরায় ভগ্নীপতির হিতোপদেশ

একদিন নকুলেশ্বর নারায়ণগঞ্জ কালীরবাজার চাড়ার ঘোপে রান্না চাপিয়ে বসে আছেন। কালীপূজার পর থেকে সব কবির দলই ঐ ঘাটে থাকে। নকুলেশ্বরের ছোট ভগ্নীপতি তারিণীচরণ চন্দ ডেভিড কোম্পানীর অফিসে কাজে যাওয়ার পথে নকুলেশ্বরকে রান্না করতে দেখে খুব রেগে গিয়ে গত বৎসরের

মতো গালাগাল শুরু করে দিলেন—ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কবিগান শিখতে এসেছ! এই বুঝি তোমার কবিগান শিক্ষা? এইসব চাকরমাইন্দারের কাজ করবার জন্যই বুঝি কবির দলে ভর্তি হয়েছ? নাও, এখন থেকে দলের মেয়েগুলোর কাপড়জামা ধোয়াও শিখে নাও। কবি শিক্ষাটা খুব ভালভাবেই হবে ইত্যাদি। নকুলেশ্বর জবাব না দিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলেন। তারিণীবাবু রাগে গর গর করতে করতে চলে গেলেন।

পরদিন আবার এসে তিনি নকুলেশ্বরকে বললেন—আমার চোখের ওপর বসে এসব জঘন্য কাজ করতে তোমার লজ্জা হয় না, কিন্তু লজ্জায় আমার তো মাথা কাটা যায়। তুমি একাজ করতে পারবে না। খুব কবি শিখেছ; এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আর কবি শিক্ষার কাজ নেই।

নকুলেশ্বরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি তার মুখের উপর বলে দিলেন —আপনি আমার কে? আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কই, এতোদিন তো এতো আত্মীয়তা দেখান নি। এখন গার্জিয়ানী ফলাতে এসেছেন কেন? যদি কোনদিন গুরুর কৃপায় মানুষের মতো মানুষ হতে পারি সেদিন আপনার মতো শ' দুই শ' টাকা মাইনের চাকর আমার হুকুমে চলবে। আশীর্বাদ করে যান যেন এভাবে শুক্তি কুড়াযে মুক্তা সংগ্রহ করতে পারি। এ বলে নকুলেশ্বর পানসীতে চলে গেলেন।

তারিণীবাবুর গালাগাল খেয়ে নকুলেশ্বর মনঃক্ষুণ্ণ হলেন না। হঠাৎ মহাভারতে সন্দীপন-শিষ্য উপমন্যু ও আরুণির কথা মনে পড়ে গেল। তারা কি ভাবে গুরুসেবা করে বেদবেদাঙ্গ ষড়দর্শনে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি ভাবলেন—আমিও গুরুসেবার কাজ করছি। অপরের গোলামী মাইন্দারী করতে আসিনি। গুরুকৃপায় যদি মানুষের মতো মানুষ হতে পারি সেদিন তারিণীবাবুকে দেখিয়ে দেব যে গুরুর গোলামী করে পরের গোলামী করা শিখিনি, স্বাধীনভাবে তার মতো মাইনে-করা গোলাম খাটাবার শক্তি অর্জন করেছি।

সেদিন হতে নকুলেশ্বর আরো উদ্যম ও উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করলেন। দু'একদিন পরে ঢাকা জেলার নরসিংদী বন্দরে মহাজন সমিতির বারোয়ারী কালীপূজা উপলক্ষে দুই পালা কবিগানের জন্য কুঞ্জবাবুর দল বায়না হয়ে গেল। বিপক্ষে থাকবেন কবি-সম্রাট হরিচরণ আচার্য।

ঢাকা নরসিংদী বাজারে—কবি-সম্রাট দর্শনে

নকুলেশ্বর এযাবত হরি আচার্যের নামই শুনেছেন, কিন্তু দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়নি। আজ সেই সৌভাগ্য ফলবতী হতে চলেছে জেনে নকুলেশ্বরের মনে আনন্দ আর ধরেনা। কখন তাঁর দেখা পাবেন, কখন তাঁর গান পাঁচালী শুনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন এই এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

নির্দিষ্ট দিনে পান্সী খুলে নরসিংদী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে পথে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন—আচার্য কর্তা দেখতে কেমন, কেমন গান করেন, কেমন পাঁচালী বলেন ইত্যাদি।

কুঞ্জবাবু বললেন—কথায় বলে চক্ষু কর্ণ ছয় মাসের পথ। দু' একদিন পর যাঁকে দেখতে পাবে, যাঁর গান শুনতে পাবে তাঁর বিষয় প্রশ্ন করে লাভ কি? কি উত্তর দেব? তবে এক বাক্যে বলতে পারি তিনি অদ্বিতীয়। অর্থাৎ তাঁর মত জবাবে, গানে, সুরে, তালে ছন্দে ও বাক্যবিন্যাসে সর্বগুণসম্পন্ন কবিয়াল পূর্বে ছিলনা, বর্তমানে আর হয় নি, ভবিষ্যতে হবে কিনা কে জানে?

কথাগুলি শুনতে শুনতে নকুলেশ্বর যেন কোন ভাব রাজ্যে প্রবেশ করে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—আমি যদি তেমন কবি হতে পারতাম! ভগবান কি আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবেন?

গানের দিন ভোরবেলা নৌকা গিয়ে নরসিংদী বাজার ঘাটে পৌছল। নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুকে বললেন—বাবা আচার্য কর্তার বাড়ী নাকি এই নরসিংদী গ্রামে?

কুঞ্জবাবু—গ্রাম বলছিস্ কেন? এই বাজারের সঙ্গেই তাঁর শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার আশ্রম। সেই আশ্রমের ঘাটেই তাঁর পান্সী বাঁধা। তিনি পান্সীতেই থাকেন।

নকুলেশ্বর— তবে আমি গিয়ে একটু দেখে আসব?

কুঞ্জবাবু—যাও, কিন্তু সাবধান কোন রকম ছেলেমি করে কোন কিছু প্রশ্ন করে তাঁকে যেন বিরক্ত করোনা।

নকুলেশ্বর যামিনী নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের ঘাটে গিয়ে আচার্য কর্তার পান্সীতে উঠলেন। মধ্য কামরায় যেখানে সব দোহারপত্র থাকে সেখানে গিয়ে বসলেন।

নকুলেশ্বরের সন্ধানী চোখ যাঁর সন্ধান করছে তিনি তাঁর জন্ত রক্ষিত বিশেষ

কামরায় গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে পদ্মাসনে মালা নিয়ে বসে আছেন—যেন বিশ্বামিত্র মুনি।

উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু, মুখে লম্বা দাড়ি, মস্তকে টাক, পেছনে সামান্য কিছু কেশ ঝুঁটি বাঁধা। চোখ দু'টি যেন কোন ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু। নকুলেশ্বরের যেন আর তর সইছে না, তিনি কারো অনুমতির অপেক্ষা না করে কর্তার কাছে গিয়ে ঢিপ্ করে প্রণাম করলেন।

আচার্য কর্তা তাঁর ডাক-সরকার কাশী নট্টকে বললেন—কাশী, এই ছেলেটি কেরে?

কাশী নট্ট—কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের ছাত্র। আপনাকে দর্শনের জন্য এসেছে।

আচার্য কর্তা নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম তোমার?

নকুল—নকুলেশ্বর

আচার্য—কুঞ্জবাবুর সঙ্গে কত দিন আছ?

নকুল—এই দুই বছর।

আচার্য—শিখেছ কিছু?

নকুল—চেষ্টা করছি মাত্র।

আচার্য—টপ্পা পাঁচালী বলতে পার?

নকুল—সামান্য দু'চার কথা বলতে পারি।

আচার্য—বেশ বেশ। গুরুপদে নিষ্ঠা রেখো, মানুষ হতে পারবে।

এই বলে তিনি আবার মালা জপায় মনোনিবেশ করলেন। নকুলেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। সভক্তিতে আর একটা প্রণাম করে পান্‌সী হতে উঠে চলে এলেন।

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে নকুল, আচার্য কর্তার সঙ্গে দেখা হল?

নকুল—আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে।

কুঞ্জবাবু—কেমন দেখলে?

নকুল—কি আর বলব বাবা, আমার মনে হয় যেন কোন শাপভ্রষ্ট যোগী ঋষি এসে মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

কুঞ্জবাবু—এখন তাঁর পাঁচালী শুনলেই বুঝতে পারবে সকলে তাঁকে কবি-সম্রাট বলে মান্য করে কেন? যাও, এখন আহারাদির ব্যবস্থা করে বিশ্রাম কর। রাত দশটায় গান আরম্ভ হবে।

রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেঢোল কাঁসি বেহালা সানাই ও হারমোনিয়াম নিয়ে বাদকবৃন্দ আসরে গিয়ে কনসার্ট আরম্ভ করল। কনসার্ট শেষ হতেই সরলা, মানদা এবং সে সঙ্গে পুরুষ গায়কেরা সেজেগুজে আসরে গেলেন। সবার পেছনে সরলার দেওয়া ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবী চাদর পরে নকুলেশ্বর গিয়ে বসলেন।

আসর-বন্দনা, ভবানী-বিষয় গান গেয়ে প্রথম আসর শেষ করে কুঞ্জবাবুর দল বের হয়ে আসামাত্র আচার্য মহাশয়ের দল আসরে এলেন। তবে তাঁর দলের লোকজনের কোন পোযাকের জাঁকজমক নেই। সাদাসিদা ধুতিচাদর পরা। দলে মেয়ে আছে ছ'জন, চল্লিশ পঞ্চাশ বয়স। তাদের পরনে ঢাকাইয়া টাঙ্গাইল শাড়ী।

আচার্য কর্তার দলের অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত

নকুলেশ্বর তাদের গান শোনার জন্য আসরের কাছেই বসে আছেন। দোহারগণ সকলে আসরে এসে একখানা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ফটো সামনে রেখে নতজানু হয়ে প্রণাম করে উঠেই গান আরম্ভ করলেন—

গৌর রূপের ঝমকে, জগত চমকে, দমকে দামিনী—
এমন পিরীতি রসের মূরতিখানি, নদীয়ায় আনিল কে।
কিবে খঞ্জন গঞ্জন, নয়নে অঞ্জন, ত্রিলোক রঞ্জন তিলকে॥
ভোলে চরাচর চাঁচর চুলে, বনফুলের হার দুলিছে গলে,
তরুণ অরুণ নয়ন যুগলে, জলধারা গলে ঝলকে।
ঘন শিহরি শিহরি, শ্রীহরি বলিতে শ্রীশরীর পুলকে॥
(অন্তরা) ভজ পুণ্য ভূমি ধন্য রে নদীয়া।
গোরা সুরধুনী তীরে নাচে হরি ধ্বনি দিয়া॥
দাদা বসন্তে কয় হরিচরণ, পাবি যদি ঐ চরণ,
প্রিয়াজীর যুগল চরণে শরণ লও গিয়া।
শুধু গৌর-বক্ষ বিলাসিনী রানী বিষ্ণুপ্রিয়া॥

কথায় বলে "সাচ্চা গুড় আঁধার রাতেও মিঠা"—গান তো নয়, যেন রেকর্ড চলছে। মেয়ে দু'টির কণ্ঠস্বর তেমন ভাল নয় বলে চারজন পুরুষ দোহারের উপরেই দল নির্ভর। তাদের নাম—সুবল, বিহারী, গোবিন্দ সাহা ও রাধাচরণ। তারা বেহালা সহযোগে একক বা দ্বৈতকণ্ঠে সুর-সুধা সিঞ্চন করতে লাগল।

তাদের গান শুনে নকুলেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি এতদিন মনে করতেন যে ঝালকাঠির দলই ভাল গান করে, এদের মতো গায়ক-গায়িকা আর হয়না। কিন্তু আচার্য কর্তার দলের গান শুনে তার সে ভুল ভেঙ্গে গেল। যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ। এক একজনার কণ্ঠস্বর কোকিল কণ্ঠকেও হার মানায়। সুরের মুর্চ্ছনায় আসর নিস্তব্ধ। সে গান নিজ কানে যে না শুনেছে লেখনীতে প্রকাশ করে তাকে তা বোঝান যাবে না।

দ্বিতীয় আসরে নকুলেশ্বর দল নিয়ে গিয়ে একখানা মাথুর গান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা সম্বন্ধে বৃন্দাদূতীর ব্যাঙ্গোক্তি মূলক গান গাওয়ালেন। গানখানা শেষ করে বাইরে এসে আচার্য কর্তার জবাব শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হল না। আচার্য কর্তা এ আসরে এলেন না। তাঁর ছাত্র কাশী নট্ট ঐ মাথুর গানের জবাব দিতে আরম্ভ করলেন।

গানের জবাব করে তিনি গায়ে পড়ে দু'খানা 'রংফুকার' করে গেলেন—

১। ওদের দলে আছে দুইটা ছুঁড়ী,
ছুঁড়ী নয়তো তীক্ষ্ণ ছুরি,
ওদের মধ্যে ক্ষুরধার।
থাকবেন একটু হুঁশিয়ার॥

২। দেখি, ঘাগরা পরে ছুক্‌রি নাচে,
ছোকরা থেকে পাছে পাছে,
নর্তকীদের মন জোগায়॥

এভাবে রং-ফুকার করে কাশী নট্ট বের হয়ে গেলেন। কিন্তু তার এই গায়ে-পড়া স্থূল আক্রমণে নকুলেশ্বর একটু মর্মাহত হলেন। কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে, হরি আচার্যের মতো একজন মহামানবের সঙ্গ করে কাশী নট্ট না জানি কত মহৎ গুণের অধিকারী হয়েছেন! কিন্তু এই রং-ফুকার শুনে তুলসীদাসের একটি দোহার কথা নকুলেশ্বরের মনে পড়ে গেল—

নীচ নীচাই নহি ত্যজে
সজ্জন হুকে সঙ্গ।
তুলসী চন্দন বিটপ বাসী
বিন বিষ ভয়ে ন ভুজঙ্গ॥

অর্থাৎ "রে তুলসি! চন্দন বৃক্ষে বাস করিয়াও সর্প যেমন বিষহীন হয় না,

সেইরূপ নীচ ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করেও আর নীচতা পরিত্যাগ করতে পারে না।" কাশী নট্টও এমন মহামানুষের সঙ্গ করে মহৎ হতে পারেনি। তাই এই অনর্থক ব্যক্তিগত আক্রমণ। তবে এ ব্যাপারে কাশী নট্টকেও ষোল আনা দোষ দিয়ে লাভ নেই। কবিগানের উদ্যোক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যেই কেহ কেহ কবিয়ালদের আদি ও স্থূল রসাশ্রয়ী রং-ফুকার বা মালফুকার গাওয়ার জন্য উত্তেজিত করে থাকে, এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

যা হোক, রং ফুকার যখন গেয়েছে, তখন বিপক্ষকে তার জবাব না দিলে চলবেনা। নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে জবাব গাওয়ালেন—

১। বললে, আমার দলে দুইটা ছুঁড়ী,
ছুঁড়ী নয়তো তীক্ষ্ণ ছুরি—
তোমার ভাগ্যে ঘটবে না।
ঘোলে দুধের তৃষ্ণা মিটবে না॥
তোমার দলে দুইটা বুড়ী,
বয়স হয়েছে দু'তিন কুড়ি,
এসব পাকা শ্রোতার পাকা দাড়ি—
ভোঁতা ক্ষুরে কাটবেনা॥

২। বললে, ঘাগরা পরে ছুক্‌রি নাচে,
ছোকরা থেকে পাছে পাছে,
নর্তকীদের মন জোগায়—
ওসে মন জোগায় না গান জোগায়।
কাশী বাঁচেনা হিংসার জ্বালায়॥
থাকে দুইটা বুড়ীর সাথে,
ছুঁড়ী জোটে না বরাতে,
তাইতে, দুধভাত দেখে পরের পাতে—
নিজের গালে চাপড় খায়॥

নকুলেশ্বর বনাম কাশী নট্ট ও আচার্য কর্তা

নকুলেশ্বর কাশী নট্টের রংফুকারের জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসরের শ্রোতারা বললেন—আমরা এখন টপ্পা-পাঁচালী শুনতে চাই। নকুলেশ্বর অমনি টপ্পার লহর গান ধরলেন, যথা—

আমি কল্পনায় রুক্মিণী সতী, তুমি নারায়ণ।
অদ্য তোমার পূজা করিতে,
বাসনা করিয়ে চিতে—,
বড় সাধ করে বিধিমতে, করলেম আয়োজন ॥
আমি জলপদ্ম আর স্থলপদ্ম নীলপদ্ম, স্বহস্তে করে চয়ন ;
অদ্য তোমায় ফুল সাজে সাজালেম মদনমোহন।
যখন আনিয়ে রাধাপদ্ম, সাজাই তোমার পাদপদ্ম,
বিরুদ্ধ হলে কি কারণ ?
কেন পায়ের পদ্ম মাথায় তুলে—
আজ তুমি কান্না কর নারায়ণ ?

এই রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক টপ্পার লহরের মাধ্যমে বিপক্ষ দলের প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করে পরে ছড়া পাঁচালী মারফত উক্ত বিষয়বস্তু আরো ব্যাখ্যা করে এবং বিবিধ পরিপোষক প্রশ্নের অবতারণা করে নকুলেশ্বর পাঁচালী শেষ করলেন।

নকুলেশ্বরের টপ্পার জবাব দিতে আচার্য কর্তার বদলে কাশী নট্টই লহর গাওয়াতে আরম্ভ করলেন, যথা—

তুমি কল্পনায় রুক্মিণী, আমি কৃষ্ণগুণাধার।
আমি ব্রজলীলা করে শেষ, করেছি ঐশ্বর্যে প্রবেশ,
আমার দ্বারকা ঐশ্বর্যের দেশ, ঐশ্বর্যের আচার ॥
নিয়ে ঋষভের 'রা' ধৈবতের 'ধা'—
বাঁশীতে করতেম রাধার গুণগান !
ব্রজেশ্বরী কিশোরী, সে আমার গুরু গরীয়ান ॥
তুমি আনিয়ে রাধাপদ্ম, সাজালে মোর পাদপদ্ম,
তাই দেখে কেঁদে উঠল প্রাণ।
আমার ইষ্টনামের শ্রেষ্ঠ পদ্ম—
তাই আমি মস্তকে দিয়েছি স্থান ॥

কাশী নট্ট রাধারানীকে প্রেমের গুরু কল্পনা করে নানা প্রকারে রাধারানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে পাঁচালী বলে গেলেন। নকুলেশ্বরের চেয়ে কাশী নট্টের বয়স অনেক বেশী। কণ্ঠস্বরে তেমন মধুরতা ছিল না। কিন্তু পাঁচালীর ছন্দ ও রচনার পারিপাট্যে নকুলেশ্বর মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নাই বা হবে কেন ? তিনি

অনেক দিন যাবত আচার্য মহাশয়ের সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁর পাঁচালীর ছন্দ ভাষা বেশ অনুকরণ এবং রপ্ত করেছেন। নকুলেশ্বর তাঁর পাঁচালীর ছন্দ শুনে মনে মনে বলতে লাগলেন—আমি যদি কিছুদিন আচার্য কর্তার সঙ্গ লাভ করতে পারতাম!

দ্বিতীয় আসরে নকুলেশ্বর উঠে কাশী নট্টের দেওয়া জবাবের প্রতি-জবাব দিতে লাগলেন, যথা—

বললে, রাধা তোমার প্রেমের গুরু শুনে লজ্জা পাই।
যেদিন বিলাস বাঞ্ছা পুরাতে,
বাসনা করিলে চিতে,
সেদিন তোমার বামাঙ্গ হতে, জন্ম নিল রাই॥
যদি তুমি রাধার জন্মদাতা—
বিচারে পিতা বলে বলা যায়।
কন্যা হয় পিতার গুরু—
একথা শুনেছ কোথায়?
যখন গুরু শিষ্য দুইজনে,
বসতে যুগল আসনে,
গুরু কেন থাকে শিষ্যের বাঁয়?
হলে নিধুর্বনে কৃষ্ণকালী—
গুরু কেন অঞ্জলি দেয় শিষ্যের পায়?

এরকম বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করে নকুলেশ্বর গোপকন্যা রাধারানীকে হেয় প্রতিপন্ন করে গেলেন।

আচার্য কর্তার অননুকরণীয় সঙ্গীত—মন্ত্রমুগ্ধ নকুলেশ্বর

দ্বিতীয় আসরের টপ্পার জবাব দেবার জন্য আসরের শ্রোতৃমণ্ডলী আচার্য কর্তাকে আসরে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। নকুলেশ্বরও এতক্ষণ এ কামনাই করছিলেন। শ্রোতাদের অনুরোধ শুনে তাঁর আর আনন্দ ধরে না। ঘন কৃষ্ণ মেঘের বারিবিন্দু লাভের আশায় উৎকণ্ঠিত চাতকের মতো নকুলেশ্বর আচার্য কর্তার আগমন প্রত্যাশায় বসে রইলেন।

কাশী নট্ট গিয়ে আচার্য কর্তার কাছে শ্রোতাদের অনুরোধের কথা জানালেন। আচার্য কর্তার একটা অভ্যাস ছিল যে আসরে ঢোল বাবার

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে মালা নিয়ে বসে থাকতেন। আসরে কি হয় না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম আসত না। শেষ আসরে তাঁকে স্বয়ং যেতে হবে জানতেন বলে আগেই প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। কাশী নট্টের মুখে সংবাদ শোনামাত্র তিনি আসরে চললেন।

কাশী নট্টের সঙ্গে আসরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাগণ সকলে হরিধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। দোহারপত্রে জানে যে তিনি আসরে বসবেন না; যাওয়া মাত্রই গান আরম্ভ করতে হবে। সুবল, বিহারী উঠে দাঁড়াল। আচার্য মহাশয় দ্বিতীয় টপ্পার জবাব বলতে আরম্ভ করলেন, যথা—

বললে, রাধা কিসে গুরু হল বল দেখি তাই।
এই যে সৎ চিৎ আর আনন্দময়,
ভক্তেরা আমাকে যে কয়,
ও সেই তিনটি শক্তির সমন্বয়, ভাবরূপিনী রাই॥
বললে, কোনখানেতে গুরুর আসন,
কোনখানে শিষ্য থাকে দাও বলে।
গুরু রয় সহস্রারে, শিষ্যরয় জীব চতুর্দলে॥
নাকি, আমার অঙ্গে জন্মে রাই—
মহাভাবের জন্ম নাই;
আবির্ভাব হল ভূতলে।
সে যে সর্বলক্ষ্মী স্বরূপিনী—
তাই আমি নাম লিখি চরণ তলে॥
যখন সাধক সিদ্ধাবস্থা পায়,
জ্ঞান থাকে না ডাইনে বাঁয়,
গুরু আর শিষ্যে যায় মিলে।
তখন সেব্য সেবক, পূজ্য পূজক—
তাহাদের চরণ মস্তক যায় ভুলে॥

এভাবে টপ্পার লহরখানা শেষ করে আচার্য কর্তা যখন পাঁচালীর ডাক-ছড়া অর্থাৎ ত্রিপদী ছন্দে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন নকুলেশ্বর হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জেরা লেখার কলম ধরার শক্তি তাঁর রইল না। এর আগে নকুলেশ্বর দাশরথী রায়ের পাঁচালীখানা পড়েছেন; অংশ বিশেষ মুখস্থও করেছেন। কিন্তু আচার্য কর্তার উপস্থিত পাঁচালী ও ছন্দ দাশরথীকেও যেন

হার মানিয়েছে। দাশরথী লেখ্য কবি। তিনি ভেবে চিন্তে পদের যোজনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু কবিয়ালদের তো চিন্তা করে বলার অবসর নেই; উপস্থিত মতে আসরে দাঁড়িয়ে সুর ছন্দ ও যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে বক্তব্য বলতে হবে। আচার্য মহাশয়ের ছন্দ রচনা, ভাববিন্যাস ও বাক্যের পারিপাট্য শুনে নকুলেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হতে লাগল যে কবি দাশরথী হতে এ কবির শ্রেষ্ঠত্ব শত গুণে বেশী।

রাধারানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য রাধাতন্ত্রের যে সব প্রমাণ আচার্য কর্তা প্রয়োগ করতে লাগলেন, নকুলেশ্বর আজ পর্যন্ত কোন কবির মুখে তা শোনেন নি। জেরা লেখার জন্য কলম ধরার ক্ষমতা হারিয়ে যাদুমন্ত্রে বশীভূত পুতুলের মতো তিনি বসে রইলেন।

ডাকছড়া অর্থাৎ ত্রিপদী বক্তৃতা শেষ করে আচার্য কর্তা ধুয়া ধরে সুরে গাইতে লাগলেন—

আমার মন বাঁধা রাধা চরণে॥
আমার ধ্যানেতে রাধিকা, জ্ঞানেতে রাধিকা,
রাধিকা জীয়নে মরণে॥ মন বাঁধা…

নিরজনে আমি বসে চুপি চুপি,
সম্মোহিনী সুরে মুরলী আলাপি,
সংলাপে বিলাপে রাধামন্ত্র জপি—
থাকি রাধা নাম স্মরণে॥ মন বাঁধা…

ষড়জ ছেড়ে যবে গান্ধারেতে যাই,
ঋষভেতে 'রা' আর ধৈবতে 'ধা' পাই,
এই দুটি অক্ষরে রাধামন্ত্র গাই—
বিশ্বের সন্তাপ হরণে॥ মন বাঁধা…

লোকে বলে আমায় সচ্চিদানন্দ,
সৎ সত্যানন্দ, চিৎ জ্ঞানানন্দ,
আনন্দ স্বরূপে হ্লাদিনীর আনন্দ—
শ্রীগোবিন্দের নাম পূরণে॥ মন বাঁধা…

এই ভাবে অনর্গল পদ বলতে বলতে হঠাৎ সুরের পরিবর্তন করে কীর্তন সুর দিয়ে জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের কিশোরীভজন, পরকিয়া প্রেমের

সাধন-রহস্য এমন সু-রসালঙ্কারে বর্ণনা করতে লাগলেন যে চতুর্দিক উলুধ্বনি হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। যুক্তি-তর্ক হার-জিত গৌণ হয়ে গেল।

কবির পাঁচালীর ভিতরে কীর্তনের সুরে এইভাবে রসাল ভাবাত্মক বক্তৃতা নকুলেশ্বর আজ আচার্য কর্তার মুখেই প্রথম শুনলেন এবং স্তম্ভিত বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। পাঁচালীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু লিখে রাখার মতো শক্তি নকুলেশ্বরের হল না। শুধু নকুলেশ্বরই বা বলি কেন ; সে উপস্থিত বক্তৃতার ছন্দাবলী শুনে শুনে লিখে রাখার শক্তি স্বয়ং ব্যাসদেবের পক্ষেও সম্ভব হতো কিনা জানি না। কলম বন্ধ রেখে নকুলেশ্বর শ্রবণানন্দেই বিভোর হয়েছিলেন। ঘণ্টা তিনেক ধরে পাঁচালী বলে আচার্য কর্তা গান শেষ করে চলে গেলেন।

আচার্য কর্তার মুখনিঃসৃত পাঁচালী শোনার পূর্ব পর্যন্ত নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবতেন—তিনি কবির পাঁচালী কিছু কিছু শিখেছেন। কিন্তু আজ তাঁর সে ভুল ভেঙ্গে গেল এবং কিছুই শিখিনি বলে আক্ষেপ হতে লাগল। তিনি ভাবলেন—হায় হায়, যদি আমি কিছুদিন এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করতে পারতাম তাহলে তাঁর অগাধ কাব্যসাগর থেকে দু'এক বিন্দু পান ও পরিবেশনের পন্থা আয়ত্ত করতে পারলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হতো।

নকুলেশ্বরের মনোবাসনা পূর্ণ

লোকে বলে বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান কারো বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। এখানেও তাই প্রমাণিত হলো।

গানের শেষে হরি আচার্য মহাশয় কুঞ্জবাবুকে তাঁর পান্‌সীতে ডেকে পাঠালেন। কুঞ্জবাবু দেখা করতে গেলে আচার্য কর্তা বললেন—দেখ কুঞ্জ, আমি একটা অনুরোধ তোমাকে করবো, যদি তুমি রক্ষা কর।

কুঞ্জবাবু—সে কি কথা! আপনাকে আমরা সকল কবিয়ালই কবিগুরু বলে মান্য করি। আর আপনার একটা অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না? বলুন, কি করতে হবে?

আচার্য কর্তা—দেখ, আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি। আসরের খাটুনি ষোল আনা খাটতে পারি না। দলে দু তিনটা করে ডাক-সরকার রাখি, কিন্তু আমাকে একটু বিশ্রাম দিতে একটাও পারে না। তাই আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ করব বলে তোমাকে ডেকেছি।

কুঞ্জবাবু—অনুরোধ বলছেন কেন, আদেশ বলুন। আমি আপনার কি সাহায্য করতে পারি।

আচার্য কর্তা—অন্য কোন সাহায্য চাইছিনা। তোমার শরীরে এখনো বেশ শক্তিসামর্থ আছে। কবির আসরেও বেশ যশঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছ। আমি এখন বৃদ্ধ; এক রকম অচল বললেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব তোমার ঐ ছাত্রটি নকুলেশ্বরকে যদি আমার সঙ্গে দাও তবে আমার বিশেষ সাহায্য হয়। আমি ওর পাঁচালী শুনেছি। ও সুরসঞ্চারে ও বচনবিন্যাসে যে নৈপুণ্য অর্জন করেছে তাতে মন হয় ভবিষ্যতে ও একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত হবে। সে যা হোক, ঐ ছেলেটাকে যদি তুমি দাও, তবে শেষ জীবনে একটু বিশ্রাম নিয়ে গান করতে পারি—এই আমার অনুরোধ।

কুঞ্জবাবু—সে তো অতি সুখের এবং ওর সৌভাগ্যের কথা। তবে কি জানেন, ঐ ছেলেটার মা আমার হাতে ওকে সমর্পণ করে দিয়েছেন এবং আমি ওর সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়ে এসেছি। এখন ওকে আপনার সঙ্গে দেওয়া ওর মা'র অনুমতি সাপেক্ষ। বিশেষতঃ এ বছরের গানের ফিরা তো শেষ হয়েই গেল। অল্প দিনের মধ্যেই দল নিয়ে দেশে রওনা হবো। কাজেই আমি আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামী সন দুর্গাপূজার পূর্বেই যাতে আপনি ওকে দলে পেতে পারেন, আমি ওর মায়ের কাছে বলে কয়ে তার ব্যবস্থা করে দেব।

আচার্য কর্তার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুঞ্জবাবু নৌকায় এসে নকুলেশ্বরকে এই সংবাদ জানালেন। নকুলেশ্বরের আনন্দ আর ধরে না। বাংলা ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম অঙ্গ কবিগানের নবরূপদাতা কবি-গুণাকর হরিচরণ আচার্য মহাশয় তাঁর গান শুনে প্রীতিলাভ করেছেন জেনে তিনি মনে মনে ভগবানকে অজস্র প্রণাম ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং কুঞ্জবাবুকে প্রণাম করে বললেন—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। মনে মনে বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবানকে প্রণাম করে বললেন—জয় ভগবান। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

ঢাকায় 'ফিরা' শেষ করে কুঞ্জবাবু দল নিয়ে ঝালকাঠি এলেন। একদিন নকুলেশ্বরসহ তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর মা কামিনীসুন্দরীকে বললেন—আপনাকে একটা শুভ সংবাদ দিতে এসেছি। আপনার ছেলেটি দুই বৎসর আমার সঙ্গে থেকে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাতে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে ও একজন শ্রেষ্ঠ

কবি বলে পরিচিত হবে। ঢাকা জেলার নরসিংহদীর কবি-সম্রাট শ্রীহরিচরণ আচার্য মহাশয় নকুলের গানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর দলে ওকে নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আগামী দুর্গাপূজার পূর্বেই নকুলেশ্বরকে তাঁর দলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। এখন আপনার অনুমতি পেলেই আমি আমার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারি।

কামিনীসুন্দরী—আমি ওকে আপনার হাতে সমর্পণ করেছি। ও ছেলে এখন আপনার। ওর যাতে ভাল হয়, মানুষের মতো মানুষ হয়ে আপনার সুনাম রক্ষা করতে পারে, সে দায়িত্বও আপনার। সেজন্য আমার অনুমতির প্রয়োজন করে না। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করবেন। তবে কি জানেন, বিদেশ বিগাঁও অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে গিয়ে কি ওর মন টিকবে?

কুঞ্জবাবু—তা আপনার ছেলের কাছেই জিজ্ঞাসা করুন, ওর কি মত।

নকুলেশ্বর মাকে বললেন—মা, এমন শুভ যোগে তুমি আপত্তি করো না। কত শত ছেলে ছাত্র-শিষ্য হয়ে তাঁর দলে থাকার এবং সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। আমি আমার গুরুর কৃপায় সেই সুবর্ণ সুযোগ লাভ করতে চলেছি। গুরুদেব আমার মঙ্গলের জন্যই, তাঁর নিজের একটু অসুবিধা সত্ত্বেও, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আমাকে আচার্য মহাশয়ের দলে দিতে কথা দিয়ে এসেছেন। তুমি আশীর্বাদ কর যেন গুরুদেবের সে ইচ্ছা সফল হয়। আমি যেন গুরু কৃপায় সেই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর অগাধ কাব্য-সিন্ধুর দুই এক বিন্দু অনুকরণ করে ধন্য হতে পারি।—এই বলে আগে গুরু ও পরে মাতৃপদে প্রণাম করলেন। মা বললেন—তোমার গুরুদেবের প্রতিশ্রুতি পালন করে কবি সমাজে চির-স্মরণীয় বরণীও হও—এই আশীর্বাদ করি।

বঙ্গাব্দ ১৩২১ সালের ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহেই কুঞ্জবাবুর কাছে আচার্য কর্তার চিঠি ও মনিঅর্ডার যোগে দুই শত টাকা এসে পৌছল—নকুলেশ্বরকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য। কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—যাও, এই টাকা তোমার মায়ের কাছে দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এসো। আমি তোমাকে নরসিংহদী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

হাতে টাকা পেয়ে নকুলেশ্বরের মনে আজ এক নূতন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর সঙ্গে কবিগান শিখতে এসেছেন দু'বছর। এযাবত একটি পয়সাও কুঞ্জবাবু তাঁকে দেন নি। আর নকুলেশ্বরও একটি পয়সা তাঁর কাছে চান নি। আসরের শ্রোতারা সন্তুষ্ট হয়ে যৎসামান্য যা ইনাম বখশিস

দিত তা দিয়ে তিনি কোন প্রকারে হাত-খরচ চালাতেন। আজ হাতে দুইশত টাকা পেয়ে বাড়ী গিয়ে মাতা ঠাকুরানীর পায়ে টাকাগুলি রেখে প্রণাম করলেন।

মা বললেন—এত টাকা কোথায় পেলি?

নকুল—ঢাকায় যাঁর দলে যাব বলে স্থির হয়েছে তিনি এই টাকা পাঠিয়েছেন। আগামী দিনই আমার রওনা হতে হবে!

মা—তুই একা কি করে যাবি?

নকুল—গুরুদেব বলেছেন তিনিই সে ব্যবস্থা করবেন।

মা—তিনি যদি সে ভার নিয়ে থাকেন তবে আর ভাবনা কি?

নকুল—(আনমনে) তাই তো মা, ভাবনা কি! এই বলে নকুলেশ্বর তৎক্ষণাৎ একটি গান রচনা করে গেয়ে মাকে শোনালেন এবং মা'র আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন—

গুরু নামের সারি গেয়ে,
ভাসাইয়েছি দেহ তরী,
শ্রীগুরু কাণ্ডারী আছে,
ঝড় তুফানের কি ধার ধারি ॥

অনুরাগের বাদাম তুলে,
দিয়েছি মোর জ্ঞান-মাস্তলে,
জয় গুরু জয় গুরু বলে—
কাব্য-সিন্ধু ধরব পাড়ি ॥

ঢেউ আসিলে শত শত,
জ্ঞান করব বুদ্‌বুদের মত,
জপ করিব অবিরত—
শ্রীগুরু কুঞ্জবিহারী ॥

অমূল্য ধন লাভের তরে,
চলেছি আজ দেশান্তরে,
আশীর্বাদ কর আমারে—
আরাধ্য ধন পেতে পারি ॥

নকুলের এই ক্ষুদ্র দেহ,
জয় করতে পারবে না কেহ,
গুরুকৃপা মাতৃস্নেহ—
থাকবে এ দেহের প্রহরী ॥

মা বললেন—বাবা, তোমার এই উপস্থিত রচনা-শক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আশীর্বাদ করি গুরুকৃপায় তুমি অদ্বিতীয় হও, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক।

পরের দিন নকুলেশ্বর ঝালকাঠি এসে কুঞ্জবাবুকে বললেন—বাবা, আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এখন আমাকে আচার্য কর্তার কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

আচার্য কর্তার দলে নকুলেশ্বর

ঝালকাঠি কালী বাড়ীতে বামাচরণ শীল নামে একজন কবিরাজ ছিলেন। তাঁর বাড়ী ঢাকা জেলায় ভৈরব বাজারের কাছে। দুর্গা পূজা উপলক্ষে তিনি দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কুঞ্জবাবু তাঁকে বললেন—আপনি তো বাড়ী যাবেন, এই ছেলেটাকে যদি আপনি নরসিংহদী হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের কাছে পৌছে দেন তাহলে আমার বড় উপকার হয়। ছেলেমানুষ পথঘাট চেনে না।

কবিরাজ মহাশয়—আপনি সেজন্য কোন চিন্তা করবেন না। আমি ওকে তাঁর কাছে পৌছে দিয়ে তার পরে বাড়ী যাব। আমরা আগামী দিন সন্ধ্যায় বরিশাল গিয়ে ঢাকা মেইল-স্টীমার ধরব। ওকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলবেন।

কুঞ্জবাবু—ও প্রস্তুত হয়েই আছে।

পরদিন যথাসময়ে বামাচরণ কবিরাজের সঙ্গে নকুলেশ্বর রওনা হলেন। যাবার সময় কুঞ্জবাবুর পদধূলি নিতে তিনি বললেন—আচার্য কর্তার কাছে পৌছেই পত্র লিখবে। আর আচার্য কর্তাকে দেবতার মতো ভক্তি করবে। মনে রেখো, তিনি তোমার গুরুর গুরু পরম গুরু।

পরের দিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমার গিয়ে নারায়ণগঞ্জ ঘাটে পৌছল। সঙ্গে সঙ্গে নরসিংহদীর টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বেলা দশটা নাগাদ আচার্য কর্তার নরসিংহদী শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রমে পৌছলেন। আশ্রমের সেবাইত বললেন যে, কর্তা নদীর ঘাটে তাঁর পান্‌সীতে আছেন।

বামাচরণ বাবু নকুলেশ্বরকে নিয়ে পান্‌সীতে যাওয়া মাত্র আচার্য কর্তা খুব আনন্দ সহকারে 'এসেছিস! আয় আয়' বলে নকুলেশ্বরকে কোলের কাছে টেনে নিলেন। নকুলেশ্বর প্রণাম করে পদধূলি নিয়ে বসতেই আচার্য কর্তা দলের

পরিচালিকা তরঙ্গিনীকে ডেকে বললেন—'তরঙ্গ, সমস্ত রাত ওদের খাওয়া হয়নি। রান্নার ঠাকুরকে বল, ওদের আহারের ভাল ব্যবস্থা করতে।'

তরঙ্গিনী বর্ষিয়সী মহিলা; বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। দেখে স্নেহশীলা ভক্তিমতী বলেই মনে হয়। নকুলেশ্বর তাঁকেও প্রণাম করলেন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি তাদের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

স্নানাহার সেরে বামাচরণবাবু বললেন—এখন তো আর তোমার চিন্তা নেই। জায়গা মতো পৌঁছে দিয়ে গেলাম। এখন আমি চলি।

বামাচরণবাবু চলে গেলে তরঙ্গিনী নকুলেশ্বরকে বললেন—কর্তার জ্ঞাতি-ভাই মনোমোহন আচার্য দলের ধরতা দোহার; খুব ভাল লোক। তুমি তার পাশেই বিছানা করে নাও; ওর কাছেই থাকবে।

মনোমোহন নকুলেশ্বরকে আদর করে নিজের পাশেই জায়গা করে দিলেন, আর বললেন—যদি কোন অসুবিধা হয় আমাকে বলবে। তুমি আমার ছোট ভাইটির মতো।

মনোমোহন আচার্য যে শুধু দলের ধরতা তাই নয়—তার উপরে অনেকগুলো কাজের ভার ন্যস্ত ছিল। দলের হাট-বাজার, কেনাকাটা এবং আচার্য কর্তার জন্য আলাদা রান্না—এসব কাজ তাকে করতে হতো। আচার্য কর্তা ছিলেন নিরামিষভোজী। তিনি মাছ মাংস প্রিঁয়াজ রসুন স্পর্শ করতেন না। সেজন্য দু'বেলা তাঁর জন্য আলাদা রান্না হতো।

সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার কীর্তন সেরে আচার্য কর্তা নকুলেশ্বরকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি দলের সরকারী রান্না খাবে, না আমার সঙ্গে নিরামিষ খাবে।'

নকুল—আপনি যা বলবেন, তাই করবো।

কর্তা—তুমি ছেলেমানুষ; মাছমাংসে প্রবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক। নিরামিষ খেতে তোমার কষ্ট হবে না?

নকুল—চিরদিন নিজের প্রবৃত্তি নিয়ে চলতে গেলে এ জীবনে কখনো নিবৃত্তি আসতে পারেনা। আপনাদের মতো মহাপুরুষরাই তো বলেন—

ন যাতুঃ কাম কামানামুপভোগেন সাম্যতি—

হবিষা কৃষ্ণ বর্তেব ভূয় এবাভি বর্ধতে।—(অর্থাৎ, যজ্ঞে ঘৃতের হবি যত দেয়, ততই অগ্নি বৃদ্ধি পায়, বাড়ে ছাড়া কমে না। তেমনি কামকামনা ভোগবাসনা আহারবিহার ভোগের দ্বারা শেষ হয়না। যত ভোগ করে ততই

বৃদ্ধি পায়।) অতএব প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি মার্গে নিতে হলে মহতের মহৎবাক্য অনুসরণ করে চলতে হয়।

কর্তা—বেশ, বেশ তোমার সৎসাহস দেখে আমি সুখী হলাম। ত্রিবিধ আহারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্বিক আহারকেই শ্রেষ্ঠ বলে গীতায় প্রতিপন্ন করেছেন, যথা—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥ অর্থাৎ,

যাহা আয়ু, উৎসাহ, বল আরোগ্য চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি—এ সকলের বর্ধনকারী, এবং সরস স্নেহযুক্ত সারবান এবং প্রীতিকর এইরূপ আহার সাত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।

আচার্য কর্তার কথা শুনে নকুলেশ্বর তাঁর সঙ্গে নিরামিষ খেতেই স্বীকার করলেন। তিনি মনোমোহনকে ডেকে বললেন—আজ হতে নকুলেশ্বর আমার পাকেই খাবে। দুই জনার মতো ব্যবস্থা করে রান্না করবে।

মনোমোহন নকুলেশ্বরকে বললেন—ভাল করেছ ভাইটি! এ দলে আমিষ খাওয়ার চেয়ে নিরামিষ খাওয়া শত গুণে ভাল।

নকুল—কেন দাদা?

মনোমোহন—এ দলে মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, নাম উচ্চারণ করারও সাধ্য নেই। তারপর মাছ, মরা মাছ ছাড়া জ্যান্ত মাছ কেহ কিনে আনলে তাকে বরখাস্ত করা হবে। মরা মাছ খেলে তো আর প্রাণী হিংসা হবেনা—এই হল কর্তার আদেশ। তোমার ভাগ্য ভাল তাই তুমি নিরামিষ খেতে রাজী হয়েছ। দেখবে, নিরামিষ তো নয় রাজ ভোগ। দুধ, দই, মাখন, মুগডাইল, ঘি এই সব হল কর্তার নিরামিষ ভোজন। তবে দলের লোকগুলিও নাছোড়বান্দা। কর্তার চোখে ধুলি দিয়ে জ্যান্ত মাছ কিনে মেরে আনে। কর্তা তো আর সে খোঁজ রাখেন না। তিনি তো ভাবেন তাঁর অহিংসাব্রত দোহারপত্রেরা পুরো-পুরি পালন করছেন।

নকুল—সে কি! এমন মহাপুরুষের সঙ্গে থেকে তাঁর বাক্যের অবমাননা! তাঁর সঙ্গে চাতুরী! এই বলে নকুলেশ্বর একটা কবিতা লিখে মনোমোহনকে দেখালেন—

সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরে

লোকে বলে এ সংসারে।

আত্মশুদ্ধি না হলে তার
সঙ্গে কি করিতে পারে।
থাকিলে চন্দনের ধারে,
সার বৃক্ষকে চন্দন করে,
চন্দন কি বানাইতে পারে—
ভিতর ফাঁপা বাঁশের ঝাড়ে॥
হাঙ্গর কুম্ভীর কোন কালে,
শুদ্ধ হয়না গঙ্গা জলে,
তুলসী বনে বাঘ থাকিলে—
সে কি কভু হিংসা ছাড়ে॥
থাকলে চন্দনের কোটরে,
কাল সাপের বিষ যায়না দূরে,
উচ্চাকাশে শকুন ওড়ে—
দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে॥

মনোমোহন আচার্য কবিতাটি দেখে হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাঁ, বুঝেছি কবিতাটি আমাদের উদ্দেশ্য করেই লিখেছ। তবু তোমার কাব্যশক্তির প্রশংসা না করে পারলাম না। তুলনাগুলি বেশ সুন্দর হয়েছে।

নকুলেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, দলের অন্যান্য লোক কবে আসবে?

মনোমোহন—এই মাসের শেষ ভাগেই সব এসে যাবে। তুমি কর্তার কাছ থেকে গানের খাতাটি এনে গানগুলি মুখস্থ করে রাখ। দোহারপত্র এলেই গান তালিম আরম্ভ হবে।

নকুলেশ্বর গানের খাতা এনে গান মুখস্থ করতে লাগলেন।

আচার্য কর্তার দলে রাজেন্দ্র সরকার

হঠাৎ একজন নূতন আগন্তুক এসে উপস্থিত হলেন। খুব উঁচু লম্বা চেহারা, শ্যাম বর্ণ। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরী চুল। চোখ দুটি কেমন চঞ্চল—দেখতে যেন ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা বলেই মনে হয়। তিনি নৌকায় উঠেই আচার্য কর্তার খাস কামরায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

নকুলেশ্বর মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, ইনি কে?

মনোমোহন—তুমি একে চিনবেনা, এর নাম ক্ষ্যাপা রাজেন্দ্র। খুলনা জিলায়

বাড়ী ; কর্তার ছাত্র। তিন-চার বছর যাবত পূজার সময় এসে কিছু দিন দলে থেকে চলে যায়। সবাই তাকে 'পাগলদা' বলে ডাকে ; তুমিও তাই ডাকবে।

নকুল—ওঁকে দেখে আমার ভয় করে।

মনোমোহন—ভয় করবে কেন ? ওর সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পারবে, খুব ভাল লোক। কর্তার ছাত্রদের মধ্যে ওর জানাশোনা জ্ঞানগরিমা যথেষ্ট। শুনেছি খুলনা ফরিদপুরে ইতিমধ্যেই নাকি খুব যশ-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

নকুল—আচ্ছা মনোমোহনদা, আচার্য কর্তা তবে ওনাকে বাঁধাবাঁধি ভাবে দলে না রেখে আবার অন্য ডাক-সরকার রাখেন কেন ?

মনোমোহন—ও লোকটা একটু খামখেয়ালী। নিজে যা ভাল মনে করে তাই করে, তাই বলে। সাধু গুরু বৈষ্ণব দেখলে ভেকধারী ষণ্ডা বলে বিদ্রূপ করে, দেবদেবীর উপাসনাকে বাতুলের পুতুল পূজা বলে ব্যাখ্যা করে। এসব কারণে আচার্য কর্তা ওকে একটা গোঁড়া নাস্তিক বলে মনে করেন। কেননা আচার্য কর্তা হলেন পরম বৈষ্ণব, ভগবত ভক্ত, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক। তাই ওর সঙ্গে তাঁর মনের মিল হয়না। তুমিও কিন্তু খুব সতর্ক হয়ে চলবে, যাতে আচার্য কর্তার মনের মতো হতে পার তাই করবে। রসাল আম্রবৃক্ষের তলে আশ্রয় নিয়েছ, পাকা আমের রস খেয়ে পেট ভরে নাও ; ওর মতো পাতা গুণে সময় নষ্ট করো না।

এদিকে ভাদ্রমাস শেষ না হতেই দলের সুবল, বিহারী, গোবিন্দ সাহা, রাধাচরণ ইত্যাদি সব দোহারপত্র এসে গেল। দল এখন বেশ জমজমাট। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই দুর্গাপূজা। এবছর আচার্য কর্তার বায়না হয়েছে বৈদ্যের বাজারের কাছে সোনারগাঁ পানাম। বিপক্ষে ঝালকাঠির উমেশ-যামিনীর দল এ বৎসর জোটে থাকবে।

নকুলেশ্বরের আনন্দ আর ধরে না। একটা নৌকার মধ্যে এতগুলি গুণী লোকের সমাবেশ। চব্বিশ ঘণ্টা গান বাজনা, ঐ সম্বন্ধে আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া তাঁদের আর অন্য কাজ নেই। তার মধ্যে ঐ ক্ষ্যাপা রাজেন্দ্রই প্রধান। কারণ লোকটা সত্যিই গুণী। হারমোনিয়াম, বেহালা, সানাই, ঢোল সব যন্ত্রেই তার বেশ অধিকার আছে। বিবিধ তাল রাগ রাগিনীতেও জ্ঞান আছে। এই সব দেখে শুনে সেই ক্ষ্যাপা রাজেন্দ্রের উপর নকুলেশ্বরের অপরিসীম ভক্তির উদ্রেক হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন—মনোমোহন দা যে বলেছেন কথাটা মিথ্যা নয়। ক্ষ্যাপাই হোক নাস্তিকই হোক লোকটা যে

অনেক গুণের অধিকারী এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর কাছে আমার জানবার শিখবার অনেক কিছু আছে। আমি তার দোষ অন্বেষণ না করে যদি গুণরাশির কিয়দংশ আয়ত্ত করতে পারি তবে নিজেকে নিজে ধন্য মনে করবো। কারণ শাস্ত্রে বলে—

সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি, দোষমিচ্ছন্তি বর্বরা।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি, মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদা॥

(অর্থাৎ গুণগ্রাহী মানুষ লোকের দোষ দেখে না, শুধু গুণেরই অন্বেষণ করে। আর বর্বর যারা তারা শুধু তার দোষ খুঁজে বেড়ায়। যেমন মাছিরা শুধু পচা ঘা অন্বেষণ করে, আর ষট্‌পদ অর্থাৎ ভ্রমর ঘায়ের কাছে যায় না—ফুলে ফুলে কেবল মধু অন্বেষণ করে।)

এই ভেবে নকুলেশ্বর রাজেন্দ্র সরকারকে দাদা বলে প্রণাম করে ভাব করবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে নানাবিধ তাল রাগিণী কিছু কিছু আয়ত্ত করে ফেললেন।

আশ্বিনের প্রথম ভাগেই আচার্য কর্তা আদেশ করলেন—নৌকা খুলে পূজা-বাড়ী ঘাটে রওনা হও। মাঝিমাল্লারা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ধ্বনি দিয়ে নৌকা খুলে দিল। যথাসময় নৌকা গিয়ে পূজাবাড়ীর ঘাটে পৌছল।

এক আসরে ত্রিমূর্তি

আচার্য কর্তা কাশী নট্ট, রাজেন্দ্র সরকার ও নকুলেশ্বরকে ডেকে আসরের কাজ ভাগ করে দিলেন। কাশী নট্টকে বললেন—কাশী, তুমি শুধু গানের জবাব করবে। রাজেন্দ্রকে বললেন—তুমি টপ্পার লহর করে ডাক-ছড়া বলবে। নকুলেশ্বরকে বললেন—তুমি গানগুলি বলে দেবে; আর রাজেন্দ্র যে টপ্পা করে ডাক-ছড়া বলবে, সেই বিষয়বস্তুটার ভিত্তিতে সুরে ছন্দে পাঁচালী বলবে। আমাকে সব সময় বিরক্ত করবে না, আমার কাজ আমি বুঝে করবো।

ঝালকাঠির উমেশ-যামিনীর দল অনেক পূর্বেই ঘাটে পৌচেছিল। আচার্য কর্তার নৌকা ঘাটে লাগামাত্র উমেশ সরকার এসে আচার্য কর্তাকে প্রণাম করে বললেন—কর্তা আপনার সঙ্গে গান করতে আসা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এ বছর আপনি অনুগ্রহ করে জোটে রাখবার জন্য বায়না দিয়েছেন তাই এসেছি। আমার জাত-মান সব আপনার হাতে, কোন প্রকারে চালিয়ে নেবেন।

আচার্য কর্তা—আমি চালাবার কে? গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া চালাবেন।

উমেশ সরকার চলে গেলে আচার্য কর্তা রাজেন্দ্র সরকারকে ডেকে বললেন —দেখ রাজেন, উমেশ সরকার সরল সোজা মানুষ, কুটিল কাটিল্য বোঝে না। ওর সঙ্গে সরলতা নিয়েই আসরে আলোচনা করবে। খামখেয়ালী করে একটা উদ্ভট কিছু করে ওকে অপমান করবে না—মনে থাকে যেন।

সোনার গাঁ পানামে : উমেশ শীল বনাম কাশীনট্ট-রাজেন্দ্র-নকুল।

যথাসময়ে গান আরম্ভ হল। ষষ্ঠী-সপ্তমী দুই পালা শুধু গান আর জবাবে কেটে গেল, টপ্পা পাঁচালী হল না। কাশী নট্টই সেই দুই দিনের ঠেকা দিলেন। অষ্টমীর রাত্রে উমেশ সরকার টপ্পা করলেন ; বিষয়বস্তু—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ : শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিভীষণের প্রশ্ন। উমেশ সরকার বিভীষণের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করলেন—

আমি কল্পনায় রাজা বিভীষণ, তুমি বাঁকা শ্যাম।
করেন রাজসূয় যজ্ঞ যুধিষ্ঠির,
নিমন্ত্রণ দিল পার্থ বীর,
তাইতে যজ্ঞ দেখা করে স্থির, এই যজ্ঞে এলাম॥
দেখি লক্ষ শালগ্রামের পরে
উচ্চাসন দিয়ে যুধিষ্ঠির রাজার।
ব্রাহ্মণের পাও ধোয়াতে,
তোমার হাতে সুবর্ণ ভৃঙ্গার॥
আমি নিমন্ত্রিত অতিথি,
না রেখে আমার প্রীতি,
আজ তোমার একি ব্যবহার ?
রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম দিতে
আমাকে বল কেন বারংবার ?

টপ্পার লহর শেষে করে উমেশ সরকার ডাক-ছড়া ধরে বললেন—

বিভীষণ নামটি ধরি লঙ্কাপুরে বসত করি
লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজার ভাই।
দেব দানব গন্ধর্ব নরে সবাই আমায় শঙ্কা করে
সবার কাছে আমি মান্য পাই॥

যুধিষ্ঠিরে যজ্ঞ করে যজ্ঞ দেখিতে আমারে
সমাদরে করলে নিমন্ত্রণ।
ডেকে এনে যজ্ঞাগারে নিমন্ত্রিত অতিথিরে
কেন তুমি কর নির্যাতন॥
লক্ষ বেদীর উপরে বসাইয়ে যুধিষ্ঠিরে
নিজে ধোয়াও ব্রাহ্মণের চরণ।
যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করতে বল আমায় কি নিমিত্তে
কোন্ কার্য করিতে সাধন॥

ইত্যাদি বলার পর ধুয়া ধরে অনেকক্ষণ নিজ বক্তব্য বিস্তৃতভাবে পেশ করে উমেশ সরকার প্রথম আসর শেষ করলেন।

আচার্য কর্তার দল নিয়ে রাজেন্দ্র সরকার আসরে গেলেন। আচার্য কর্তার আদেশে টপ্পার জবাব দেওয়া এবং ডাক-ছড়া বলা রাজেন্দ্রের উপরেই ন্যস্ত। তিনি আসরে গিয়ে টপ্পার লহরের জবাব দিতে লাগলেন—

তুমি বীরকুলের পবিত্র পাত্র, মিত্র বিভীষণ।
পেয়ে যজ্ঞের পত্র স্বহস্তে,
এই যজ্ঞ দেখার মনস্থে,
আজ এসে ইন্দ্রপ্রস্থে, দিলে দরশন॥
আছে রাজসূয় যজ্ঞে রাজার প্রণাম—
রাজনীতি ভঙ্গ করতে চাও নাকি!
এসো মিতা, দুই মিতায়,
ভক্তরাজ ধর্মের মান রাখি
উন লক্ষ রাজা যারা, প্রণাম করেছে তারা,
একমাত্র তুমি রও বাকী।
দেখ আমি যারে প্রণাম করি
মিতা গো তোমার করতে বাধা কি?
রামরূপে ডাকলে মিতা—
সেকথা ভুলেছ নাকি?

টপ্পার লহরের জবাব দিয়ে রাজেন্দ্র সরকার ডাক-ছড়া সুরু করলেন—

বিভীষণ মহামতি তুমি নাকি লঙ্কাপতি
গর্ব করে পরিচয় দাও।

যে তোমাকে দিল রাজ্য তাঁরে করে অগ্রাহ্য
ছোট মুখে বড় কথা কও ॥
রাবণ রাজার লাথি খেয়ে যার চরণে শরণ লয়ে
মিতা বলে করলে আলিঙ্গন।
আমি হই সেই রাম পাণ্ডব-সখা নিলেম নাম
ধর্ম-রাজ্য করিতে স্থাপন ॥
ধর্ম রাজা যুধিষ্ঠিরে বসায়ে বেদীর উপরে
দেশ বিদেশে দিলেম নিমন্ত্রণ।
লক্ষ রাজায় প্রণাম দিবে বশ্যতা স্বীকার করিবে
তবে হবে যজ্ঞ সম্পূরণ ॥
উন লক্ষ রাজা যারা প্রণাম করিয়ে তারা
করেছে যাঁর বশ্যতা স্বীকার।
তুমি একা থেকে বাকী যজ্ঞ পণ্ড করবে নাকি
কেন তোমার হেন অহঙ্কার॥
আমি যাঁরে দাদা বলে প্রণাম দিয়ে চরণ তলে
ভৃত্যের মত করতেছি সেবন।
তুমি তারে প্রণাম দিলে জাত যাবেনা কোন কালে
প্রণাম কর রাজা বিভীষণ ॥

এইভাবে অনেকক্ষণ ত্রিপদী ছন্দে ডাক-ছড়া বলে রাজেন্দ্র সরকার তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন। এবার নকুলেশ্বরের পালা। ধুয়া দিয়ে স্বরে ছন্দে পাঁচালী বলতে হবে। নকুলেশ্বর উঠেই ধুয়া দিলেন—

মিতাগো, বর্বরের ন্যায় গর্ব করোনা—
পাণ্ডবের বিরুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে মরো না ॥
এল যত রাজগণ, সবে বন্দিল চরণ,
সম্রাট বলে যুধিষ্ঠিরকে করেছেন বরণ।
তুমি করে তার বিরুদ্ধাচরণ—
মরণ বরণ করোনা ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যাঁর ভয়েতে অস্থির,
রাজসূয় যজ্ঞ করেন সেই যুধিষ্ঠির।

দেখে যাঁদের পরাক্রম,
পালায় ইন্দ্র চন্দ্র যম,
তুমি তো অধমের অধম—
তাঁদের চেয়ে বড় না ॥

গাণ্ডীব নিয়ে দাঁড়ায় যদি একা ধনঞ্জয়,
স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল সে করতে পারে জয়।
ভীমের গদার ঘায়,
কত রাক্ষস প্রাণ হারায়,
অকালে মরিবার আশায়—
কাল সাপের লেজ ধরো না ॥

কীর্তন সুরে পাঁচালী অনুশীলন

এভাবে নকুলেশ্বর কিছু সময় বলার পরে সুর পরিবর্তন করে ত্রেতাযুগে বিভীষণের আনুগত্য, রামপদে আত্মসমর্পণ, নিজপুত্র তরণী সেনকে রামপদে উৎসর্গ—এই বিষয়গুলি কীর্তন সুরে এমন রসালভাবে বর্ণনা করলেন যে আসরের শ্রোতৃমণ্ডলী, এমন কি স্বয়ং আচার্য কর্তাও খুব সন্তুষ্ট হলেন।

এর আগে নকুলেশ্বর আর কখনো কীর্তন সুরে পাঁচালী বলেননি। গত বছর নরসিংহদী বাজারে গানের সময় আচার্য মহাশয় যে কীর্তন সুরে পাঁচালী বলেছিলেন, তাই নকুলেশ্বর এত দিন ধরে মনে মনে আবৃত্তি এবং অনুশীলন করছিলেন এবং আজকের আসরেই তার প্রথম প্রয়োগ। গান ছেড়ে নৌকায় গেলে আচার্য কর্তা তাঁর অনুকরণ শক্তির প্রশংসা করে অজস্র আশীর্বাদ করলেন।

রাজেন্দ্র সরকার নকুলেশ্বরের পাঁচালী শুনে বললেন—ভাইটি নকুল, তোর পাঁচালী শুনে আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম। যেমন বাচনভঙ্গী তেমনি সুরসঞ্চার—সবই ঠিক আছে। এই সঙ্গে দু'চারখানা ভালো শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারলেই তো সোনায় সোহাগা।

নকুলেশ্বর বললেন—দাদা, কি শাস্ত্র পড়লে ভাল হয়, আপনি আমাকে একটু বলে দিন।

রাজেন সরকার একখানা চিঠি লিখে নকুলেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন—এই

চিঠিতে আমি তোর জন্য একখানা ভাল পুরাণ-শাস্ত্র পাঠাবার জন্য কলিকাতা গুরুদাস লাইব্রেরীতে লিখে দিলাম, ডাকে দিয়ে আয়।

নকুলেশ্বরের হাতে পত্র দেখে আচার্য কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কিসের চিঠিরে ?

নকুল—রাজেনদা আমার জন্য একখানা ভালো শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠাবার জন্য কলিকাতায় চিঠি পাঠাচ্ছেন।

কর্তা—দেখি দেখি কি শাস্ত্র ?

আচার্যকর্তা পত্র পাঠ করে দেখেন, 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' পাঠাবার জন্য লিখেছে। তিনি নকুলেশ্বরকে বললেন—এটা পড়ে কি হবে ?

নকুল—দাদা বলেছেন এর মধ্যে অসংখ্য জটিল বিষয় আছে যা অনেক সরকার জানেন না।

কর্তা—আর তুমি বুঝি তাই জেনে নিয়ে অন্যান্য কবিকে আসরে জব্দ করে যশ-প্রতিষ্ঠা লাভ করবে! ছিঃ ছিঃ! ঐ গোঁড়া গোবিন্দের পাল্লায় পড়ে তুইও দেখছি দিন দিন নাস্তিক হয়ে যাবি।

এই বলে তিনি চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজে একখানা চিঠি লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। দশ বারো দিন পরে ভি. পি. এসে পৌছল। প্যাকেট খুলে আচার্য কর্তা দু'খানি বই বের করে নকুলেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন—নাও এই দু'খানি বই বেশ করে মুখস্থ করগে।

নকুলেশ্বর পড়ে দেখেন, একখানি চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, আর একখানি কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী। নকুলেশ্বর আচার্য কর্তাকে বললেন—কর্তা, একটা কথা বলবো ?

কর্তা—বল, কি বলতে চাও।

নকুল—এ দুই খানিই তো কীর্তন পদাবলী, কীর্তনীয়াদের অমূল্য সম্পদ, কিন্তু আমাদের কবিয়ালদের প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে এ গ্রন্থ পড়ে কি লাভ হবে ?

কর্তা—লাভালাভের হিসাব পরে পাবে। এখন এই দু'খানি গ্রন্থে যে সব বড় বড় মহাজনের পদ সংগ্রহ আছে, সেইগুলি মুখস্থ করে পাঁচালী বলার সময় স্থান বিশেষে দু'চারটি সমভাবাপন্ন পদ যোজনা করলে পদের গুণে আসরে বাহবা পড়ে যাবে। মানীলোকের মান মেরে, কুতর্কে হারিয়ে বাহবা নেওয়া কবির ধর্ম নয়। রসাল ভাব-ভাষায় মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বক্তব্য পরিবেশন করে যশ-প্রতিষ্ঠা লাভ করাই কাব্য প্রতিভার পরিচয়। যদিও আমাদের

কবিগানে জয় পরাজয়ের প্রশ্ন বর্তমান, তবে সেটা বস্তুগত হবার চেয়ে ভাবগত হওয়াই শ্রেয়ঃ। কালী উলঙ্গিনী কেন, স্বামীর বুকে দণ্ডায়মান কেন—এসব প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তরও দেওয়া যায়, আর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও করা যায়। গোপিনীদের বস্ত্র হরণ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে লাম্পট্যের অভিযোগ এনে আসরে রঙ্গ-রস ঠাট্টা ইয়ারকী করা সহজ, বৈষ্ণবদের ফোঁটা-তিলক-চৈতন নিয়ে হাসি মস্করা করে সস্তা হাততালি লাভও ঘটে। কিন্তু তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কয় জনে জানে! আমার মতে তথ্যের চেয়ে তত্ত্বের মূল্য বেশী। আর যে জন উভয়ের সমন্বয় সাধন করতে পারে সে তো আরো প্রশংসনীয়। গানে জয় পরাজয়েরও একটা রকমফের আছে। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুর-বাক্য স্মরণ কর—

ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশবব্যুপ শাম্যতি।
অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং, অসাধুং সাধুনা জয়েৎ ॥
ন পাপে প্রতিপাপংস্যাদ্ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
ধর্মেন নিধনং শ্রেয়ঃ, ন জয় পাপ কর্মনা ॥

অর্থাৎ বিদুর বললেন—হে যুধিষ্ঠির! শত্রুকে প্রীতির দ্বারা, ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা, হিংসুককে অহিংসা দ্বারা জয় করাই ধর্ম। অতএব যদি চিরস্থায়ী যশ-প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাও কখনো কারো প্রাণে দুঃখ দেবে না। মানী লোককে অপমান করবে না; কুটিলতা ছেড়ে সরলতা নিয়ে কাজ করে যাবে। কারো অভিশাপ না কুড়িয়ে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা লাভ করে যদি যশস্বী হতে পার, তবে সে যশ তোমার অক্ষয় অব্যয় অম্লান হয়ে থাকবে। গানের আসরে প্রতিপক্ষকে যুক্তি তর্কে হারাবে বৈ কি! কিন্তু সে যেন পরাজয়ের গ্লানি অনুভব না করে, বরং হাসি মুখে পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে পারে তেমনি ভাবে তোমার বক্তব্য রাখবে।

তিন বছর আগে আচার্য কর্তারই সমবয়সী খ্যাতনামা কবিয়াল হরকুমার শীলের মুখেও নকুলেশ্বর এমনি কথাই শুনেছিলেন। আজ আচার্য কর্তার মুখে এসব উপদেশ শুনে নকুলেশ্বর কোন প্রতিবাদ না করে প্রণাম করে বললেন, আপনার এই আদেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি।

কীর্তনের সুরে পাঁচালী বলার কৌশল্ আয়ত্ত করে নকুলেশ্বর এখন আচার্য কর্তার দেওয়া সেই চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, কবি জয়দেবের রচনা থেকে পদ উদ্ধৃত করে স্থান বিশেষে প্রয়োগ করে আসরে বেশ বাহবা পেতে লাগলেন।

লক্ষীপূজার গান শেষ করে কালীপূজার পূর্বেই রাজেন্দ্র সরকার দেশে

চলে গেলেন। কালীপূজায় তাঁর বার্ষিক গান আছে। যাবার সময় নকুলেশ্বরকে বললেন - ভাইটি নকুল, আমি চল্লাম। আশা করি অচিরেই তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে। পাগল দাদার কথা ভুলে যাসনে যেন। আর একটি কথা—জোয়ার থাকতে মুখ ধুয়ে নিবি, তবে আর টান ভাটিতে কাদা মাড়াতে হবে না। রত্নাকরে আশ্রয় নিয়েছিস, হাঙ্গর কুম্ভীরের স্বভাব না নিয়ে ডুবুরী জহুরী হয়ে তার মণিমুক্তা যত পারিস কুড়িয়ে নে, জীবনে আর তোর অভাব হবে না।

রাজেন্দ্র সরকার চলে যাওয়ার পর নকুলেশ্বরের খাটুনি বেড়ে গেল। এযাবত টপ্পার লহর ও ডাক-ছড়া বলার ভার রাজেন্দ্রের উপরে ছিল। এখন গান বলে দেওয়া, টপ্পা করা, ডাক-ছড়া ও পাঁচালী বলা সবই নকুলেশ্বরকে করতে হয়। গান আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। স্বর্ণ যত দগ্ধ করে উজ্জ্বলতা তত বৃদ্ধি পায়। এখানে নকুলেশ্বরের অবস্থাও তাই হলো। খাটুনি যত বাড়ল তার উদ্যম উৎসাহও দ্বিগুণ বেড়ে যেতে লাগল। কবির আসরে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার একটা সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল।

কথায় বলে, খুঁটীর জোরে মেড়া কোঁদে। কবি-সম্রাট হরি আচার্য যার পেছনে, কবির আসরে তার আর ভয় ভাবনা কি! দলের দোহারপত্র সকলেই নকুলেশ্বরকে ভালবাসে এবং সমীহ করে চলে। আচার্য কর্তা এখন বেশ বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে আরামেই আছেন। দুই পালা গান হলে তিনি শেষের দিনের শেষ আসরে গিয়ে কিছু সময় পাঁচালী বলে গান ভেঙ্গে দিতেন।

সঙ্গীত রচনায় অনুপ্রেরণা

পর পর গান চলতে লাগল। রাজেন্দ্র সরকার বলে গেছেন রত্নাকর থেকে যত পারিস রত্ন কুড়িয়ে নিবি। তাই নকুলেশ্বর ভাবলেন—গুরুদেব কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের কাছে শুনেছি, বাঙলাদেশে যত কবিয়ালই কবি গান করেন, কেউ নিজে গান রচনা করতে পারেন না। আচার্য কর্তার বাঁধা গান নিয়েই সকল দলে গান করেন অথচ জবাব তৈরীতে তাঁদের রচনা ও মুন্সীয়ানার যথেষ্ট ছাপ আছে। কেন তারা গান তৈরী করেন না? তাহলে নিশ্চয়ই গান তৈরী করার মধ্যে বিশেষ কোন নিয়মকানুন আছে। সে নিয়মকানুনটা কি তা জানবার জন্য নকুলেশ্বরের মনে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা দিল।

একদিন গানের অবসরে নকুলেশ্বর আচার্য কর্তার খাস কামরায় গিয়ে এক

কল্‌কে তামাক সেজে হুঁকাটি কর্তার হাতে দিয়ে কাছে বসামাত্র কর্তা বললেন—কিরে নকুল, কি যেন বলবি বলে মনে হচ্ছে!

নকুলেশ্বর ভয়বিজড়িত কণ্ঠে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা কথা জানতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে; কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছি না!

কর্তা—সে কি রে! ভয় কি! নির্ভয়ে বল কি বলতে চাস।

নকুল—আজ্ঞে, গুরুদেব কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের কাছে শুনেছি অন্য কোন কবির সরকার গান রচনা করতে জানেন না। আপনার বাঁধা গান নিয়েই সব দলে গান করেন। কেন তাঁরা গান তৈরী করেন না, বা পারেন না, জানতে আমার খুব আগ্রহ হয়।

কর্তা—ওটা তাঁদের উদ্যমের অভাব। যারা গানের জবাব দিতে পারে, ছড়া-পাঁচালী বলতে পারে, ভাষা ও সুর জ্ঞান আছে, তারা একটু চেষ্টা করলেই গান রচনা করতে পারে। তবে গান রচনা করার কতগুলি নিয়ম আছে, যেমন—দেশ, কাল, পাত্র ও বিষয়। এইসব বিবেচনা করে গান রচনা করতে হয়।

নকুল—দেশ-কাল-পাত্র কি ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলুন।

কর্তা—আমাদের কবিগানে প্রশ্নোত্তর বিষয়ক গানগুলি শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলা নিয়ে রচিত, যথা—পূর্বরাগ, বিরহ, মান, মাথুর, বিচ্ছেদ, বসন্ত ইত্যাদি। আগে নির্বাচন করবে দেশ; অর্থাৎ বৃন্দাবন, মথুরা দ্বারকা কোন্ লীলা নিয়ে গান রচনা করবে। তারপর কাল—অর্থাৎ কোন্ সময়ের গান, যেমন—কৃষ্ণ শ্রীরাধা কুঞ্জে মিলিত হবার আশা দিয়ে অন্য নায়িকার কুঞ্জে গমন করলেন; নিশি ভোরে বন্ধুর বিরহে নায়িকার যে আক্ষেপ তারই ভাব হচ্ছে মান। তারপর পাত্র—অর্থাৎ গানটি কার উক্তি, কার প্রতি এবং সব শেষে বিষয়—অর্থাৎ কি বলতে হবে। মাথুর অর্থে শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা, বিরহ অর্থে প্রিয়তমের অদর্শনে প্রিয়তমার মনের যে অবস্থা বা আক্ষেপ—ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করে গান রচনা করতে হয়।

তারপর কতগুলি মালসী গান প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনাত্মক, যেমন ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি। আর কতগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক সমস্যা-ভিত্তিক। তবে এসব গানে কোন প্রশ্নোত্তরের অবকাশ নেই। যা ঘটছে বা ঘটেছে তারই কাব্যিক ও সাঙ্গীতিক বর্ণনা। এগুলি দেশ জাগরণ, সমাজ ও জন-শিক্ষার তাগিদে রচিত ও গীত হয়। কবিগানের মাধ্যমে জনজীবন

ও সমাজ জীবনের ছবি তুলে ধরেছি এ কারণে যে, মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার ছায়া লোকশিল্প ও সঙ্গীতে না পড়লে, শুধুমাত্র শাস্ত্র-গ্রন্থ ও দেব-দেবীর লীলা মাহাত্ম্যের আলোচনায় গণ্ডীবদ্ধ থাকলে তা অচিরে নীরস হয়ে পড়বে, তাকে একঘেঁয়েমী পেয়ে বসবে। কবিগানের 'সরকার'গণ সাধারণ ব্যক্তি। যারা আমাদের গান শুনতে আসেন তারাও সরল-সোজা সাধারণ ব্যক্তি। তারা দারিদ্র্য হতাশা অভাব অনটন অশিক্ষা কুশিক্ষার নিত্য শিকার। তাদের মূক মুখে ভাষা ফোটে না, নিজেদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা চুপচাপ সয়ে যায়। তাদের ব্যথা বেদনার ভাষা যদি আমাদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে তাহলে কবিগানের প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ত আছেই, তৎসহ দরদও জাগবে। পূর্ববঙ্গে মরা কবিগান এসব কারণেই আবার পুনর্জীবন লাভ করেছে।

তাছাড়া, কবিগানের পালার মধ্যে 'কবি' নামেও এক অভিনব গান আছে। এই গান হাস্য ব্যঙ্গ রসাত্মকও হয়, আবার গুরু গম্ভীর ভাব নিয়েও রচিত হয়। দুটি পক্ষ খাড়া করে প্রশ্নোত্তর ভিত্তিতে এ গান তৈরী হয়। রচনা-পদ্ধতি ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে এসব গান সখী-সংবাদ জাতীয় গানেরই অনুরূপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—কুম্ভ ও কঙ্কণের কবি, সত্য-মিথ্যার কবি, কাক-কোকিলের কবি, ব্যাঙ-পদ্মিনীর কবি ইত্যাদি।

এ ছাড়া ভোর এবং গোষ্ঠ গান সম্পর্কেও আচার্য কর্তা আলোচনা করলেন এবং গান রচনা সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিলেন।

সেদিন থেকে নকুলেশ্বরের মনে একটা নূতন চিন্তার উন্মেষ হলো—কি করে গান রচনা করা যায়। হঠাৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর একটি পদ তাঁর মনে পড়ে গেল। পদটির ভাব হল—শ্রীকৃষ্ণ সখা সঙ্গে গোচারণে গিয়ে চম্পক ফুল দরশনে চম্পকবরণী রাধার কথা মনে করে অচৈতন্য হয়ে ভূতলে পতিত হলেন—

একদিন চম্পকেরি ফুল দেখিয়ে আকুল
হইল গোকুল শশী।
কোথা রাধা বলে পড়িল ভূতলে
সুবল ধরিল আসি॥

এই পদটি মনে হতেই নকুলেশ্বরের মনে একটা নূতন ভাবের উদয় হলো, সেটি এই—চম্পকের ফুল দেখে যদি চম্পক-বরণী রাধার কথা কৃষ্ণের মনে উদয় হতে পারে, তবে সেই চম্পকবরণী রাধাকে দেখেই বা চম্পক ফুলের কথা স্মরণ হতে

পারবে না কেন? যা হোক আমি একটা উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে গান রচনা করবো, এই ভেবে নকুলেশ্বর শ্রীগুরুর পদাঙ্ক স্মরণ করে লেখনী ধরলেন—

চিতান—একদিন ধেনু সঙ্গে মনোরঙ্গে কানু করে গোচারণ।

পারণ—গোষ্ঠ অবসানে, সুবল সনে করে বন বিচরণ॥

১ম ফুকার—তখন কত দূরে গিয়ে, পথ পানে চেয়ে,

চমকি দাঁড়াল হরি ;

দেখে তটিনীর তট আলো করি।

নব যৌবনা লাবন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,

জল নিয়ে যায় ভানু কন্যা, কক্ষে স্বর্ণ গাগরী॥

মিল—দেখে সঙ্গিনী বেষ্টিতা রাই,

বলে অধৈর্য্য কানাই, দেখরে সুবল ভাই—

অদূরে মধুর কুসুম উদ্যান।

মুখ—সুবল রে, চম্পক কানন বলে,

মনে যেন হয় অনুমান॥

ডাইনা—মৃদুমন্দ হিন্দোলনে আন্দোলিত করে ফুল,

মকরন্দ গন্ধেছন্দে, ভ্রমে অন্ধ অলিকুল।

রক্তিম ভাস্কর আভা, পড়েছে ফুলের উপর,

হের যেন প্রতিবিম্ব, পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর।

ফুলের রূপ অযাচিত, কাঞ্চন খচিত,

কোন্ বিধির রচিত, এ ফুলের বাগান।

মুখ—সুবল রে চম্পক কানন বলে,

মনে যেন হয় অনুমান॥

২য় ফুকার—সুবল, সখা সঙ্গে মিশি, গোচারণে আসি.

দিবানিশি ভ্রমি বনে,

কভু এ বন দেখি নাই জীবনে।

ভানু চলে অস্তাচলে, ত্রস্ত মনে ব্যস্ত চ'লে,

এসেছি কি রাস্তা ভুলে, ইন্দ্রের নন্দন কাননে॥

অন্তরা—আমার আঁখি যুগল, হয়েছে পাগল,

ফুলের বরণ হেরিয়া।

আমার মনপ্রাণ গিয়েছে ভুলে,

ফুলে নিয়েছে পরাণ হরিয়া॥

স্থবল আমি মালী হব, ঐ ফুলের বাগানে রব,
ঝরা ফুল কুড়ায়ে লব—যতনে ডালা ভরিয়া।
শেষে মালা গেঁথে বিনা সূতে,
জালা জুড়াব মালা পরিয়া ॥

পরচিতান—জানি কত জন্মের কর্মফলে, গোকুলে জন্ম আমার।
পারণ—নইলে হেমসম প্রেমবনে, ভ্রমে এমন ভাগ্য কার ॥
৩য় ফুকার—ফুলে ছত্র ধরে ফণি, যেন কৃষ্ণ বেণী,
নারী পৃষ্ঠে আভরণ ;
ফুলের বর্ণ স্বর্ণকুম্ভ যেমন।
শুভ্র বর্ণ কুচি কুচি, ফুলে পরমাণু বুঝি,
সজ্জিত সুদন্ত রুচি, যেন রমণীর বদন ॥

এই "ফুল-সুবল" গানখানা লিখে নকুলেশ্বর বড় সমস্যায় পড়লেন। আচার্য কর্তাকে দেখাতেও সাহস হচ্ছেনা আবার না দেখালেও চলবেনা। কারণ রচনার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে আচার্য কর্তা যতক্ষণ না অনুমোদন করেন, ততক্ষণ নকুলেশ্বরের মন শুদ্ধ হবে না। উভয় সঙ্কটে পড়ে নকুলেশ্বর মনোমোহন আচার্যের শরণাপন্ন হয়ে বললেন—মনোমোহনদা, আমি একখানা গান লিখেছি। আচার্য কর্তাকে দিয়ে গানখানা মঞ্জুর করিয়ে আনতে হবে। আমার সাহস হচ্ছে না। হয়তো তিনি মনে করবেন, বেটা বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়। অতএব আপনি একটু গানখানা আচার্য কর্তাকে দেখালে ভাল হয়।

মনোমোহন—কেন ভয়টা কিসের! গান তৈরী করেছ—চুরি ডাকাতি তো আর করো নি। যাঁর কাছে শিখতে এসেছ, যখন যা মনে হবে তাঁর কাছে বলবে। তিনি ভুল সংশোধন করে দেবেন। ভয় করে কাছে না গেলে শিখবে কি করে?

এই বলে মনোমোহন আচার্য নকুলেশ্বরের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে আচার্য কর্তার কামরায় গিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এই কাগজখানা দেখুন, নকুলেশ্বর একটা গান লিখেছে, আপনাকে দেখাতে সাহস হয়না বলে আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছে।

আচার্য কর্তা গানখানা পড়ে একটু হেসে বললেন, নকুলেশ্বরকে ডেকে দাও। মনোমোহন এসে নকুলেশ্বরকে পাঠিয়ে দিলেন। কর্তা বললেন—বসো, গান লিখেছ তা দেখাতে এত ভয় করলে চলবে কেন? কচু গাছ কেটে কেটেই

ডাকাত হয়—এই প্রবাদ কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। লিখতে লিখতেই শিখতে পারবে। গানখানার রচনা এবং কল্পনা বেশ ভালই হয়েছে ; তবে একটু বিপ্রলিপ্সা ভাব হয়েছে।

নকুলেশ্বর—সেটা কি বুঝলাম না, বিপ্রলিপ্সা ভাব কাকে বলে ?

কর্তা—বিপ্রলিপ্সা হল, যা নয় তাই বলে লোক ঠকানোর কৌশল। এ গানখানার রচনার ভঙ্গিতে বিপক্ষ কবিকে ঠকানোর কৌশল-জাল বিস্তার করা হয়েছে।

নকুলেশ্বর—একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন।

কর্তা—প্রথম কথা হল, এই গানখানার জবাবের জোর নষ্ট করে দিয়েছ, যেমন—তোমার গানের মধ্যে সঙ্গিনীগণসহ চম্পকবরণী রাইরঙ্গিনীকে দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ সুবলসখাকে বলেছেন, দেখ দেখ সুবল, কেমন সুন্দর চম্পক ফুলের বাগান! এক ফুকারে বলেছ—

শুভ্র বর্ণ কুচিকুচি, ফুল পরমাণু বুঝি
সজ্জিত সু-দন্তরুচি, যেমন রমণীর বদন।

শেষের ঐ "যেমন রমণীর বদন" পদটি না দিলে বিপক্ষ সরকারের জবাব হতো—শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে—

বললি, শুভ্র বর্ণ কুচি কচি, ফুল পরমাণু বুঝি,
মিথ্যে তোর এ অনুমান।
হাসি মুখে সব যুবতী জল নিয়ে যায় দ্রুতগতি
দেখে তাদের মুখের দন্ত পাঁতি
পরমাণু করলি জ্ঞান॥

কিন্তু তুমি 'যেন রমণীর বদন' পদটি দিয়ে বিপক্ষ কবির সেই জবাবের জোরটা নষ্ট করে দিয়েছ। আর এক স্থানে বলেছ—

ফুলে ছত্র ধরে ফণি যেন কৃষ্ণ বেণী
নারী পৃষ্ঠে আভরণ।

এখানে 'কৃষ্ণ বেণী' পদটি না থাকলে বিপক্ষ কবির জবাব হতো—

বললি, চেয়ে দেখ ঐ ফুলের পরে,
কাল ফণি ছত্র ধরে, কিবা শোভা হল তায় ;
ও তুই ভুল বুঝেছিস শ্যাম রায়।

সঙ্গেতে নিয়ে সঙ্গিনী, চলেছেন ঐ রাইরঙ্গিনী,
তাদের কালো চুলের কালো বেণী,
ফণির মতো দেখা যায় ॥

তুমি 'যেন কৃষ্ণ বেণী নারী পৃষ্ঠে আভরণ' পদটি দিয়ে বিপক্ষ কবির সেই পথ বন্ধ করেছ ; একেই বলে বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ লোক ঠকানো কৌশল।

তারপর রজ্জু দেখে সর্প-ভ্রম, তমাল দেখে কৃষ্ণ-ভ্রম অর্থাৎ নকল দেখে ভ্রম-বশতঃ আসল মনে করে কবিরা রাধার প্রেমোন্মাদ অবস্থা অনেক স্থলে প্রকাশ করেছেন ; যেমন চম্পকের ফুল দেখে চম্পকবরণী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়েছিল। তমাল দেখে মেঘ দেখে শ্রীকৃষ্ণকে মনে করে শ্রীরাধার উন্মাদাবস্থা প্রকাশ করে কবিরা অনেক পদ রচনা করে গিয়েছেন। আর তুমি চম্পকবরণী সঙ্গিনীগণ সঙ্গে আসল চম্পকবরণী শ্রীরাধাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে চম্পক ফুলের বাগান বলে ভ্রম দেখিয়েছ, সত্যকে মিথ্যা বলেছ—কল্পনাটি অভিনব নয় কি !

নকুলেশ্বর বললেন—আচ্ছা কর্তা ! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার বাচালতা হলে ক্ষমা করবেন তো !

কর্তা—কি বলতে চাও বল ; মনে সঙ্কোচ থাকলে শিখবে কি করে ?

নকুলেশ্বর—আসলকে নকল ধারণা করাটা যদি অভিনব বা উদ্ভট কল্পনা হয় তবে চিন্তামণির প্রেমে উন্মত্ত হয়ে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর দুর্যোগের রাত্রে একটা আসল মরা মানুষকে কলাগাছ মনে করে তাই চেপে ধরে কৃষ্ণবেন্না নদী পার হয়েছিলেন। চিন্তামণির প্রাচীরের গর্তে মুখ দেওয়া লম্বমান একটা জলজ্যান্ত আসল অজগর সাপকে রজ্জু মনে করে তাই ধরে প্রাচীর পার হয়েছিলেন। আপনার রচিত 'চিন্তামণির কবি' গানখানার মধ্যেই তো এসব দেখেছি। তাহলে আসল মরা মানুষকে কলা গাছ মনে করা, আসল অজগর সর্পকে রজ্জু মনে করা এটা কি অভিনব কল্পনা নয় ?

নকুলেশ্বর এই কথা বলামাত্র হরি আচার্য মহাশয় নকুলেশ্বরের পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন—বেশ ! বেশ ! তুই আজ আমাকেও হার মানিয়ে দিয়েছিস। আশীর্বাদ করি নিত্য নূতন কল্পনা বিস্তার করে অল্প দিনের মধ্যেই কবি সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করবি।

আচার্য কর্তার আশীর্বাদ পেয়ে নকুলেশ্বরের উৎসাহ উদ্দীপনা শতগুণ বেড়ে গেল। নিত্যনূতন ভাবের গান রচনার প্রবণতা দেখা দিল। ক্রমান্বয়ে মেঘের

গান, মান, মাথুর, বিচ্ছেদ, বিরহ ভূতের গান, রাসের গান ইত্যাদি কত গান যে তিনি রচনা করেছেন তা লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে আচার্য কর্তার দলেই নকুলেশ্বরের প্রথম গান রচনার হাতে খড়ি।

দেখতে দেখতে বাসন্তী পূজা এসে গেল। আচার্য কর্তা প্রত্যেক বৎসর বাসন্তী পূজার গান শেষ করেই দল বন্ধ করেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। দল বন্ধ হয়ে গেল; নকুলেশ্বর দেশে যাবার জন্য আচার্য কর্তার কাছে বিদায় চাইতে গেলে তিনি বললেন—দেখ নকুল, আমার অনেক শিষ্য ছাত্র আছে। তারা এক একজন ভাল যশ-প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছে। কিন্তু তোর মতো আমাকে শান্তিতে অবসর দিতে কেউ পারেনি। শান্তি দেওয়া তো দূরের কথা তাদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে আমি অভিশাপও দিয়েছি। শুনিস নি কি আমার একটা ডাক গানে আছে "মাগো অকালে নির্বংশ কর অ-কারাদি গোষ্ঠীগোত্র"—এর অর্থ কি জানিস? আমার প্রধান ছাত্র হয়েছিল দুইজন—অর্জুন দেবনাথ আর অম্বিকা পাটুনী। এরা ছাত্র হয়ে আমার সঙ্গে পুরা শত্রুতা করেছে। এমনকি লোক সমাজে আমাকে অপমান করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। সেই দুঃখে লিখেছি, "মাগো অকালে নির্বংশ কর অ-কারাদি গোষ্ঠী গোত্র।" অর্থাৎ নামের আদিতে অ-কার ঐ অম্বিকা ও অর্জুন। যাক সে কথা তোর ব্যবহারে এবং আসরের কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আগামী সন দুর্গা-পূজার পূর্বে আমার কাছে চলে আসবি মনে থাকে যেন। এই বলে আচার্য কর্তা নকুলেশ্বরকে বিদায় দিলেন।

দেশে এসে নকুলেশ্বর আগেই ঝালকাঠি গিয়ে গুরু কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে আচার্য কর্তার দলের অবস্থা, কর্তার ব্যবহার, নিজের শিক্ষার অবস্থা—একে একে সব বর্ণনা করলেন। কুঞ্জবাবু শুনে খুব সুখী হলেন। তিনি বললেন—আচার্য কর্তা যখন আগামী সনও তাঁর দলে থাকার কথা বলেছেন, মনে করবে এটা তোমার পরম সৌভাগ্য—তাঁর সে বাক্যের অন্যথা করবে না।

কুঞ্জবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে নকুলেশ্বর নিজ বাড়ীতে চলে এলেন। দেখতে দেখতে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে দু'তিন মাস কেটে গেল। শ্রাবণ মাসে নকুলেশ্বর একটা হ্যাণ্ডবিলে দেখলেন—শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন ঝালকাঠির সংলগ্ন বাসণ্ডা জমিদার বাবুদের বাড়ী পাষণ্ড দলন আরম্ভ হবে।

বাসণ্ডায় পাষণ্ড দলন

পাষণ্ড দলনটা কি জানবার জন্য নকুলেশ্বর শ্রাবণী পূর্ণিমার পূর্বেই ঝালকাঠি এসে উপস্থিত হলেন। কুঞ্জবাবু দল বন্ধ করে দেশে চলে গেছেন বলে নকুলেশ্বর গিয়ে সরলার বাড়ীতে উঠলেন। নকুলেশ্বরকে পেয়ে সরলা খুব খুশী হল। নকুলেশ্বর বললেন—আপনাদের বাসণ্ডায় জমিদার বাবুদের বাড়ী নাকি পাষণ্ড-দলন আরম্ভ হবে; আপনি সে বিষয়ে কিছু জানেন কি?

সরলা—জানি বৈ কি। এ পাষণ্ড দলন কলি যুগের সেই জগা-মাধা পাষণ্ডকে যে গৌর-নিতাই দলন অর্থাৎ উদ্ধার করেছিলেন তার চেয়েও বিরাট পাষণ্ড দলন।

নকুলেশ্বর—বিষয়টা কি জানবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে। আপনি একটু বিস্তারিতভাবে বলুন।

সরলা—এ পাষণ্ড ছিল ঝালকাঠির পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাসণ্ডার জমিদার গোষ্ঠী। এরা ছিলেন শাক্ত উপাসক। বাড়ীতে কালী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালী প্রতিমা, প্রতি শনি মঙ্গলবার জাঁকজমকে কালী পূজা হতো। সেই উপলক্ষে মদ্যমাংসের আদ্যশ্রাদ্ধ। এবং ঝালকাঠির সেরা বাইজী খেমটাওয়ালিদের নাচগানে জমিদার বাড়ী দিনরাত মুখরিত থাকত। আমিও সেখানে নাচের মুজরায় গিয়ে স্বচক্ষে যা দেখেছি তা শুনুন—

বাড়ীর দরজায় খালের ঘাটে থাকত পাঁঠা বেপারীদের নৌকা বাঁধা। যখন ইচ্ছা তখনই পাঁঠা নিয়ে কালী মায়ের দুয়ারে বলি দিত। বৈঠকখানার ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক পিঁপে ভরা মদ। ঐ পিঁপের গায়ে অনেকগুলি নল লাগান। জমিদারবাবুরা ইয়ার-বন্ধু নিয়ে চারদিকে ঘিরে বসতেন। প্রত্যেকের হাতেই একটি নল থাকত—মুখে দিয়ে টান দিলেই মদ—বণ্টন করার জন্য বেয়ারা ডাকার বালাই ছিল না! ঐ সঙ্গে বাবুর্চি এসে মাংস পরিবেশন করতো। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে নর্তকীদের প্রতি হুকুম হতো—নাচ গাও আনন্দ কর ইত্যাদি। সে যে কি এক বীভৎস কাণ্ড ভাষায় তার বর্ণনা হয় না। পাষণ্ড দলন করবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেমন করুণা করে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এখানে তেমনি এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হল।

ত্রিশ'এর বসন্ত সাধুর মা-দাদা সম্প্রদায়

ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জিলার কোম্পানীগঞ্জ থানার অধীন ত্রিশ গ্রাম নিবাসী শ্রীশ্রীবসন্ত সাধু নামে এক মহামানব শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক। বসন্ত সাধু

তাঁর স্ত্রীকে (লৌকিক লীলায়) ডাকতেন 'মা' আর তাদের শিষ্যমণ্ডলী সাধুকে ডাকতো 'দাদা' বলে। সে জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের নাম ছিল 'মা—দাদা' সম্প্রদায়। নরসিংহদী নিবাসী কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য মহাশয়ও ঐ 'মা-দাদা' সম্প্রদায়ের প্রধান শিষ্য। প্রতি বছর বসন্ত সাধু স্বদলবলে দেশে দেশে 'নাম' প্রচারোদ্দেশে পান্‌সী নৌকা নিয়ে পরিক্রমায় বের হতেন। প্রধান শিষ্য বলে হরি আচার্য মহাশয়ও ঐ সঙ্গে থাকেন।

এ বছর বরিশাল পরিক্রমার উদ্দেশে 'মা-দাদার' দল ঝালকাঠি আসার পথে ঐ বাসণ্ডা জমিদার বাড়ীর ঘাটে এসে বিরাট কালী মন্দির, শিব মন্দির, পঞ্চ-রত্ন, নবরত্ন, মঠ ইত্যাদি এ দেখে এক ভদ্রলোকের কাছে বসন্ত সাধু জিজ্ঞাসা করলেন—এটি কার বাড়ী ?

সে ভদ্রলোক বললেন—এটা হচ্ছে বাসণ্ডার প্রতাপশালী জমিদার হরেন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়ী।

বসন্ত সাধু মাঝিমাল্লাদের হুকুম দিলেন—এই ঘাটেই নৌকা বাঁধ। সাধুর নৌকার উপর লাল কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—

॥ শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া জয়তি ॥

॥ মা-দাদা সম্প্রদায় ॥

উক্ত লেখা দেখে সেই ভদ্রলোক বসন্ত সাধুকে বললেন—আপনার নৌকার উপরে ঐ লেখাটা এবং আপনাদের বেশ ভূষণ দেখে মনে হচ্ছে আপনারা পরম বৈষ্ণব। এই গোঁড়া শাক্তের ঘাটে নৌকা বাঁধাটা কি উচিত হবে ?

বসন্ত সাধু সহাস্যে বললেন—কেন, তাতে দোষ কি ? শাক্ত কি ভক্ত হতে পারেনা ?

ভদ্রলোক—তা হয়তো পারে; তবে একটা প্রবাদ কথা আছে 'শাক্ত আর বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব'। জমিদারবাবু ঘোর মাতাল। নেশার ঘোরে শেষে একটা হৈ-হল্লা না বাধিয়ে বসেন। বলা তো যায়না মাতালের খেয়াল।

বসন্ত সাধু—আপনি সেজন্য চিন্তা করবেন না। আমিও চাই জমিদারবাবুর মনে সে দ্বন্দ্বের উদয় হোক। তা হলেই তো ভালমন্দ বুঝবার মতি হবে। আর গৌর-নিতাই যদি হরিনাম দিয়ে পাষণ্ড জগা-মাধাকে উদ্ধার করতে পারেন, তবে আমরা কেন পারবনা জমিদারবাবুকে উদ্ধার করতে? হরিনাম যে সর্বশক্তিমান।

এই বলে বসন্ত সাধু সঙ্গী ভক্তগণকে বললেন—তোমরা সবে মিলে নামগান কর। তখন ভক্তবৃন্দ খোল করতাল সহযোগে নাম আরম্ভ করলেন—

ভজ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া, কহ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া,
লহ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া নাম রে।
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজে, সে যে আমার প্রাণ রে॥

অকস্মাৎ নাম কীর্তনের ধ্বনি বৈঠকখানা ঘরে জমিদারবাবুর কর্ণে প্রবেশ করে তাকে আনমনা করে ফেলেছে। তিনি নায়েবকে ডেকে বললেন—দেখে আসুন তো, আমাদের নদীর ঘাটে ও কিসের কোলাহল? কিসের শব্দ?

নায়েব মশাই ঘাটে গিয়ে সবিশেষ জেনে এসে জমিদার বাবুকে বললেন—ও কিছু নয়; কতগুলো বৈরাগী বৈষ্ণবের দল দেশ পরিক্রমায় বের হয়েছে। তারাই ঐ হৈ-হল্লা করছে।

জমিদার—আমি যাব, চলুন আমার সঙ্গে। নায়েব ও অন্যান্য ইয়ার-বন্ধুরা আঁৎকে উঠে বললেন—সে কি! আপনি যাবেন কোথায়? ওরা বৈষ্ণব ভিখারীর দল, কিছু পাওনার আশায় বেরিয়েছে। গণ্ডগোল ভাল না লাগে পাইকপেয়াদা পাঠান। ব্যাটাদের ঠেঙিয়ে বিদায় করুক। আর যদি কিছু দিতে চান, লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত মিটে যায়; আপদ তাড়াতাড়ি বিদায় হয়। আপনি যাবেন কেন?

জমিদার—না না! আমিই যাব, যা দিতে হয় আমিই দেবো—এই বলে জমিদার হরেনবাবু উন্মত্তের মতো ঘাটের দিকে ছুটলেন। পেছন পেছন ইয়ার বন্ধুর দলও টলতে টলতে ছুটলো।

বসন্ত সাধু দূর থেকে দেখলেন—নীল রং-এর লুঙ্গী পরা গেঞ্জী গায়, নেশার ঘোরে চোখ দু'টি ঢুলু ঢুলু জমিদারবাবু স্খলিত পদে নৌকার দিকে ছুটে আসছেন! সাধুও পান্‌সী হতে ডাঙ্গায় নেমে হাত দুটি বাড়িয়ে অগ্রসর হওয়ামাত্রই জমিদার-বাবু বাতাহত কদলী বৃক্ষের মতো বসন্ত সাধুর পদতলে পতিত হয়ে সাশ্রুলোচনে বললেন—বাবা, আমায় উদ্ধার কর, উদ্ধার কর।

বসন্ত সাধু অমনি তাকে তুলে সাগ্রহে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করে বললেন—উদ্ধার করার মালিক যিনি তিনিই তোমায় উদ্ধার করেছেন। নতুবা তোমার এ অভাবনীয় পরিবর্তন হবে কেন? এখন এস আমরা সকলে মিলে সমস্বরে সেই পতিত পাবন গৌরহরির নামগুণ কীর্তন করি।

এই বলে জমিদরবাবুকে মধ্যস্থলে নিয়ে চৌদিকে বৈষ্ণব ভক্তগণ কীর্তন

আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ কীর্তনের পর বসন্ত সাধু বললেন—আমরা তোমার বাড়ীতে চৌষট্টি প্রহর কীর্তন এবং মহামহোৎসব করতে চাই—যদি তুমি রাজী থাক।

জমিদার বললেন—প্রভু আমি ঘোর পাষণ্ড, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানহীন। আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করলাম। যা আপনার ইচ্ছা তাই করুন। আমি শুধু ভৃত্যের মতো আপনার আদেশ পালন করব।

হরিনামের কি ঐশী শক্তি! যে জমিদার ছিল পাষণ্ড উচ্ছৃঙ্খল মাতাল পূঁতি-গন্ধময় নরকের কীট; আজ হরিনামের প্রভাবে সেই জমিদার স্বর্গের নন্দন কাননের পারিজাত ফুলের পরমাণু! সেদিন থেকে বাসণ্ডার জমিদার বাড়ীতে কীর্তন মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে।

নকুলেশ্বর সরলাকে বললেন—চলুন, আগামী দিন গিয়ে এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে আসি।

পরদিন খুব ভোরে নকুলেশ্বর সরলার সঙ্গে বাসণ্ডার জমিদার বাড়ীর উদ্দেশ্যে চললেন। দূর থেকে নকুলেশ্বর শুনলেন—আকাশ বাতাস মুখরিত করে হরিনামের ধ্বনি উঠেছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

জমিদার বাড়ীর দরজায় নদীর খেয়া পার হয়ে ওপারে উঠে দেখলেন—বিরাট নাম-যজ্ঞের প্যাণ্ডেল করা হয়েছে, চতুর্দিকে ঐ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর লেখা, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি স্থাপিত। অসংখ্য বৈষ্ণব সাধু মহান্তের সমাবেশ। অবিরত নাম-কীর্তন হচ্ছে। নকুলেশ্বর দেখলেন মধ্যস্থলে সেই মা-দাদা সম্প্রদায়ের বসন্ত সাধু আর তাঁর প্রধান শিষ্য হরি আচার্য উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করছেন—যেন স্বয়ং গৌর নিতাই দুই-ভাই পাষণ্ড দলনের জন্য পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন।

নকুলেশ্বর তিন চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কীর্তন শুনলেন, কিন্তু আচার্য কর্তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেন না। ঐ মহাকীর্তনের মধ্যে প্রবেশ করার সাহস হলো না। সরলাকে নিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। যে জমিদারের নামে মানুষের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি হতো যে ছিল ম-কারোপাসক, তার আজ এত পরিবর্তন! পরিধানে গৈরিকবসন, স্কন্ধে নামাবলী, সর্বাঙ্গে তিলক ফোঁটা, গলে তুলসীর মালা! ধন্য! ধন্য হরিনামের মহিমা! ভাগবতে লিখেছে—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা—
জাতানু রাগো দ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি, রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি-লোকবাহ্য ॥

অর্থাৎ এই প্রকার ব্রতধারী মনুষ্য নিজের প্রিয় নাম কীর্তনের দ্বারা জাত-প্রেম হযে, বিগলিত চিত্তে বিবশ হয়ে তিনি উচ্চৈস্বরে কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন, কখনো চেঁচান, কখনো গান করেন আর কখনো বা উন্মাদের মতো নৃত্য করেন ; কোন ঘৃণা লজ্জা ও লোকনিন্দার ভয় করেন না।

নকুলেশ্বর দেখলেন ভাগবতের শুক মুনির বাণী শুধু কাল্পনিক নয়, বর্ণে বর্ণে সত্য। হরিনামের উদ্দেশ্যে শত শত প্রণাম করে নকুলেশ্বর সরলাকে নিয়ে ঝালকাঠি চলে এলেন। শাস্ত্রে বলে—

শৈব শাক্ত গাণপত্য, সৌরশ্চ দেবপূজকঃ।
গোবিন্দ শরণঃ পশ্চাদ্ভবেদ যদি স বৈষ্ণব ॥
শাক্তস্ত বৈষ্ণব ভূত্বা দুর্গতিং ত্রায়তে স্বয়ম্।

অর্থাৎ শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য ইত্যাদি সকল উপাসকই পরে কৃষ্ণমন্ত্র নিতে পারেন। শক্ত যদি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করে তবে সে সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পায়।

বাসণ্ডার শাক্ত জমিদারগোষ্ঠীকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করে, তাদের সর্ববিধ দুর্গতির পথ হতে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করে, কীর্তন মহোৎসব সেরে হরি আচার্য মহাশয় ঝালকাঠির আড়তদার পট্টির সোনারগাঁ পানামের গদীতে এসে নকুলেশ্বরকে ডেকে পাঠালেন।

আচার্য কর্তার দলে দ্বিতীয় বৎসরের দাদন গ্রহণ

নকুলেশ্বর গিয়ে আচার্য কর্তাকে প্রণাম করে বললেন—আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি বাসণ্ডা জমিদার বাড়ী গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনাদের ঐ মহানামযজ্ঞে প্রবেশে সাহস না পেয়ে ফিরে এসেছি। এখন আদেশ করুন কি করতে হবে ?

আচার্য কর্তা—গত বৎসর দল বন্ধের সময় যা বলে দিয়েছি স্মরণ আছে তো ?

নকুলেশ্বর—আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে আছে।

আচার্য কর্তা—তবে এই নাও, এই দুই শত টাকা। এবার তোমাকে

মাসিক একশত টাকা এবং খাওয়াপরা সব দেব। দুই মাসের মাহিনার টাকা দাদন দিলাম। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি নরসিংহদী আমার আশ্রমে যাবে। ভুল হয় না যেন।

নকুলেশ্বর টাকাগুলি হাতে নিয়ে প্রণাম করে বললেন—তবে এখন আসি।

আচার্য কর্তা—হ্যাঁ এসো। মনে থাকে যেন। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।

হরি আচার্য মহাশয়ের কাছে দাদন গ্রহণ করায় সরলা একটু মনক্ষুণ্ণ হয়ে বলল—আপনি ত বিদেশে পাড়ি ধরলেন; আর আমরা এই ঝালকাঠির মাল গুদামের বস্তা পচা আলুর মতো পড়ে রইলাম।

নকুলেশ্বর—একথা বলছেন কেন? আপনারা হচ্ছেন আলালের ঘরের দুলালীর মতো। বড় গায়িকা হয়েছেন; সকল দলপতিই আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। আর আমি হলাম কবি সমাজে নগণ্য; কিছু জানিনা। আমার এখন সাগর সেচে রত্ন আহরণ করে মানুষ হতে হবে। স্বদেশ-বিদেশ বিচার করলে চলবে কেন? আপনি আশীর্বাদ করুন আমার যেন অভীষ্ট পূর্ণ হয়। এই বলে নকুলেশ্বর টাকা নিয়ে বাড়ী গিয়ে মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে টাকা দিলেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন—এ কিসের টাকা, কে দিল?

নকুলেশ্বর—গত বছর যে আচার্য প্রভুর দলে ছিলাম এ বছরও তাঁর দলেই যেতে হবে। তিনি আমাকে এক শত টাকা মাস-মাহিনা স্থির করে এই টাকা অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন।

মা খুব খুসী হয়ে বললেন—তোর কপাল ভাল, তাই তিনি তোর উপরে অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর মন জুগিয়ে চলতে পারলে তুই অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের মতো মানুষ হতে পারবি।

নকুলেশ্বর—মা, তুমি সেই আশীর্বাদই করো, যেন আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

লোকে বলে শুভকার্যে বহু বিঘ্ন। নকুলেশ্বরের ভাগ্যেও তাই ঘটল। পুজার সময় দলে যাবার প্রস্তুতি হিসেবে কিছু জামা কাপড় কেনার জন্য নকুলেশ্বর বরিশাল গিয়েছেন। টাউনের কাছেই তাঁর মেজদির বাড়ী। সেখানে দু' এক দিন থাকবেন বলে স্থির করেছেন। এদিকে ঝালকাঠির আদর্শ কবি সেই শরৎ সরকার মহাশয়ের দলের পরিচালিকা 'রাঙ্গা' যামিনী দলপতির সঙ্গে বিবাদ করে তার দল থেকে বের হয়ে নিজে দল করার মনস্থ করেছেন।

যদিও দল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা তার আছে, তথাপি একজন উপযুক্ত

ম্যানেজার রাখা প্রয়োজন মনে করে সে হরিচরণ নট্টকে ম্যানেজার রাখল। হরিচরণ নট্ট খুব ভাল ঢুলী। ঝালকাঠির ঢুলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব সে গানের আসরে ঢোলও বাজাবে, এবং দলের সব কিছু দেখা শোনাও করবে রাঙ্গা যামিনী হরিচরণ নট্টকে বলল—আমি যেমন শরৎবাবুর দল ছেড়ে বের হয়ে এসেছি, তখন এমন ভাবে দল গঠন করবেন যেন ঝালকাঠির সব দলের চেয়ে ভাল হয়।

হরিচরণ—সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি টাকা চালাতে পারলে আমি সব দলের সেরা দল গড়ে দেব।

রথযাত্রার দিন দলের পত্তন আরম্ভ হল। গায়িকা চারজন চাই—সরলা, ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালী, সত্যভামা আর দলের কর্ত্রী রাঙ্গা যামিনী—এই চার জন স্থির হল। রাঙ্গা যামিনী বলল—পূজার সব রকম আয়োজন তো হয়ে গেল, এখন একজন উপযুক্ত পুরোহিত না হলে তো সব আয়োজন পণ্ড হবে।

হরিচরণ—আপনি কি বলছেন ? সব পণ্ড হবে কেন ?

রাঙ্গা যামিনী—হবেনা ? অন্যান্য দলপতিরা নিজেরাই সরকার; অন্য সরকারের অপেক্ষা রাখেনা। ক'জন গায়ক গায়িকা হলেই তাঁদের দল হয়ে গেল। কিন্তু আমি ত নিজে সরকার নই, সামান্য গায়িকা মাত্র। কবির দলের সরকারই হল মূল মাঝি, পরিচালক, এমন কি সর্বেসর্বা। যেমন—

'এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে,
লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কি করতে পারে ?'

যেমন দল, তেমন একজন উপযুক্ত সরকার না হলে সব উদ্‌যোগই যে পণ্ড হয়ে যাবে। এখন সরকার কোথায় পাওয়া যায়! ঝালকাঠির যে কয়জন সরকার সকলেই দলপতি। নিজের দল আছে। এখন দল ছাড়া উপযুক্ত সরকার কোথায় পাওয়া যায় ?

রাঙ্গা যামিনীর দলে নকুলেশ্বর

সরলা—সরকার তো একজন ছিল; কিন্তু এখন আর তাকে পাওয়া সম্ভব নয়।

হরিচরণ—কে ? কার কথা বলছ সরলা ?

সরলা—আমি বলছিলাম গুরু দত্ত মহাশয়ের প্রধান ছাত্র নকুলেশ্বরের কথা।

কুঞ্জবাবুর আদেশে সে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কবিগুরু হরি আচার্য মহাশয়ের দলে গিয়ে খুব উন্নতি লাভ করেছে।

হরিচরণ—তবে তাকে পাওয়া যাবে না কেন ?

সরলা—পাবেন কি করে ? হরি আচার্য মহাশয় যে কিছুদিন আগে তার এক শত টাকা মাহিনা স্থির করে দাদন দিয়ে গেছেন। এ বছর সে আর অন্য দলে যাবে না।

হরিচরণ—আমরা যদি তার বেতন দাদন বাড়িয়ে দিই।

সরলা—আমার মনে হয় সে আচার্য কর্তার সঙ্গে কথার খেলাপ করবেনা। বিশেষতঃ তার বড় হবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কি সে টাকার প্রলোভনে ভুলবে ? আমার তো মনে হয়না।

যামিনী—একবার তার বাড়ীতে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি। আগেই হাল ছেড়ে বসে থাকলে যে আমার সাধের তরণী মাঝ গাঙে ডুবে যাবে। চল সরলা, আমরা তার বাড়ীতে যাই।

সরলা, রাঙ্গা যামিনী ও হরিচরণ নট্ট তিনজনে নকুলেশ্বরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। নকুলেশ্বর তখনো বরিশাল হতে ফেরেন নি। সরলার সঙ্গে নকুলেশ্বরের মায়ের পরিচয় ছিল। সে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

নকুলেশ্বরের মা—সুখে থাক মা ! তোমার সঙ্গে ও দুই জনকে তো চিনতে পারলাম না।

সরলা—এরা ঝালকাঠি থেকে এসেছেন। (বর্ষিয়সী রাঙ্গা যামিনীকে দেখিয়ে) এই মহিলা অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে একটি কবিগানের দল করেছেন। কিন্তু "সরকার" অভাবে সব নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সে জন্য আপনার ছেলেকে খোদ "সরকার" হিসেবে দলে নেবার মনস্থ করে এসেছেন।

নকুলের মা—সে আর কি করে হবে বাছা। সে তো আচার্য কর্তার দলে থাকবার জন্য দাদন নিয়ে এসেছে। এ বৎসর যে তার সেই দলেই যেতে হবে।

সরলা—আপনাকে সে দেবীর মতো ভক্তি করে। আপনি বললে নিশ্চয়ই সে এই দলে যেতে রাজী হবে।

মা—ছিঃ ছিঃ সরলা। আমি মা হয়ে এমন একজন মহাপুরুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার পরামর্শ কেমন করে দেব। আমার দ্বারা তা হবেনা। তোমরা অন্য একজন ভাল সরকার খোঁজ করে নাও। আমি ওর উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারব না।

মাকে টলাতে না পেরে রাঙ্গা যামিনী ও হরিচরণ এসে নকুলেশ্বরের পিতাকে প্রণাম করলে তিনি তাদের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। সব শুনে বললেন—শুনেছি সে নাকি ঢাকার হরি আচার্য মহাশয়ের দলে এ বছর থাকার কথা দিয়ে টাকা নিয়েছে।

হরিচরণ—সে দলে তো খোদ হতে পারবেনা। ডাক-সরকার হিসাবে কাজ করতে হবে। এ দলে নিজেই খোদ সরকার হয়ে দল পরিচালনা করবে। তাতে তার কত সুনাম সুখ্যাতি হবে ; আর টাকাও বেশী পাবে।

নকুলেশ্বরের বাবা—হরি আচার্য মহাশয় তো একশত টাকা স্থির করে অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন। এখন সে দলে না গেলে তাঁর যে ক্ষতি হবে।

হরিচরণ—তাঁর আর এমন কি ক্ষতি হবে? সে দলে তিন চারজন করে ডাক সরকার থাকে। তার মধ্যে উনি একা না গেলে তাঁর দল তো আর অচল থাকবেনা। কিন্তু এ বেচারী এই দল গড়তে দু'তিন হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছে। এখন যদি সরকার অভাবে দল চালাতে না পারে তবে ওর একেবারে সর্বনাশ।

হঠাৎ রাঙ্গা যামিনী নকুলেশ্বরের বাবার পায়ে হাত দিয়ে বলল—আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, নইলে আমার আর উপায় নেই।

বাবা—তোমরা কত বেতন দিতে পারবে?

যামিনী—আপনি যা বলবেন তাই দেব।

বাবা—দেড় শত টাকা মাহিনা দিতে পারবে?

যামিনী—তাই দেব।

যামিনীর সঙ্গে টাকা ছিল। হরিচরণ নট্ট যামিনীকে বলল—দিন দুই মাসের দাদন তিন শত টাকা। আর দেরী করবেন না। যামিনী সঙ্গে সঙ্গে তিন শত টাকা নকুলেশ্বরের পিতার হাতে দিয়ে বলল—এই নিন আপনার ছেলের দুই মাসের বেতন।

বাবা—এত ব্যস্ত কেন, খাওয়াদাওয়া কর। নকুলেশ্বরও হয়তো এখনই এসে পড়বে, তার সামনেই টাকা নেব।

যামিনী—না না! আপনি টাকা না নেয়া পর্যন্ত আমরা আহার করব না। দয়া করে টাকাটা নিন।

ওদের আবদারে বাধ্য হয়ে সরলমতি বৃদ্ধ যামিনীর কাছ থেকে টাকা হাতে নিলেন। সরলা যামিনীর কানে কানে বলল—আর দেরী করবেন না।

তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে চলুন; নকুলেশ্বর এসে পড়লে হয়তো সব ওলটপালট হয়ে যাবে। খাওয়াদাওয়া সেরে যাবার সময় যামিনী নকুলেশ্বরের বাবাকে প্রণাম করে বলল—দেখবেন, আমি যেন পথে না বসি।

আচার্য কর্তার দাদন ফেরৎ—রাঙ্গা যামিনীর দলে

সন্ধ্যার পূর্বে নকুলেশ্বর নিজের জন্য দলের সঙ্গে থাকাকালীন ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী এলেন। বাড়ী আসামাত্র তার পিতা তাকে ডেকে বললেন—বাবা নকুল, আমি তো একটা কাজ করে বসেছি।

নকুল—কি কাজ বাবা ?

তখন নকুলেশ্বরের পিতা আনুপূর্বিক সব ঘটনা তাঁকে জানালেন। শুনে নকুলেশ্বর বললেন—সে কি কথা! আপনি জানেন না যে আমি আচার্য কর্তার দলে যাওয়ার কথা দিয়ে টাকা নিয়েছি।

বাবা—হ্যাঁ তা জানি কিন্তু এটা যে তার চেয়েও জরুরী। তাঁর একটু সাহায্যের জন্য তোকে ডাক-সরকার হিসাবে নিতে চায়। আর এ বেচারী তোকে দলপতি করে দলের সম্পূর্ণ পরিচালন ভার তোর হাতে ছেড়ে দেবে। টাকাও বেশী, যশ প্রতিষ্ঠাও বাড়বে, সে কথাটা ভেবে দেখেছিস্ ?

নকুল—বাবা! আপনি ভুল বুঝেছেন। এখন খোদ সরকার হয়ে যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যাওয়া আর বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়া সমান নয় কি! আমি এখনো কবির 'ক'-ও শিখতে পারিনি; সে জন্য পুনরায় হরি আচার্য প্রভুর পদাশ্রয় নিতে চেয়েছিলাম। আপনি আমার সে আত্মোন্নতির পথ বন্ধ করে দিলেন। আপনার কাছে আমার পরমার্থের চেয়ে অর্থটাই বেশী হল ? এখন আমি আচার্য কর্তাকে কি বলে জবাব দেব ?

বাবা—টেলিগ্রাফ মণি অর্ডারে তাঁর টাকা ফেরৎ দিয়ে ভাল করে একখানা চিঠিতে সত্য ঘটনা লিখে তাঁকে জানিয়ে দে। তিনি মহৎ ব্যক্তি। নিশ্চয়ই তিনি বুঝবেন যে বিপন্নকে উদ্ধার করাও মানুষের পরম ধর্ম।

পরের দিন আচার্য মহাশয়ের টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নকুলেশ্বর বড় দুঃখিত হলেন।

দেখতে দেখতে আষাঢ় শ্রাবণ কেটে গেল। ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যানেজার হরিচরণ নট্ট এসে নকুলেশ্বরকে ঝালকাঠি নিয়ে গেলেন। রাঙ্গা

যামিনী বলল—এতদিন ত আমরা প্রত্যেক দলই হরি আচার্য মহাশয়ের রচিত গান গেয়ে আসছি। শুনলাম তুমি নাকি আচার্য কর্তার দলে থেকে নূতন নূতন গান তৈরী করেছ। আমার দলে তোমার সে সব গান গাওয়াতে হবে। আমার গানের খাতায় তোমার রচিত গানগুলি লিখে দাও। আমার ছোট ভগ্নীপতি সূর্যকান্ত ঘোষ সব গান মুখস্থ করে রাখবে; আসরে বলে দিয়ে তোমার ডাক-সরকার হিসাবে কাজ করবে।

নকুলেশ্বর তাঁর রচিত, ফুল-সুবল, কালো মেঘ, সারস, সমাজ মালসী, জল-কুম্ভের কবি প্রভৃতি অনেক গান যামিনীর দলের খাতায় লিখে দিলেন। দলের শ্রেষ্ঠ গায়িকা সেই সরলা নকুলেশ্বরকে পেয়ে খুব খুশী হয়ে ঠাট্টা করে বলল—কি মশাই! আমাদের ছেড়ে পালাবার জন্য তো বিদেশে পাড়ি ধরেছিলেন! কৈ পারলেন না তো! আর পারবেনই বা কি করে—

'না জানি মথুরাপুরের আছে কি ক্ষমতা,
এখানে যে আসে তার ভোলে পূর্ব কথা।'

—আমাদের ঝালকাঠির এমন এক মোহিনী শক্তি আছে যে একবার ঝাল-কাঠির বাতাস গায় লাগলে আর অন্য বাতাস ভাল লাগে না।

নকুলেশ্বর—এ যাদু শক্তির মূল তো আপনারাই। আপনারাই তো হাকিনী, কাঁকিনী, ডাকিনী, সাকিনী, মোহিনী সব রূপে পথিককে পথভ্রষ্ট করেন। তবে দেখবেন এই সরল তীর্থযাত্রীটিকে পথভ্রষ্ট করে বিপথগামী করবেন না যেন।

সরলা—না, না! সে জন্য আপনি ভয় করবেন না। কুঞ্জবাবুর দল থেকেই তো আপনাকে দেখে আসছি। আপনি হলেন এক জন অরসিক কর্তব্যনিষ্ঠ গোঁড়া যাত্রী। আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে গেলে মোহিনীরাই পথভ্রষ্ট হবে। আমরা ষড়যন্ত্র করে যা করেছি, তাতে আপনার মঙ্গলই হবে দেখবেন। দশ বছর ডাক-সরকারী করে যা না হতো, এক বছর খোদ সরকার হয়ে দল পরিচালনা করলে তার চেয়ে শতগুণ উদ্যম উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, অভিজ্ঞতা বাড়বে।

নকুলেশ্বর—আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়।

দু' চারদিন ঝালকাঠি থেকে নকুলেশ্বর বাড়ী যেতে মনস্থ করলেন। রাঙ্গা যামিনী বলল—বাড়ী যাবে ত যাও। আশ্বিন মাসের দুই তারিখ দল নিয়ে ঢাকা রওনা হতে হবে। তুমি সে ভাবে প্রস্তুত হয়ে আসবে। সব দলেরই বার্ষিক পূজার বায়না আছে। আমার নূতন দল, পূজার বায়না নেই। কাজেই একটু আগে ঢাকার ঘাটে গিয়ে পৌছতে হবে।

নকুলেশ্বর—আপনি শরৎবাবুর দলে থেকে ত অনেক পূজাবাড়ীতে পরিচিত হয়েছেন। সেই সব স্থানে চিঠি দিলে হয়তো বায়না হতে পারে।

যামিনী—শরৎবাবু অনেকদিন যাবত পূজায় বার্ষিক গান করেন কুমিল্লায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিদার বাড়ী। আমি সেখানে একখানা চিঠি লিখে দেখি কি হয়। তুমি কিন্তু দোসরা আশ্বিন অবশ্য আসবে।

রাঙ্গা যামিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিদারবাবুর কাছে পত্র লিখলেন—আমি অনেক দিন যাবত শরৎ সরকার মহাশয়ের দলে পরিচালিকা হিসাবে কাজ করছি। এ বৎসর আমি নিজে দল গঠন করে খুব ভাল গায়ক-গায়িকা রেখেছি। এবং অল্প বয়সী একজন সরকারও নিযুক্ত করেছি। শরৎবাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনার বাড়ী দুর্গাপূজায় গান করবার আশায় এই পত্র দিলাম। আশা করি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন।

পত্র পেয়ে জমিদারবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে যামিনীকে লিখলেন—তোমার নূতন দল বায়না করলাম। শরৎবাবুর সঙ্গে জয়ী হতে পারলে তোমাকেও বার্ষিক করে দেব।

নির্দিষ্ট তারিখে ঝালকাঠি এসে নকুলেশ্বর শুনলেন দুর্গাপূজার বায়না হয়েছে। স্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিপক্ষে শরৎ সরকার।

রাঙ্গা যামিনীর নূতন দলের নিজস্ব নৌকা নেই। তাই ঢাকাইয়া এক ঘাসী নৌকা (যাকে গহনার নৌকা বলে) মাঝিমাল্লাসহ ভাড়া করে যথাসময়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে গানের বাড়ীর উদ্দেশ্যে নৌকা খুলে দুর্গাষষ্ঠীর দিন দ্বিপ্রহরে দুই দল গিয়ে পূজাবাড়ী উপস্থিত হলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিদার বাড়ীর গান

ষষ্ঠী সপ্তমীতে একখানা করে ষষ্ঠী ও সপ্তমীর গান ছাড়া আর কোন গান গাইতে হয়না। অষ্টমী নবমী দু'দিন দু'পালা পুরা গান। অষ্টমীর দিন রাত দশটায় শরৎ সরকারের দল আসরে গিয়ে ডাক মালসী গেয়ে বের হয়ে এলো। রাঙ্গা যামিনী দল নিয়ে আসরে যাবার সময় নকুলেশ্বরকে বলে গেল—তুমি বিশ্রাম কর। ডাক-মালসীর আসরে তোমার দরকার হবে না। সূর্য ঘোষ মশাই গান বলে দেবেন। বিপক্ষ দলে সখী-সংবাদ গান করলে তুমি সেই গানের জবাব দিতে যাবে।

দল আসরে গিয়ে ডাক মালসী ও ভবানী গাইছে। নকুলেশ্বর এই অবসরে

শরৎবাবুর বাসাঘরে গিয়ে তাকে প্রণাম করে বললেন—আপনি ত এখন সখী-সংবাদ গান গাওয়াবেন। দয়া করে সে গানের পদগুলি একটু বললে আমার জবাব করতে একটু সুবিধা হতো।

শরৎ সরকার একটু উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন—কম্‌পিটিশনে গান ; খোদ সরকার হয়ে এসেছ। আসরে গান শুনে যদি জবাব করতে না পার, তবে এ গুরু দায়িত্ব নিয়ে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে এসেছ কেন ?

শরৎ সরকারের মতো একজন বয়স্ক ও বিজ্ঞ সরকারের মুখে এরকম শ্লেষোক্তি শুনবেন নকুলেশ্বর ধারণা করেন নি। চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো তিনি ফিরে চললেন। শরৎ সরকার ডেকে বললেন—আরে যাচ্ছ কেন? যখন এসেছ গানটা শুনেই যাও।

নকুলেশ্বর—প্রয়োজন হবে না ; আসরে শুনেই জবাব করব। তিনি সোজা আসরে গিয়েই বসলেন।

বস্তুতঃ ঝালকাঠির কোন কবিয়ালই নিজে গান রচনা করতেন না। তাদের নিজস্ব সম্বল কিছু ডাক, ভবানী ও টপ্পা পাঁচালী। আর অন্য গানের বেলা হরি আচার্য। তাঁর রচিত গানই সব দলে গাইত। শরৎ সরকারও আজ আসরে সেই আচার্য কর্তার রচিত একখানা "পূর্বরাগ" গান পরিবেশন করলেন। আচার্য কর্তার দলে থাকাকালে তাঁর গানের খাতায় নকুলেশ্বর ঐ গান দেখেছিলেন। গানটির মূল বক্তব্য—

সঙ্গিনীগণসহ জল আনতে গিয়ে, যমুনার কূলে কদম্বতলে বংশী বাদনরত শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনেই প্রেমাহত রাধারানী বিহ্বল হয়ে সখীদের বলছেন—

বড় রসের পর্ব, পূর্বরাগের অপূর্ব রস।
বাল্য পৌগণ্ড অতিক্রম, পূর্ব ভাব ব্যতিক্রম,
যৌবনের উপক্রম, বড়ই উত্তম প্রথম বয়স॥

কক্ষে কুম্ভ রাই তপন-তনয়ার তীরে যায়,
চরণ উপরে নূপুরে পঞ্চম গায়।
রাখাল চরায় বনে ধেনু, কি আনন্দে নন্দের কানু,
কেলী কদম্বে হেলায়ে তনু, রাই বলে বেণু বাজায়॥

প্রথম দর্শনে দেহের সনে নাই আর মনের গতি,
তখন শ্রীমতী সখীর প্রতি, প্রীতিবাক্যে বলে।

জানলে বলগো সখী, উহার ধাম কোথায়,
নাম ধরে কি, করে কি গোকুলে ॥

রূপে মন করে মুগ্ধ, প্রাণ করে স্নিগ্ধ,
বিদগ্ধ নাগর রায়।
দেখলে তেরছ চাহনি, ত্রৈলোক্য মোহিনী,
মোহিনীর মন মোহ যায়।
দাম্ভিকার মন দমিছে, পীতাম্বর চমকিছে,
যেমন চপলা চমকিছে, নবীন মেঘের কোলে।
অচিন রাজ্যতে চিত্ত আমার গেছে চলে ॥

আমার দেহ-মন গৃহকর্মে হৈল উদাসীন,
ইহ পরকাল পরের জন্য পরাধীন।
প্রাণ কাঁদে তাঁর ফাঁদে পড়ে, চঞ্চল চরণ চলতে নারে,
সখি, ডুপ করে রূপ সাগরে, ডুবল আমার আঁখি মীন ॥
উহার রূপ দেখে সচল দেহ অচল হৈল,
কক্ষের জলাধার খসে পৈল, তোরা ধর সকলে ॥

সখি কদম্বমূলে ঐ কে গো।
যে রূপ চিত্রপটে এঁকে, দেখালি আমাকে,
একি সখি আমার সে গো ॥
ত্রিভঙ্গ মূরতি মধুর আকৃতি, শিরে দেখি শিখি চন্দ্রিমালকৃতি,
কোন্ সতীর এই গোকুলে বসতি,
যুবতী সমাজে সে গো।
আমি রাখিব ঐরূপ হৃদয়ে ভরিয়ে, যতনে ধরিয়ে দে গো ॥

এ যমুনার কূলে একুল ওকুল দুকুল খেলেম।
আমার দু'নয়নের বারি, কি দিয়ে নিবারি,
আর যাবনা বাড়ী, কেন বারি নিতে এলেম ॥

সখি, গোকুলে কুলে রবে কোন্ কুলজায়,
যমুনার কূলে বুঝি আমার কুল যায়।

নবনীল শশধরে, ধর ধর আমায় নিল ধরে,
কেন অধরে মুরলী ধরে, রাই বলে বাঁশী বাজায় ॥
শ্রীঅঙ্গে চন্দন চুয়া, দাঁড়াইয়া ঐ কার বঁধুয়া,
গলে বৈজয়ন্তীর মালা, যেমনি গলা তেমনি মালা দোলে ॥

নকুলেশ্বর জবাব দিতে উঠে প্রেমাকৃষ্ট রাধারানীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সখীদের জবানীতে বললেন—

শুনে কিশোরীর সে রসের কথা, বলে সঙ্গিনী সকল।
দেখে জলের ঘাটে শ্রীহরি, উঠলি কেন শিহরি,
চল কিশোরী বারি নিয়ে চল ॥

আমরা সব সঙ্গিনী তোরই সঙ্গে,
জল ভরিতে মনোরঙ্গে, নিত্য আসি শ্রীমতী ;
হঠাৎ হলো আজ তোর কি মতি।
জলের ঘাটে রূপ দরশন,
তাইতে উন্মাদিনীর লক্ষণ,
রাধে সাক্ষাৎ যদি হতো মিলন—
জল নিতি না প্রাণ দিতি ॥

রূপ দেখিয়ে অন্ধ কূপে দিও না'ক ঝাঁপ,
শেষে পাবি মনস্তাপ, তাইতে বারণ করিলাম।
পরপুরুষে মন সঁপিলে, এ গোকুলে রটিবে দুর্নাম ॥

চিন্ময় রসে নাই আকিঞ্চন জানালি আমায়,
পরপুরুষের রূপের পানে সতী কি তাকায়,
আজ তোরে ভুলাবে বলে, কালিন্দী যমুনার কূলে,
দাঁড়াল কদম্ব মূলে, নন্দ-নন্দন বাঁকাশ্যাম।
আর এক কথা শুনে বড় ব্যথিত হলাম ॥

বললে, ঐ কালরূপ চক্ষে হেরে, ঢুপ করে ঐ রূপ সাগরে,
আঁখি মীন ডুবিল তোর ;
আছে মীন হলে ধীবরের ডর।

মতি রেখে পতির ধ্যানে, থেকে পতির রূপ সাধনে,
রাধে পতি রূপামৃত পানে, আঁখি-চকোর অমর কর ॥

বললে, অধরে মুরলী ধরি, রাই বলে বাজায় বাঁশরী,
তাই শুনে হলি ব্যাকুল ; কেন হাসালি কুলনা কুল।
হারা হয়ে ধবলী গাই, বাঁশীতে কয় হা রাই হা রাই,
রাধে তুই শুনিস যে, বলে রাই রাই ;
এ সকল তোর শ্রুতির ভুল ॥

বললে, অধরে মুরলী ধরে, হাসিতে উদাসী করে,
দেখে উহার মৃদুহাস ; কেন হলো রাই তোর বুদ্ধি নাশ।
কাজ কি উহার মৃদু হাসে, যা শুনে কুলজা হাসে,
সদায় শুনবি বসে পতির পাশে, সতী ধর্মের ইতিহাস ॥

বললে, নবনীল শশধরে, ধর ধর আমায় নিল ধরে,
শুনে দুঃখ ধরে না ; সতী এ সঙ্কল্প করে না।
ধরে নিতে সাধ্বী সতী, শশধরের কি শকতি,
শুনি সতীর অঙ্গ মৃত্যুপতি, স্পর্শ করতে পারে না ॥

এইভাবে নকুলেশ্বর পূর্বরাগ গানের জবাব দিয়ে সে সঙ্গে একটি রংফুকার দিলেন—

আগে লোকের মুখে তত্ত্ব শুনি,
শরৎ আর রাঙ্গা যামিনী,
দল করেছেন বহুদিন ;
এখন আত্মদ্বন্দ্বে হল ভিন্।
দারুণ বিচ্ছেদ রবিকরে,—
নিষ্প্রভ চাঁদ পুড়ে মরে,
হল যামিনীর অভাবে পড়ে—শরৎচন্দ্র জ্যোতিহীন ॥

এরপর নকুলেশ্বর স্বরচিত সেই 'ফুল্ল-সুবল' গানখানা আসরে গাওয়ালেন, যার রচনা শুনে হরি আচার্য বলেছিলেন—সরকার ঠকানো গান লিখেছিস্! শরৎ সরকার সে গানের জবাবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন না। জবাবের

শেষে তিনি নকুলেশ্বরের রং ফুকারের সূত্র ধরে পাল্টা একটা রং ফুকার করলেন—

দেখি ঐ দলের রাঙ্গা যামিনী,
নূতন দল করেছেন তিনি,
পুরান লাগেনা ভাল,
তাইতে নতুন 'সরকার' জোটালো।
দলে দুইটা ছুক্‌রী আছে,
ঘাগরা পরে সভায় নাচে,
থাকে ছোকরা সরকার পাছে পাছে—
সভাটা করলো আলো॥

নকুলেশ্বর পুনরায় এসে উপরিউক্ত ফুকারের জবাব করলেন—শরৎবাবুর দলে এলোকেশী নামে গায়িকার সঙ্গে ঠেস দিয়ে উক্ত ফুকারের নিম্নরূপ জবাব দিলেন—

বললে, যামিনী বেশ দল করেছে,
ছোকরা সরকার ছুকড়ীর পাছে
সভা আলো করেছে।
এলোকেশীর এলোচুলে,
শরৎবাবু গেছেন ভুলে,
তাইতে ছোঁড়া সাজতে বুড়া কালে—
কচি সাল্‌সা ধরেছে॥

শরৎ বৈরাগী বনাম নকুলেশ্বর

এর পর শরৎবাবু এসে টপ্পা পাঁচালী আরম্ভ করলেন—

আমি কনক লঙ্কার অধিপতি রাজা দশানন।
যত যক্ষ রক্ষ কিন্নরে, দেব দানব গন্ধর্ব নরে,
আমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বিশ্ববাসীগণ॥
যত তেত্রিশ কোটি দেবগণে
আমারি অধীন হয়ে কাজ করে;
ঘোড়ার চাকর যম তুমি,
চিরদিন রও ঘোড়ার ঘরে।

অদ্য শ্রীরামের শরাসনে, পড়েছি ধরাসনে,
প্রাণপাখী যেতে চায় উড়ে।
তুমি ঘোড়ার ভৃত্য কি নিমিত্ত,
এ সময় দাঁড়ালে মোর শিয়রে?

এই টপ্পা উপস্থাপন করে শরৎবাবু মনে করেছিলেন যে নকুলেশ্বর জবাবে বলবেন, "আমি মৃত্যুপতি যম, মৃত্যুকালে সব জীবের আত্মা নিয়ে যমপুরে পাপপুণ্যের বিচার করি।" নকুলেশ্বরের এই জবাবের উত্তরে শরৎবাবু এসে আবার জেরা করবেন—জীব দেহে মরে কি? আত্মা তো বায়ুমাত্র, তুমি তার বন্ধন কর কি? স্বর্গ নরক কাকে বলে? তুমি মৃত্যুপতি হলে মৃত্যুকন্যা কি করে? শিবকে সংহার কর্তা বলে কেন? ইত্যাদি কূট-প্রশ্ন তুলে নকুলেশ্বরকে জব্দ করবেন। কিন্তু নকুলেশ্বর এমনভাবে নিম্নোক্ত জবাব দিলেন যে তার আর ওসব প্রশ্ন করার অবসর রইলনা।—

তুমি মহাতেজা রাবণ রাজা, কুম্ভকর্ণের ভাই।
তুমি ব্রহ্মাদেবের পেয়ে বর, হয়েছ দেবতার ঈশ্বর,
ক্ষুদ্র জ্ঞানে নরবানর, গ্রাহ্য কর নাই॥
ও সেই নররূপী নারায়ণে জীবনে ভক্তি করা শিখ নাই:
যমকে দেখে দায় ঠেকে, নিলে আজ রামচরণে ঠাঁই॥
এখন তুমি যাচ্ছ চলে, তাই তোমার মরণ কালে,
আজ আমি শিয়রে দাঁড়াই।
আমি ভৃত্য হয়ে যা করেছি—
কর্তাকে শেষের হিসাব দিয়ে যাই॥

নকুলেশ্বরের এই জবাবখানা শুনে শরৎবাবুর মনোকল্পিত ধারণা কর্পূরের মতো উড়ে গেল। নিজের জীবনের ভুল ভ্রান্তি ও আত্মকৃত অপরাধের কথা বলতে বলতেই সময় কেটে গেল। তাঁর আসরে বাহবা নিতে পারলেন না।

নকুলেশ্বর দ্বিতীয় আসরে শ্রীরামচন্দ্রের গুণাগুণ—পাষাণী অহল্যা উদ্ধার, মাধবের কাষ্ঠতরণী সোনা করণ, তরণীসেনের মুক্তি, গুহক চণ্ডালকে কৃপা, ইত্যাদি বিষয়গুলি ধুয়া ধরে হরি আচার্য মহাশয়ের কাছে শেখা পদাবলী সুরে পাঁচালী বলে আসিরে দু'তিনটা হরিধ্বনি ফেলে চলে এলেন। অষ্টমীর গান শেষ হলো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিদার বাড়ীতে নবমীর গান

নবমীর রাত্রে রাঙ্গা যামিনীর দল আগে আসরে গেলেন। উভয় দলের ডাক মালসী গান হয়ে গেল। রাঙ্গা যামিনীর দল নকুলেশ্বরের রচিত 'জল কুম্ভের' কবিখানা গাওয়ালে শরৎ সরকার সে কবি'র জবাব দিয়ে হরিচরণ নাথের রচিত 'যবন হরিদাসের' কবিখানা গাওয়ালেন।

'কবির' জবাব দিয়ে নকুলেশ্বর প্রথম আসর নিয়ে শরৎবাবুকে বিপক্ষে রেখে টপ্পা করলেন—

আমি কল্পনায় অদ্বৈতাচার্য, শান্তিপুরে বাস।
তুমি গঙ্গাদাস বিদ্যানিধি, পাণ্ডিত্যে পেলে উপাধি,
জাতিতত্ত্ব কৌমুদী, করেছ প্রকাশ॥
ক'রে গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ, নদীয়ায় এল গৌর গুণাধার,
কি অভাবে যেন তার নয়নে বহে অশ্রুধার॥
নিমাই সাজিয়ে নামের পাগল,
সঙ্গে নিয়ে ভক্ত দল, হরিবল বলে অনিবার।
তোমরা কয়েক জনে করে দ্বন্দ্ব,
আজ কেন সমাজ বন্ধ করলে তার?

এই টপ্পার সঙ্গে ছড়া পাঁচালীতে আলোচ্য বিষয়বস্তুর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে নকুলেশ্বর আসর শেষ করলেন। শরৎবাবু সদলে এসে উক্ত টপ্পার জবাব দিলেন—

কেন নিমাই'র করি সমাজ বন্ধ জানতে চাও কারণ।
ক'রে গয়াধামে পিণ্ড দান, শিখেছে হরিনামের গান,
হিন্দু ধর্মের জাতিমান দিল বিসর্জন॥
বেদে বর্ণাশ্রমের ধর্ম যাহা—মোটে তা করে না সে পছন্দ,
ডোম হাড়ি যবন নিয়ে, কীর্তনে করে আনন্দ।
বেটা হয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, যায় না ব্রাহ্মণের দলে,
শেখ তুরুক সঙ্গে সম্বন্ধ।
ও সেই শেখের সাথে, খায় একপাতে—
তাইতে তার করেছি সমাজ বন্ধ॥

ছড়া-পাঁচালীতে শরৎ সরকার হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ, শুচিস্পর্শ সমর্থন করে,

দেবের বর্ণাশ্রম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করে গেলেন। নকুলেশ্বর দ্বিতীয় আসরে এসে প্রতি-জবাব করলেন—

নাকি নিমাইয়ের নাই জাতির বিচার, তাইতে কর রাগ।
ঠাকুর! ব্রাহ্মণ শূদ্র শেখ জাতি,
খৃষ্টিয়ান কিংবা মগ জাতি,
মূলে সবাই এক জাতি, গুণে কর্মে-ভাগ॥
নিমাই শেখের সাথে খায় এক পাতে—
তাইতে তার গলায় দাও সমাজের ফাঁস।
কুব্‌রা জোলার ফেন খেয়ে—
কি জন্য হয় না জাতি নাশ।
যদি হরি নামে হয় রুচি, অশুচিও হয় শুচি,
তার সাক্ষী মুচী রুহিদাস।
যাহার প্রসাদ খেতে ক'রে আর্তি—
সাজিলেন কুত্তার মূর্তি কীর্তিবাস॥

টপ্পার জবাব দিয়ে নকুলেশ্বর পুনরায় পাঁচালীতে যুধিষ্টিরের ঘরে রুইদাস মুচী বৈষ্ণবের ভোজন, শ্রীক্ষেত্রে যবনী করমাবাঈ'র জগবন্ধু সেবা, শবরীর হাতে শ্রীরামের উচ্ছিষ্ট ফল ভক্ষণ, গুহক চণ্ডাল, সুগ্রীবাদি'র সঙ্গে রামের মিত্রতা, দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ইত্যাদি বিষয়গুলি সুরে ছন্দে আসরে পরিবেশন করলেন। শুনে শ্রোতৃবৃন্দ খুব সন্তুষ্ট হলেন, গান শেষ হয়ে গেল।

বিদায়ের সময় জমিদারবাবু দলের কর্ত্রী রাঙ্গা যামিনীকে ডেকে বিদায়ের টাকা দিয়ে বললেন--তোমার দল বেশ ভাল হয়েছে। তোমাকেও আমার বাড়ীতে দুর্গাপূজায় বার্ষিক করে দিলাম।' সকল দোহারপত্রকে বখ্‌শিস দিলেন; যামিনীকে একখানা শাড়ী এবং নকুলেশ্বরকে ধুতি-চাদর দিয়ে জমিদারবাবু বললেন—'তোমার জবাবে পাঁচালীতে শুধু আমি কেন সভার সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছেন। আশা করি তুমি হরি আচার্য মহাশয়ের সুনাম রক্ষা করে তার স্থান অধিকার করতে পারবে।'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বসে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন "সরকারের" সঙ্গে দশ বারো পালা বায়না পেলেন। গানের পর গান চলছে। বিভিন্ন "সরকারের" সঙ্গে গান করে নকুলেশ্বরের বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা লাভ হতে লাগল।

কবির কাব্য প্রতিভা একবার বিকাশোন্মুখ হলে উত্তরোত্তর কবির মনে

নূতন নূতন ভাবের উন্মেষ হতে থাকে। নকুলেশ্বর দেখলেন, সরলার কথাই ফলবতী হতে চলেছে। সরলা বলেছিল—দশ বৎসর ডাক—সরকারী করে যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভ হতো, এক বৎসর 'খোদ' সরকার হয়ে দল পরিচালনা করলে তার চেয়ে শতগুণ উদ্যম উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। নকুলেশ্বরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। খোদ সরকার হিসাবে কাজ করতে করতে তাঁর আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, নূতন নূতন ভাবের উদ্দীপনা অন্তরে অঙ্কুরিত হচ্ছে।

কুমিল্লা—গৌরীপুরে আচার্য কর্তার সঙ্গে গান—প্রথম ও শেষ

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে বায়না নেওয়া গানগুলি শেষ করে কালীপূজা উপলক্ষে ত্রিপুরা জিলার গৌরীপুর বাজারে এক পালা গানের বায়না নিয়ে ঐ বাজার ঘাটে এসে নকুলেশ্বর ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। দেখলেন হরি আচার্য মহাশয়ের পীনিস বোট ঘাটে বাঁধা। দেখামাত্র নকুলেশ্বর হর্ষ-বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। হর্ষ-বিষাদের কারণ হলো—যখন আচার্য কর্তার সঙ্গে গান হবে, তখন অনেক নূতন কথা নূতন জবাব শুনতে পাবেন—যা অন্য কোন কবির মুখে শোনা যাবেনা বা এতদিন শোনা যায়নি। সে সব অমূল্য বস্তু সংগ্রহ করা নকুলেশ্বরের পক্ষে পরম লাভ। এই তার হর্ষের কারণ। আর বিষাদের কারণ? তিনি ভাবলেন—আমি কি? আমার এমন কি সম্বল আছে যে তাই নিয়ে আমি কবি-সম্রাট হরি আচার্য মহাশয়ের বিপক্ষে আসরে দাঁড়াব? চাঁদকে আলো দেখাতে জোনাকী পোকার নিষ্ফল প্রয়াসের মতোই তা বাতুলতা মাত্র। এই ভেবে নকুলেশ্বরের মন বিষাদে মুহ্যমান।

কিন্তু নিরুপায়, বায়না নিয়ে যখন দল নিয়ে আসা হয়েছে, আসরে দাঁড়াতেই হবে। এই ভেবে নকুলেশ্বর মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে গুরুপদে আত্মনির্ভর করলেন। সন্ধ্যার পর আহারাদি সেরে তিনি দলের ঢুলী ও ম্যানেজার হরিচরণ নট্টকে বললেন—বাইন মশাই! আজ আমাদের দল আগে আসরে যাবে।

হরিচরণ নট্ট—কেন, আজ এমন তাড়া কেন? অন্য কোন দিন আগে যাবার কথা বলেননি; বরং পেছনে থাকবার কথাই বলেছেন—আজ আগে যেতে চাচ্ছেন কেন?

নকুলেশ্বর—আমি ছেলেমানুষ; আচার্য কর্তা যদি প্রশ্ন করেন আমি তার জবাব দিতে পারব না। তাই প্রশ্নের ভাগে আমি থাকব। তাঁর মুখে জবাব শুনলে আমার অনেক কিছু শিক্ষাও হবে, জাতমানও থাকবে।

হরিচরণ নট্ট—আচ্ছা তাই হবে, সময় হলে আমি দল নিয়ে আসরে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন।

রাত এগারটায় হরিচরণ ঢুলী দল নিয়ে আসরে গেল। দুই দলের ডাক-মালসী গান হয়ে গেল যথারীতি। দ্বিতীয় আসরে নকুলেশ্বর সূর্য ঘোষ মশাইকে বললেন—আমার "সারস" গানখানা গাওয়াবেন। গানখানার বিষয়বস্তু হলো—শ্যামবিরহে বিরহিনী রাই বর্ষার সময় অদূরে সারস পাখীর ধ্বনি শ্রবণ করে ভাবোন্মাদে শ্যামের বংশী-ধ্বনি মনে করে সখীর কাছে বলছেন—

সখি! ঐ শোন বহুদিন পরে প্রাণবন্ধু আমার বৃন্দাবনে এসে অদূরে বসে বংশী বাজাচ্ছেন। সুতরাং—

১। চলগো সখী দেখে আসি,
কোন্ বনে শ্যাম বাজায় বাঁশী ?

২। সাধে কি শ্যামকে প্রসংশি,
বংশী হল প্রেমের অংশী,
আমায় কলঙ্কী সাজায়।—ইত্যাদি বলে আক্ষেপ করছেন।

হরি আচার্য মহাশয় এই গানের জবাব দিতে এসে প্রথম সাজানী ফুকারে এমন সুন্দরভাবে পদ যোজনা করলেন যে শ্রোতাগণ বাহ্‌বা বাহ্‌বা বলে হাতে তালি দিতে লাগলেন। সখীর জবানীতে আচার্য কর্তা বলেছেন, রাই—

১। চিরদিন পর্যায়ক্রমে, বরজে (ব্রজে) বরষাগমে,
জলময় দশ দিশি,
আমরা নয়নের জলে ভাসি।
মেঘে লাগলো বরষিতে,
সরোবর আর সরসীতে,
ডাকে হংস সারস সারসীতে,
তুই ভাবলি শ্যামের বাঁশী॥

২। কান্তের বাঁশী শুনতে শুনতে, কান তো বশে নাই,
যে শব্দ তুই শুনিসগো রাই,
বংশী ধ্বনি মনে হয়।
নীল চশমা দিলে চোখে,
জগৎটাকে নীল বরণ দেখায়॥

৩। বললে, বাঁশী স্বরে মন উদাসী,
চলগো সখী দেখে আসি,
কোন বনে বাঁশী বাজায়,
রাধে, আসে নাই তোর শ্যামরায়।
শ্যামের বাঁশী যদি হতো,
বেণু মুগ্ধ ধেনু যত,
সবাই উর্ধমুখে বনে যেত,
উজান বইতো যমুনায়॥

৪। বললে, কুলনারীর কুল ধ্বংসী,
বংশী হলো প্রেমের অংশী,
মিছে বংশী প্রসংশিস্,
কেন না বুঝে তুলনা দিস্।
সুযন্ত্রীতে যদি ধরে,
কুযন্ত্রেও সুধা ক্ষরে,
পড়লে অসুরা বেসুরার করে,—
সুযন্ত্রেও ঢালে বিষ॥—ইত্যাদি যেমন রসাল পদ, তেমনি রসাল মুখের বলার গুণে আসরে এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করে অজস্র বাহবা নিলেন। এরপরে নকুলেশ্বরকে একটু ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত 'ব্যাঙের কবি' খানা গাইতে হুকুম দিয়ে গেলেন। সে গানটির বিষয়-বস্তু হলো—বর্ষাকালে একদিন একটা ব্যাঙকে পদ্মের উপর উপবিষ্ট দেখে পদ্মিনীর বন্ধু ভ্রমর এসে রাগ করে পদ্মিনীকে অনুযোগ করে বলছে—

১। পদ্মিনী বল আমারে, ব্যাঙ কেন তোর উপরে,
ওর সঙ্গে সম্পর্ক তোর কি ?

২। জাতি যূথি আর কামিনী, মালতী আর কুমুদিনী,
আমারে ভালবাসে কত ?

৩। পটাপট মারব জুতা, বের করব হাগা মুতা,
না দিতে আজ ঠেঙ্গার গুঁতা, সকালে ব্যাঙারে নামা।

৪। বসে পদ্মের উপরে, ব্যাং কেন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ?

৫। আজ কেন সন্ধ্যাবেলায়, দেখি ঐ ব্যাঙা শালায়,
উঠলো তোর দোতলার উপর ?

৬। পদ্মী তোর প্রেমে মাতুক, ব্যাঙাই আসন পাতুক,
তোর ঐ মধুর কোটায় ব্যাঙে মুতুক, এই আমি বিদায় হয়ে যাই।

এইভাবে ভ্রমর-হয়ে পদ্মিনীকে অভিমানে গালাগাল দিয়ে গেল। নকুলেশ্বর জবাব করতে উঠে পদ্মিনী হয়ে ভ্রমরকে সান্ত্বনা দিলেন—

শুনে ভ্রমরের গুমরের কথা
পদ্মিনী রাগে রাগে কয়।
ও তুই হোমড়াচোমড়া ভোম্‌রা আমার, পরাণের পরাণ,
আমার কথা মান, ধরি তোর ছয় পায়॥

১। আমি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলাম,
তাই আমায় বলিস্ দুর্বাক্য,
বৃথা করিস না তর্ক,
দুর্যোগে মরে প্রাণে, স্থান দিলাম বিপদ জেনে,
নইলে বল ভ্রমরা আমার সনে,
ব্যাঙের কোন রঙের সম্পর্ক ?

২। ও তুই ভুল বুঝেছিস ব্যাঙ তো আমার নয় অন্তরঙ্গ,
কভু তার সনে নাই প্রেম প্রসঙ্গ,
মিছে তুই সন্দেহ করিস মনে।
আমার মন আছে খাঁটি,
আমি তোর মত কি পাতড়া চাটি, ফুলের বাগানে॥

৩। বললি, জাতি যূথি আর কামিনী,
আরও তোর প্রতিবেশী কুমুদিনী,
তারা তোর আদর করে কত ;
ও তোর গুণের মধ্যে ঘ্যানঘ্যানানি, চরকা ঘোরার মত।
তোর স্বভাব জানি ভ্রমরা,
স্বার্থের আশায় প্রেম করা,
একবার মধু খাওয়া হলে সারা,—
উড়ে যাস কেতকী চম্পার বনে।
আরো একটি কথা শুনে ব্যথা পাই মনে॥

৪। বললি, না দিতে আজ ব্যাঙার গুতা,
সকালে নামা ব্যাঙারে ; মেরে সুসার কি তারে।

তুইতো পতঙ্গ ভ্রমর, জানিস্‌না কাজের গোমর,
একটু পাছার উপর আল্‌ দিলে পর,
তবেই তো ফাল্‌ দিয়ে পড়ে ॥

৫। নাকি পটাপট আজ মারবি জুতা—
তাই শুনে বাঁচিনা জ্বালায়, ওটা গালগল্পের বেলায়
বনের পতঙ্গ তোরা, স্বভাব হয় শূন্যে ওড়া,
তোদের বাপ দাদা আর জ্যেঠা খুড়া,
জুতা পায় দি'ছে কোন্‌ শালায় ?

৬। কেন ব্যাঙ করে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর—
ভ্রমর তুই জানিস না কারণ,
ব্যাঙের হয়েছে স্মরণ ;
কাইল রাতে বৃষ্টি ঝড়ে, তোর জ্ঞাতি গোষ্ঠী মরে
তাইতে ঘ্যাং ঘ্যাং করে ব্যা, পড়ে—
তোর বাবার শ্রাদ্ধের রামায়ণ।

৭। বললি, মধুর কোটায় ব্যাঙে মুতুক,
তাই শুনে পেলেম দুখ, তাতে তুই কি পাবি সুখ ?
আজ যদি মোতে ব্যাঙে, কাল এসে মনোরঙ্গে,
ও তুই মধু খাবার সঙ্গে সঙ্গে,
ব্যাঙের মুত খাবি এক চুমুক ॥

এই ভাবে নকুলেশ্বর জবাব দিয়ে আসরের শ্রোতাদের আদেশে টপ্পা করলেন—

আমি কল্পনায় রায় রামানন্দ, তুমি হও নিমাই।
তুমি ব্রজের শ্রীনন্দ নন্দন, গউর রূপ করেছ ধারণ,
অদ্য জানিতে 'সাধ্য-সাধন' এলে আমার ঠাঁই ॥
আমি গীতা তত্বের প্রমাণ দিয়ে—
করলেম সাধ্য-সাধন নিরূপণ।
'ইহ বাহ্য ইহ হয়' এই বলে বললে কি কারণ ?
যখন কান্তা-প্রেম হয় 'সাধ্য সার'
এই তত্ব করলেম প্রচার,
আমাকে দিলে আলিঙ্গন।

তোমার 'কান্তারস' আর ত্যাগের ধর্ম,
এই দুই এর কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ আচরণ ?

টপ্পার লহর শেষ করে নকুলেশ্বর পাঁচালী আরম্ভ করলেন এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুকে আরো প্রাঞ্জল করে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন—তুমি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারানীর প্রেম—ঋণ পরিশোধ এবং জীব উদ্ধারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। অন্য 'সাধ্য এবং সাধন' কি তাই জানবার জন্য আমার কাছে এসেছ। তুমি কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথীরূপে যে গীতা ব্যাখ্যা করেছিলে, আমি তোমার সেই গীতার বাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'সাধ্য-সাধন' ব্যাখ্যা করলাম। তুমি চার বার 'ইহ বাহ্য' বলে উপেক্ষা করলে কেন ? তিনবার 'ইহ হয়' বলে সমর্থন করলে কেন, আর 'এহোত্তম' বলে আনন্দ প্রকাশ করলে কেন ; শেষবারে যখন কান্তাপ্রেম 'সর্বসাধ্য' বললাম তখন 'সর্বোত্তম সর্বোত্তম' বলে আমাকে আলিঙ্গন দিলে কেন ? কান্তা প্রেমে কি আছে ? তোমার ত্যাগ ধর্ম আর কান্তারস এই দু'য়ের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ ?—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন নকুলেশ্বর করে এলেন।

আচার্য কর্তা আসরে এসে ঐ টপ্পার জবাব আরম্ভ করলেন—

আমি কল্পনায় গৌরাঙ্গ, তুমি রায় রামানন্দ।
আমি সার্বভৌমের বাক্যেতে,
এসেছি তোমার সক্ষাতে,
তোমার সাধ্য-সাধন ব্যাখ্যাতে, পেলেম আনন্দ ॥
জানি শান্ত দাস্য সখ্য আদি—
আরও সেই বাৎসল্য এই চার প্রকার,
এ সকল সাধন শক্তি, সাধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বার।
আছে পঞ্চপ্রেম এক আধারে—
কান্তা প্রেম বলে তারে, যা ছিল ব্রজে শ্রীরাধার।
তাইতে কান্তা প্রেম হয় সর্ব শ্রেষ্ঠ—
সাধকের সাধ্য সিদ্ধির মূলাধার ॥

এই বলে টপ্পার লহর শেষ করে আচার্য কর্তা পাঁচালীতে সাধ্য কি, সাধন কি, কান্তা প্রেম কি, প্রাপ্তি উপায় কি, কান্তার স্বরূপ কি, আরোপ কি ইত্যাদি জটিল বিষয় বিশেষ ভাবে বক্তৃতা দিয়ে মাধ্যমে কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে গেলেন।

দ্বিতীয় আসরে নকুলেশ্বর আচার্য কর্তার টপ্পার জবাবে বললেন—
নাকি কান্তা প্রেম হয় সাধ্য শ্রেষ্ঠ, বললে আমারে।
যদি কান্তা হয় শ্রেষ্ঠ সাধন, দেখিলে সেই কান্তার বদন,
কেন বৈষ্ণবের অধঃপতন, তোমার বিচারে ?
যেদিন হরিদাস ভিক্ষাতে গিয়ে,
মাধবী কান্তায় করে সম্ভাষণ,
ভিক্ষার চাল বদল করে, কেন হয় হরিদাস বর্জন ?
তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া কান্তারে, রাখিয়ে দেশান্তরে,
ত্যাগ ধর্ম করিয়ে গ্রহণ ;
তুমি ঘরের কান্তা পর করিয়ে,
করতে চাও পরের কান্তার রস সাধন।

এই বলে টপ্পার জবাব দিয়ে নকুলেশ্বর ধুয়া ধরলেন—
"শুধু ভেক নিলে কি গোবিন্দ মিলে,
আগে মন বৈরাগ্য না হলে।"

১। যত আছে ভেকধারী, তারা ত্যজে ঘরবাড়ী,
দ্বারে দ্বারে পরের ঘরে, খায় ভিক্ষা করি।
তারা নিজের মাকে ত্যাজ্য করি, পরের মাকে মা বলে ॥

২। ত্যাগাশ্রমী হয় যত, বেঁচে থাকতে সতত,
গৃহাশ্রমী কাছে গিয়ে হয় অনুগত।
যদি গৃহাশ্রমী না থাকিত, সব যেত রসাতলে ॥

৩। যিনি জনক রাজর্ষি, ছিল গৃহাশ্রমবাসী,
ভোগের মাঝে থেকে হলেন, ত্যাগী সন্ন্যাসী।
শুনি মায়াত্যাগী শুকদেব আসি, চরণে শরণ নিলে ॥

৪। শুনি সাধু শাস্ত্রে কয়, যারা সাধন মার্গে রয়,
বাইরে বারো ঘরে তের, করতে পারলে হয়।
যারা কামকামনা করেছেন জয়, অটল কি কভু টলে ॥

৫। বিদুর ছিল সংসারী, ছিল তার ঘরের নারী,
যাহার খুদের অন্ন খেয়ে ধন্য হলেন শ্রীহরি।
তুমি নিজের ভার্যা পরিহরি, কি জন্য সন্ন্যাস নিলে ॥

৬। যদি সাধন করতে চাও, তবে ঘরে ফিরে যাও,
ভার্যা সঙ্গে মনোরঙ্গে নামের কীর্তন গাও।
অধম নকুল বলে জীবকে শিখাও, ভোগেও সাধন চলে ॥

এই ভাবে নকুলেশ্বর চণ্ডীদাস-রজকিনী, বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি, জয়দেব-পদ্মাবতী, সুতপা-পৃষ্ণি, ধরা-দ্রোণ প্রভৃতি সকলেই যে ভোগের মধ্যে থেকেও ত্যাগের সাধন করে গোবিন্দ কৃপা লাভ করেছিলেন সে সব প্রমাণ দিলেন। সে সঙ্গে একটু বিদ্রূপ করে শ্রীগৌরাঙ্গকে বললেন—মস্তক মুণ্ডন করে মাথায় একটা 'তরমুজের বোঁটা' রেখেছ কেন ; ওতে কি হয় ? মালা তিলকে কি হয় ? —ইত্যাদি অনেক কথা বলে নকুলেশ্বর পাঁচালী শেষ করে গেলেন।

হরি আচার্য মহাশয় ঐ মালা তিলক ও টিকির নিন্দা শুনে খুব রেগে গেলেন। কারণ তিনি ছিলেন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া উপাসক বৈষ্ণব। বৈষ্ণব নিন্দা তাঁর কাছে অপরাধ। নকুলেশ্বর যে টিকিকে তরমুজের বোঁটা বলেছেন, তার জবাবে বললেন—

ও তুই বৈরাগীরে দিলি খোঁটা,
মাথায় রয় তরমুজের বোঁটা,
তরমুজ চিনতে পার নাই ;—
তোরে তরমুজের খবর জানাই।
বরিশালের সরকার এলে,
মাথা গরম হয়ে গেলে,
মোদের তরমুজ আছে"—"
তাদেরে ভেঙ্গে খাওয়াই ॥

আচার্য কর্তার এই ফুকারটা শুনে নকুলেশ্বর খুব মর্মাহত হলেন। যাঁকে সকলে কবি-সম্রাট বলে মান্য করে, যিনি বৈষ্ণবের চূড়ামণি তার মুখে এমন অশালীন কথা উচ্চারিত হতে দেখে নকুলেশ্বর মনে খুব আঘাত পেলেন।

নকুলেশ্বর এ বৎসর তাঁর দলে থাকার কথা স্বীকার করেও পাকেচক্রে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছেন। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে নকুলেশ্বরের উপর তাঁর রাগ থাকতে পারে, কিন্তু বরিশাল জিলার সব 'সরকারই' তো তাঁর কাছে দোষী নয় ? তবে তিনি ঐ বহু বচনটি প্রয়োগ করলেন কেন ? এই ভেবে নকুলেশ্বর মনের ভয় ভক্তি দূরে ফেলে জবাব দিলেন—

মোদের বরিশালের সরকার যারা,
সকলের মাথায় চুল ভরা,
নাই মাথা গরমের ভয় ;
যত চাঁদি ছোলা সরকার রয়।
টাক পড়া লোক হলে পরে,
রোদে মাথা গরম করে,
তাদের মাথা ঠাণ্ডা করবার তরে—
ঐ তরমুজ খাওয়াতে হয় ॥

ফুকারটা গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে হাত তালি ও হাসির ফোয়ারা ফুটল। তার কারণ—হরি আচার্য মহাশয়ের মাথায় চুল ছিল না। ঘাড়ের গোড়ে সামান্য দুই চার গাঁছা চুল ছাড়া সারা মাথা জুড়ে প্রকাণ্ড টাক। কাজেই যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল পড়েছে বলেই শ্রোতাদের আনন্দের কারণ।

আচার্য মহাশয় নকুলেশ্বরের ঐ ফুকার শুনে রাগে গরগর করতে করতে রাঙ্গা যামিনীকে ডেকে বললেন—শুনলে, শুনলে তোমার পোষ্যপুত্র সরকারের উক্তি,—শুনলে তো। নির্বংশের বেটার একটু ডরভয় বলতে কিছু নেই! ও হতচ্ছাড়াকে দল থেকে বের করে দাও, নইলে তোমারও মঙ্গল হবেনা।

রাঙ্গা যামিনী বলল—ওকে আপনি অনর্থক অভিশাপ দিচ্ছেন। ও ছেলে মানুষ, ভালমন্দ বিচারের বয়স এখনো হয়নি। আপনি ওভাবে ফুকারটা না করলে তো গায় পড়ে ও কিছু করতো না। আপনি যেমন ফুকার করেছেন, জবাবটা তেমন ভাবে না দিলে শ্রোতারাই বা ছাড়বে কেন?

রাঙ্গা যামিনীর কথা শুনে আচার্য কর্তা বললেন্—বুঝেছি, বুঝেছি ঐ ছেলেটার মাথা না খেয়ে তোমরা ছাড়বে না। তোমাদের উস্কানিতেই—ওর এত সাহস বেড়েছে। আমার উপর যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ এভাবে ফুকার করতে পারে, আর কয়দিন পরে ওকি মানুষকে মানুষ জ্ঞান করবে?

রাঙ্গা যামিনীর মুখে এসব কথা শুনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নকুলেশ্বর একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি জানেন যে আত্মপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই কবির ধর্ম। এখানে আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, গুরু-শিষ্য, এমন কি পিতার সম্পর্ক বিচার করলে চলবেনা। উপযুক্ত বাদ প্রতিবাদ করতেই হবে। তাতে বিপক্ষ কবি সন্তুষ্টই হোন আর অসন্তুষ্টই হোন আসে যায়না। শ্রোতার মনতুষ্টি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

হরি আচার্যের সঙ্গে গান গাওয়া নকুলেশ্বরের জীবনে এই প্রথম আর এই

শেষ। এর পর আচার্য কর্তা যত দিন গান করেছিলেন ততদিন নকুলেশ্বরের সঙ্গে বায়না নিতেন না। তার কারণ আচার্য কর্তা ছিলেন অত্যন্ত যশপিপাসু ব্যক্তি। এত যে রাজ্য-জোড়া যশ প্রতিষ্ঠা সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তবু যেন তাঁর পিপাসা মিটেনি। বিপক্ষ দলের গানে যদি একটা বাহবা পড়ে যেত তবে আর রক্ষা নেই! নিজের দলের দোহারপত্রদের গালাগাল দিতেন। তাঁর সঙ্গে বিপক্ষে যে সরকারই জোটে থাকুক না কেন, আচার্য কর্তার মতে তার চলতে হবে; নিজের ব্যক্তিগত মত নিয়ে কিছু করলেই তার সঙ্গে জোট ভেঙ্গে দিতেন। তিনি নিজের সুনাম সুখ্যাতি বজায় রাখার পক্ষপাতী। সর্বগুণ সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিদেরও একটুখানি দোষের ছোঁয়া থাকাই বুঝি বিধাতার অভিপ্রায়।

ঝালকাঠির কবিদের মধ্যে আচার্য কর্তার কবিজীবনের শেষ প্রান্তে একমাত্র উমেশ শীলের সঙ্গেই জোটে বেশী গান হতো। কারণ, উমেশ ছিলেন আচার্য কর্তার একটা পোষা টিয়া পাখীর মতো। উনি যা বলে দিতেন তিনি তাই বলতেন। নিজের মতে কিছু করতেন না। তাই আচার্য কর্তার খুব প্রিয় ছিলেন। নকুলেশ্বরের হাবভাব দেখেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে ও তাঁর মত মতো চলবেনা। কাজেই তার সঙ্গে তিনি বায়না নিতেন না। ঢাকা ত্রিপুরার অম্বিকা পাটুনী, দেবেন্দ্র দাস, মদন শীল, পূর্ণ সূত্রধর, তারিণী সরকার, দুর্গাচরণ ধুপী প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই নকুলেশ্বরের গান চলতে লাগলো; একমাত্র আচার্য কর্তা বাদ। এটা এক দৈব দুর্ঘটনা বা নিয়তির বিধান বলেই মনে করেন নকুলেশ্বর।

ত্রিপুরা—চাঁদপুরে-ঃ নকুলেশ্বর বনাম অর্জুন দেবনাথ

এখানে এক পালা গানে নকুলেশ্বর টপ্পা করেছিলেন—

রাজা অম্বরীষের ভৃত্য আমি ধীবর সুমতি।
তুমি দুর্বাসা মহা মুনি,
লোক মুখে তোমার গুণ শুনি,
তুমি আত্মারাম ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ অতি॥
ও সেই আত্মারামের তত্ত্বটা কি—
ঠাকুর হে সত্য করে কও আমায়।
যারা ভজে আত্মা রাম, তারে প্রণাম করে দেবতায়।

তুমি দেবের পূজ্য দুর্বাসা,
আজ তোমার কি দুর্দশা,
সুদর্শন পিছে পিছে ধায়।
কেন রক্ষ মাং রক্ষ মাং বলে—
পড়েছ ক্ষত্রী অম্বরিষের পায় ?

ত্রিপুরা আন্দিকূট নিবাসী অর্জুন দেবনাথ আচার্য কর্তার অন্যতম কবি-শিষ্য। তিনি উত্তর করলেন—

কেন অম্বরিষের পায় পড়েছি আমি দুর্বাসা।
করি ব্রাহ্মণ বলে অহঙ্কার,
না করে গুণ কর্মের বিচার,
সেই দোষে হল আমার, এমন দুর্দশা॥
ভক্ত অম্বরিষকে ধ্বংস করতে
এলেম তার একাদশীর পারণায়,
ছুটে এলো সুদর্শন আমাকে বধিবার আশায়।
আমি ভক্তদ্বেষী অব্রাহ্মণ, তেত্রিশ কোটি দেবগণ
কেউ আমায় দিলনা আশ্রয়,
তাইতে কৃষ্ণাদেশে পড়লেম এসে—
ভক্তবীর রাজ. অম্বরিষের পায়।
আত্মারামের সাধনা আজ আমার—
ব্যর্থ হয়ে যায়॥

ত্রিপুরা জিলার হাজিগঞ্জে—নকুলেশ্বর বনাম চৈতন্য শীল

এই আসরে ত্রিপুরা সকদী নিবাসী চৈতন্য শীল (হরকুমার শীলের শিষ্য) নকুলেশ্বরের উপর টপ্পা চাপান দিয়েছিলেন—

আমি নদীয়ায় বসতি করি নামটি গঙ্গাদাস।
করলি আমার টোলে অধ্যয়ন,
ন্যায় দর্শন স্মৃতি ব্যাকরণ,
কেন সকল ভেবে অকারণ, নিয়েছিস সন্ন্যাস॥
ও তুই সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে—

সাত দিবস রইলি এসে শান্তিপুর,
মলিন কলির জীবেরে—দিয়েছিস হরিনাম মধুর।
কেন ভেক ভাঙ্গিয়ে নিতাই রে,
পাঠাইয়ে সংসারে, বিবাহ করালি গউর,
কর না সেই মতো সংসারে গিয়ে—
শচী মা বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ দূর॥

নকুলেশ্বর এই টপ্পা চাপানের উত্তরে বললেন—

অদ্য তুমি হও গুরু গঙ্গাদাস, আমি হই নিমাই।
করতে পিণ্ড দান পিতার নামে,
যে দিনে যাই গয়াধামে,
আমার শুভ সৌভাগ্যক্রমে, দীক্ষা মন্ত্র পাই।
গুরু ঈশ্বর পুরী মন্ত্র দিয়ে—
আমাকে বৈষ্ণব জানতে বলেছে;
তাইতো এই সন্ন্যাস মন্ত্র নিয়েছি—ভারতী কেশবের কাছে॥
এখন নিতাই'র মত ভেক ছেড়ে,
আমি গেলে সংসারে,
. সন্ন্যাসের ধর্ম কি বাঁচে।
কলির অচৈতন্য জীবের জন্য—
চৈতন্য মন্ত্র দিতে কে আছে?

শ্রীহট্ট করিমগঞ্জে—হরকুমার শীল বনাম নকুলেশ্বর।

গানের মরশুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় বাসন্তী পূজার উপলক্ষে শ্রীহট্ট জিলার করিমগঞ্জে রাঙ্গা যামিনীর দল বায়না পেল। বিপক্ষে থাকবেন ত্রিপুরার প্রাচীন ও খ্যাতনামা কবি হরকুমার শীল। এই হরকুমার সরকারের সঙ্গে নকুলেশ্বরের আর একবার দেখা হয়েছিল। আগরতলার রাজার কাছারী উদয়পুরে গান উপলক্ষে। তখন তিনি ঝালকাঠির কুঞ্জ দত্তের দলে ডাক-সরকার। তারপরে আবার এই দ্বিতীয় সাক্ষৎকার।

করিমগঞ্জ বাজারের মাঝখানে ৺বাসন্তী মাতার মন্দির। তার সামনে বিরাট প্যাণ্ডেল করা হয়েছে। প্যাণ্ডেলের পরিসর দেখে নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবছেন—এত বড় প্যাণ্ডেল করা হয়েছে কেন, এত লোকই বা কোথা হতে

আসবে ? যাত্রা গান হলে হয়তো লোক বেশী হতো। এখানে হবে কবিগান ; এতে এত লোক হবে কেন ? প্যাণ্ডেলের চতুর্দিকে চেয়ার পাতা—সাহেব সুবো অফিসারদের জন্য। মাঝখানে সাধারণ শ্রোতার স্থান। রাত দশটায় গান আরম্ভ হবে। সন্ধ্যা হতে না হতে সারি সারি লোক আসতে শুরু করল। ঠিক দশটায় হরকুমার সরকার মহাশয়ের দল আসরে গেল। নকুলেশ্বর এক পাশে দাঁড়িয়ে আসরের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কবির দলে আসা অবধি এই করিমগঞ্জের আসরের মতো এত বড় আসর আর তাঁর চোখে পড়েনি। মাঝখানে সাধারণ শ্রোতায় পূর্ণ; আর চার পাশের চেয়ারে শুধু কোট-প্যান্ট পরা সাহেবদের দল।

নকুলেশ্বর ভাবতে লাগলেন—গুরুদেব আজ কি বিপদে ফেললেন ! বাঙ্গালী শ্রোতাদের না হয় বাংলা কথায় বোঝাব ; কিন্তু ওসব সাহেব সুবোদের কি দিয়ে বোঝাব ! আমি তো ইংরেজী জানিনা, কি করি ? কায়মনোবাক্যে নকুলেশ্বর গুরু চিন্তা করতে লাগলেন। তার মনে হলো, গুরুদেব যেন হাসি মুখে বলছেন, ভয় কিরে, যা আসরে যা, আমি তো আছি।

নকুলেশ্বর গুরুর নাম নিয়ে আসরে গেলেন। মালসী, সখী-সংবাদ গান এবং জবাব হয়ে গেল। আসরের বিশিষ্ট কবি রসজ্ঞ শ্রোতাগণ হরকুমার সরকারকে বললেন—সরকার মহাশয়, আপনি প্রাচীন সরকার ; হরি আচার্য মহাশয়ের সমসাময়িক। আমরা আপনার মুখে চৈতন্যচরিতামৃতের "সনাতন শিক্ষা" সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই। আপনি গৌর-ভক্ত সনাতন হয়ে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে প্রশ্ন করুন।

শ্রোতাদের আদেশ মতো হরকুমার সরকার টপ্পা করলেন—

আমি কল্পনায় অধম সনাতন, তুমি গৌর রায়।
প্রভু আমি অস্পৃশ্য যবন, বিফলে গেল এ জীবন,
তুমি স্বগুণে পতিত পাবন, উদ্ধারো আমায়॥
আমার পঞ্চভৌতিক দেহের মাঝে—
কও প্রভু 'আমার আমার' করে কে ?
'আমার' কে আর 'আমি' কে
এই 'আমি' কোন দেশে থাকে ?
আমি কোন্ জনমের কি পাপে,
জ্বলে মরি ত্রিতাপে, কিরূপে তরি বিপাকে ?

বলো, পেছন দিকে কে আমাকে
বারংবার হাতছানি দিয়ে ডাকে ?

রূপ ও সনাতন দুই ভাই ছিল ঘোর বিষয়ী, বাদশার উজীর—এই সূত্র ধরে শুরু করে শ্রীরূপের গৌর প্রেমোন্মাদনায় সংসার ত্যাগ, সনাতনের মনে বৈরাগ্য, কাজীর কারাগারে বন্দী, কারারক্ষীকে উৎকোচ দান, গৌরাঙ্গের সঙ্গ লাভ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে হরকুমারবাবু এমন রসজ্ঞ আলোচনা করলেন যে শ্রোতারা খুব সন্তুষ্ট হলো এবং নকুলেশ্বর নিজেকে নিজে যেন হারিয়ে ফেললেন। এই পাঁচালীর পর আসরে উঠে যে কি বলবেন সে ভাবনায় তাঁর চোখে জল এলো। হঠাৎ গুরুর আদেশ মনে পড়ল—ভয় কি! যা, আমি আছি।

নকুলেশ্বরের মনের অবসাদ কেটে গেল। তিনি উঠে টপ্পার লহরের জবাব করলেন—

নাকি আমি হলেম শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি সনাতন।
এই যে, কে আমি আর আমি কার,
এ জীবের কর্তৃত্বের বিকার,
'আমি' কর্তা ভেবে তার, অবিদ্যার বন্ধন।
যারা ভৃত্য হয়ে কর্তা সাজে—
সে মজে অবিদ্যার মায়ার খেলায়।
আত্ম স্বরূপ ভুল করে—
পুড়ে মরে ত্রিতাপের জ্বালায়॥
ভবে জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস,
এ তত্ত্বে যার নাই বিশ্বাস,
মায়ার ফাঁস পড়ে তার গলায়।
দিলে গোবিন্দের পর কর্তৃত্ব ভার—
তবে তার মায়া-পিশাচী পালায়॥

নকুলেশ্বর টপ্পার জবাব দিয়ে পাঁচালীতে চৈতন্য চরিতামৃতের সেই বর্ণনা—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" বিশ্লেষণ শুরু করলেন! জীব কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণই হলেন প্রভু ; তার অনুগত হয়ে তার উপরে ভার দিয়ে কাজ করে যাওয়াই জীবের স্বরূপ বা ধর্ম। জীবদেহে কাজ করে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-শক্তি। কিন্তু ভুলবশতঃ জীবে মনে করে—কর্ম করি

আমি। সেই আমিত্বের অভিমানই জীবের বন্ধনের কারণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্ম কর্তাহমিতি মন্যতে॥

অর্থাৎ প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা সাধারণ ভাবে সকল কাজ কর্ম সম্পন্ন হয়, যে অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত, সে মনে করে কর্মের কর্তা আমি, আমিই সকল করি। এই আমিত্বটাই হলো জীবের বন্ধনের কারণ। যারা এই আমিত্বের দাস তারাই মহামায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়—

নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্য সংসারে ভুঞ্জে নরকাদি দুখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকী তাপত্রয় জারি তারে মারে॥
সংসার সাগরে তারে সতত চুবায়।
কামক্রোধের দাস হয়ে সদা লাথি খায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়॥
জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস তাহা ভুলি গেলা,
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিলা॥
সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণভক্তি হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

যেমন—গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অর্থাৎ এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার মায়া নিতান্ত দুস্তরা, যারা একমাত্র আমারই শরণাগত হয়ে ভজনা করেন তারাই কেবল এই দুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন—

কৃষ্ণ তোমার হই যদি বলে একবার।
মায়া সাগর হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥
মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি সতঃ কৃষ্ণ জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৃষ্ণ করলেন বেদ পুরাণ॥

শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ভ্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥
গুরু রূপে ঘরে ঘরে, মন্ত্র দিয়ে সদা ফিরে,
বৈষ্ণব রূপে দেন শিক্ষা।
শাস্ত্ররূপে দেয় জ্ঞান, আত্মরূপে অধিষ্ঠান,
তবে জীবের কিসের অপেক্ষা ॥

অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব কি, গুরু কি, বৈষ্ণব কি, সাধু কি, ভক্ত কি ; কার কি কি কর্তব্য, দীক্ষা শিক্ষা ধর্ম উপাসনা কাহাকে বলে ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের সমালোচনা করে নকুলেশ্বর প্রথম দিনের আসর সুনাম ও সুযশের সঙ্গে শেষ করে এলেন।

আসরের প্রায় সকল শ্রোতারই দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ঐ ছোট্ট ছেলেটার উপর। এত অল্প বয়সে এত শাস্ত্র পড়ল কবে? কিন্তু তারা জানেনা যে কবির দলে আসা অবধি নকুলেশ্বর স্থির করে নিয়েছেন যে কবিগানটাই হলো শাস্ত্রালোচনা। কাজেই যিনি যত শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন, তিনি তত বড় কবি বলে গণ্য হবেন। তাই নকুলেশ্বরের শাস্ত্র পড়া একটা নেশার মধ্যে গণ্য হয়েছিল। কিবা রাত কিবা দিন আহারান্তে বিশ্রামের সময়ও তাঁর হাতে একখানা বই না থাকলে তাঁর ঘুম হতো না। শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ নয়, যে কোন বই থেকে তিনি তার সার উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করতেন। এমন কি রামসুন্দর বসাকের "বাল্য শিক্ষা" থেকেও সেই আ-কার ই-কার শূন্য—

খরতর বরশর হতদশ বদন
খগচর নগধর ফনধর শয়ন
জগদঘ মপহর ভবভয় শমন
পরপদ লয়কর কমলজ নয়ন—স্তবকটি পর্যন্ত মুখস্থ

করে রেখেছিলেন। এক কথায় শুক্তির মধ্যে মুক্তা আহরণ করাই নকুলেশ্বরের নেশার মধ্যে গণ্য হয়েছিল।

করিমগঞ্জে—দ্বিতীয় দিনের গান—প্রথম স্বর্ণপদক

দ্বিতীয় দিনের আসর সন্ধ্যার আগে থেকেই জমতে শুরু করেছে। রাত দশটায় নকুলেশ্বর দল নিয়ে আসরে গেলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এসে ফুক-চোঙ্গায় ঘোষণা করল—আসরে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী! আমাদের এই পূজা মণ্ডপে দুই পালা কবিগানের ব্যবস্থা হয়েছিল ; আজ তার শেষ দিন।

গান শেষ হলে শ্রোতাদের মতানুসারে যিনি জয়ী সাব্যস্ত হবেন তাঁকে পূজা কমিটির পক্ষ থেকে এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হবে। আপনারা যে যে চিহ্ন দ্বারা মতামত জ্ঞাপন করবেন তা হলো—নকুলেশ্বরের লাল চিহ্ন, হরকুমার সরকার—কালো চিহ্ন। ভোটাধিক্যে যিনি জয়ী হবেন, আমাদের এস. ডি. ও. সাহেব স্বহস্তে এই স্বর্ণ পদক তাঁকে পরিয়ে দেবেন।

ঘোষণা শেষ হলো, কিন্তু নকুলেশ্বরের বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হলো। এ রকম নির্বাচনের সম্মুখীন তো আর কখনো হন নি! কি জানি কি হবে। যাহোক গান আরম্ভ হয়ে গেল, যথারীতি দুই দলের বাঁধা গান ও জবাবও শেষ হলো। এখন টপ্পার আসর—দুই সরকারের ভাগ্য পরীক্ষা। নকুলেশ্বর উঠে টপ্পা করলেন:

আমি কল্পনাতে শ্বেতকেতু বিষ্ণু-পার্শ্বচর।
তুমি কল্পনায় যমের কিঙ্কর, আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর,
কেন অজামিল ভক্তের উপর করো অত্যাচার॥
কেন চর্মডুরি নিলে করে, কও তোমার অন্তরে কি অভিলাষ,
সঙ্গেতে এক যুবতী—মূরতি দেখে লাগে ত্রাস॥
ও তার আঠার হাত ছয় চরণ, চতুর্বিংশতি লোচন,
এ নারী কোথায় করে বাস?
তুমি কার আদেশে, হেথায় এসে,
কি জন্য করে নিলে চর্ম পাশ?

পাঁচালীতে নকুলেশ্বর অজামিলের পূর্ব বৃত্তান্ত, তার ধর্মভাব, পবিত্রতা, শুচিতা, ইত্যাদি বিষয়ে বলতে লাগলেন। ভাগবতে সেই শ্লোক—

অয়ং হি শ্রুত সম্পন্নঃ শীল বৃর্তগুণালয়।
ধৃত ব্রতো মৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্ মন্ত্রবিচ্ছুচি॥
গুর্বগ্ন্যতিথি বৃদ্ধানাং শুশ্রূষুরণ স্কৃতঃ।
সর্বভূত সুহৃৎ সাধুর্মিত বাগ ন সূয়কঃ॥ অর্থাৎ—

—হে যমদূত, এই ব্রহ্মকুলোৎপন্ন অজামিল বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন মৃদু স্বভাব, সদাচারী, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ, পবিত্র, নিখিল গুণের আকর, গুরুজন, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাকারী, নিরহঙ্কার, সর্বভূতের সুহৃৎ, সাধু, মিতভাষী ও অসূয়ারহিত ছিল। মরণকালে মুখে নারায়ণ নাম বলেছে। চর্মডুরি নিয়ে তোমরা তার শিয়রে কেন এলে? তোমার সঙ্গে ও কন্যাটি কে, কি করে, আঠার

খানা হাত কেন, চব্বিশ চক্ষু কেন, ছ'খানা চরণ কেন, ওর কি নাম, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?—ইত্যাদি প্রশ্ন করে নকুলেশ্বর চলে গেলেন।

হরকুমার সরকার আসরে এসে জবাব দিলেন—

বললে, অজামিলের মরণ কালে এলেম কি কারণ ?
যিনি কৃতকে করে অন্ত, নাম ধরেন স্বয়ং কৃতান্ত,
অদ্য অজামিলের প্রাণান্ত করে দরশন ॥
মৃত অজামিলের আত্মা নিতে,
যমরাজা মোদের প্রতি দিল ভার :
তাইতে নিয়ে চর্ম পাশ, শিয়রে দাঁড়ায়েছি তার।
ভবে মর জীব যখন মরে, যেতে হয় যমের ঘরে,
যম করে পাপপুণ্যের বিচার।
শেষে কর্মানুযায়ী জন্ম নিয়ে—
সংসারে আসিতে হয় পুনর্বার ॥

পাঁচালীতে বললেন—আমি যম কিঙ্কর, মহাপাপী অজামিলের মরণকালে তার আত্মা বেঁধে নিতে যমের আদেশে চর্মপাশ নিয়ে এসেছি। মৃত ব্যক্তির আত্মা নিয়ে পাপপুণ্যের বিচার করাই যমরাজার কাজ। আমার সঙ্গের কন্যাটির নাম মৃত্যুকন্যা, আঠার হাতে জীবের আঠার মোকাম বন্ধ করে, ছয় চরণে ষড় রিপুর ক্রিয়া নষ্ট করে, আর চব্বিশ চোখে জীবদেহের চব্বিশ চন্দ্র হরণ করে .. ইত্যাদি অনেক কথা বলার পর অজামিল যে মহাপাপী, মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত, চৌর্যবৃত্তি সম্পন্ন অনাচারী এই সব প্রমাণ করে হরকুমারবাবু পাঁচালী শেষ করলেন।

নকুলেশ্বর পুনরায় আসরে গিয়ে—সেই টপ্পার জবাবে বললেন—

বললে, অজামিলের আত্মা নিতে ধরলে বিকট-রূপ।
দেহে মরে কি আর বাঁচে কি,
মরণের বস্তু আছে কি,
আমার কাছে কও দেখি, জীবাত্মার স্বরূপ ॥
জীবের আত্মা হলো অজ নিত্য,
সংসারে জন্ম মরণ হয় না যার—
আত্মা বায়ু মূর্তিহীন, কোন দিন শান্তি হয়না তার।
জীবের পঞ্চ আত্মা পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চত্বে হয় অবসান,
জীবদেহে কিছু রয়না আর।

তবে কারে নিয়ে যমপুরীতে—

কও তোমরা পাপপুণ্যের কর বিচার ॥

পাঁচালীতে জীব কি, জীবের স্বরূপ কি, আত্মা তো বায়ু মাত্র—তার বন্ধন কর কি? গীতায় ভগবান বলেছেন—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা"। পঞ্চ আত্মার স্বরূপ—'স্থূল সূক্ষ্ম বদ্ধ মুক্ত তটস্থ' কাহাকে বলে; জীবের আঠার মোকামে আঠার দেবতা—মৃত্যুতে তারা কোথায় যায়—এইসব বিষয়ে আলোচনা করতে করতে নকুলেশ্বর দেহতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, ষটচক্র ইত্যাদি বিশদ ব্যাখ্যা করেন। পরে কীর্তন সুরে ধুয়া দিয়ে নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করার ছলে অজামিলের মরণকালে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ, 'হারাম' বলে যবন মুক্তি, অম্বরিষের ছেলের দশ বছর আয়ুর পরিবর্তে 'নামের' গুণে দশ হাজার বছর আয়ু লাভ—এই সব কাহিনী এমন সুললিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, ভক্ত শ্রোতারা আনন্দে হরিধ্বনি দিলেন।

সাহেবদের দিকে চেয়ে কথা বলার সময় নকুলেশ্বর লক্ষ্য করলেন যে এস. ডি. ও. সাহেব কথায় কথায় হাততালি দিচ্ছেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন—উনি সাহেব মানুষ, এসব তত্ত্ব কথায় কি বুঝে হাততালি দিচ্ছেন? পরে জানতে পারলেন তিনি ইংরেজ সাহেব নন, গুজরাটী। ভালো বাংলা জানেন।

নকুলেশ্বরের আসর শেষ হয়ে গেল। হরকুমার সরকার নকুলেশ্বরের ঐসব ষটচক্র, আত্মাতত্ত্ব, আত্মার স্বরূপ, জন্মান্তর ইত্যাদি তত্ত্বের জবাবে শ্রোতাদের তেমন সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। এখন দুই 'সরকার' একত্র হয়ে জুড়ির পাল্লা অর্থাৎ মুখে মুখে বোল কাটাকাটি করতে হবে। এমন সময় পূর্বোক্ত ঘোষক এসে বললেন—সভার সব ভক্ত শ্রোতৃমণ্ডলী! দুই কবির গান আপনারা শুনলেন। এখন জয় পরাজয় নির্ণয়ের ভার আপনাদের উপর। আপনারা কাগজে লাল বা কালো দাগ দিয়ে আপনাদের মতামত জ্ঞাপন করুন এবং কাগজগুলি এস. ডি. ও. সাহেবের হাতে জমা দিন।

এস. ডি. ও. সাহেব নিজের মাথার টুপিটি খুলে চিৎ করে হাতে নিয়ে বসলেন। শ্রোতাদের মতামত জ্ঞাপক কাগজ ঐ টুপীতে জমা হতে লাগল। জমা শেষ হলে সাহেব চিহ্ন অনুসারে বাছাই করে দেখলেন সামান্য ক'খানা ছাড়া সব কাগজেই লাল দাগ, অর্থাৎ নকুলেশ্বরের প্রতীক চিহ্ন। তখন এস. ডি. ও. সাহেব বিশুদ্ধ বাংলায় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন—ভদ্রমণ্ডলী!

আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে আপনাদের ভোটের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ভোট গণনা করে দেখা গেল সামান্য দু'চারখানা বাদে সব কাগজেই লাল চিহ্ন দেওয়া। অতএব আপনাদের ভোটের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ভোটটিও ঐ লালচিহ্নে দিয়ে আমি নকুলেশ্বর সরকারকেই অদ্যকার আসরে শ্রেষ্ঠ কবি বলে ঘোষণা করছি।

এই বলে নকুলেশ্বরকে কাছে ডাকলেন। তিনি যাওয়ামাত্র সাহেব উঠে স্বর্ণপদকখানি তার গলায় পরিয়ে দিয়ে নিজে যেই হাততালি দিলেন অমনি চতুর্দিক হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। নকুলেশ্বর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু বলবেন? কিন্তু ভাষার অনর্গল প্রবাহ যাঁর জিহ্বাগ্রে সেই নকুলেশ্বর যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। দু'তিনবার জিজ্ঞাসার পর নকুলেশ্বর বললেন—আমি আর কি বলবো; তবে দশ জায়গায় পরিচিত হতে পারি এমন কিছু প্রার্থনা করি।

সাহেব বললেন—আগামী দিন সকালে আপনি আমার বাংলোয় যাবেন। এই বলে তিনি উঠলেন; আসর ভেঙ্গে গেল। নকুলেশ্বরের কবিজীবনের প্রথম পাদে এই একটি স্মরণীয় ঘটনা।

করিমগঞ্জে এস. ডি. ও. সাক্ষাতে

পরের দিন সকালে নকুলেশ্বর স্থানীয় দু'চারজন ভদ্রলোককে বললেন—আমি এস. ডি. ও. সাহেবের বাংলোয় যাবো; কিন্তু আমি তো পথ চিনিনা। তারা বললেন—তাঁর বাংলোয় যেতে হলে আগে দরখাস্ত করা লাগে।

নকুলেশ্বর বললেন—আমার দরখাস্ত লাগবে না। সাহেব নিজ মুখে যেতে বলে গেছেন। তার চেয়ে দরখাস্তটা কি বেশী হলো? এই বলে বায়নাদার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাংলোর উদ্দেশ্যে চললেন।

বাংলোটি ছিল একটি টিলা পাহাড়ের উপর। নকুলেশ্বর ঐ টিলার গোড়ায় যেতেই উপর থেকে সাহেব তাকে দেখে আর্দালী পাঠিয়ে দিলেন উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাংলোয় পৌছানো মাত্র সাহেব সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন। বেয়ারা সিগারেট ও মৌরী এনে টেবিলে রেখে গেল। নকুলেশ্বর বললেন—আমি সিগারেট খাই না। এস. ডি. ও. সাহেব চা এবং মিষ্টি আনালেন। এবার আর নকুলেশ্বর না করতে পারলেন না। চা-মিষ্টি খাওয়ার

পর সাহেব কাগজ কলম নিয়ে বসে নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি লিখবো—বাবু নকুলেশ্বর লিখবো ত ?

নকুলেশ্বর—না, না, বাবু লিখবেন না।

সাহেব—কেন ?

নকুলেশ্বর—আমি সামান্য কবিয়াল। আমাকে বাবু টাইটেল দেওয়া উপহাসের মতো মনে হবে না কি ?

সাহেব—আপনি কি বলছেন! কবিয়ালরা সামান্য! চন্দ্রসূর্যের রশ্মি যেখানে প্রবেশ করতে পারে না, কবির কল্পনাশক্তি সেখানে প্রবেশ করে। বিশেষতঃ আপনাদের তো তুলনাই হয়না। প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে অনেক অনেক দার্শনিক কবি-শ্রেষ্ঠ আছেন বটে; সেক্সপীয়র, মিলটন, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি, কিন্তু তারা লেখা-কবি, কালীকলম ধরে চিন্তা-ভাবনা করে গান. কবিতা, নভেল, নাটক লেখেন—ভুল ত্রুটি হলে কেটে ছেঁটে শুদ্ধ মার্জিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন; কিন্তু আপনাদের তো ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ নেই। আসরে উঠে তিন চার ঘণ্টা যাবত অনর্গল মুখে যা বলেন তাই মিল, তাই কবিতা, তাই গান। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি ঐ সব বড় বড় লেখ্য কবিরাও আপনাদের এই উপস্থিত রচনার কাছে হার মানতে বাধ্য। আমি জীবনে আর কখনো কবিগান শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য অনেক কবির কবিতা পড়েছি গান শুনেছি; কিন্তু আপনাদের উপস্থিত রচনাবলী শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, সে ভাষা আমার নেই। আপনি এই কবিদের সামান্য কবিয়াল বলছেন!

এই সব কথার পর সাহেব তার রাইটিং প্যাড্ বের করে আপন মনে লিখতে লাগলেন। তিন পৃষ্ঠা লিখে নকুলেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন—আপনি যা শোনালেন, যা দিলেন তার মূল্য দেওয়ার মতো আমার আর কিছু নেই—এই সামান্য সার্টিফিকেটখানা দিলাম. অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।

নকুলেশ্বর সাগ্রহে কাগজখানা নিয়ে নমস্কার করে বললেন—এই আমার অমূল্য সম্পদ।

সাহেব বললেন—আর একটা অনুরোধ করবো, রক্ষা করবেন কি ?

নকুলেশ্বর—অনুরোধ বলছেন কেন ? আদেশ করুন, কি করবো ?

সাহেব—গতকল্য আপনি আসরে দেহতত্ত্ব বর্ণনার সময় যে ষটচক্র সম্বন্ধে

আলোচনাটা সঙ্গীতাকারে পরিবেশন করেছিলেন, সেটা যদি এখন স্মরণ থাকে তবে দয়া করে আমাকে লিখে দিন। ওটার ভিতরে আপনার নাম আছে। আমি এ বিষয়গুলি আমার ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি। তিনি ছিলেন ন্যাসী যোগী। আর আপনার মুখে সেই জিনিষই সঙ্গীতাকারে শুনলাম। আমি আপনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যত্ন করে এটা রেখে দেবো। লিখে দিন।

সাহেব কাগজকলম এগিয়ে দিলেন। নকুলেশ্বর লিখতে লাগলেন—

(১) দেহের মাঝে আছে নিত্য বৃন্দাবন।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে রত্ন বেদী সিংহাসন ॥
চতুর্দলে মূলাধারে
কুণ্ডলিনী সর্পাকারে
বন্দী ক'রে জীবাত্মারে—
সুধাপানে অচেতন ॥
গুরুমন্ত্র প্রণব বীজে
কুণ্ডলিনী জাগবে নিজে
ষড় পদ্ম সরসীজে
ক্রমে করবে আরোহন ॥
সাধিষ্ঠানে লিঙ্গ দ্বারে
চন্দ্র সাধে চন্দ্র চূড়ে
নাভিপদ্ম মণিপুরে—
রাধাকুণ্ড সুশোভন ॥
হৃদিপদ্ম অনাহতে
শ্যামকুণ্ড পাবি দেখিতে
কণ্ঠপদ্ম বিশুদ্ধাতে—
অপ্রাকৃত দোল ঝুলন ॥
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না
গঙ্গা সরস্বতী যমুনা
এই তিনটি নদীর নমুনা—
বহিতেছে অনুক্ষণ।
সেই যমুনা নদীর তটে
আত্মশুদ্ধি স্নানের ঘাটে

নিত্য চিত্ত বংশী বটে—
বাঁশী বাজায় মনোমোহন ॥
তারুণ্যকারুণ্যামৃত
আরও সেই লাবন্যামৃত
তিন ধারাতে অবিরত—
সুধা হতেছে ক্ষরণ ॥
ললাটে দ্বিদল মূলে
তিনটি ধারা এসে মিলে
ত্রিবেণী সঙ্গম স্থলে—
করবে অবগাহন ॥
ত্রিবেণীর পরপারে
দ্বাদশদল পদ্ম বিহরে
সহস্রদল তার উপরে—
ছত্রাকারে আচ্ছাদন ॥
সেই পদ্মের কর্ণিকা পাশে
হংস পীঠাসনে বসে
নকুল বলে সিদ্ধির দেশে—
রাই শ্যামের যুগল মিলন ॥

তারপর তিনি—

আধারং গুহ্যচক্রান্ত সাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকং
মণিপুরং নাভিচক্রং হৃদয়স্ত অনাহতম্ ॥
বিশুদ্ধ কণ্ঠ চক্রান্ত মূর্ধঞ্চ সহস্রদলং
চক্রভেদং ময়াখ্যাতং চক্রাতীতং নমোনমঃ ॥

এই শ্লোকটির সঙ্গীতাকার দিলেন—

(২) যদি পাবিরে সে ধনে অসাধ্য সাধনে,
ষড় পদ্মবনে করো বিচরণ।
দেহ সরোবরে এ পদ্ম বিহরে
সাধক ভ্রমরে করে অন্বেষণ ॥
গুরু মন্ত্র নিয়ে মূলাধারে চলো
'ব' আদি 'স' অন্ত শোভে চারিদল,

স্বর্ণ জিনিয়ে সে বর্ণ উজ্জ্বল—
চতুর্দল মাঝে খেলে পদ্মাসন ॥
সাধিষ্ঠান পদ্মে 'ব' আদি 'ল' অন্ত,
অতীব সুচারু ষড় দলবন্ত,
শ্যামল সুন্দর অতি রূপবন্ত—
হের লক্ষ্মীকান্ত অনন্ত শয়ন ॥
মণিপুর পদ্ম আছে নাভিমূলে,
'ঋ' আদি 'অঃ' অন্ত দশ দলে খেলে,
কুণ্ডলিনী সহ স্বয়ং শম্ভু মিলে—
দশদলে আছে দেব ত্রিলোচন ॥
হৃদে অনাহত পদ্মের বসতি,
'ক' আদি 'ঠ' অন্ত নিয়ে দ্বাদশ বৃত্তি,
দ্বাদশ দলে শোভে বলরাম মূরতি—
সে রূপের জ্যোতি ভুবনমোহন ॥
বিশুদ্ধাক্ষ পদ্ম কণ্ঠে অবস্থিত,
ষোড়শ প্রকার স্বর বিরাজিত,
'হ' আদি 'ক্ষ' অন্ত দুটি বর্ণযুত—
ললাটে দ্বিদল কর দরশন ॥
তালু মূলে সহস্রারে কর তত্ত্ব,
সহস্র আদিত্য জিনি অজ নিত্য,
গুণময় সত্ত্ব পুরুষ নির্লিপ্ত—
এ নকুলের চিত্ত হয় যেন মগন ॥

এবং তৃতীয় গানটি রচনা করলেন—

(৩) ভক্তি সাধন রেলের গাড়ী,
বেপার কিবা পরিপাটি।
মূল হতে তার লাইন খুলেছে—
ছয় স্টেশন ঘাঁটি ঘাঁটি ॥
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে
কুণ্ডলিনী বদন তুলে

ছয় ঠিকানায় গাড়ী চলে—
ইন্দ্র চন্দ্র সারেং জুটি ॥
যোগীর শুভ যোগ ঘটেছে
সুষুম্নাতে রেল বসেছে
তার দু'পাশে তার চলেছে—
ঈড়া পিঙ্গলা এই দুটি ॥
কৃপা বাষ্প দিয়ে ছাড়ি
শ্রীগুরুর চালানো গাড়ী
হংস হংস রব করি—
চলে গাড়ী ছুটোছুটি ॥
শান্তি নিকেতনে যেতে
জীবাত্মা চড়েন তাতে
চলে যায় সে আনন্দেতে—
ত্যজে ভবের খুঁটিনাটি ॥
ধর্ম কর্ম জপ ব্রত
পথের সঙ্গী যত শত
হয়ে জীবের অনুগত –
চলে যে যার আপন বাটী ॥
দীক্ষা সম্বল নিয়ে সাথে
নিবৃত্তি রূপ টিকেট হাতে
নকুল বলে হবে যেতে—
বেল পড়েছে বাঁধ গাট্টি ॥

গান তিনখানা লিখে সাহেবের হাতে দিয়ে নকুলেশ্বর বললেন—স্যার, একটা কথা বলবো!

সাহেব—একটা কেন, দশটা বলুন। সঙ্কোচ কেন?

নকুলেশ্বর--গতকাল গানের আসরে যখন এইসব আলোচনা করি তখন দেখলাম আপনি কথায় কথায় হাতে তালি দিচ্ছেন, আমি ভাবলাম—আমাদের এই বাংলা-ভাষায় শাস্ত্রীয় আলোচনা শুনে সাহেবমানুষ কি বুঝে হাততালি দিচ্ছেন। এখন আবার বললেন, আপনার ঠাকুরদাদা ছিলেন ন্যাসী যোগী। তবে তিনি কি সাহেব ছিলেন না!

সাহেব—হ্যাঁ, তিনিও সাহেব ছিলেন বটে ; ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তবে ইংরেজ সাহেব নয়। আমরা গুজরাটী, আমার নাম এইচ. এম. মেড্ডা। এখানে চাকুরীতে এসে বাঙ্গালী চাপরাসীর কাছে আমি ভাল বাংলা শিখেছি।

সাহেবের এইসব আন্তরিক কথাবার্তায় নকুলেশ্বর ভাবলেন, একটা চৌকিদারের দেমাকে গ্রামে টেকা যায় না। আর এ ব্যক্তি এতবড় একজন অফিসার হয়েও এত আন্তরিকতা, এত নম্রতা! এই জন্যই লোকে বলে—

"বৃক্ষ হলে ফলবান নত শিরে রয়।"

নকুলেশ্বর সাহেবকে নমস্কার করে বিদায় নিলেন। শুনেছি পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

নৌকায় এলে রাঙ্গা যামিনী বলল—বাসন্তী পূজার পরে আর এদিকে গানের বায়না থাকে না। কাজেই এবার ঝালকাঠি ফেরা যাক।'

দল নিয়ে ঝালকাঠি এসে রাঙ্গা যামিনী দল বন্ধ করে দোহার পত্রের হিসাব মিটিয়ে দিলে সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে গেল। যামিনী নকুলেশ্বরকে বলল—বাবা, তুমি আমার নূতন দল যে ভাবে চালিয়ে এনেছ, আশীর্বাদ করি তুমি কবিসম্রাট হও। আগামী সনেও কিন্তু আমার দলে তোমাকে থাকতে হবে।

নকুলেশ্বর বললেন—গুরুদেবের যা ইচ্ছা তাই হবে।

নকুলেশ্বরের নিজের দল গঠন

রাঙ্গা যামিনীর দলের ম্যানেজার হরিচরণ নট্ট নকুলেশ্বরকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বলল—আমি বলি কি এখন আর পরের দলে না গিয়ে আপনার নিজের দল করাই সঙ্গত।

নকুলেশ্বর—ম্যানেজারবাবু, অমৃতে কি কারো অরুচি হয়? নিজে দল করতে আমার ইচ্ছা করে; কিন্তু আমার সে শক্তি সামর্থ কোথায়? আপনি তো জানেন নিজস্ব দল তৈরী করতে হলে অন্ততঃ তিন চার হাজার টাকার দরকার। মেয়েদের নাচের পোষাক, রান্নার বাসনপত্র, প্রত্যেক দোহারের তিন চার মাসের মাহিনা অগ্রিম দিয়ে দলিল রেজিষ্ট্রি করা, নৌকা ভাড়া ইত্যাদি নানা খাতে বহু টাকার দরকার। আমার কি আছে! শুধু হাতে কি বাঘ তাড়ানো যায়?

হরিচরণ—আপনি টাকার জন্য ভাবছেন কেন? ঝালকাঠির কাপুড়িয়া পট্টিতে অভয় সাহা নামে একজন মহাজন আছে। সে সব কবির দলকেই টাকা কর্জ দেয়; অবশ্য সুদটা একটু বেশী। মাসিক শতকরা ছয় টাকা। তবে টাকাটা তো বেশী দিন খাটবেনা। দুর্গাপূজা থেকে কালীপূজা পর্যন্ত। এর মধ্যে যা আয় হবে তাতে দেনা শোধ হয়ে যাবে। যদি মত হয় তবে চলুন। সেই মহাজনের কাছে নিয়ে আমি টাকার ব্যবস্থা করে দেব।

হরিচরণ নট্টের কথা শুনে নকুলেশ্বরের প্রাণে আশার সঞ্চার হলো। তিনি বললেন—যদি দল গড়া হয়, তবে পরিচালন ভার কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে।

হরিচরণ—সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না। সব ভার আমি বহন করবো।

পরদিন নকুলেশ্বরকে নিয়ে হরিচরণ নট্ট অভয় সাহার গদীতে গিয়ে নকুলেশ্বরের নূতন দল করার প্রস্তাব জানিয়ে টাকা কর্জের কথা পাড়ল। অভয় সাহা নকুলেশ্বরের যশ প্রতিষ্ঠার কথা লোক মুখে শুনে থাকবে। এখন সাক্ষাতে বিস্তারিত জেনে শুনে টাকা দিতে কোন ওজর-আপত্তি করল না। অভয় সাহা বলল—দল যদি করতে হয় ভাল ভাবে করবেন। টাকার চিন্তা করবেন না। যত টাকা লাগে আমি দেবো।

নকুলেশ্বরের অনেক দিনের আশার স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে দেখে তার আনন্দের সীমা রইল না। অভয় সাহার সঙ্গে পাকাপাকি কথা স্থির করে নকুলেশ্বর হরিচরণ নট্টকে বললেন—নাইন মহাশয়! আপনার উপরেই কিন্তু দলের সম্পূর্ণ ভার; আমি উপলক্ষ মাত্র।

ঝালকাঠির পাশের গ্রাম বাসণ্ডায় হরিচরণের বাড়ী। সে বলল—আমি তো সর্বদাই ঝালকাঠি যাতায়াত করি, দেখে শুনে দোহারপত্র ঠিক করবো। আমাদের দল সব দলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে; আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী চলে যান। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন নূতন দলের পত্তন হবে। গায়ক-গায়িকা বাজনদারদের দাদন দিতে হবে। ছয় সাত দিন আগেই আপনি ঝালকাঠি চলে আসবেন।

নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গিয়ে নকুলেশ্বর মাতা ঠাকুরাণীর কাছে নিজে দল করার সঙ্কল্প জানালেন। মা বললেন—তুমি ছেলেমানুষ; নূতন দল করে কি তুমি দলের ঝামেলা সইতে পারবে? আর এত টাকা পয়সাই বা কোথায় পাবে?

নকুলেশ্বর হরিচরণ নট্ট এবং অভয় সাহার সঙ্গে আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ মাকে জানালেন এবং বললেন—অভয় সাহা যখন অভয় দিয়েছে তখন আর টাকার জন্য চিন্তা! মা, তুমি আশীর্বাদ কর এই দল যেন আমার জীবন মরণের সম্বল হয়।

মা—তোমার বাসনা পূর্ণ হোক, তবে মনে রাখবে তুমি দশ জন নিয়ে একজন হতে চলেছ; দশজন দোহারপত্রের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবে। নিজে তুমি যতই বড় হও, দলের দোহারপত্র ছাড়া তুমি কিছু করতে পার না। অস্ত্রই হলো সেনাপতির শক্তি সামর্থ সহায় ও সম্বল। দলের প্রত্যেকটি লোকই তোমার এক একখানা অস্ত্র।

১৩২৩ সাল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কেটে গেল। আষাঢ়ের প্রথম ভাগে নকুলেশ্বর পিতামাতার পদধূলি ও আশীর্বাদ পাথেয় করে শুভদিনে ঝালকাঠি এলেন দলের পত্তন করতে। এদিকে হরিচরণ নট্ট শেখ সরলা, কালা সুখদা ও মানদা নামে তিনটি সুন্দরী তরুণী গায়িকাকে দলে নেওয়া ঠিক করে রেখেছে। নকুলেশ্বর এসে শেখ সরলার বাড়ী উঠলেন। হরিচরণ এসে দল গড়া সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থা করেছে তা নকুলেশ্বরকে জানাল।

রথযাত্রার দিন যাত্রা কবি জারী রয়ানী কীর্তন ইত্যাদি যত রকম গানের দল আছে সব দলেরই নূতন খাতা মহরৎ অর্থাৎ হাল-কাগজ। বন্দরময় ধূমধাম। গান বাজনা আনন্দ উৎসবে চারদিক মুখরিত। এসব আনন্দ উৎসবের মধ্যে অন্যান্য দলের সঙ্গে নকুলেশ্বর নূতন দলের শুভ সূচনা করলেন। দল গঠন করে গুরুদেব কুঞ্জবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা! আমার তো চুক্তিপত্র ছাপাতে হবে; দলের কি নাম দেব?

কুঞ্জবাবু বললেন—তুই যখন নিজে দল করেছিস আমি এখন দল ভেঙ্গে দেব। নিজস্ব দল পরিচালনার এত ঝামেলা আর বইতে পারিনা। আমি 'সরকার' হিসাবে রাঙ্গা যামিনীর দলে যোগ দেব, মাসে তিন চার শত টাকা মাহিনা ও আদর যত্ন পাবো। সেই আমার পক্ষে এখন ভাল। তুই এক কাজ কর—আমার দলের এই নামটা বজায় রাখবার জন্য তোর দলের নাম দে ঐ 'বীণাপাণি কবি পার্টি।' যতদিন তোর দল থাকবে, ততদিন আমি ঐ নামের মধ্যে বেঁচে থাকবো।

নকুলেশ্বর তদনুসারে দলের নাম 'বীণাপাণি কবি পার্টি' দিয়ে গুরু-বাক্য রক্ষা করলেন। শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস বাড়ীতে বসে নকুলেশ্বর গত বছর যে সব আসরে গান করে এসেছেন, সেই সব অনুষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের পত্র দিয়ে তাঁর নূতন দল গঠনের কথা জানালেন এবং বায়নার জন্য প্রার্থনা করলেন। সকল জায়গা থেকেই তিনি পত্রোত্তরে সানন্দে সম্মতি পেলেন। পত্রযোগে বায়না স্থির হয়ে গেল। বাড়ি বসেই বিশ পঁচিশ পালা বায়না পেলেন। দুর্গাপূজায় গানের বায়না হলো ঢাকা মুন্সীগঞ্জ সাব-ডিভিসনে নগর কসবা কুরী বাড়ী। হরিচরণ নট্ট দলের দোহারপত্র সবাইকে ঢাকা যাত্রার তারিখ জানিয়ে দিলেন।

দুর্গাপূজার সাত আটদিন আগে ঝালকাঠির অন্যান্য দলের সঙ্গে রওনা দিতে হবে। একটা ঢাকাইয়া বড় ঘাসী নৌকা (গহনার নৌকা মতো) মাঝি মাল্লা সহ ভাড়া করা হলো। নির্দিষ্ট দিনে ঝালকাঠি কালী বাড়ী মহল্লা দিয়ে সব দল একত্রে ঢাকা অভিমুখে রওনা হলো।

কবির দলের ঘাট বদল

দুর্গা ষষ্ঠীর চারদিন থাকতে সব কবির দল ঢাকা পৌছে বুড়ী গঙ্গা নদীর পাড়ে সোয়ারী ঘাটে গিয়ে নৌকা নোঙ্গর করল। এটাই হলো কবির দলের প্রাচীন ঘাট। শুধু ঝালকাঠির কবির দলই নয়, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, নাটোর ইত্যাদি বহুস্থানের অন্তত শতাবধি গানের দল ঐ ঘাটে জমায়েত হয়ে বায়না ধরে।

এ বছর নকুলেশ্বর ও-ঘাটে প্রথম গিয়েছেন। ঘাটের নিয়ম কিছু জানেন না। সেখানে গিয়ে শুনলেন ঘাট মাঝিকে দিতে হবে বায়নার টাকার শতকরা সোয়া ছয় টাকা। আরো শুনলেন যে প্রত্যেক দলকে ঘাট মাঝির গদীঘরের সামনে এক খানা করে গান শোনাতে হবে। নকুলেশ্বরের বায়না বাড়ীতে

বসেই হয়ে গেছে। ঢাকা গিয়েছেন শুধু ঢাকেশ্বরীর বাড়ী পূজা দেওয়ার জন্য। তিনি ঘাটের এসব নিয়মকানুনের বিরোধিতা করতে মনস্থ করলেন। গুরু কুঞ্জ দত্তের নৌকায় গিয়ে বললেন—বাবা! শুনলাম ঘাটমাঝিকে নাকি বায়নার টাকার শতকরা সোয়া ছয় টাকা দিতে হয় ঘাট-খাজনা হিসাবে; তার উপর, তার গদীর সামনে নাকি সব দলকে একখানা করে গান শোনাতে হবে?

কুঞ্জবাবু—হ্যাঁ, প্রাচীন কবিয়ালদের আমল থেকেই এ ঘাটে এই নিয়মই চলে আসছে।

নকুলেশ্বর—খাজনা দিয়ে ঘাটে থেকে আবার তার গদীর সামনে গান শোনাতে হবে কেন? ওটা তো ঢাকেশ্বরী কালীও নয়, কোন দেবালয়ও নয়। ওখানে গান শোনাব কেন? আমি ও প্রস্তাবে রাজী নই। ঘাট মাঝির সঙ্গে খাজনার সম্বন্ধ, সে ঘাট খাজনা নেবে। তার হুকুম মাথা নত করে মানা আমি সমর্থন করতে পারি না।

কুঞ্জবাবু—তুমি ছেলেমানুষ; এ ঔদ্ধত্য তোমার সাজে না। ওর কথা না শুনলে ও যদি এ ঘাটে থাকতে না দেয়, তবে সর্বনাশ হবে। সারা দেশের বায়নাদার জানে ঢাকা সোয়ারী ঘাটেই কবির আড়ং মিলে। ওখানে গেলেই দল বায়না করা যায়। তাই সকলে ছুটে আসে এই ঘাটে। এ ঘাট ছেড়ে দিলে কি আর উপায় আছে?

নকুলেশ্বর—আমরা সব দল যে ঘাটে থাকব, সেখানেই কবির আড়ং মিলবে। অন্য ঘাট ঠিক করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং কয়েক হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে দলের দোহারদের দিয়ে শহরময় বিলি করে দিলেই তো প্রচার হয়ে যাবে। এ কাজ সামান্য কয়টা টাকায় করা যায়। তা না করে আমরা মান খুইয়ে ঘাটমাঝির অধীনতা স্বীকার করে মাথা বিক্রি করব কেন? আপনি সব দলের কাছে এ কথা বুঝিয়ে বলুন। আমি একটু ঘুরে আসি।

এই বলে নকুলেশ্বর ঢাকা সদর ঘাটে চলে গেলেন। সে ঘাটের ঘাটমাঝির সঙ্গে দেখা করে বললেন—আপনি যদি আপনার ঘাটে গানের নৌকার থাকার ব্যবস্থা করে দেন, তবে আমরা শতাবধি কবিগানের নৌকা নিয়ে এসে আপনার ঘাটে আড়ং মিলাতে পারি।

সদর ঘাটের মাঝিটি ছিল খুব সৎচরিত্র ও আনন্দপ্রিয়। সে বলল—সে তো খুব আনন্দের কথা। চার পাঁচদিন বিরাট মেলার মতো বসবে আমার ঘাটে।

নৌকায় নৌকায় গান বাজনায় ঘাট আনন্দমুখর থাকবে—এ সৌভাগ্য কে না চায়? কিন্তু সোয়ারী ঘাটের ঘাটমাঝি আপনাদের ছাড়বে কেন? এত দিনের প্রাচীন ঘাট!

নকুলেশ্বর—এখন আর প্রাচীন কুসংস্কার ভাল লাগে না। দেশে দেশে দেখুন না কেমন নূতনের হাওয়া বইছে। তাই আমরাও পুরান ঘাট ছেড়ে নূতন ঘাটের সন্ধানে আপনার কাছে এসেছি।

ঘাটমাঝি—আমি সানন্দে প্রস্তুত। আপনারা এই মুহূর্তে চলে আসুন; আমি ব্যবস্থা করে দেবো।

নকুলেশ্বর- তা আপনাকে দক্ষিণা কত দিতে হবে?

ঘাটমাঝি—কিছু না, কিছু না; আমার কোন দাবী নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি আনন্দের ভিখারী, আনন্দই আমার কাম্য।

নকুলেশ্বর ঘাটমাঝির সঙ্গে কথা বলে হ্যাণ্ডবিল ছাপানোর জন্য ছাপাখানায় অর্ডার দিয়ে এলেন—

স্থান পরিবর্তন—ঘাট বদল

ভদ্র মহোদয় এবং কবি-রসপিপাসু সুধী বন্ধুগণ!

আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, বহুদিন পর্যন্ত ঢাকা সোয়ারী ঘাটে কবির দলের আড়ং বসিত। বর্তমানে সে ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভদ্রলোকের চলাফেরা, কবিগানের নৌকায় ওঠানামার খুব অসুবিধা। তার উপর ঘাটমাঝির অভদ্র আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া সোয়ারী ঘাটের সেই নোংরা আড়ং ভেঙ্গে দিয়ে সব কবির দল একজুতি হইয়া ঢাকা সদর ঘাটে নূতন আড়ং পত্তন করিলাম। এই ঘাটে আসিয়া আপনাদের মনোমত যে কোন কবির দলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

—নিবেদক

বাংলা দেশের কবিমণ্ডলী

হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে এনে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করে সদর ঘাটের মাঝির সদয় ব্যবহার ও স্বতঃস্ফূর্ত আদর সম্ভাষণের কথা জানিয়ে বললেন—আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব নয়। মাঝি আমাদের জন্য ঘাট পরিষ্কার করে রেখেছে, 'জয় গুরু, মা ঢাকেশ্বরী' বলে আসুন একত্রে সবাই নোঙর তুলে রওনা হই।

কুঞ্জবাবু আগেই সকলের কাছে নকুলেশ্বরের বক্তব্য বলে রেখেছিলেন। এখন খবর দেওয়া মাত্র একযোগে সব নৌকার নোঙ্গর তুলে জয় মা ঢাকেশ্বরী বলে সোয়ারী ঘাট ছেড়ে সদর ঘাটের উদ্দেশ্যে নৌকা খুলে দিল। সদর ঘাটে যাওয়ামাত্র মাঝি সব নৌকা সুবিধা মতো রাখার ব্যবস্থা করে দিল—

এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে
এই তো নদীর খেলা—

এদিকে বিভিন্ন দলের দোহারপত্র দ্বারা হ্যাণ্ডবিলগুলি ঢাকা নারায়ণগঞ্জে বিলি করা হলো। নকুলেশ্বর সোয়ারী ঘাটের মাঝির কাছে একখানা পত্র লিখলেন—

মহাশয়! আপনার বহু দিনের প্রাচীন ঘাট ভেঙে এসেছি বলে দুঃখ করবেন না। মনে রাখবেন কারো অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জুলুমবাজী করা মনুষ্যত্ব বিরোধী। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মতিগতিরও পরিবর্তন হয়। মুখ বুজে জুলুম সহ্য করার মনোবৃত্তি চিরদিন থাকে না। পরিবর্তনশীল জগৎ। এখন আপনার শূন্য ঘাটে বসে বসে আমার এই কবিতাটি পড়ুন; শান্তি পাবেন—

ভাঙা গড়া নিয়ে বিধাতার খেলা
মানুষের বোঝা ভার।
আজ যেথা বাজে মিলনের শঙ্খ
কাইল সেথা হাহাকার॥ ইত্যাদি—

সদর ঘাটে তিন চার দিনের মধ্যে সকল দলের বায়না হয়ে গেল। ষষ্ঠীর দিন সকালে সব দল ঢাকেশ্বরী মায়ের বাড়ী পূজা দিয়ে আসার পর নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে বললেন—বাবা, এখন তো সব দল গানের বাড়ী চলে যাবে। কিন্তু ঘাটমাঝি আমাদের সঙ্গে যে ভদ্রতা করেছে তার প্রতিদানে আমাদেরও কিছু করা দরকার। চলুন সব দলপতির নিকট থেকে দলপ্রতি পাঁচ টাকা তুলে ঘাটমাঝিকে দিয়ে যাই।

নকুলেশ্বরের এ প্রস্তাবে কুঞ্জবাবু রাজী হলেন। দু'জনে দলপতিদের নিকট গিয়ে বললেন—সোয়ারী ঘাটে আপনাদের টাকাপ্রতি এক আনা হারে খাজনা দিতে হতো, কম পক্ষে পাঁচ শত টাকার বায়না পেলেও তাকে একত্রিশ টাকা চার আনা দিতে হতো। এ ঘাটমাঝি কোন দাবী না করে আমাদের সঙ্গে উদার ভদ্রতা দেখিয়েছে। তার প্রতিদানে আমাদেরও তো কিছু কর্তব্য

আছে। আসুন আমরা প্রত্যেক দল মাত্র পাঁচটি করে টাকা দিয়ে আমাদের কর্তব্য করি।

এ প্রস্তাবে সকল দলপতি খুশী মনে রাজী হলেন। এবং মোট চার শত পঞ্চাশ টাকা আদায় হলো। ঘাটমাঝিকে নকুলেশ্বর নৌকায় ডেকে এনে তার হাতে টাকা দিয়ে বিদায় চাইলেন। ঘাটমাঝি বলল—আমি তো টাকার লোভে এ আড়ং মিলাই নাই; শুধু আনন্দ লাভই আমার উদ্দেশ্য। আবার টাকা কেন?

নকুলেশ্বর—আপনার ভদ্র ব্যবহারে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছি। আপনার দাবী না থাকলেও আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে।

ঘাটমাঝি ছল ছল চোখে বলল—এই তিন চার দিন যে কি আনন্দে কেটেছে বলতে পারি না। আজ আনন্দের হাট ভেঙ্গে যাবে এই আমার দুঃখ। যা হোক, কথা দিয়ে যান প্রত্যেক বৎসর আপনারা সব দল আমার ঘাটে এসে এইভাবে আনন্দ দান করবেন।

সানন্দে সকলে সম্মতি দান করে দুর্গা দুর্গা বলে যার যার গানের বাড়ীর অভিমুখে নৌকা খুলে দিলেন। সে বছর থেকে সদরঘাটই কবির দলের পাকাপাকি ঘাট নির্দিষ্ট হলো; সোয়ারীঘাটের হাট চিরতরে ভেঙ্গে গেল।

নগর কসবা কুরী বাড়ী—নকুলেশ্বর বনাম উমেশ শীল

সে বৎসর নকুলেশ্বরের গানের বায়না ছিল ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ সাব-ডিভিশনে কমলাঘাটের কাছে নগর কসবা কুরী বাড়ী। স্বদলে এটিই জীবনে তাঁর প্রথম গান। দুর্গাপূজায় সব চেয়ে বেশী গান করেছেন এই বাড়ীতে—একাদিক্রমে আঠার বৎসর। কর্তাদের নাম ছিল রাধু (রাধাচরণ) কুরী এবং ক্ষেত্রমোহন কুরী। কলিকাতায় মির্জাপুর ও কলেজ স্ট্রীটে "ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটি" নামে এদের বিভিন্ন দোকান ছিল। ঢাকা জিলার বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে এ বাড়ীতে তাঁর গান হয়েছে—যেমন, বেণুপুরের অম্বিকা পাটুনী, তাঁর ভাই জ্ঞানেন্দ্র পাটুনী, রাজখাড়ার মদন শীল, কালীয়াকুরের পূর্ণ সরকার, রেবতী ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে বৎসর বিপক্ষে ছিলেন ঝালকাঠির উমেশ শীলের দল।

গানের দিন উভয় দলের রীতিমাফিক ডাক, মালসী, সখী-সংবাদ ও জবাব হয়ে গেলে উমেশ শীল টপ্পা করলেন—

আমি নীলধ্বজের পুত্রবধূ মদন মঞ্জরী।
হয়ে পতি শোকে অধীরা,
ধরাতে হলেম অধরা,
সদা চক্ষেতে দুঃখের ধারা, অবলা নারী॥
জানি বিপদে মধুসূদন—
প্রাণপতি করতো তোমার নাম স্মরণ;
বিপদে কর না পার, কে বলে বিপদভঞ্জন?
তুমি দিয়েছিলে বিজয়-বাণ,
ওহে প্রভু ভগবান—বাণ থাকতে যাবেনা জীবন।
করে অর্জুনের সঙ্গেতে যুদ্ধ—
কি জন্য প্রাণপতির হলো মরণ?

ডাক-ছড়া ও পয়ার পাঁচালীতে বক্তব্য বিষয়কে আরো বিশদ ব্যাখ্যা করে উমেশ সরকার আসর ত্যাগ করলে নকুলেশ্বর সদলে এসে জবাবে বললেন—

তুমি কল্পনায় মদনমঞ্জরী, আমি ভগবান।
তোমার পতি সেই ভক্ত প্রবীর,
প্রেম ভক্তি ছিল তার গভীর,
আমি তুষ্ট হয়ে যদু বীর, বাণ করেছি দান॥
তারে বলেছিলাম দিবার কালে—
এই অস্ত্র হাতে থাকবে যতক্ষণ;
দেব দানব নরের করে, সমরে যাবেনা জীবন।
যখন গেল সে যুদ্ধস্থলে,
মোহিনীর মোহে ভুলে,
সেই অস্ত্র করিল অর্পণ;
ও সে নিজের মরণ ডেকে আনে—
তাইতে তার পার্থের বাণে হয় মরণ।
কাম থাকিলে পায়না রাম—
প্রবীর তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন॥

সিন্ধুর স্বাদ বিন্দুতে

পূজা বাড়ীর গানের পর এক নাগাড়ে গান চলতে লাগল। পূজা থেকে কালীপূজার পূর্ব পর্যন্ত লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 'সরকারের' সঙ্গে নকুলেশ্বরের চৌদ্দ পনের পালা গান হয়ে গেল। সে সব গানে কি হলো কেমন হলো তা লিখতে গেলে এ জীবনে এ মহাভারত শেষ হবেনা। একজন কবিয়ালের জীবনে শত সহস্র পালাগানের বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ একেবারে অসম্ভব। এক একজন 'সরকারের' সঙ্গেও শত শত পালা গান হয়ে থাকে। তাই বিভিন্ন কবির সরকারের পরিচয় দানের নিমিত্ত দু'একটি পালা এবং ঘটনা বহুল কিছু স্মরণীয় আসরের উল্লেখের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

ঢাকা চুড়াইন বাজার—নকুলেশ্বর বনাম দেবেন্দ্র দাস

কালীপূজা উপলক্ষে নকুলেশ্বরের বায়না হয়েছে বিক্রমপুর পরগণায় কলা-কোপা খালের পাড়ে চুড়াইন বাজারে কালীবাড়ী। বিপক্ষে ছিলেন বিক্রমপুর হাসাড়া গ্রাম নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ দাস সরকার। তিনি বয়সে প্রাচীন, কবিত্বেও প্রবীন। নকুলেশ্বরের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

চুড়াইন বাজার-ঘাটে নৌকা গিয়ে পৌছলে কর্তৃপক্ষ দলের আহার্য সামগ্রী পাঠিয়ে দিলেন। রাত দশটার মধ্যে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেল। রাত বারোটার সময় আসরে ঢোল পাঠাবার আদেশ এলে ম্যানেজার হরিচরণ নট্ট যন্ত্রশিল্পীদের নিয়ে আসরে গেল। দুই দলের ডাক-মালশী সখী-সংবাদ গান শেষ হয়ে গেল।

দেবেন্দ্র সরকার সখী-সংবাদ গানের জবাব দিতে আসরে গেলেন, খুব সুন্দর জবাব করলেন। জবাব শুনে নকুলেশ্বর নিজেকে নিজে খুব ছোট মনে করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন—এরকম জবাব তো আমার কল্পনায় আসতো না। ইনি প্রকৃতই সু-কবি ইত্যাদি মনে মনে জল্পনা করছেন। হঠাৎ শুনলেন দেবেন্দ্র সরকার একটা রং ফুকার করে দলের মেয়েদের গালাগাল দিচ্ছেন—

দেখি নকুল সরকার সুকৌশলে,
কয়টা নটী আনলো দলে, যাদুমন্ত্র শিখায়ে—

ওরা নাচে মাজা বাঁকায়ে।
সবাই বলে নকুল নকুল,
কেউ ধরেনা নকুলের ভুল,
সকল শ্রোতার মন করে লয় আকুল ;
নটীর নাচনা দেখায়ে ॥

ফুকারটা শুনে নকুলেশ্বর খুব বিমর্ষ হলেন। এমন প্রবীণ কবির মুখে এমন অভব্য উক্তি কেন ? নির্দোষ মেয়েগুলোকে গালাগাল না দিলে কি আর কবির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকতো না! এই সব ভেবে ভেবে তাঁর মন বিষিয়ে উঠল। তিনি দেবেন্দ্র সরকারকে যতখানি ভক্তির উচ্চাসনে স্থাপন করেছিলেন, সে ভক্তি তার অন্তর হতে কর্পূরের মত উড়ে গেল। বাসায় গিয়ে ম্যানেজার হরিচরণ নট্টকে এই রং ফুকারটা শুনিয়ে বললেন—বলুন তো, নির্দোষ মেয়েগুলোকে এই রকম গালাগাল দেওয়া ভদ্রোচিত ব্যবহার নাকি !

হরিচরণ নট্ট—ওকে ভদ্র বলছেন কেন ? ও তো কোন উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেনি। ও যেমন জাতে চাষা, ওর ভাষাও তেমনি। বিশেষতঃ ওর পকেটে একটা গাঁজার কল্‌কী থাকে। খুব করে গাঁজায় দম দিয়ে আসরে যায়। নেশার ঝোঁকে কাকে কি বলে জ্ঞান থাকেনা। সেজন্য সব কবিয়ালের কাছে ও অপ্রিয়। ওসব ভদ্রাভদ্রের বিচার ছেড়ে দিয়ে যেমন কুকুর তেমন মুগুর মারুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে দেবেন্দ্র সরকারের উক্ত রং ফুকারের জবাব দিলেন—

১। ঘমিছে গাঁজা খেয়ে নেশার ঘোরে,
ঠাট্টা করে গেলি মোরে,
নটী নিয়ে কবি গায় ;—
আছে নটীর মান্য এ ধরায়।
ব্রজ রসের পরিপাটি,
কৃষ্ণ নট আর রাধা নটী,
ও তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী কপালকুটি,—
প্রণাম দেয় সেই নটীর পায় ॥

২। হয়ে এক ভগবান দ্বিধাকৃতি,
সাজিলেন পুরুষ প্রকৃতি,

স্বষ্টি করতে দুনিয়া ;—
বিশ্ব স্বষ্টি হল দুই নিয়া ॥
মেয়ের পেটে জীব জন্মেছে,
মাতৃস্তন্য খেয়ে বাঁচে,
বুঝি দেবেন চাষা জন্ম নিছে,—
ওর বাবার··· ··· ॥

রং ফুকারের জবাব দিয়ে নকুলেশ্বর টপ্পা করলেন—

তুমি স্বর্গের রাজা হও দেবেন্দ্র, আমি তপোধন।
নিয়ে কোন্ পাপের কি প্রসঙ্গ,
কার সঙ্গে করিয়ে রঙ্গ,
তোমায় শ্বেতশক্র ভগাঙ্গ, বলে সর্বজন ?
তুমি সহস্র বৎসর লুকায়ে, কিজন্য ছিলে পদ্মের মৃণালে,
অনিদ্রা আর অনাহার, কও তোমার কোন্ পাপের ফলে ?
অন্ত পড়লে আর এক সমস্যায়,
কাটা মুণ্ড পাছে ধায়,
তোমাকে গ্রাস করবে বলে।
হাতে বজ্র থাকতে কি নিমিত্তে—
ডুব দিলে সরস্বতীর সলিলে।
স্বর্গের রাজা হয়ে এই সাজা কেন কপালে ?

পাঁচালীতে নকুলেশ্বর ঐ টপ্পার বিষয়বস্তু বিশদ ব্যাখ্যা করে বললেন।

নকুলেশ্বরের রং ফুকারের জবাবে দেবেন্দ্র সরকার আগেই তো রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন। তার উপর টপ্পায় তাঁকে দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় স্থাপন করে নিন্দাসূচক ও কলঙ্কজনক কতগুলি প্রশ্ন করে গেছেন। সে কারণে তিনি মনে মনে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। আসরে এসে টপ্পার জবাব দিলেন বটে, কিন্তু নিজের দোষ এড়াতে পারলেন না। তিনি ইন্দ্র হয়ে নারদকে বলছেন—

বললে, কও তোমার ভগাঙ্গ হলো করে কি রঙ্গ।
আমি অজ্ঞানে করেছি পাপ,
গৌতম দিয়েছেন অভিশাপ,
তাইতে ভোগ করি এ মনস্তাপ, হয়ে ভগাঙ্গ ॥

জীবের মন হলো ইন্দ্রিয়ের কর্তা—
জীবাত্মা মনের প্রেরণায় ভোলে ;
মন হলে বিপথগামী, জীবাত্মা কুপথে চলে।
আমি বৃত্রাসুরকে করে ক্ষয়,
ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয়, লুকালেম পদ্মের মৃণালে।
অন্য নমুচি দানবের ডরে—
ডুব দিলেম সরস্বতীর সলিলে॥

এভাবে টপ্পার জবাব দিয়ে পাঁচালী আরম্ভ করার প্রাক্কালে দেবেন্দ্র সরকার একটা ডাক-ধুয়া দিলেন—

আমায় চাষা বলে গালি দিয়েছে—
যেমন বাংলা কুকুর জংলা হয়ে,
ভাল্লুকের লোম ছিঁড়েছে॥

এই ধুয়ার পর ইন্দ্রের গুরুপত্নী হরণ, দুর্বার মনের চাঞ্চল্য, যথা—'মনকরোতি পাপানি মনৈলিপ্যতে পাতকা' অর্থাৎ পাপপুণ্য মনই করে, মনই ইন্দ্রিয়ের কর্তা, ভাগবতে আছে—

ন কুর্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মন সিহ্নবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীনং চস্কন্দ তপৈশ্বরম্॥

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা বলেন—মন চঞ্চল থাকলে কুত্রাপি কাহারও সহিত সখ্য করা বিধেয় নয়। কারণ ঐ চঞ্চল মনকে বিশ্বাস করায় মহাদেবেরও চিরকালের সঞ্চিত তপস্যা বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি দর্শনে নষ্ট হয়েছিল। সেই দুর্বার মনই আমার এই ভগাঙ্গের কারণ। তষ্টা মুনির পুত্র বৃত্রকে বধ করে ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয়ে আমি সহস্র বৎসর পদ্মের মৃণালে লুকিয়ে ছিলাম। আর নমুচি দানবের মুণ্ড কেটে তার ভয়ে সরস্বতী নদীতে ঝাঁপ দিলাম পাপ ক্ষালনার্থে।

ইত্যাদি অনেক কথা বলার পরে বললেন—আপনারা 'নকুল' 'নকুল' বলে সবাই আকুল হয়ে পড়েছেন। খুব ভাল পাঁচালী বলে ব'লে শতমুখে প্রশংসা করছেন। ওগুলিকে পাঁচালী বলে নাকি? আমরা চিরদিন জানি পাঁচালীর একটা ছন্দ থাকে, যেমন—ত্রিপদী, চৌপদী, দশপদী, বিশ পয়ারী ইত্যাদি। যে আসরে যে ছন্দে পাঁচালী আরম্ভ করবে শেষ পর্যন্ত সেই একই ছন্দ বজায় রেখে পাঁচালী বলতে হবে। ও ছোঁড়ার পাঁচালীর কোন ছন্দ আছে কি?

কীর্তন রাগিণী দিয়ে কখন দশপয়ারী, কখনো বিশপয়ারী, যখন যা ইচ্ছা তাই করে। একে কি কবি বলে? ও রকম পাঁচালী আমাদের দেশে গরু চরানো রাখালেরাও বলতে পারে—এভাবে নকুলেশ্বরকে খুব নিন্দা করে গেলেন।

দেবেন্দ্র সরকারের এসব নিন্দামন্দ শুনে নকুলেশ্বর দুঃখিত হলেন না। কেন না হরি আচার্য গুরুর কৃপায় অজস্র বোল ও অজস্র মিল বলার শক্তি নকুলেশ্বরের আয়ত্ব হয়েছে। বাড়তি পাঁচালীতে তাঁর মতো দুন চৌদুন বোল দেওয়ার ক্ষমতা হরি আচার্য ছাড়া অন্য কোন সরকারের নেই। এটাই হলো তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

হাসতে হাসতে আসরে এসে নকুলেশ্বর দেবেন সরকারের লহর টপ্পার জবাব দিতে আরম্ভ করলেন—

বললে, গৌতম ঋষির অভিশাপে ভগ হয়েছে গায়।
তুমি রাজা হয়ে দেবতার—
হরণ করেছ গুরু দার,
দেব দানবে তবে আর কি, পার্থক্য রয়॥
জানি ঊর্ধ্বরেতা হয় দেবতা—
একথা শিব লিখে গেছে আগে,
কীর্তি থাকবে দেবতারঃ
আজ তোমার এই ভগের দাগে।
নিজের গুরুমাতা দর্শনে, তাহার অঙ্গ স্পর্শনে
যার মনে কামরিপু জাগে।
এসব মার্কামারা পশুগুলো—
একমাত্র কামদেবের পূজায় লাগে॥

টপ্পার জবাব দিয়ে নকুলেশ্বর দেবেন্দ্র সরকারের ডাক ধুয়ার জবাবে ধুয়া দিলেন—

কেবল চাষ করলেই চাষা নয়।
ভাষার দোষে চাষা হতে হয়॥
কাক কোকিল বিধাতার সৃষ্টি
সমান রং ধরে,
আকাশ পাতাল প্রভেদ হয় তার
গুণের বিচারে।

কোকিল মধুর স্বরে পরাণ হরে—
কাকের স্বরে ঝাঁটা খায় ॥
ভাষার দোষে চাষা হতে হয় ॥

ডাক-ধুয়া ছেড়ে দিয়ে নকুলেশ্বর পাঁচালীতে দেবতা কে, অসুর কে, তার ব্যাখ্যা করে বলেন—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্ত স্মৃত দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্যয় ॥

—স্বর্গমর্ত্যের ভিতরে যারা বিষ্ণুভক্ত নিষ্কামী সংযমী তারাই হলো দেবতা ; আর 'আসুরস্তদ্ বিপর্যয়" অর্থাৎ তার বিপরীতধর্মী, অভক্ত স্বকামী অসংযমী তারাই অসুর। তুমি দেবতার রাজা হয়ে অসুরের চেয়েও জঘন্য। গুরুপত্নী মাতৃসমা ; তার সতীত্ব নষ্ট করে বেশ গুরু দক্ষিণা দিয়েছ! শিবতন্ত্রে বলে—

নতপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্যতপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেৎ যস্ত স দেব ন তু মানুষ ॥

—ব্রহ্মচর্যই হল শ্রেষ্ঠ তপস্যা, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নেই। ব্রহ্মচর্যপরায়ণ ঊর্দ্ধরেতা ব্যক্তিই "সদেব ন তু মানুষ" অর্থাৎ সে মানুষ হলেও মানুষ নয়, সেই প্রকৃত দেবতা। কোন্ গুণে তুমি স্বর্গের দেবতা? বৌ চুরি, ঘোড়া চুরি, গুরু পত্নী হরণ, পরস্ত্রীকাতরতা, এই সকল গুণেই কি তুমি দেবতার রাজা হয়েছ? হিরণ্যকোশিপুর সাধন ভঙ্গ করতে তার বৌ কয়াধুকে চুরি করেছিলে ; পৃথুরাজ, সগররাজ ইত্যাদি বহু রাজার যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করেছ। বৃত্রাসুর ও নমুচির কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মিত্রতা করে গোপনে সুযোগ বুঝে মিত্রদ্রোহী পাপ করেছ। আমরা জানতাম, পুণ্যবান ব্যক্তিরাই স্বর্গে যায়, আর পাপী যায় নরকে, কিন্তু তোমার কার্য দেখে বোঝা গেল, মহা মহাপাপ সঞ্চয় করতে পারলেই স্বর্গের রাজা হওয়া যায়,—ইত্যাদি বক্তব্যের পর নকুলেশ্বর বললেন—

আসরে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী! আপনারা দেবেন্দ্র সরকারের মুখে শুনলেন আমার কবির কোন ছন্দ নেই—কখনো দশ পয়ার, কখনো বিশ পয়ার—যখন যা ইচ্ছা তাই বলি। এ রকম পাঁচালী নাকি তাঁর দেশের গরু চরানো রাখালেরাও বলে। কিন্তু আপনারা জানেন—কীর্তন সুরে পাঁচালী বলতে হলে এক তাল, এক রাগিণীতে, এক রকম ছন্দে বলা যায়না ; আলাদা আলাদা তাল, যেমন এক-তালা, কাওয়ালী, পঞ্চম সোয়ারী, দশকুশী, কাশমারী, কাহারবা—ইত্যাদি এক

এক তাল এবং এক এক রাগিণীতে সময় ও সুযোগ অনুযায়ী বলতে হয়। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের পরিবর্তন না করলে তালে মিশবে কেন? দেবেন্দ্র সরকার 'ছাদপিটানো সরকারের' ছাত্র কিনা, তাই ঐ এক 'ছাদ পিটানো' তালে পাঁচালী বলা শিখেছে। ওর বাইরে ওঁর বলবার ক্ষমতা নেই। আপনাদের আশীর্বাদে আমি কবি-সম্রাট হরি আচার্য মহাশয়ের কাছে যে ছন্দানুশীলন শিখেছি, তাই পরিবেশন করেছি। তাতে উনি গরুর রাখালের সঙ্গে তুলনা দিয়ে গেলেন। এখন আমার শেষ আসর। আমি একখানা কীর্তনসুরে ধুয়া দিয়ে ওঁর সঙ্গে জুড়ির পাল্লা করি, আপনারা শুনুন। এই বলে নকুলেশ্বর তেওট তালে ধুয়া ধরলেন—

ধনি ধৈর্য ধরগো রাজনন্দিনী—
এখন কাঁদলে কি আর হবে বিনোদিনী।
শঠে প্রাণ দিয়ে,—এ জনম গেল রাই তোর কাঁদিয়ে,
আগে বললেম যাই, শুনলিনা রাই কান দিয়ে—
এখন ফললো তাই সুধাকরবদনী॥

এই ধুয়াখানি ধরে নকুলেশ্বর বৃন্দা সখী হয়ে দেবেন্দ্র সরকারকে রাধারানী করে জুড়ির পাল্লায় ডাকতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ডাকার পর মাজাভাঙ্গা সাপের মতো দেবেন সরকার এসে হারমোনীওলার কাছে বসে রইলেন। উঠে বোল বলার মতো শক্তি নেই। তার কারণ, চিরদিন যারা কাশমারী কাহারবায় ছয় মাত্রা আট মাত্রার মুগুর-মারা তালে পাঁচালী বলা অভ্যাস করেছে, তাদের সাধ্য কি যে তেওট, কাওয়ালী, ঝাঁপ ইত্যাদি চৌদ্দমাত্রা, ষোল মাত্রা, দশমাত্রার তালের পাঁচালী বলবে? একে তাল জানা চাই, আবার সুরও জানা চাই। দেবেন সরকার জীবনে কখনো এ তালতলা দিয়ে হাঁটেননি। অনেকক্ষণ একা একা বলার পরে নকুলেশ্বর ধুয়া ছেড়ে বললেন— বুঝেছি এ তালে বোল দিতে পারবেন না। এখন আপনি একখানা ধুয়া ধরুন; আমি বোল্ দেব।

দেবেন্দ্র সরকার ধুয়া ধরলেন, (কাহারবা আটমাত্রা)—

আমি কেমনে জানিব রে কার মনে কি!
আগে জানলে কি আর শ্যামনাগরে গো—
আমি প্রাণ দিতেম সখী। কার মনে কি···

কুলনাশা বাঁশরী স্বরে, আমায় পাগলিনী করে,
শ্যাম কমলাখি।
উহার মনহরা মুরলীর স্বরে গো—
কিসে ধৈরয রাখি ॥ কার মনে কি ..

ছন্দটি ত্রিপদী— সঙ্গে সঙ্গে নকুলেশ্বর উঠে পদ দিলেন—

শাশুড়ী ননদী তোরে,
কত মতে বারণ করে,
ওগো রাই বিধুমুখী।
ও তুই তাদের কথা শুনলে পরে গো—
এখন কাঁদতে হতো কি ॥ কার মনে···

এইভাবে অনেকক্ষণ বোল্ কাটাকাটির পর নকুলেশ্বর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন—আপনারা দেবেন সরকারের মুখে শুনেছিলেন আমি বাঁধা ছন্দে পাঁচালী বলতে পারিনা। আমি ওঁর ত্রিপদী ছন্দের ধুয়ার সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা খানেক বোল দিলাম। এখন তাঁর এই ধুয়াকে দুন অর্থাৎ দ্বিগুণ করে ছয়পদী ছন্দে বলবো; দেখি তাতে তিনি কেমন বোল দেন—তাল ঐ কাহারবাই থাকবে—

জ্ঞানী লোক সকলে বলে, কোন কার্য করিতে হলে
আগে চিন্তা করে নেওয়া চাই।
না ভাবিয়া কাজ করিলে, পরিণামে কুফল ফলে
তার কপালে দুঃখের সীমা নাই—
হতে পারে না সুখী।
তুমি প্রেম করে রাখালের সনে, নাম রটালে বৃন্দাবনে
কলঙ্কিনী রাই কালোমুখী ॥ কার মনে কি···

যেই ত্রিপদীকে ছয়পদী ছন্দে দুন করে নকুলেশ্বর পদ দিলেন দেবেন সরকারের বাক্য বন্ধ হয়ে গেল। অতো বাড়্‌তি বোলে পাঁচালী বলা তাঁর অভ্যাস নেই। তিনি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাই দেখে নকুলেশ্বর বললেন—

তোমার দেশের গো রাখালে, এ রকম পাঁচালী বলে,
তুমি কেন নীরব হয়ে রও।

কবি গাওয়া ছেড়ে দিয়ে, গরু চরাও মাঠে গিয়ে,

তবে যদি এমন 'সরকার' হও—

তোমার ভাবনা আছে কি।

নইলে রাখাল বাবার দোহাই দিয়ে গো—

নাক কানে খৎ দাও লিখি॥ কার মনে কি…

বাংলা কুকুর জংলা হল, ভল্লুকের লোম ছিঁড়ে নিল,

গর্ব করে বলোছলে কি।

ভল্লুক হলি ভেজা মেকুর, কুকুর হয় তোর গোষ্ঠীর ঠাকুর,

চেয়ে দেখ দেখি।

এখন লোক সমাজে চলতে হবে গো—

কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি॥ কার মনে কি…

এইভাবে নকুলেশ্বর দেবেন সরকারের ত্রিপদী ছন্দের ধুয়াকে ছয় পদীতে রূপান্তরিত করে অনেক ঠাট্টা উপহাস করলেন; আর দেবেন সরকার—

"বোবার স্বপন কইতে নারি

সইতে নারি প্রাণ যায়।"

এই অবস্থার মধ্যে আসর ভেঙ্গে গেল। বিক্রমপুরনিবাসী শ্রোতৃবৃন্দ সকলে দেবেন সরকারকে মন্দ বলতে লাগলেন: জলের ছিটে দিয়ে লগীর গুঁতো খেতে গেলি কেন; বেটা বিক্রমপুরের মুখে চুণ কালী মাখালি ইত্যাদি বলতে বলতে চলে গেলেন। নকুলেশ্বরও নৌকায় গিয়ে বিশ্রাম নিলেন।

যশোলক্ষ্মী যখন যখন মানুষকে আশ্রয় করে তখন সে নিজেও বুঝতে পারে না যে কিভাবে তার যশপ্রতিষ্ঠা লাভ হচ্ছে। তাই শাস্ত্রকারগণ লিখেছেন—

আগচ্ছতি লক্ষ্মী নারিকেল ফলাম্বুবৎ।

নির্গচ্ছতি লক্ষ্মী গজভুক্ত কপিত্থবৎ॥

অর্থাৎ নারকেল ফলে কোন ছিদ্র না থাকলেও যেমন তার ভিতরে অদৃশ্য পথে জল জল প্রবেশ করে, মানুষের ভাগ্যে যশোলক্ষ্মীর আগমন তেমনি। আবার হাতী গোটা বেল গিলে ফেলে এবং গোটা বেলই মলের সাথে বেরিয়ে যায়; কিন্তু ভাঙলে যেমন দেখা যায় যে কোন অদৃশ্য ছিদ্র পথে তার সার পদার্থ বেরিয়ে গেছে—মানুষের ভাগ্য-লক্ষ্মী যশোলক্ষ্মীর নির্গমনও তেমনি।

নকুলেশ্বরের কাঁধে এখন যশোলক্ষ্মী ভর করেছেন; চতুর্দিকে তাঁর যশ-প্রতিষ্ঠা ছড়াতে শুরু করেছে। নকুল, নকুল বলে সবাই আকুল। বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে যত গান হচ্ছে ততই তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা সাহস ও আত্ম-নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়নার বিরাম নেই।

বারুদিতে—অম্বিকা পাটুনী বনাম নকুলেশ্বর

ঢাকা জিলার বেণুপুর গ্রামের অম্বিকা পাটুনির সঙ্গে অনেক বার তাঁর গান হয়েছে। ইনিও আচার্য কর্তার কবি-শিষ্য ছিলেন। বারুদি গ্রামে গানে একবার নকুলেশ্বর অম্বিকা সরকারকে বিপক্ষে রেখে টপ্পা করেছিলেন—

আমি নগর-কোটাল জগা, আমার হস্তেতে অসি।
তুমি ছিলে ব্রজেন্দ্র নন্দন,
গৌর রূপ করেছ ধারণ,
মজায়েছ বৃন্দাবন, বাজায়ে বাঁশী॥

তোমার বাঁশী আর এই অসির মধ্যে—
কও দেখি কি পার্থক্য শুনতে চাই;—
বাঁশী না অসি বড়, বলহে শ্রীশচীর নিমাই।
আমরা করেতে ধরে অসি, দুষ্ট জনে বিনাশি,
শিষ্টেরে আসনে বসাই।
কেবল পরনারী করতে চুরি—
তোমার এই বাঁশের বাঁশীর জুড়ি নাই॥

অম্বিকা পাটুনী গৌরাঙ্গের ভূমিকায় জবাবে বললেন

তোর ঐ অসি আর এই বাঁশীর তত্ত্ব, শোন রে জগা শোন।
তোর ঐ সর্বনাশা অসিতে,
পারে এই বিশ্ব নাশিতে,
মধুর প্রেম সাগরে ভাসিতে, বাঁশীর প্রয়োজন॥
জানি মুক্তকেশী ধরে অসি—
অসংখ্য দৈত্যদানব করে ক্ষয়;
ছুটায় রক্তের প্রস্রবণ, কি ভীষণ বিভীষিকাময়।

শুনলে মধুমাখা বাঁশীর গান,
দ্রব হয় কঠিন পাষাণ,
ভক্তের প্রাণ আকুল, করে লয়।
যত সাধকের হয় সাধন সিদ্ধি—
প্রেম-যমুনায় উজান বয়॥

অসিতে হিংসা জাগে, বাঁশীতে জাগে প্রেম প্রণয়॥

টপ্পার উক্ত জবাবের প্রতি-জবাবে নকুলেশ্বর আবার বললেন—

নাকি অসি হতে বাঁশী বড়, শ্যাম কালোশশী।
যেদিন আয়ান ভয়ে কৃষ্ণ-কালী, সাজিলে বনমালী,
সেদিন কেন ঐ বাঁশী ফেলে, ধরিলে অসি॥

যেদিন মাধা মেরে কাঁধার বাড়ি—
নিতাইকে করেছিল নির্যাতন;
বাঁশী না ধরে কেন, ধরিলে চক্র সুদর্শন?
যেদিন কুরু বংশ করতে নাশ,
পাণ্ডবের হও ক্রীতদাস,
না করে বাঁশরী বাদন,
সেদিন পাণ্ডবেরে কৌশল করে—
শিখালে অসি ধরা কি কারণ?

শ্রীকাইলে—দুর্গাচরণ সরকার বনাম নকুলেশ্বর

ত্রিপুরা জিলার শ্রীকাইল গ্রামে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের (বরানগরে বেঙ্গল ইমিউনিটি নামক বিশিষ্ট ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা) বাড়ীতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পরপর কয় বৎসর নকুলেশ্বর বিভিন্ন 'সরকারের' সঙ্গে কবিগান করেন। একবার ঐ জিলারই ভাসখোলা ইলিয়টগঞ্জ নিবাসী দুর্গাচরণ ধুপী সরকারের সঙ্গে তাঁর গান হয়। দুর্গাচরণ টপ্পা করেছিল—

আমি বৃন্দাবনের দূতী বৃন্দে, তুমি শ্যাম কানাই।
তুমি হয়েছ আজ মহারাজ,
অঙ্গে নাই ব্রজের রাখাল আজ,
নাগরী পাগড়ী দেখে আজ, লজ্জায় মরে যাই॥

হয়ে কংসের দাসী রাজমহিষী—
বসেছে সেজেগুজে তোমার বাঁয়।
কুবুজার কুজের বোঝা, সোজা আজ করে কোন্ ওঝায়?
বলো কোন্ নাম মন্ত্রে কুবুজা,
কি দিয়ে করে পূজা,
বাধ্য আজ করেছে তোমায়?
তোমার কপট প্রেমে ব্রজধামে
রাধিকার মধুর প্রেমের মান্য যায়!

উক্ত টপ্পার জবাবে নকুলেশ্বর বললেন—

তুমি বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতী এলে প্রবাসে।
বৃন্দে তোমায় করে দরশন,
ব্রজের কথা হয়েছে স্মরণ,
ত্যজে সখা সখীগণ, ছিলেম প্রভাসে॥
কেবল পূর্বার্জিত কর্ম ফলে—
কুবুজা রানী হয়ে বসল বাঁয়;
বাধ্য প্রেমের সাধ্যেতে, বাধ্য হলেম শ্যামরায়।
ভক্তে নাম করে নিশি দিবা,
প্রেমিক করে প্রেম সেবা,
একথা ব্যক্ত এ ধরায়।
ভবে নামের চেয়ে প্রেমের মান্য,
জানে যার প্রেমের বাতাস লাগে গায়॥

পালনী'র গান—পূর্ণ সরকার বনাম নকুলেশ্বর

পৌষ মাস পর্যন্ত গান হবার পর মাঘ মাসে পালনী'র গান। অর্থাৎ মাঘ মাসে ঝালোরা নদীর জলে জাল ফেলত না। এই একমাস যাবৎ তারা ব্রত পালন করত এবং প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় কালী পূজা ও কবি গান হতো। বায়নার সংখ্যাও বেশী। একমাসে কমপক্ষে পঁচিশ ছাব্বিশ পালা গান; টাকাও বেশী। এই মাঘ মাসে এক ঝালো পাড়া ছাড়া কোন জমিদারেরও সাধ্য

হতো না কবির দল বায়না করতে। ঝালো পাড়ায় এক পালা গানে নকুলেশ্বর পূর্ণ সরকারকে (সূত্রধর) বিপক্ষে রেখে টপ্পা করেছিলেন—

আমি শ্রীদাম সখা তুই আমার সেই বাঁকা ত্রিভঙ্গ।
শুনি হয়ে রাধার প্রেম ঋণ,
কলিতে সেজে দীনহীন,
অঙ্গে নিয়ে ডোর কৌপীন, হলি গৌরাঙ্গ॥

ও তোর অন্তরঙ্গ সখা যারা—
তুই বিনে শবের মতো কাল কাটায়—
সেবার দাসী সখীগণ, তোর কারণ কেঁদে বুক ভাসায়।
তোর সেই সখা আর সখীর দেনা,
সে দেনা তো দিলিনা,
পালায়ে এলি নদীয়ায়।
কেবল রাধার দেনায় পরলি তেনা—
বলনা তোর মায়ের দেনার কি উপায়?

পূর্ণ সরকার উক্ত টপ্পার জবাবে বললেন—
সখ্য প্রেমেতে রাখালের দেনা ছিলেম শ্যামরায়।
ছিল ব্রজে যে দ্বাদশ রাখাল,
দেনা শেষ করলেম নন্দলাল,
নাম ধরে দ্বাদশ গোপাল, এলো নদীয়ায়॥

ছিল চতুষষ্ঠি ব্রজাঙ্গনা, হয়েছে চতুষষ্ঠি মোহন্ত,
দাস্য ভাবে সেবা পায়, দিয়েছে সে দেনায় ক্ষান্ত॥
দেনা বাৎসল্যেতে জননীর,
পান করে তার স্তনের ক্ষীর—
সে দেনা করেছি অন্ত।
আমার রাধারানীর প্রেমের দেনা—
শোধ করতে পারি নাই আজ পর্যন্ত॥

ঝালো পাড়ায় পালনীর গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক খুলনার রাজেন্দ্র সরকারের একখানা চিঠি নিয়ে নারায়ণগঞ্জে এসে নকুলেশ্বরের হাতে

দিলেন। এই রাজেন্দ্র সরকারও হরি আচার্য মহাশয়ের উদীয়মান ছাত্র এবং নকুলেশ্বরের চেয়ে তিনি চার বৎসরের বড়। তিনি লিখেছেন—

'ভাইটি নকুল! লোকমুখে শুনিলাম তুমি নাকি নিজে দল করিয়া বেশ যশ সহকারে গান করিয়া খুব সুনাম অর্জন করিয়াছ। শুনিয়া সুখী হইলাম। আমাদের খুলনা ফরিদপুরে এখন বারোয়ারী কালীপূজা আরম্ভ হইয়াছে। বাগেরহাট সাব-ডিভিশনে কারাপাড়া জমিদার বাড়ী আমার বার্ষিক একটা গান আছে। তোমার নাম যশ শুনিয়া জমিদারবাবু আমাকে ধরিয়াছেন আমার বিপক্ষে তোমাকে বায়না করার জন্য। আমার অনেক গান আছে বলিয়া আমি আসিতে পারিলাম না। চিঠি দিয়া লোক পাঠাইলাম। তুমি ওদিকের বায়না ছেড়ে দিয়ে আমার এই বায়নাটি নিয়া চলিয়া আস। জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গানের অভাব হবেনা। যদিও ঝালকাঠির কোন দল এ পর্যন্ত খুলনা ফরিদপুরে বেশী আসে নাই, সেজন্য তুমি ভয় করিওনা। নিশ্চিন্তমনে চলিয়া আস। টাকাও বহু আয় হবে, আর নূতন একটা দেশও আবিষ্কার হবে। আশা করি অনুরোধ অবশ্য রক্ষা করিবে। ইতি—রাজেন্দ্র সরকার।

নকুলেশ্বর ম্যানেজার হরিচরণ নট্টকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাজেন্দ্র সরকার তো বায়না নিয়ে লোক পাঠিয়েছেন, এখন আমার কি করা কর্তব্য।

হরিচরণ নট্ট—আমরা নূতন দল করে এ দেশে তো এক রকম পরিচিত হয়েছি। ওদেশে ত কখনো যাইনি। বিশেষতঃ রাজেন্দ্র সরকারের চিঠিতে একটু ইঙ্গিত আছে—"যদিও ঝালকাঠির কোন দল সেখানে যায় নাই, সেজন্য তুমি ভয় করিও না"—এ কথায় বোঝা গেল তারা ভয় করেই সেদিকে যায়নি। কেন, কিসের ভয়ে তারা ওদেশে যেতেন না? চলুন, আমরা ভয়টা ভেঙ্গে দিয়ে আসি। নতুবা ঝালকাঠির সে কলঙ্ক ঘুচবে না। চলুন আমরা দিগ্বিজয়ে বের হই।

হরিচরণ নট্টের কথা শুনে নকুলেশ্বরের মনে শতগুণ উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। তিনি মাঝিমাল্লাদের হুকুম দিলেন—খুলনা জিলার বাগেরহাট অভিমুখে নৌকা চালাও। এই বায়নাকারক ভদ্রলোকের সঙ্গেই হেতে হবে।

যেই কথা সেই কাজ। দুর্গা দুর্গা বলে নূতন দেশ আবিষ্কার করতে রওনা হলেন। গানের আগের দিন বাগেরহাট টাউনের ঘাটে গিয়ে নৌকা বাঁধা হলো। বাগেরহাট হতে কারাপাড়া জমিদার বাড়ী তিন চার মাইলের পথ। ভাল পাকা রাস্তা। গানের দিন সকালে দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী করে নকুলেশ্বর দল

নিয়ে কারাপাড়া জমিদার বাড়ী পৌছলেন। বৈঠকখানা ঘরে দলের থাকার ব্যবস্থা হলো। সেখানে দারুণ ভীড় জমে গেল। নকুলেশ্বরকে দেখবার জন্ত দলে দলে স্ত্রীপুরুষ এসে ভীড় করছে। আর নানা মন্তব্য করছে, যেমন—একেবারে ছেলেমানুষ, ও কি গান গাইবে; ছেলেটার সাহস আছে বলতে হবে! যে দেশে ঝালকাঠির কোন দল কোনদিন আসে নাই, সে দেশে সাহস করে আসা কি চারটিখানি কথা! ছোট দেখলে কি হয়, মনে হয় ইস্পাতের তরবারির মতো ধারালো; ক্ষুদ্র একটি বটের বীজের মধ্যে যদি অত বড় প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ থাকতে পারে তবে এই ছোট ছেলেটার মধ্যেই বা কবির কাব্য-ক্ষমতা থাকতে পারবে না কেন—ইত্যাদি। এসব মন্তব্যের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে নকুলেশ্বর একখান ভাগবত গীতা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন।

আচার আছে বিচার নেই

ক্রমে দর্শকের ভীড় কমে গেল। জমিদার বাবুর নায়েব মশাই এসে নকুলেশ্বরকে বললেন—আহারাদির ব্যবস্থা আমাদের বাড়িতেই হবে। আমরা ব্রাহ্মণ, কারো কোনো আপত্তি নেই তো! ম্যানেজার হরিচরণ নট্ট সহ সকলেই বলে উঠলেন—না, না, ব্রাহ্মণ বাড়ীতে খেতে আপত্তি থাকবে কেন?

নকুলেশ্বর বললেন—আমার একটা আপত্তি আছে।

নায়েব—কিসের আপত্তি?

নকুলেশ্বর—আপনি প্রথমেই বললেন, আমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমার দলের সবাই তো ব্রাহ্মণ নয়। নানা জাতি আছে। আপনাদের একটা সামাজিক কুসংস্কার আছে—যেমন,

খেতে গেলে বামুন বাড়ী, বিড়াল কুকুর মনে করি,
ভাত বেড়ে দেয় আইঠা কলার পাতে,
যত মাছ মাংস আর পায়স পিঠা, সবই দেয় একসাথে।
খেতে পারো আর না পারো, খাওয়ার পরে আইঠা পাড়ো,
এমন বামুন বাড়ীর খাওন ছাড়ো—
জাত যাবেনা মুচীর ভাতে।

—কেমন নায়েব বাবু, আমার মনের কথাটা বুঝলেন তো! আমরা মানুষ হিসাবে মানুষের বাড়ীতে খাব, জাতি হিসাবে নয়। উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলতে পারবো না।

নায়েব মহাশয় নকুলেশ্বরের কথা শুনে জমিদার বাবুর কাছে গিয়ে সব বললেন। জমিদারবাবু একে তো ব্রাহ্মণ জমিদার, তার উপর গোঁড়া হিন্দু। কেমন গোঁড়া একটি ঘটনাই তার প্রমাণ—ঐ গ্রামের মধ্যে এক ঘর কুম্ভকার ছিল। তার একটা ছেলে এম. এ. বি এল. পাশ করে সদর খুলনায় ওকালতি করতেন। এক শীতকালের সকালবেলা উকিলবাবু জুতা মোজা পায় দিয়ে জমিদারবাবুর বাড়ীর দরজা দিয়ে যাচ্ছিলেন। বৈঠকখানায় বসে জমিদারবাবু তাই দেখে পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে এনে জুতা মোজা খুলিয়ে হুকুম দিলেন—নে, এখন এই জুতা মাথায় নিয়ে বাড়ী যা। ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ীর ওপর দিয়ে জুতা পায় দিয়ে যাওয়ার শাস্তি!

এই সেই জমিদার নায়েবের মুখে নকুলেশ্বরের বক্তব্য শুনে কি জানি কি ভেবে নায়েব বাবুকে বললেন—যান, বলুন গিয়ে উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলতে হবে না। জমিদারবাবু হয়তো চিন্তা করলেন যে—আমার বাড়ীতে আহারের আগেই যে এমন স্পষ্ট উক্তি করতে পারে, তার খাওয়ার কোন ত্রুটি হলে কবির আসরে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সে যে কি বলতে কি বলে ফেলবে তার স্থিরতা নেই। কবির মুখ বন্ধ করবো কি দিয়ে? এসব চিন্তা করেই হয়তো সরলভাবে হুকুম দিলেন। বিনা ঝঞ্চাটে আহারপর্ব মিটলো।

খুলনা কারাপাড়া—নকুলেশ্বর বনাম রাজেন্দ্র সরকার

রাত বারোটায় গানের আসর বসেছে। নকুলেশ্বর দল নিয়ে আসরে গিয়ে একপাশে বসলেন, তাঁর দলের ডাক-মালসীগান হয়ে গেল।

রাজেন্দ্র সরকার দল নিয়ে আসরে আসামাত্র নকুলেশ্বর হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। রাজেন্দ্র সরকার তা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। অন্য পাশে গিয়ে বসলেন। রাজেন্দ্র সরকারের এই ব্যবহারে নকুলেশ্বর খুব মর্মাহত হলেন। তিনি ভাবলেন—চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়ে বায়না করে এনে এখন যেন মোটে চিনতেই পারলেন না, এ কি রকম ভদ্রতা! আচ্ছা যাক, দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

দুই দলের ডাক-মালসী ও সখী-সংবাদ গান শেষ হলো। রাজেন্দ্র সরকারকে আসর থেকে হুকুম করলো—আপনি একখানা লহর 'কবি'গান করুন, নকুলবাবু সেই কবির জবাব দিয়ে টপ্পা-পাঁচালী আরম্ভ করবেন। শ্রোতাদের আদেশ পেয়ে রাজেন্দ্র সরকার একখানা কাল্পনিক "বৃদ্ধ পিতার বিয়ের কবি" আরম্ভ করলেন। সেকালে বৃদ্ধদের মধ্যে পত্নীবিয়োগের পর পুনরায় বিয়ে

করার কুপ্রবৃত্তি 'কবি'খানার বিষয়বস্তু। এক বৃদ্ধের পত্নী বিয়োগ হয়, ভার্যাহারা বৃদ্ধ উন্মত্তের মতো জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে পুনরায় দারপরিগ্রহের আবদার করছে। গানটির প্রারম্ভিক অংশ নিম্নরূপ—

এক প্রাচীন হলো গৃহশূন্য, সমাজে খুব গণ্যমান্য
ছেলে মেয়ে নাতিপুতি খুব।
বুড়ো একা একা বোকার মতো শুয়ে বিছানায়,
কেঁদে রাত পোহায়, নীরবে নিশ্চুপ ॥
একদিন জ্যেষ্ঠ পুত্রে ডেকে এনে. যতনে বলে শোন বাপ,
আমার বুকে হস্ত দিয়ে দেখ, কত বড় তাপ।
তোমরা ত শ্রাবণ ভাদ্রে, সবে যাও শুয়ে নিদ্রে,
আমি পুড়ে মরি চৈতি রৌদ্রে,
এ আমার কোন্ জনমের পাপ ॥
সে যে তোমার মায়ের চিতার আগুন,
আমার বুকে জ্বলছে দ্বিগুণ।
আগুনে বেগুন সিদ্ধ হয়,
আমার বুড়ো কালে পুড়ে গেল, ঘৃণা লজ্জা ভয়।
তোমার মত পুত্র যার, এত দুঃখ কেন তার,
আমার এ দুঃখের করতে প্রতিকার,
আমায় বিয়ে দিতে পার কি ?
তুমি চাইলে মেয়ে কেউ না দেবে না কি ?

ইত্যাদি বলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলছেন—

১। কাছারীর নায়েব মশায়, কটু কয় মিঠে ভাষায়,
তুমি বিয়ে না করে এ দশায়, ফিরে আর কাছারী এসো না।
২। আমার হস্ত দেখে দৈবজ্ঞরা গিয়েছে কয়ে,
বিয়ে করলে হবে তোমার ছেলে আর মেয়ে।
৩। ত্রেতায় পিতার আদেশে, রাম গেল বনবাসে,
তুমি আমার আদেশ ঘরে বসে, পার পালিতে।
৪। করতে দুই এক শ' ব্যয়, তোমার ন্যায়,
ছেলে কি পারেনা বাবার জন্য।—ইত্যাদি বলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অনুযোগ করছে।

নকুলেশ্বর পুত্ররূপে জবাবে বললেন—

শুনে বৃদ্ধ পিতার বিয়ের কথা, দুঃখে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়।
তোমার তিনকাল গেছে, এক কাল আছে, মরণের বাকী,
এখন সাজে কি, বিয়ের অভিনয় ॥

১। শুনি পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা. বলে তাই আর্যগণ সবাই,
তোমার পুত্রের অভাব নাই।
চারি পুত্র আছে ঘরে, কষ্ট নাই ভাত কাপড়ে,
তবু বুড়াকালে বিয়ে করে, আনতে চাও বৈতরণী গাই ॥
জানি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বিষের সমতুল,
বাবা জেনেশুনে করিয়ে ভুল,
দিওনা মোদের মুখে চুণকালী।
নয়া বৌ এনে ঘরে, কেন লোকসমাজে ঘরেপরে
খেতে চাও গালি।

৩। বললে, আশয়বিষয় নায়েব মশায়,
তোমায় কয় বিয়ে করিতে, তোমায় স্বামী করিতে,
আতপ চাল মালসা করে, কে আসবে তোমার ঘরে
দিব হাজার টাকা নাযেবেরে,
বিয়ে দিক তার মাসীর সাথে ॥

৩। বললে, পিতার বাক্যে রাম যায় বনে,
ত্যাগ করে ভোগের লালসা, তুমি ছাড় দুরাশা,
পিত্রাদেশ নিয়ে মাথে, পারি এ প্রাণ ত্যজিতে,
কভু পারবনা ঘটায়ে দিতে, অবলার বৈধব্য দশা ॥

৪। নাকি, পুত্র কন্যা হবে বলে, বুঝলে দৈবজ্ঞের আলাপে,
কথা মানি কিরূপে।
বীর্যবান এ জগতে, পারে সন্তান জন্মাতে.
এমন হীনবীর্যে পুত্র দিতে, পারবে না দৈবজ্ঞের বাপে ॥

৪। বললে আমার জন্য দু'চার হাজার. টাকা ব্যয় করতে পার না,
তোমার মিথ্যা ধারণা।
টাকা নেও রাশি রাশি, হও গিয়ে তীর্থবাসী,
তবু বার্ধক্যে এনে ষোড়শী, ফাঁসীর রসিতে মরো না ॥

৬। তুমি টাকার জোরে বিয়ে করে, হয়তো এক তরুণী পাবে,
সে কি তোমারে চাবে ?
হবেনা ভোগের তৃপ্তি, আয়ুর হল সমাপ্তি,
হবে আজ বাদে কাল গঙ্গাপ্রাপ্তি,—
দেবের ভোগ ভূত প্রেতে খাবে ॥

নকুলেশ্বর 'কবি'র জবাব শেষ করে শ্রোতাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কি হবে ? এক বাক্যে সবাই বললেন—এখন টপ্পা পাঁচালী আরম্ভ হোক। নকুলেশ্বর উঠে টপ্পার লহর করলেন—

আমি কল্পনাতে রামচন্দ্র খান, তুমি হরিদাস।
তুমি হয়ে যবনের ছেলে, জাতির স্বধর্ম ফেলে,
কেন হরি বোল হরি বলে, বল বার মাস ?
জানি জপের সংখ্যায় পায়না যারে—
অ-জপায় জপ হতেছে অনিবার ;
নিয়ে এক জপের মালা—
তিন বেলা জপ করতেছ কার ?
শুনি একবার হরিনাম নিলে,
তবেই মুক্তি মিলে, সংসারে জন্ম হয়না তার ;
তুমি সেই নামে অবিশ্বাস করে—
কি জন্য নাম কর তিন লক্ষ বার ?

টপ্পা শেষ করে নকুলেশ্বর পাঁচালীতে 'নাম' নিলে কি ফল হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বললেন—শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ মুচকুন্দকে বলেছেন—

জন্মকর্মাভিধানানী সন্তিতে সহস্রশঃ।
ন শক্যতে নুসংখ্যাতু মনন্তত্বান্ময়া পিহি ॥

অর্থাৎ 'হে মহারাজ মুচকুন্দ! আমার কোন্ নামটি খাঁটি, তুমি জানতে চেয়েছ ; আমার জন্ম লীলা ও নাম অনন্ত। সেজন্য আমি নিজেও তার সংখ্যা গণনা করতে অক্ষম।' যে ভগবান নিজের নামের সংখ্যা নিরূপণ করতে অপারগ, তুমি সেই সংখ্যাতীত ভগবানের নামের একটা সংখ্যা নির্ণয় করে রোজ তিন লক্ষ বার নাম জপ কর কেন ?

মুসলমানের ছেলে, খোদার নাম ত্যাগ করে বোল নাম জপ কর কেন ?

খোদাতালার নামের চাইতে ঐ ষোল নামে এমন তেজী বস্তু কি আছে ?

হরে, কৃষ্ণ, রাম—এই তিনটি নামকে ষোল নাম বলে কেন ?

ঐ তিন নামের অর্থ কি ? বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলি রাজা শুক্রাচার্যকে বলেছিলেন—

জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ং।
বিষ্ণুলোকমপাপ্নোতি পুনরাবৃর্তিদুর্লভম্॥

অর্থাৎ যাঁর জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই অক্ষর দু'টি একবার উচ্চারণ হয় তাঁর বিষ্ণুলোকে গতি হয়, এবং তাঁকে সংসারে এসে জন্ম নিতে হয়না, তিনি নির্বাণ মুক্তি পান। একবার হরি নামেই যদি জীব নির্বাণ মুক্তি লাভ করে, তুমি সেই নামের শক্তিতে অবিশ্বাস করে তিন লক্ষ বার নাম জপ কর কেন ? তোমার কি এই নামের গুণে মুক্তি হবে, না 'নাম' অবিশ্বাসের ফলে নরকবাস হবে ? তুমি জাননা, বামদেব দশরথকে তিনবার নাম দিয়ে চণ্ডাল হলেন। ভাল ভাল ফলবান বৃক্ষের ছায়া থাকতে তুমি একটা অশুচি তুলসীগাছের ঝোপা করে তার তলে বসে আছ কেন ? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করে নকুলেশ্বর চলে এলেন। রাজেন্দ্র সরকার উঠে টপ্পার জবাব করতে লাগলেন—

বললে, একবার নামে মুক্তি মিলে, স্বীকার করি তাই।
আছে নামে যে নামী শক্তি,
একবারে জীবকে দেয় মুক্তি,
কিন্তু নামের সনে প্রেমভক্তি, যুক্ত থাকা চাই॥
যেমন কবিরাজী ঔষধ খেলে—
নিদানে লিখে দিয়েছে বিধান ;
অণুপান দিয়ে খেলে, ঔষধে শক্তি করে দান।
জীবের ঘুচাতে ভবব্যাধি, হরিনাম মহৌষধি,
করিতে রোগের পরিত্রাণ।
হরি নাম-ঔষধে হবে দিতে—
প্রেম-চিনি ভক্তি-মধু অণুপান॥

টপ্পার লহর শেষ করে রাজেন্দ্র সরকার প্রথমেই আত্মভূমিকা আরম্ভ করলেন—সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ ! কবিগান শুনবার জন্য আজ আপনারা এই কারাপাড়া জমিদারবাবুদের আসরে সমবেত হয়েছেন। আমি রাজেন্দ্র সরকার, আমার বিপক্ষে ঝালকাঠির উদীয়মান 'সরকার' নকুলেশ্বরকে

বায়না করে এনেছেন। কিন্তু ওর সঙ্গে কবির পাল্লা করা সম্ভব নয়। কারণ, ও আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। আমি আসামাত্র নকুলেশ্বর উঠে আগেই হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার দিয়েছে। কিন্তু আপনারা জানেন, কবিগানটা একপ্রকার যুদ্ধ—বাক্যযুদ্ধে কে কাকে পরাস্ত করতে পারে তাই হলো উদ্দেশ্য। যুদ্ধের আগে প্রণাম দিয়ে যে বশ্যতা স্বীকার করে, তার সঙ্গে কি আর যুদ্ধ চলে? অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদার বাক্যে পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরিয়ে দিতে গিয়ে অর্জুনকে পিতা বলে প্রণাম করেছিলেন। অর্জুন তখন তাকে ভীরু, কাপুরুষ, জারজ বলে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দিলেন। কারণ যুদ্ধের আগে আত্মীয়তা করাটা কাপুরুষের লক্ষণ—আত্মীয়তার পরিচয় হবে যুদ্ধের পরে, আগে নয়। আমি ভীরু কাপুরুষ নকুলেশ্বরের প্রণাম প্রত্যাখ্যান করলাম।

এই বলে রাজেন্দ্র সরকার খুব আস্ফালন করে, তার পরে প্রশ্নের উত্তরে বললেন—কলিযুগে নামই হলো পতিতপাবন। তাই ভাগবতে শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে নাম-মাহাত্ম্য বলতে গিয়ে বলেছিলেন—

ধ্যায়ানকৃতে যজন যজ্ঞান ত্রেতায়াং দ্বাপরেশন।
যদাপ্নুতি তদাপ্নুতি কলৌ সংকীর্ত্যকেশব॥

অর্থাৎ, সত্যে ধর্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্তি ধরি।
কর্দমকে বর দিলা যেহ কৃপা করি॥
কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী।
ত্রেতায় ধর্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥
কৃষ্ণ পদার্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম।
কৃষ্ণ বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চন কর্ম॥
তিন কর্মহীন কলির জীবের উদ্ধারে।
হরিনাম মহামন্ত্র কলিতে প্রচারে॥ (এই হল হরিনাম)

আর— সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু সৎফলম্।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি॥

অর্থাৎ পুণ্য বিষ্ণুর সহস্র নাম তিনবার বললে যে ফল লাভ হয়, কৃষ্ণের নাম একবার মাত্র বললেই সেই ফল পাওয়া যায়—(এই হলো কৃষ্ণ নাম)

রমন্তে যোগিনো, নন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রাম পদে নাসৌপরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ যিনি সত্য, যিনি আনন্দ, যিনি চৈতন্যময় পরমাত্মা, যিনি অনন্ত, তাঁর ধ্যানেই যোগীরা রমণ করেন অর্থাৎ আনন্দ পান বলে, পরম ব্রহ্মকেই রামনামে অভিহিত করা হয়—এই হল রাম নাম এই জন্যই আমি হরে, কৃষ্ণ, রাম এই তিন নামকে লক্ষ্য করে তিন লক্ষ বার নাম করি।

একবার নামে পাপ যায় সত্য ; কিন্তু প্রেম ভক্তি না থাক্‌লে তা হয় না।

হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্বমুক্ত্যাদিসিদ্ধয়।

ভুক্তশ্চাদ্ভুতস্তস্যা ; শ্চেটিকাবদনুব্রতা ॥ (হরিভক্তি বিলাস)

অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধনার সিদ্ধিতে যে ভক্তি মুক্তি লাভ হয়, সেই ভক্তি মুক্তি দাসীর ন্যায় 'ভক্তি' মহাদেবীর অনুগত হয় সেবা করে। অতএব প্রেমভক্তি ছাড়া শুধু নামে হয় না। যেমন…

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিশাস্ত্রং জপস্তপ।

অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥

অর্থাৎ যার ভগবানে ভক্তি নেই তার উচ্চ জাতি, শাস্ত্র পাঠ, নাম জপ, তপ সব বৃথা। মৃত লোকের শরীরে অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর মতোই নিরর্থক।

আল্লা—হরি যে কোন নাম নিলেই মানুষের নম্রতা আসে। যেমন,

"নময়তি ইতি নাম" অর্থাৎ নামে মানুষের মনকে উচ্চ অহঙ্কার পর্বত থেকে নামিয়ে সমতলে আনে ; এই জন্য ভগবৎ মন্ত্রকেই নাম বলা হয়—ইহার মধ্যে আল্লা, হরি, গড্‌ যিশু বিচার নেই। যে নামে যার রুচি হয়, ভক্তি হয়, সেই হল শ্রেষ্ঠ। ভজন রাজ্য কোন জাতির বিচার নেই যেমন—

অষ্টবিধাহ্যেষা ভক্তি যস্মিন ম্লেচ্ছোপিবর্ততে।

স বিপ্রেন্দ্রমুনি শ্রীমান স যতি স চ পণ্ডিত ॥ অর্থাৎ—

আট প্রকার ভাব ভক্তি যদি কোন মুসলমানের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে সেই মুনি, সেই শ্রীমান, সেই যতি, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ।

গুণে কর্মে জাতি বিভাগে ইহাই ভগবৎগীতার মত, যেমন—"চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্ট" ইত্যাদি প্রমাণগুলি রাজেন্দ্র সরকার এমন সুন্দর ভাবে নানা শাস্ত্র গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণ উদ্ধৃত করে পরিবেশন করলেন যে শ্রোতাদের মন মুগ্ধ হলো। এমন কি নকুলেশ্বর নিজেও রাজেন্দ্র সরকারের অগাধ শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নিজেকে খুব ছোট বলে মনে করতে লাগলেন।

রাজেন্দ্র সরকারের ব্রাহ্মণ নিন্দন

হঠাৎ রাজেন্দ্র সরকারের উপর দুষ্টা সরস্বতীর দৃষ্টি পতিত হলো। তিনি অন্য এক প্রসঙ্গ নিয়ে ব্রাহ্মণ নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন। রাজেন্দ্র সরকার কারাপাড়া এসে সন্ধ্যার পূর্বে পৌঁছান। এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে তাঁর দলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। রাত্রে খাওয়ার শেষে উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলা এবং জায়গা পরিষ্কার করা নিয়ে লাগল ঝামেলা। রাজেন্দ্র সরকার নিজে নমঃশূদ্র, আর একমাত্র ঢুলী বাদে দলের দোহারপত্র সবাই তাঁর স্বজাতি। রাজেন্দ্র সরকার সকলকে উচ্ছিষ্ট কুড়াতে নিষেধ করেছেন। সব উঠে গেল। এখন ব্রাহ্মণরাও ছাড়বেন না। উচ্ছিষ্ট নিতেই হবে। এই নিয়ে বচসা হতে হতে বাড়ীর কর্তা নাকি ওদের জাত তুলে বলেছেন—ছোট লোকদের আস্পর্ধা দেখ। যাদের বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ বাড়ীতে চাকর খাটছে, ব্রাহ্মণের পাতের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেয়ে ধন্য হয়েছে, আজ সেই ছোট লোকগুলো ব্রাহ্মণ বাড়ী খেয়ে উচ্ছিষ্ট ফেলবেনা! কালে কালে হলো কি! জাত ধর্ম আর থাকবে না, ম্লেচ্ছ রাজ্য হয়ে যাবে ইত্যাদি। দেহমনে বলিষ্ঠ রাজেন্দ্রের মতো গুণবান ব্যক্তির এসব অসহ্য মনে হলো। ক্ষ্যাপা রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপর খুব ক্ষেপে ছিলেন; এখন আসরে সেই বিষ উদ্গীরণ শুরু করলেন। তিনি বললেন—ব্রাহ্মণ কাকে বলে? যে নবগুণে ব্রাহ্মণ হয় তাকে। সেই গুণের একটাও এসব ব্রাহ্মণের নেই। গায়ত্রী মন্ত্র আমি ওদের শিখিয়ে দিতে পারি। প্রণব মন্ত্র ওঁ আমি বাম পাও দিয়ে পুছে ফেলবো দেখি আমার কি হয়। ব্রাহ্মণের নাকি মুখে আগুন—আমার একগাছা লোম পুড়িয়ে দেখাক দেখি কে সে ব্রাহ্মণ। বেদের কর্তা ব্যাস মুনির বাবা পরাশর এই চাড়ালের ছেলে; এই চাড়ালই ঐ ব্রাহ্মণ জাতির পূর্বপুরুষ। আগে ব্রাহ্মণের যে পঞ্চলক্ষণ ছিল—

> তিলকযজ্ঞসূত্রঞ্চ পবিত্র কুশধারণম্।
> সদা মুখে বেদপাঠ বিপ্রস্য পঞ্চলক্ষণম্॥

কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণের এসব লক্ষণ আছে। এখনকার এই সব কপট ব্রাহ্মণের পঞ্চলক্ষণ হলো—

> চাকুরীবাকুরীশ্চৈব মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা।
> সদা মুখে শ-কার শব্দ বিপ্রস্য পঞ্চলক্ষণা॥

এইভাবে রাজেন্দ্র সরকার গায়ের ঝাল মিটিয়ে ব্রাহ্মণদের মুণ্ডপাত করলেন। যদিও তিনি শাস্ত্রপুরাণ সঙ্গত প্রমাণ দিয়ে বলেছেন, কিন্তু কারাপাড়া ব্রাহ্মণ-

প্রধান গ্রাম। নিজেদের গ্রামের আসরে দাঁড়িয়ে এভাবে নিন্দা করলে তাদের মনের অবস্থা কি হয় তা সহজেই বোধগম্য।

এদিকে ব্রাহ্মণেরা নকুলেশ্বরকে ডেকে বললেন—শুনলে তো বেটার উক্তি। কোন মানুষের মুখ দিয়ে কি এসব কথা বের হয়? আর জানো বেটার আস্পর্ধা কতো? আমাদের এই কালীপূজায় সাত পুরুষ ধরে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। শুধু আমাদের কেন, খুলনা জেলার বড় বড় প্রসিদ্ধ কালী পূজায়, যেমন কারা-পাড়া, পীলজঙ্গ, নওপাড়া, উত্তর পাড়া, হোচলা, দোহাজারী, সাধের গাছতলা, কুদীমায়ের গাছতলা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কালীখোলায় অজস্র বলি হয়ে থাকে। সেই সব বলি বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে। বেটার সাহস কতো! তুমি অবশ্য এর প্রতিবাদ করবে?

নকুলেশ্বর বললেন—আচ্ছা দেখি গুরুদেব কি বলান। রাজেন্দ্র সরকারের আসর শেষ হয়ে গেলে নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে লহর টপ্পার জবাবে বললেন—

বললে, ভক্তি ছাড়া নাম করিলে সারেনা ব্যাধি।
যদি ভক্তি ছাড়া নিলে নাম, সে নামে না হয় পরিণাম,
তবে কোথা থাকে নামের দাম, ভক্তি হয় আদি॥
যদি নামের মধ্যে থাকে শক্তি,
জীবেরে মুক্তি দিবে ভক্তি বই।
অভক্তিতে মদ খেলে ঠিক যেমন আমরা মাতাল হই।
শুনি ভক্তি শূন্য জীবনে, 'হারাম' বলে যবনে,
হয়ে যায় শমন যুদ্ধে জয়ী।
পাপী অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল—
বল তার ভক্তির শক্তি ছিল কই?

লহর শেষ করে নকুলেশ্বর পাঁচালীতে বললেন—ভক্তি ছাড়া নাম নিলে যদি জীবের মুক্তি না হয় তবে নামের 'নামী' শক্তির মূল্য কি? হরি নাম বড় না ভক্তি বড়? বস্তু শক্তিতে কখনো ভক্তি বিশ্বাসের অপেক্ষা করেনা। যেমন, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আগুনে হাত দিলেই হাত পোড়ে—আগুনে বস্তু শক্তির গুণ। ইচ্ছা অনিচ্ছায় মদ খেলে মাতাল হয় কেন? বিষ খেলে মানুষ মরে কেন?

ভাগবতে বলে—

অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোক নাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহে দেধো যথানলঃ॥ (৬।২।১৮)

অর্থাৎ যেমন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কাষ্ঠরাশি মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অগ্নি সেই কাষ্ঠ-রাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ মানুষ জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে ভগবানের নাম একবার উচ্চারণ করলে তাঁর সর্ববিধ পাপসকলকে নামাগ্নিতে দগ্ধ করে। ভক্তি অভক্তির অপেক্ষা রাখেনা।

যথাগদং বীর্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্যান্মন্ত্রোপ্যুদাহৃত॥ ৬।২।১৯

অর্থাৎ যেমন—কোন ব্যক্তি না জেনেও কোন বীর্যবন্ত ঔষধ যদৃচ্ছাক্রমে ভক্ষণ করলে সেই ঔষধ আত্মগুণ প্রদর্শন করে, অর্থাৎ রোগ আরোগ্য করে, সেইরূপ নাম মন্ত্রও অজ্ঞান অভক্তিতে উচ্চারণ করলেও আপনার কার্য অবশ্য করবে। কারণ বস্তু শক্তি কখনো শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না।

দন্তীদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছ হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃনন্॥ অর্থাৎ—

শূওরের দন্তাঘাতে মৃত্যুকালে এক যবন শূওর দেখে যাবনিক ভাষায় 'হারাম হারাম' বলতে বলতে নামাভাষে মুক্তি পেয়ে গেল ; ভক্তির প্রয়োজন হল না।

মহাপাপী অজামিল মরণকালে নিজপুত্র নারায়ণকে ডেকে মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠে গেল। তার ভগবানের নামও ছিল না, ভক্তিও ছিলনা ; শুধু নামাভাষে মুক্তি হল। যথা,

ম্রিয়মানো হরের্নাম গৃনণ্ পুত্র পচারিতাম্।
অজামিলোপগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃনণ্॥ অর্থাৎ

—যে নামের এত শক্তি তুমি সেই নাম তিন লক্ষ বার জপ করে নামের অপমান করছো কেন ?

টপ্পার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এইসব বক্তব্যের পর নকুলেশ্বর বললেন—এখন আসরে একটু আত্মনিবেদন জানাচ্ছি। রাজেন্দ্র সরকার এবং আমি দু'জনই হরি আচার্য মহাশয়ের ছাত্র। সে হিসাবে গুরুভাই। তারপর তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। সেই কারণে তিনি আসরে আসামাত্র আমি পরমার্থ দাদা জ্ঞানে নমস্কার করেছিলাম। এখন বুঝলাম নমস্কারটা সুপাত্রে পড়েনি ; অপাত্রে পড়েছে বলে নমস্কারের মূল্য বুঝতে না পেরে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

অন্ধ হস্তে রত্ন পেলে যত্ন নাহি করে,
শালগ্রামের দাম জানে কি—
চাম-ছোলা চামারে ?

যাহোক আমিও আমার প্রণাম ফিরিয়ে নিলাম। যুদ্ধের পরে পাত্র নির্বাচন হবে। ও পায় ওকে দেবো; না হয় আমি পাই আমাকে দেবে।

তারপর বললেন—লোকের মুখে শুনেছিলাম খুলনা ফরিদপুরে রাজেন্দ্র সরকার খুব জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ 'সরকার' বলে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু আজ তাঁর জ্ঞানের পরিচয় যা পেলাম তাঁতে তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায় না। কোন একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট ফেলা নিয়ে বচসা হয়েছে বলে এতবড় প্রকাশ্য সভায় গোটা ব্রাহ্মণ জাতটাকে গালাগালি করা কি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের পরিচয়? শাস্ত্রে লিখেছে—

দেবাদীনাং জগৎ সর্বে মন্ত্রাধীনশ্চ দেবতা!
তে মন্ত্র ব্রাহ্মণ জ্ঞাত্বা ব্রাহ্মণ সর্বদেবতা॥ অর্থাৎ—

জগতে যত দেবতা আছেন সবাই মন্ত্রের অধীন, ব্রাহ্মণ সেই মন্ত্রের স্রষ্টা ও জ্ঞাতা। সেজন্য ব্রাহ্মণকে সর্বদেবতা জ্ঞানে পূজা করতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৃগু পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে সেই আদর্শ দেখিয়েছেন। বিশেষতঃ—

গুরুরাগ্নি দ্বিজাতিনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ গুরু।
পতিরেক গুরুস্ত্রীণাং সর্বাত্রভ্যাগত গুরু॥

অর্থাৎ ব্রহ্মাদেব হলেন ব্রাহ্মণের গুরু, ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের গুরু, পতি স্ত্রীলোকের গুরু, আর অতিথি হলেন জগতে সকলের গুরু। যা হোক, আমাদের সমাজে যখন খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে নানা সংস্কার চালু আছে, তখন আগে থেকে ব্যাপারটার ফয়সালা করে নিলে পারতেন। এই বলে তিনি নিজ দলের আহারের ব্যবস্থার উল্লেখ করে বললেন—রাজেন্দ্র সরকারকে চাড়াল বলেছে সেই দুঃখে তিনি চাড়ালকে ব্রাহ্মণ জাতির পূর্বপুরুষ বলেছেন। এতে দুই পক্ষই পরস্পরকে গালাগালি করে নিজেদের ছোট করলেন। পরাশর ব্যাসদেবের পিতা, তিনি নাকি ছিলেন চণ্ডালের পুত্র। এ সম্পর্কে আসল কথা হলো—বশিষ্ট ঋষির পুত্র শক্তিমুনি, এক চণ্ডালিনীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন। তার নাম অদৃশ্যন্তি। সেই অদৃশ্যন্তির গর্ভে শক্তিমুনির ঔরসে পরাশরের জন্ম। যে পরাশর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বেদ বেদাঙ্গ ষড়দর্শন পাঠ করেছিলেন সেও হল চণ্ডাল, আর রাজেন্দ্র সরকারও চণ্ডাল! কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে!

পরে জুড়ির পাল্লার সময় নকুলেশ্বর বললেন—শুনলাম রাজেন্দ্র সরকার নাকি 'অহিংসা পরম ধর্ম' পালন করছেন। সেইজন্য খুলনা জেলায় কালীপূজায় বলি বন্ধ করার জন্য যেখানে পাঁঠা বলি হয় সেখানে বায়না নেন না। এ নিয়েও

নকুলেশ্বর রাজেন্দ্র সরকারকে আরো কিছু ঠাট্টা উপহাস করলেন। ফলে ব্রাহ্মণদের ক্রোধ প্রশমিত হলো। নকুলেশ্বর আসর জয় করে নিলেন এবং হাততালি ও হৈ হৈ শব্দের মধ্যে আসর ভেঙ্গে গেল। কারাপাড়া গান শেষ হলো; কিন্তু রাজেন্দ্র সরকার মনে মনে নকুলেশ্বরের উপর খুব রেগে গেলেন। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ক'দিন পরে।

বিমর্ষ নকুলেশ্বর

গান শেষ হলো, নকুলেশ্বর বাহবাও পেলেন; কিন্তু হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও মূঢ়তা দেখে খুবই বিচলিত হলেন। দুই বৎসর পূর্বে গৌরীপুর বাজারে নিম্নশ্রেণীর হাতে নিম্নতর শ্রেণীর যে অবমাননা দেখে ব্যথা পেয়েছিলেন, আজ উচ্চশ্রেণীর হাতে নিম্নশ্রেণীর অমর্যাদা দেখে তিনি আরো মর্মাহত হলেন। নূতন নূতন জায়গায় গান উপলক্ষে যাতায়াত ও বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে মেলামেশার ফলে নকুলেশ্বর দেখলেন বিরাট হিন্দু সমাজটা ভিতর ফাঁপা বাঁশের মতো। এর কোন প্রতিরোধ শক্তি নেই। সামান্য বাতাসেই হেলতে দুলতে থাকে। আর প্রবল ঝড়ের প্রারম্ভেই একদিন মড়মড়াৎ ভেঙে যাবে। রাজেন্দ্র সরকারের মতো গুণী লোক যে সমাজে এমন অমানুষের মতো ব্যবহার পায়, সে সমাজের দিন যে কত শীঘ্র ফুরিয়ে আসছে তা তলা-ফুটো নৌকার আরোহীর মতো সমাজ-নেতারা টের পাচ্ছেন না।

গোলাবাড়ীর গানের বায়না

গান শেষে রাজেন্দ্র সরকার ব্রাহ্মণবাড়ী আহার করলেন না। বিদায়ের টাকা নিয়ে যাবার সময় নকুলেশ্বরের দলের ম্যানেজার হরিচরণ নট্টকে ডেকে বললেন—আমার হাতে এই লগ্নে আর দুই পালা গানের বাসনা আছে; বায়না নেবেন?

হরিচরণ—কেন বায়না নেব না?

রাজেন্দ্র সরকার হরিচরণের হাতে বায়নার টাকা দিকে পাকা এগ্রিমেণ্ট লিখে নিয়ে চলে গেলেন।

হরিচরণ নকুলেশ্বরের কাছে গিয়ে বলল—রাজেন্দ্র সরকার দুই পালা গানের বায়না দিয়ে গেলেন।

নকুলেশ্বর—কোথায় গান?

হরিচরণ এগ্রিমেণ্টের খাতা সামনে মেলে ধরে বলল—এই দেখুন। নকুলেশ্বর দেখলেন গান হবে ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পার্শ্ববর্তী গোলাবাড়ী গ্রামে। চার শত এক টাকা চুক্তি, অগ্রিম একশত টাকা। এগ্রিমেণ্ট দেখে নকুলেশ্বর বললেন—কাজটা ভাল করেননি। কি জানি ওর মনে কি আছে! আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে।

হরিচরণ—ভয়টা কিসের শুনি? গান করতে এসেছি বায়না নেব না? কেন, ও কি বাঘ না ভালুক যে আমাদের খেয়ে ফেলবে! সে দেশেও মানুষ আছে। গুরুর নাম স্মরণ করে চলুন, তিনিই মান সম্মান রক্ষা করবেন।

বিদায়ের টাকা নিয়ে রওনা হবার সময় কারাপাড়ার পূজা কর্তৃপক্ষ নকুলেশ্বরকে বার্ষিক করে দিলেন। যতদিন তিনি বাংলাদেশে ছিলেন বার্ষিক নষ্ট করেন নি।

বাগেরহাটে এসে নৌকা খুলে গোপালগঞ্জ অভিমুখে রওনা হলেন। গানের দিন দুপুরে গোপালগঞ্জে গিয়ে নৌকা বেঁধে খাওয়া-দাওয়া সারলেন। স্থানীয় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল গোপালগঞ্জের পার্শ্ববর্তী খাল দিয়ে গোলাবাড়ী যেতে হবে—মাইল দেড়েক পথ। সন্ধ্যার আগেই নৌকা গিয়ে গ্রামের ঘাটে পৌঁছল। গ্রামে সাড়া পড়ে গেল—ঝালকাঠির দল এসেছে।

নৌকায় বসে সকলে গল্পগুজব করছেন। নকুলেশ্বরের নৌকার পাশেই একটা টাবুরে নৌকা অর্থাৎ এক বৈঠার একটা ভাড়াটে ডিঙ্গি নৌকা ছিল। নৌকার মাঝি জিজ্ঞাসা করল—কঃটায় গান আরম্ভ হবে?

হরিচরণ—রাত এগারটায়।

মাঝি—আপনাদের রান্নাবান্নার তো কোন আয়োজন দেখছিনা।

হরিচরণ—রান্না হবেনা; কর্তাবাড়ীতেই খাবো।

মাঝি—আপনাদের মধ্যে কায়েত বামুন নেই? সবাই কি নমঃশূদ্র?

হরিচরণ—তা হবে কেন? কায়েত, বামুন, নাপিত, ধোবা নবশ্রেণীর লোকই আছে। এক জাতির দল নিয়ে কি আর কবির দল হয়?

মাঝি—সকলেই নমঃশূদ্রের ভাত খাবেন?

হরিচরণ—নমঃশূদ্রের ভাত খাব কেন; কায়স্থ বাড়ী খাব।

মাঝি—এই গোলাবাড়ী কায়স্থ পাবেন কোথায়? সব নমঃশূদ্রের বাস।

হরিচরণ—বলো কি মাঝি! এগ্রিমেণ্টে যে মনোমোহন বসুর নাম দিয়েছে! ঘোষ বসু গুহ মিত্র এরা তো কায়স্থ। তুমি নমঃশূদ্র বলছো কেন?

এর উত্তরে মাঝি যা বলল তা যেমনি চমকপ্রদ তেমনি অবিশ্বাস্ত। মাঝি বলল—জানেন না কর্তা, ঐ সব কায়স্থ কুলীনদের সঙ্গে দশ বৎসর মামলা করে ঐ ঘোষ বসু উপাধি পেয়েছে।

হরিচরণ—কি বলে মামলা করলো ?

মাঝি—এরা দেখালেন, আমরা বিত্তায় বুদ্ধিতে তেজে, ধন ঐশ্বর্যে কোনটায় কম আছি। আমাদের এই গ্রামে পাঁচজন আছেন ব্যারিষ্টার, উকিল মোক্তারের তো হিসাবই নেই। এমনকি আমাদের মধ্যে হালচাষ করা ম্যাট্রিকও আছে। তাহলে আমরা ওসব টাইটেল পাবনা কেন ? কায়স্থ কুলীনরা মামলায় হেরে গেলেন। সেই থেকে ওরা ঘোস বসু মিত্র গুহ হয়েছেন ; এখন আর হালদার, মণ্ডল, মাঝি, বিশ্বাস নয়। বুঝলেন কর্তা সব কুলীন, সব কুলীন।

হরিচরণ এই কথা শুনে দলের চাকর নিয়ে কর্তাবাড়ী গিয়ে বললেন—আমরা রান্না করে খাব ; নতুবা অসুবিধা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন আপত্তি না করে চাল ডাল মাছ তরকারী দিয়ে দিলেন। রাত দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ। নকুলেশ্বর হরিচরণকে বললেন—আপনি গিয়ে আসরের অবস্থাটা দেখে আসুন তো। হরিচরণ এসে বলল—আসর তো নয় এ যেন জনসমুদ্র ! চার পাঁচ বিঘা জমির উপর বিরাট প্যাণ্ডেল করেছে। তার ভিতরে তিল ধারণের জায়গাও খালি নেই। প্যাণ্ডেলের চারপাশে বাইরে খোলা জায়গায় ওরকম চার প্যাণ্ডেলের লোক বসেছে। চোখের দৃষ্টি যত দূর যায় শুধু মাথা আর মাথা। লোকের কাছে শুনলাম—এসব এই গোলাবাড়ী এবং চার পাশের গ্রামের লোক। এটা একটা নমঃশূদ্র প্রধান অঞ্চল। এই যত লোক দেখছেন এর মধ্যে সাড়ে পনের আনাই নমঃশূদ্র ; তবে শিক্ষিত ও ভদ্র। দেখলাম এত লোকের মধ্যে একটি টুঁ শব্দ নেই ; সব শান্ত নীরব।

আসরের অবস্থার কথা শুনে নকুলেশ্বরের প্রাণে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। ভাবলেন, সেদিন কারাপাড়া গ্রামে গান করে রাজেন্দ্র সরকার একটু অপদস্থ হয়েছিলেন—সেটা ছিল কায়স্থ ব্রাহ্মণের সভা। তাই বুঝি আজ আমাকে জব্দ করার জন্ত এই নমঃশূদ্র প্রধান আসরে বায়না করে এনেছেন ?

ফরিদপুর গোলাবাড়ীর গান—নকুলেশ্বর বনাম রাজেন্দ্র সরকার

সময় মতো নকুলেশ্বরের দল আসরে গিয়ে ডাক গান আরম্ভ করলো—

মুক্ত কর পদ মন্দির দুয়ার, আমি যে বিপন্ন অতিথি।
ত্রিতাপ-আতপে তাপিত এ তনু, চলিতে নাহিক শকতি॥

পথের পাথের কিছু নাহি সনে,

অনশনে তনু পোড়ে।

পিপাসা ক্ষুধায় সুপ্ত বসুধায়,

কেহ না সুধায় মোরে।

দিয়ে কৃপা-গঙ্গাজল, কল্প-বৃক্ষ ফল, শীতল করহে শ্রীপতি ॥

ভ্রান্তি অলসে কামনা বিলাসে

অঙ্গ পড়িছে ঢলিয়া,

ভেঙ্গে ঘুম ঘোর সুখ স্বপ্ন মোর

দাও জ্ঞানের আঁখি খুলিয়া

যেন পালটিয়ে আঁখি, জনম ভরে দেখি, মোহন রূপের মূরতি ॥

কোন পথে ঘরে ফিরি পথ চিনিতে নারি

এ পথে হেরি মায়া-নাগিনী।

আমারে করিতে সারা, অদূরে দিয়েছে সাড়া,

ভীষণা জড়া মড়া-বাঘিনী ॥

কে জানি চিনাল পথ ভবে আসিবার বেলা,

যাব বলে বার বার, হয়ে গেল বারবেলা।

দীন নকুলে ভাষে, যাত্রা ভঙ্গ দোষে,

সম্মুখে বাসনা যোগিনী ॥

ডাক গান শেষ করে সমাজ দ্বন্দ্ব মালসী গান শুরু হলো—

চিতান—মা, তোর সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর অন্তে,

ঘোর কলির ঘোর কাল কৃতান্তে,

গ্রাসিল এই সোনার বঙ্গদেশ।

আমরা সমাজশৃঙ্খলে আঁটা, জাতি কৌলিন্যের ঘটা,

হিন্দু ধর্মটা ছুঁৎমার্গ বিশেষ ॥

১ম ফুকার—আমরা হীনদোষের হিন্দু বলে, বেদের বলে গৌরব করি নাকি.

মোদের অন্ধ জ্ঞান-আঁখি;

আমরা বেদ দিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে,

চোখ থাকিতে অন্ধের মত থাকি।

জানিনা সেই বেদের তত্ত্ব, জানিনা হিন্দুর মাহাত্ম্য;

খাঁচায় ভরা প্রভুভক্ত—
আমরা যেমন ব্যাধের তোতাপাখী ॥

ডাইনা—ঘোর কলির সেই ঘোর প্রতাপে,
এখন ম্লেচ্ছেও অজপা জপে,
বেদ উচ্চারণ ক্ষুদ্র শূদ্র মুখে।
যত হিন্দু জাতির জাতিয়তা, বামুন জাতির সুতার পৈতা,
ন্যায়ের দণ্ডে ঠেকেছে বিপাকে ॥

চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্ট, বেদের ভাষ্য গীতায় রাষ্ট্র,
গুণ কর্মে দেখাও উৎকৃষ্ট, কেবা বামুন কেবা যবন।
ব্রহ্মতত্ব ন জানাতি, বামুন জাতি কে করে বরণ ॥

২য় ফুকার—আমরা বেদের দোহাই দিয়ে সবাই,—
অন্ধ হিন্দু দেখাই হিন্দুয়ানী—আমরা বেদের কি জানি;
আমরা চিনিনা চিনির আস্বাদন,
চিনির বলদ চিনির বস্তা টানি।
বেশ্যাপুত্র সেই বশিষ্ঠ, দেখালেন বেদের বৈশিষ্ট্য;
মৎস্যগন্ধার গর্ভ সৃষ্ট, বেদের কর্তা হলেন সেই ব্যাসমুনি ॥

অন্তরা—অনার্য আজ আর্য হল—উঠল সাড়া রাজ্য জোড়া,
আর্যধর্ম উঠল জেগে, উন্নত অনার্য যারা ॥
কেউ যদি ভাই ছোট থাক, কর্মোন্নতি ভুলো না'ক,
কর্ম করে ধর্ম রাখ, ভুলে যাও ভাই জাতির ধারা—
জাতি হয়না কর্ম ছাড়া॥
শুচিস্পর্শ বিষম বিষে, ঘিরেছে এই বঙ্গ দেশে;
বিষের বিনাশ করবি কিসে, শিখ মন্ত্র বিষের ঝাড়া—
ছুঁৎমার্গ পরিহার করা ॥

পরচিতান—আমরা এলেম যারা মানুষ সাজে,
মিশব মানুষের সমাজে,
তার মাঝে কেন এত অনিয়ম ॥
বন্য পশুর সমাজ নয় মন্দ, তাদের নাই জাতির দ্বন্দ্ব,
মানুষ জ্ঞানান্ধ, পশুরও অধম ॥

৩য় ফুকার—হিন্দুর জাতিবদ্ধ ঘরের চালে,
হুঁকার জলে জাতিয়ত্তা ভরা—এই ত সমাজের ধারা ;
যত শুচিস্পর্শ নদীর জলে, দধির জলে যায়না জাতি মারা।
কুকুর বিড়াল কোলে তোলে, স্নান করতে হয় মানুষ ছুঁলে,
এ সমাজকে সমাজ বলে, নররূপী বড় পশু যারা ॥

৪র্থ ফুকার—হিন্দুর আর্যগুরু ভটচার্যেরা আর্যধর্ম দিল রসাতলে,
তাসার সূতা দেয় গলে ;
তাদের পূজার ফুল চণ্ডালে ছুঁলে,
দোষ ঘোচেনা গঙ্গাজলে ধুলে।
বিল্বপত্র গাছে কাঁটা, চাকর বিনা তুলবে কেটা ;
রামধনা সেই চণ্ডাল বেটা—
বেলপাতা আর পদ্ম তুলবার কালে ॥

এর পর রাজেন্দ্র সরকারের দলও নিম্নোক্ত ডাক ও মালসী গান গাইল—

আমার হৃদয় মন্দিরে বাজায়ে মন্দিরে
কে গো তুমি গেলে,
যখন ভালবাস আবার এস
বিদ্যুৎ বাতি জ্বেলে।
এরূপ মাঝে মাঝে তড়িৎ সেজে
কি বুঝে বা আবার এলে ॥
এত মনোহর যার ছবিখান,
তার সাজে কিহে এত অভিমান,
ত্বরা এস জুড়াইতে প্রাণ—
সুমধুর খেলা খেলে ॥
ত্রিতাপে তাপিত পাপময় দেহ,
তার মাঝে তোমার শান্তিময় গেহ,
তুমি বিনে জানেনা কেহ—
সাধ্য কার দ্বার খোলে ॥
আমার রুদ্ধ হৃদয় দ্বার এস গুণাধার—
শ্রীকর পরশে মেলে ॥ ইত্যাদি—

এবং তার পর মালসী মনশিক্ষা গান ধরল—

গুরু হরিবর, শ্রীহরিচরণ, চরণ শরণ তারণ কারণ—
সভক্তিতে ধারণ কর হৃদে।
মনরে, থাকলে পবিত্র স্বভাব, এভবে কিসের অভাব,
সবই লাভ হবে রাই পদ প্রসাদে ॥
করে বিষয় চিন্তে কুবাসনা, সৎকর্ম হলনা, অর্থ অভাবে—
তবে দিন কি বৃথা যাবে।
মনরে আমার কথা ধর,
যা করতে হয় আজই কর,
আজ বাদে কাল যদি মর, দশাননের দশা হবে ॥
তাইতে শুভ কর্ম করতে তোমায় দিব উপদেশ—
হবে আত্মতত্বে করে প্রবেশ, সৎকর্ম সাধন করা।
চিন্ময় রাজ্যে সেজে রাজা, মহাকালীর কর পূজা,
বিবেক নামক পুরোহিতের দ্বারা। ইত্যাদি—

কবির আসরে কবি-রত্ন

প্রথমদিনে নকুলেশ্বরই আগে আসরে গিয়েছিলেন; দ্বিতীয় দিন জবাবে থাকবার জন্য। নকুলেশ্বর প্রশ্ন করার চেয়ে জবাব করতে ভালবাসেন। এ স্বভাব তাঁর মজ্জাগত। ডাক-মালসীতে উভয় দলের প্রথম আসর সমাপ্ত হলে সখী সংবাদের আসরে নকুলেশ্বর গুরু গুরু বলে যাত্রা করলেন। গিয়ে দেখলেন আসর তো নয়, ঠিকই যেন জন-সমুদ্র। তদুপরি আসরের ঘেরের মধ্যে আট দশজন কবি-রত্ন শ্রোতা হয়ে বসে আছেন। ফরিদপুর জিলার ওলপুর নিবাসী বাঘা কবি দুই ভাই, হরিবর ও মনোহর সরকার—যাদের নাম শুনলে নদীর কুমীর ডাঙ্গায় উঠতো। তারা দু'জন আবার রাজেন্দ্র সরকারের আপন মাতুল। তাঁদের সঙ্গে বসেছেন ছোট রজনী, বড় রজনী, কুড়ালতলার কামিনী সরকার, ঘাগরের শশী সরকার—এরা প্রতেকেই এক একটি রত্ন। আর ছোট খাটো সরকারের তো হিসাবই নেই। তদুপরি রাজেন্দ্র সরকারের প্রথম জীবনে কবিগানে হাতে খড়ি ঘটে তাঁর মাতুল ঐ হরিবর সরকারের কাছে। তিনি একাধারে ভাগ্নে এবং শিষ্য।

আসরে ঐ সব নবরত্ন দর্শন করে নকুলেশ্বরের হাত পা যেন অবশ হয়ে আসছে। কারণ একে তো নমঃশূদ্রের আসর, তার মধ্যে যে কয়টি রত্নের কথা

বলা হলো তারাও সব নমঃশূদ্র। এদের মধ্যে নকুলেশ্বরের মতো একটা ছোট কায়স্থ কিশোর কবি কি বলতে কি বলে অপমান হবে এই ভাবনায় নকুলেশ্বরের অবস্থা সেদিন সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মতো। নকুলেশ্বর বুঝলেন তাঁর ধারণাই ঠিক। স্বজাতি প্রধান আসরে এনে নকুলেশ্বরকে নাস্তানাবুদ করাই রাজেন্দ্র সরকারের উদ্দেশ্য।

নকুলেশ্বর ভূলুণ্ঠিত মস্তকে আসরের সকলকে প্রণাম করে নিজের দৈন্য প্রকাশ করলেন। পরে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন—অনুমতি করুন, এখন আমি কি করবো ?

যে আসরে হরিবর মনোহরের মতো কবিরত্ন উপস্থিত সেখানে কি অন্য কোন শ্রোতা অনুমতি দিতে পারে ? এক বাক্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বললেন—আসরে মধ্যে ঐ যে রাঙ্গা কর্তা, কালা কর্তা বসে আছেন তাঁরাই যা হয় অনুমতি করবেন।

রাঙ্গাকর্তা হলেন মনোহর সরকার। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মাথায় দীর্ঘ চুল, মুখে দাড়ি। দেখতে ঠিক ব্যাস-বশিষ্ঠের মতো চেহারা। তাই সকলে তাঁকে রাঙ্গাকর্তা বলে ডাকতো। আর হরিবর সরকারের মাথায় টাক, মুখে দাড়ি, শান্তশিষ্ট চেহারা। তবে রংটা একটু কালো বলে সকলের কাছে তিনি ছিলেন কালাকর্তা। নকুলেশ্বর অনুমতি চাইতেই তাঁরা বললেন—তুমি এখন টপ্পা-পাঁচালী আরম্ভ করো। নকুলেশ্বর টপ্পার লহর আরম্ভ করলেন—

অদ্য কল্পনায় কালকেতু আমি, নিষাদের পুত্র।
তুমি কলিঙ্গ রাজ পুরোহিত,
চিরদিন করো পুরের হিত,
কেন অদ্য দেখি বিপরীত, তোমার চরিত্র ॥
অদ্য দৈববাণী কানে শুনি—
ভবানী এলেন কলিঙ্গ দেশে,
পূজিতে মায়ের চরণ, এসেছি মনের মানসে।
আমি সাজাতে মা'র পদতল, নিয়ে জবা বিল্বদল,
ঢুকিলেম মন্দিরে এসে।
তুমি চুলে ধরে আজ আমারে—
কও ঠাকুর প্রহার করো কোন্ দোষে ?

উক্ত ভাবের ভিত্তিতে টপ্পা তৈরীর পেছনে নকুলেশ্বরের উদ্দেশ্য হলো

রাজেন্দ্র সরকারকে বর্ণহিন্দুর ভূমিকায় রেখে নিজে নীচ জাতির পক্ষ সমর্থন করা—নীচ জাতিও যে গুণে কর্মে উচ্চ বর্ণের সঙ্গে শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে তাই প্রতিপন্ন করা। তা হলে আর নমঃশূদ্র শ্রোতৃবৃন্দ তার উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারবে না। টপ্পার লহর শেষ করে তিনি পাঁচালীতে বললেন—আমি অপবিত্র নিষাদ; তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অপবিত্রকে পবিত্র করবে। গঙ্গাজল যেমন মহাপাপীকে পাপমুক্ত করে, তুলসী যেমন অপবিত্রকে পবিত্র করে তেমনি সৎ ব্রাহ্মণ স্পর্শ করে অশুচিকেও শুচি করবে। মহাপাপী দেখে গঙ্গা যদি পাপের ভয়ে পলায়ন করে, সে গঙ্গা গঙ্গা নয়, পাতকুয়ার জল; সে তুলসী তুলসী নয়, চ্যাঙ্গা গাছ। পরশমণি যদি লোহাকে সোনা না করতে পারে তবে সে পরশ পাথর নয়, শীলনোড়া।

আর তোমার মন্দিরের ঐ দুর্গা মা হলেন জগৎ জননী। ডোম, হাড়ী, মুচী, চণ্ডাল, শুচি, অশুচি, কীটপতঙ্গ সবই তিনি প্রসব করেছেন—তাই তিনি বিশ্বপ্রসবিনী জগজ্জননী মা।

অঙ্গে বিষ্ঠামাখা ছেলে যদি মায়ের কাছে যায়, মা কি অশুচির ভয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন, না মলমূত্র পরিষ্কার করে ছেলেকে বক্ষে ধারণ করেন?

আমি নিষাদ হলেও মায়ের পুত্র; মায়ের পায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করতে মন্দিরে এসেছি। তুমি আমাকে প্রহার করে তাড়িয়ে দিলে কেন?—ইত্যাদি প্রশ্ন করে নকুলেশ্বর তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

রাজেন্দ্র সরকার বাব্‌ড়ি চুলে ঝাড়া দিয়ে উঠে জবাব দিতে আরম্ভ করলেন—

ও তুই ব্যাধের পুত্র কালকেতু, আজ কবির কল্পনায়।
করে বনে বনে বিচরণ, জীবহিংসা করো সর্বক্ষণ,
অপবিত্র তোর মতন, কে আছে ধরায়।
আমি দুর্গা মায়ের পূজা করি,
সম্মুখে দিয়ে ষোড়শ উপচার
তুই এসে মণ্ডপ ঘরে—
করলি সেই পূজায় অনাচার॥
যত দেব দেবীর পূজা করা, মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ ছাড়া',
অপরের নাইকো অধিকার।

ও তুই সেই পূজা করলি অশুদ্ধ—

তাই অস্ত্র তোরে করেছি প্রহার ॥

রাজেন্দ্র সরকার পাঁচালীতে বললেন—তুই নিষাদের পুত্র কালকেতু ; জাতিতে তোরা ব্যাধ, জীবহিংসা করাই তোদের ধর্ম। সেকারণে তমঃগুণ-সম্পন্ন, অশুচি। শুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবদেবীর পূজা করতে কেবল মাত্র সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন নীচ জাতের অধিকার নেই। শাস্ত্রে বলে 'মন্ত্রাধীনশ্চ দেবতাঃ'—অর্থাৎ সব দেবতাই মন্ত্রের অধীন। ব্রাহ্মণগণ সেই মন্ত্র জ্ঞাতা, তাই ব্রাহ্মণকে সর্বদেবতা বলা হয়। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রশক্তির জোরে মৃন্ময় মূর্তির ভিতরে চিন্ময় শক্তি দান করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন।

কয় দিন পূর্বে কারাপাড়ার গানে রাজেন্দ্র সরকারের ব্রাহ্মণ নিন্দার প্রতিবাদে নকুলেশ্বর যে সব প্রমাণ প্রয়োগ করেছিলেন, আজ নকুলেশ্বর কৌশলে রাজেন্দ্র সরকারের মুখ দিয়ে সেই কথাগুলিই বের করে নিলেন। পাঁচালীর শেষে রাজেন্দ্র সরকার বললেন—তুই অস্পৃশ্য ব্যাধ হয়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দির অপবিত্র করেছিস, তাই তোকে প্রহার করে বের করে দিয়েছি।

দ্বিতীয় আসরে নকুলেশ্বর তার জবাবে বললেন—

আমি ব্যাধের পুত্র অপবিত্র, হিংসাতে থাকি।
হয়ে মায়ের পূজায় আসক্ত, তোমরা সব পবিত্র শাক্ত,
দাও যে মেষ মহিষ ছাগের রক্ত,—অহিংসা নাকি ?
জানি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদরী—
যার সৃষ্টি কীট পতঙ্গ সুরাসুর ;
জঘন্য পশু হতে, মানুষ কি ঘৃণ্য এত দূর ?
যিনি বিশ্বপ্রসবিনী মায়, পুত্র যদি কাছে যায়,
মা'র পূজায় যদি হয় কসুর।
তবে কোন্ পুণ্যেতে মণ্ডব ঘরে—
স্থান পেল জঘন্য মহিষাসুর ?

পাঁচালীতে বললেন—আমরা ব্যাধ, প্রাণী হিংসা করি বলে যদি অপবিত্র অশুচি হয়ে থাকি, তবে তোমরা মায়ের পূজায় যে মেষ মহিষ ছাগের রক্ত দিয়ে পঞ্চ-মকারে মায়ের পূজা কর, সেটা কি প্রাণী হিংসা নয় ? মা যদি বিশ্বপ্রসবিনী, তবে মেষ মহিষও তো সেই মায়ের সন্তান। মা কি নিজের সন্তান-বলি গ্রহণ করেন ? কালিকাপুরাণে মা বলেছেন—

মম নামে মম যজ্ঞে যে নরা পশুঘাতকা।

তে নরা নরক যাস্তি যাবশ্চন্দ্র দিবাকরঃ ॥ অর্থাৎ—

আমার নামে আমার যজ্ঞে আমার দ্বারে যারা পশুঘাতণ করে তারা যতদিন চন্দ্র সূর্য উদয়-অস্ত থাকবে তত দিন নরক ভোগ করবে। তা সত্বেও তোমরা নরকে যাবার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছ—অশুচি কি আমরা না তোমরা ?

দেবদেবীরা কি জাত অজাত শুচি অশুচি বিচার করে পূজা গ্রহণ করেন ? তাঁরা প্রেমভক্তির কাঙ্গাল। ভক্তি থাকলে জাতে অজাতে কিছু আসে যায়না। ভাগবতে বলেছেন—

বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দ নাভ—
পাদারবৃন্দ বিমুখাৎ শপচং বরিষ্ঠম্।
মন্থে তদর্পিতমনো বচনে হিতার্থ—
প্রাণং পুণাভিসকুলং ন তু ভূরিমান॥ (৭।৯।১০)

অর্থাৎ সত্য ধর্ম ইত্যাদি বারোটি গুণ যে ব্রাহ্মণের কাছে, সেও যদি পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল থেকে বিমুখ হয় তবে তার চেয়েও সম্মানের পাত্র হবে চণ্ডাল, যে সঁপে দিয়েছে তার মন বাক্য চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ। সেই চণ্ডালই বংশকে পবিত্র করে—মান-গর্বিত ব্রাহ্মণে নয়। যেমন—

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণা
হরিভক্তি বিহীনা যে দ্বিজ শপচাধমঃ॥ অর্থাৎ—হরিভক্তিযুক্ত চণ্ডাল হলে সে মুনিরও শ্রেষ্ঠ, আর হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ হলেও সে শপচ্ অর্থাৎ চণ্ডাল হতেও অধম। তাই—

চণ্ডালোপি মুনি শ্রেষ্ঠ—
থাকিলে প্রাণে ভক্তি বল
আমি ভক্তি থাকতে পাইনা কেন—
মাতৃত্বের দখল।
পশু যার কৃপার পাত্র
কৃপা পায় দিবা রাত্র,
হ'ল কোন দোষে আজ অপবিত্র—
নিষাদের গঙ্গা বিল্বদল॥

ভাবুক কবিরা বলেছেন—

মিছে বল জাতিকুল—
যে কোন কুলেতে হোক না জনম
কেবল ভকতি মূল।
দেখনা কি কুল বিদুরের ছিল
প্রভু খায় যার ঘরে,
চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিল
গুহক চণ্ডাল বরে।
বানর কুলেতে বীর হনুমান
হইল ভকত রাজ,
রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বসে
রামের সভার মাঝ।
দৈত্য কুলেতে প্রহ্লাদ জন্মিয়া
নৃসিংহে করিলেন বশ,
কোন্ কুলে পেল গোপ গোয়ালিনী
শ্যামের পিরিতি রস।
রুইদাস মুচী হয়ে গেল শুচি
এমনি ভকতি বল,
শবরীর ঘরে রাম কৃপা করে
খেয়েছেন উচ্ছিষ্ট ফল।
তাই বলি ভাই কুলের বড়াই
জাতির গুমান ছাড়ো।
দম্ভ ত্যজিয়া ভক্তিতে মজিয়া
ভক্তের চরণে পড়ো।

বিশ্বপ্রসবিনী মায়ের কাছে কি জাতির বিচার আছে? অতএব—

ঘুচায়ে জাতির ভান মতিমান
খুলিয়ে দেখ দুটি জ্ঞান-আঁখি।
যিনি জগন্মাতৃ জগদ্ধাত্রী—
তার আবার পবিত্রাপবিত্র কি?
হয়ে প্রসন্নময়ী সুপ্রসন্না সবার অন্ন খায়,

হাড়ি মুচী চণ্ডালেও যদি ভোগ লাগায়—
মাতা তার বাড়ীও যায়।
ও সেই মুচীর অন্ন খেয়ে কি মায়—
মুখ ধুতে বামুন বাড়ী যায় নাকি ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু চণ্ডীতে পড়,
কাজের বেলায় মাকে জাতির গণ্ডিতে ভরো—
তোমরা পণ্ডিত তো বড়।
তোমার মা চণ্ডী সূক্ষ্ম না জড়—
আগে তার স্বরূপ-তত্ত্ব কও দেখি ॥

—আমি নিষাদ হই, চণ্ডাল হই মানুষ তো বটে। আমার প্রেম আছে, ভক্তি আছে. আমি মায়ের মন্দিরে গেলে যদি মন্দির অপবিত্র অশুচি হয়, মায়ের জাতি নষ্ট হয়, তবে তোমাদের মায়ের মন্দিরটা যে একটা চিড়িয়াখানা তাতে দোষ হয় না? যেমন মন্দিরের দিকে তাকালে আমরা দেখি—

মা আমার সিংহবাহিনী,
কার্তিকের বাহন হয় শিখি ;
আবার লক্ষ্মী মায়ের বাহন হলো
সেই পেঁচা পাখী।
বৃষেতে শিবের গতি, মুষিকে গণপতি
ঐসব সিংহ বলদ ইঁদুর হাতী—
ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিভাই নাকি ?

এই বলে নকুলেশ্বর ডাক পাঁচালী বন্ধ করে বারো পর্দা সুরে ধুয়া ধরে তাঁর সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ ধুয়ার মধ্যে কীর্তন রাগিণীতে পদযোজনা করতে লাগলেন। কীর্তন রাগিণীতে পাঁচালী এক হরি আচার্য মহাশয় ছাড়া ওদেশে আর কোন সরকার বলতে পারতেন না। একমাত্র নকুলেশ্বরই আচার্য কর্তার সে ক্ষমতার একত্ব লাভ করেছিলেন। ঐ কীর্তন সুরে শ্রোতাদের মন মুগ্ধ করে নিতেন। কীর্তন সুরে তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আরো ব্যাপক আকার দিলেন এবং বললেন—

লবকুশের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের অর্থাৎ রাম মিতার সাহায্য করতে গুহক চণ্ডাল সৈন্যসেনা সহ সরযূ নদীর তীরে উপস্থিত হলে রামচন্দ্র হনুমানকে আদেশ দিলেন—তুমি কাঁধে করে সৈন্যসেনাসহ আমার গুহক মিতাকে পার করে

আনো। হনুমান বললেন—না, না প্রভু! আমাকে এ আদেশ করবেন না। ঐ চণ্ডালের গোদা পা (গুহকের এক পায়ে গোদ ছিল) আমি কাঁধে নিতে পারবো না। শুনেছি ও নাকি আপনার পরম ভক্ত। আমরা লঙ্কায় যাওয়ার সময় গাছ পাথরে দুস্তর সাগর বন্ধন করেছিলাম। এ চণ্ডাল যদি এ সামান্য সরযূ নদীতে সেতু বেঁধে আসতে না পারে তবে ও আপনার কেমন ভক্ত ?

হনুমানের দম্ভপূর্ণ আস্ফালন শুনে গুহক করজোড়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বললেন—হে রাম, হে করুণানিধি, আমি যদি কায়মনোবাক্যে তোমাকে ভক্তি করে থাকি, তবে আমার এই গোদা পায়ে গোদের সেতু হোক।

এই বলে চণ্ডাল গুহক সরযূর জলে তার গোদা পা ভাসিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে এক অপূর্ব গোদের সেতু প্রস্তুত হলো। সৈন্যসামন্ত সব পার হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে হনুমান মনে মনে বলছেন—একি হলো ? একি যাদু না মায়া ? আমরা কতশত পরিশ্রম করে সমুদ্রে সেতু বেঁধেছিলাম। আর এই চণ্ডাল বেটা বিনা পরিশ্রমে বিনা খাটুনিতে গোদের সেতু বেঁধে ফেললো। আচ্ছা মজাটা দেখাচ্ছি। আমি এখন ওর ঐ গোদের সেতু ভেঙ্গে ফেলবো।

এই ভেবে হনুমান বিরাট দেহ ধারণ করে লাফ দিয়ে গুহক চণ্ডালের গোদের সেতুর উপর পড়ে খুব জোরে জোরে ঝাঁকি দিতে লাগলেন। সেতু কড়মড় কড়মড় শব্দ করছে। গুহক করজোড়ে শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বললেন—হে ঠাকুর, হে রামামিতা, সত্যিই যদি তুই আমাকে মিতা বলেছিস্, আমি যদি সত্যিই তোকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি করে থাকি, তবে এই অধম চণ্ডালের মান রক্ষা কর প্রভু!

আর কি রামচন্দ্র ধৈর্য রাখতে পারেন। তিনি অস্বতন্ত্র ভক্ত পরাধীন। ভাগবতে দুর্বাসার প্রতি নারায়ণের বাক্য—

অহংভক্তপরাধীনা হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভিগ্রস্ত হৃদয়োভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়॥ (৯।৪।৬৩)

অর্থাৎ "হে দ্বিজ দুর্বাসা ; আমি ভক্ত পরাধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্র, ভক্তজন আমার প্রিয় ; এই কারণে সাধুভক্তরা আমার হৃদয় গ্রাস করেছে।" ভক্ত গুহকের ডাকে ভগবান রামচন্দ্র আর দূরে থাকতে পারলেন না। হনুমানের দর্প চূর্ণ করবার জন্য জলের তলে গিয়ে—

চণ্ডালের গোদা পাও কাঁধে তুলে নিল।
প্রেমানন্দ ভক্তগণে হরি হরি বল॥

এই কথা বলামাত্র আসর হরিধ্বনি হুলুধ্বনিতে মুখরিত হলো। নকুলেশ্বর ধুয়া ছেড়ে দিয়ে আসরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে প্রথম দিনের গান শেষ করে নৌকায় চলে গেলেন।

রাজেন্দ্র সরকার যদিও তাঁর দ্বিতীয় আসর বলতে উঠলেন ; কিন্তু যশ করতে পারলেন না। কারণ চিরদিন ব্রাহ্মণ তথা বর্ণহিন্দুগণ কর্তৃক নিন্দিত ধিকৃত এবং উৎপীড়িত নমঃশূদ্র প্রধান গোলাবাড়ীর আসরে নিষাদ চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতিকে ঘৃণা করে ব্রাহ্মণের যশোগাথা গাইলে তাঁর নিজেরই হার হয় এবং আসরের সমর্থনও পাবেন না। উভয় সঙ্কটে পড়ে তিনি কোন রকম ঠেকা কাজ করে আসর ভেঙ্গে দিয়ে প্রথম দিনের গান শেষ করলেন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বৈরথ

দ্বিতীয় দিনের গানের আসর প্রথম দিন থেকেও জমজমাট। আজ রাজেন্দ্র সরকারের প্রথম আসর। রাত দশটায় আসরে রাজেন্দ্র সরকারের ঢোল বেজে উঠলো।

যুদ্ধের ভেরি কাড়া নাকাড়া বেজে উঠলে যোদ্ধাদের মনে যেমন অবস্থা হয় নকুলেশ্বরের দলের দোহারপত্রেরও সেই রকম উৎসাহ উদ্দীপনা। নকুলেশ্বরও আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। রাজেন্দ্র সরকার দল নিয়ে আসরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দল নিয়ে আসরে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে বসে দেখলেন রাজেন্দ্র সরকার সুটপরা ফিটফাট চেহারা একজন বিশিষ্ট ভদ্র লোককে এনে আসরের সামনে বসিয়ে দিলেন। গতকাল তিনি ছিলেন না। পরিচয় নিয়ে জানলেন তিনি সেই দিগ্বিজয়ী কবি হরিবর সরকার অর্থাৎ কালা কর্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, জর্জ কোটের উকিল ; রাজেন্দ্র সরকারের মামাতো ভাই। গত দিনের কবি রত্ন কয়টিও এসে যথাস্থানে বসেছেন।

গান আরম্ভ হলো। নিয়মমাফিক দু'পক্ষের ডাক-মালসী গান শেষ হয়ে গেল। রাজেন্দ্র সরকার সখী-সংবাদ গাওয়ালেন। বিরহবিধুরা রাধারানী সখীদের কাছে তাঁর অন্তর্দাহের কথা বলছেন—গানটির মুখ্য পদগুলি নিম্নরূপ—

১। জ্বলে বিচ্ছেদ আগুন সহস্র গুণ রাধিকার বক্ষে।
ছুটল আগুনের বাণ, কে তাহা করিবে নির্বাণ
দুর্বলা অবলার পরাণ, পোড়ে অলক্ষে॥

২। রাধার বক্ষ মাঝে দুঃখের আগুন এতই প্রবল,
নাইরে জল, জল বিনিময় নয়নে অনল।
উপসর্গ দীর্ঘশ্বাসে, দীপ্তানল ঢালে বাতাসে,
রসময় শ্যাম রসের আসে, বিবর্ণ রাই স্বর্ণ শতদল ॥

৩। অতি ভগ্নদেহ আগ্নেয়গিরি, কাতরস্বরে কিশোরী,
উদ্গারে দীপ্ত অঙ্গার।
জ্বলে আগুন হৃদয় মাঝে, পারিনা যে সইতে সই আর!

৪। কোথা গেলে জুড়াবে প্রাণ বলে দে লো সজনী,
চিনিতে না পারি আমি, দিবা কিংবা রজনী।

৫। সবাই আমায় করল ব্যাকুল,
কোন কালে পাব কি কূল, এ বিচ্ছেদ অকূল পাথার ॥

৬। সখি, যে বনে শ্যাম আমায় নিয়ে করিত ভ্রমণ,
অনুক্ষণ ভুলে তথায় করি অন্বেষণ।
যেন তারে দেখি দেখি, ভুলের দেশে ভালই থাকি,
ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সখী, আগুনে আবৃত বৃন্দাবন ॥

৭। হৃদয় পিঞ্জর ছেড়ে, শ্যাম-শুক গিয়েছে উড়ে,
এখন পিঞ্জরে গুঞ্জরে পোড়া দুখ।

৮। জল নয় সে সুশীতল করে,
আগুন নয় পোড়ায় আমারে,
এত কাঁদায় জনম ভরে,
তবু তারে চাই কেন সই বল ॥

নকুলেশ্বর সখীদের জবানীতে উক্ত গানের জবাব গাওয়ালেন—

১। দেখে রাই রঙ্গিনীর উন্মাদনা, অমনি সঙ্গিনীগণ কয়।
তোরে বলব কি বিধুমুখী, কৃষ্ণ সুখে তুই সুখী,
কেন দেখি হেন বিপর্যয় ॥

২। বললে, সবাই আমায় করল ব্যাকুল,
কোন কালে পাব কি কূল, বিচ্ছেদের অকূল পাথার,
যদি বিচ্ছেদ সাগর হবি পার।
সাজাইয়ে দেহতরী, প্রেমানুরাগ বোঝাই করি,

রাই, তোর ধৈর্যকে করে কাণ্ডারী,
পার হয়ে যা পারাবার ॥

৩। আঁধারের পর আলোরাশি বিধাতার বিধান,
কান্নার পরে হাসির তুফান দুঃখান্তে সুখ কার না হয়।
দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা, দুঃখ বিনা সুখী কেহ নয় ॥

৪। কোথা গেলে পাবি তারে, শুনতে চাইলি রাই,
কান্তের জন্য কাঁদিস শুধু অন্তর্দৃষ্টি নাই।
প্রেমময় শ্যামসুন্দরে, পাবিনা হাটে বন্দরে,
আছে তোর হৃদি কন্দরে, মনোমন্দিরে মনোময়।
প্রেমিকে করে না কভু—প্রেম বিরহের ভয় ॥

৫। বললে, ভুলের ঘোরে ভাল থাকি,
ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সখী, শ্রীবৃন্দাবন অগ্নিময়,
রাধে করিসনা বিরহের ভয়।
সৌভাগ্য বাতাসে যবে, শ্যাম-জলধর উদয় হবে,
প্রাণের সকল আগুন নিবে যাবে,
মিলন মেঘের বরিষায় ॥

৬। বললে, হৃদয়-পিঞ্জর শূন্য করে, শ্যাম-শুকপাখী গেল উড়ে,
পোষা পাখী থাকে যার,
উড়ে গেলেও আসে আবার,
আশা পানে চেয়ে থাকিস
আবেগে নাম ধরে ডাকিস,
পাখীর অপেক্ষাতে খুলে রাখিস,
হৃদি-পিঞ্জরের দুয়ার ॥

৭। বললে, এত কাঁদায় জনম ভরে, তবু কেন চাই তারে,
যার জন্যে যার কাঁদে প্রাণ,
ছোটে নয়ন-গঙ্গায় প্রেমের-বান।
যত কাঁদায় বন্ধু তোরে,
ততই সে বাঁধা পড়ে,
হয়না জন্ম কিংবা জন্মান্তরে,
প্রেমের কান্নার অবসান ॥

রাজেন্দ্র সরকার বনাম নকুলেশ্বর

বিচ্ছেদ গানের জবাব হয়ে গেল। আসরের সকল শ্রোতাই এখন টপ্পা পাঁচালী শোনবার জন্ম উদগ্রীব। হরিবর এবং মনোহর সরকার বললেন—রাজেন, এখন গান বন্ধ করে টপ্পা কর।

মাতুলদ্বয়ের আদেশ পাওয়ামাত্র রাজেন সরকার উঠে টপ্পার লহর করলেন—

আমি পরিব্রাজক হরি শর্মা কাব্য ভূমিকায়।
তুমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তোমার নাম শুনেছি আমি,
তুমি গৌরাঙ্গ প্রেমের প্রেমী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়॥
নাকি তুমি সেই অদ্বৈতের বংশ. করিয়ে গৌরাঙ্গ মন্ত্র গ্রহণ,
ভক্ত সঙ্গে নদীয়ায় করিতে হরিসংকীর্তন।
হঠাৎ কি বুঝে কাহার কথায়,
ছুটে এসে কলকাতায়, স্বধর্ম দিয়ে বিসর্জন॥
ব্রাহ্ম কেশব সেনের দলে মিশে—
কও তুমি ব্রাহ্ম হলে কি কারণ?

টপ্পা শেষ করে পাঁচালীতে ঐ বিষয় বিস্তার করে বললেন - তুমি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাপ্রভু অদ্বৈতের বংশধর। হঠাৎ কার পরামর্শে কোন আদর্শে তুমি সে বৈষ্ণব ধর্ম ত্যাগ করে, কলিকাতায় এসে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী কেশব সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে? শাস্ত্রে লিখেছে—

গুরু ত্যজে গোবিন্দ ভজে,
সেই পাপী নরকে মজে! অর্থাৎ—

দীক্ষাগুরুকে ত্যাগ করে কেহ যদি স্বয়ং গোবিন্দকেও ভজনা করে তথাপি তার নরকে পতিত হতে হয়। তুমি দীক্ষাগুরুকে মন্ত্রসহ ত্যাগ করে নরকগামী হতে চাও কেন?

আসরে অশোভন ঘটনা

তারপর কলিকালে নামসংকীর্তনই পরম ধর্ম, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণই নাম প্রেম প্রচারের জন্ম নবদ্বীপে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন—রাধারাণীর প্রেমঋণ পরিশোধ করা এবং মলিন কলির জীবের উদ্ধার করাই এই গৌরাঙ্গ অবতারের মূল উদ্দেশ্য ইত্যাদি অনেক কিছু বলার পর রাজেন্দ্র সরকার বক্তব্যের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। গানের প্রারম্ভে যে ভদ্রলোককে তিনি এনে বসিয়েছিলেন

তাকে লক্ষ্য করে বললেন—গতদিন কবির আসরে তুমি উপস্থিত ছিলেনা। আমার বিপক্ষের ঐ নকুল সরকার, গতকল্য নমঃশূদ্র জাতটাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে নমঃশূদ্রের জাত মেরেছে। নিজে ও কায়স্থ বলে জাতের গৌরবে অন্ধ হয়ে যে সব ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে নমঃশূদ্র জাতের নাক কান কাটা গেছে। ওর এই অদূরদর্শিতার জন্য উচিত ছিল আসরের মধ্যে জুতা মারা। ভদ্র আসর বলে ওকে ক্ষমা করেছে।

রাজেন্দ্র সরকার যেই জুতামারার কথা বলেছেন, অমনি হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার উঠে আসরে দাঁড়িয়ে বললেন—হারামজাদা, তুই কি বললি? জুতা মারবি? দেখি তোর কত বড় সাহস! এখানে কি মানুষ নাই? নকুলেশ্বরের হাত ধরে হরিবর সরকার বললেন—বাবা নকুল! তুমি দুঃখ করোনা; আমি একটু পাঁচালী বলবো।

তখন রাজেন্দ্র সরকারকে বসিয়ে দিয়ে হরিবর সরকার উঠে সিংহবিক্রমে তাঁর ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন—ঐ কুলাঙ্গারটার মুখে একেবারে নির্জলা মিথ্যা কথাগুলো শুনতে শুনতে তুইও খুব উত্তেজিত হয়েছিস। তোর চোখমুখ দেখলে বোঝা যায়। তবে শোন গতদিন আসরে নকুলেশ্বর কি বলেছে—এই বলে যে প্রশ্ন হয়েছিল এবং নীচ জাতির পক্ষ সমর্থন করে নকুলেশ্বর যে সব প্রমাণ দিয়েছিলেন, সেই সব কথাগুলো হরিবর সরকার কবির ছন্দে এমন সুললিত সুরসাল ভাবে প্রকাশ করলেন যে নকুলেশ্বরের কাছে তার নিজের বক্তব্যের চেয়েও মধুরতর বলে মনে হল।

তারপর ছেলেকে বললেন—শুনলি তো নকুলেশ্বর গতকাল কি কি বলেছে। এটা কি নমঃশূদ্রের জাত-মারা কথা না জাত বাড়ানো কথা? তুই তো ঐ বাঁদরটার কথায় খুব উত্তেজিত হয়েছিলি। চিলে কান নিয়েছে শুনে চিলের পেছনে ধাওয়া করবি, না কানে হাত দিয়ে দেখবি?

এরপর নকুলেশ্বরকে বললেন—ওঠো বাবা, এখন তোমার ইচ্ছামতো যা বলতে হয় বলো, কোন ভয় নেই। হয়তো তুমি ভাবতে পার যে এটা নমঃশূদ্রের আসর, রাজেনও নমঃশূদ্র; সুতরাং শ্রোতারা ক্ষিপ্ত হয়ে কি করে বসে! কিন্তু তুমি সে ভয় করোনা। এটা নমঃশূদ্রের আসর হলেও মানুষের আসর, পশুর আসর নয়। বিশেষতঃ আমরা দুই ভাই যে আসরে বর্তমান শ্রোতা—সে আসরে এমন কোন নমঃশূদ্রের সাধ্য নেই সাহস নেই যে কোন একটা অন্যায়কে আশ্রয় দিয়ে কোন কথা বলবে। তুমি নির্ভয়ে ঐ মূর্খটাকে আচ্ছামতো

লগুড়াঘাতে শায়েস্তা করো। ও শিখে যাক যে একটা ভদ্র সন্তানকে আসরের মধ্যে জুতো মারতে চাওয়া কতখানি অপরাধ। এই বলে নকুলেশ্বরকে তুলে দিয়ে হরিবর সরকার মহাশয় বসলেন।

এমন জমজমাট রত্নসভার মাঝে আকস্মিক এই অশোভন ও অস্বাভাবিক ঘটনায় নকুলেশ্বর হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু তিনি অবাক হলেন দেখে যে দর্শকদের মধ্যে একটা টুঁ শব্দ নেই। সব চুপচাপ। কালাকর্তা রাঙ্গা কর্তার মতো মাতব্বর মুরুব্বীদের উপস্থিতিতে তাদের বলার বা করার কিছু নেই যেন। যা করার মান্য মাতব্বরগণই করবেন—এই ভাব। হৈ চৈ, খিস্তি ও অঙ্গভঙ্গি করে আরো বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণায় কেহ মেতে ওঠে নি। এটা সামাজিক শৃঙ্খলাপরায়ণতা, বড়দের প্রতি অটুট আস্থা এবং সমাজের সাধারণ লোকদের উপর সমাজ কর্তাদের অসীম প্রভাবেরই পরিচয়।

উচ্চাঙ্গ কবিগান

নকুলেশ্বর উঠে রাজেন্দ্র সরকারের টপ্পার জবাব বলতে লাগলেন—

বললে, গউর ধর্ম ছেড়ে কেন ব্রাহ্ম ধর্ম লই।

ভবে ব্রাহ্ম হয়েছেন যারা, মূল ব্রহ্মের উপাসক তারা

হলো ব্রহ্ম সব ধর্মের গোড়া তাইতে ব্রাহ্ম হই॥

যেমন সমুদ্রেতে বান ডাকিলে—

সেই জলে নদীনালা ভেসে যায়;

লাগলে প্রলয় ভাটির টান

সকল জল সাগরে মিলায়।

তোমার কৃষ্ণ বিষ্ণু গৌরাঙ্গ,

সকলই এই ব্রহ্মের-অঙ্গ,

সিন্ধুর এক বিন্দু কণার প্রায়।

এমন অসীম সাগর কাছে পেলে

কে থাকে সসীম কূপের প্রত্যাশায়?

পাঁচালীতে নকুলেশ্বর বললেন—

আমি অদ্বৈতের বংশধর; বংশের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করার জন্য আমি বৈষ্ণব হয়ে গৌর মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ভজন রাজ্যে প্রবেশ করে দেখি যে পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চমত। কারো মতের সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। বৈষ্ণবের মধ্যে আউল, বাউল, দরবেশ, নাড়া ইত্যাদি বহু সম্প্রদায়। মনের

একাগ্রতা নিয়ে সাধন করা চলেনা ; তাই আমি ও ডাল-খিচুড়ি ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

—জিজ্ঞাসা করেছ ব্রাহ্ম ধর্মে কি আছে ?

—ভেবে দেখ ব্রাহ্ম ধর্মে কি না আছে ! ব্রহ্মই হলেন ব্রাহ্মদের উপাস্য। তিনি দ্বৈতবিহীন, অদ্বৈত, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তার কোন জোড়া নেই। তিনি ইচ্ছা শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, পঞ্চভূত ; মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন, যথা—

ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চিদাসীদ্
সদেবঃ সৌম্যঃ দেবাগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীযম্।
স বা এষ মহানজ আত্মা জড়, মর' মৃত' ভয়ম্—
স তপস্তস্থাইদং সর্বম্ সৃজত যদিদংকিঞ্চ—।
এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানিচ,
খং বায়ুঃ জ্যোতিরাপো, পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী
(উপনিষদ ২৯ সুক্ত)

ভাগবতে বলেছেন—বিশ্ব সৃষ্টির মানসে পরমব্রহ্ম তপ করলেন—অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তি প্রকাশ করলেন। তাঁর সেই তপ হতে প্রথম অন্নের উদ্ভব হলো। সেই অন্ন হতে প্রাণ—প্রাণ হতে মন, মন হতে মননে মানবের সৃষ্টি হল—এই হলো শ্রুতির ক্রমবিকাশ। পরম ব্রহ্মই হলো বিশ্বস্রষ্টা, ব্রহ্মই হলো বৈজ্ঞানিকের ইথার সাগর, ব্রহ্মই হলো সবার মূল অনন্ত মহাসাগর।

তোমাদের শিব শক্তি গণেশ সূর্য বিষ্ণু ও কৃষ্ণ সবই ঐ সাগরের বিন্দু কণা, ঐ বুদ্‌বুদের মতো। ঐ সাগরেই উদ্ভব, সাগরেই লয় হয়। সেই নিরাকার নির্বিশেষ পরম ব্রহ্মকে পেলে অর্থাৎ সিন্ধু পেলে আর বিন্দুর দরকার কি ?

হিন্দুর রাম শ্যাম শিব গণেশ তাদেরও যখন উপাস্য আছে, যথা—শিব কৃষ্ণ উপাসনা করেন, রাম অকালবোধন করে কালীর উপাসনা করেন, কৃষ্ণ নরনারায়ণ নাম নিয়ে বদরিকাশ্রমে বসে ব্রহ্ম উপাসনা করেন, গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করেন। অতএব যাঁদের প্রত্যেকের এক এক জন উপাস্য দেবতা আছে, তখন ওসব উপাসকের উপাসনা না করে মূল উপাস্য—সর্বদেব নমস্য সেই পরমব্রহ্মের উপাসনা করা শত গুণে শ্রেষ্ঠ।

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র রুদ্রমরুতঃ স্তুন্বস্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ—
বেঁদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত—তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো—
যস্যান্ত ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ অর্থাৎ—

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র ও মরুৎ দিব্য স্তব দ্বারা যাঁর স্তুতি করেন, সাম্ গায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্ সহিত বেদ দ্বারা যাঁর মহিমা গান করেন, যোগিগণ ধ্যানে তদ্গত চিত্ত হয়ে যাঁকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণ যাঁর তত্ত্ব অবগত নন, সেই পরম দেবতা পরম ব্রহ্মকে প্রণাম করি।—এই কারণে আমি উপাসকের উপাসনা ছেড়ে দিয়ে সেই সর্ব উপাস্য পরম ব্রহ্মের শরণাগত হয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

একটি গল্প আছে—একদিন এক ফকির কিছু ভিক্ষা চাইতে সম্রাট আকবরের কাছে গিয়ে দেখেন যে তিনি খোদার কাছে মোনাজাত করছেন—খোদা! ধন দাও, দৌলত দাও, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য দাও। ফকির সাহেব সম্রাটের মোনাজাত শুনে চলে যাচ্ছেন দেখে আকবর জিজ্ঞাসা করলেন—ফকির সাহেব! আপনি এলেনই বা কেন; কিছু না বলে চলেই বা যাচ্ছেন কেন?

ফকির বললেন—হুজুর! আমি এসেছিলাম আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইবার জন্য। এসে দেখলাম আপনিই খোদার কাছে ধন দাও, দৌলত দাও বলে ভিক্ষা চাইছেন। তাই ফিরে যাচ্ছি। কারণ ভিখারীর কাছে ভিক্ষা না চেয়ে সেই পরম পিতা খোদার কাছেই ভিক্ষা চাইব॥

তেমনি—যে গৌরমন্ত্রে আমি দীক্ষা গ্রহণ করেছি সেই গৌরাঙ্গই উর্ধ্বদণ্ডে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্রাহি মাং" বলে পরিত্রাণ কামনা করছেন। বাঁধা ব্যক্তি কি অপরের বন্ধন মোচন করতে পারে? এক অন্ধ কি অপর অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? তাই আমিও আমার মুক্তি ভিক্ষা চাইবার জন্য সর্বশক্তিমান পরম ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয়েছি।

তুমি বলেছ—গুরু ত্যজে গোবিন্দ ভজলেও নরকে যেতে হয়। এসব মিথ্যা কথা। গুরুগীতায় লিখেছে—

মধুলুব্ধো যথাভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যোগুরোর্গুর্বান্তরং ব্রজেৎ॥ অর্থাৎ—

মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন নানা ফুলে তার মনের মতো মধু অন্বেষণ করে বেড়ায়,

জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করবার জন্য নানা গুরুর কাছে মন্ত্র নিতে পারে। তাতে গুরুত্যাগ করা হয়না। নানা গুরুতে বিচরণ করার ফলে—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে মন যথা গিয়ে রয়
সেই সে পরম গুরু জানিবে নিশ্চয়॥

তারপর তুমি বলেছ—মলিন কলির জীব উদ্ধার এবং রাধার প্রেমঋণ শোধ করবার জন্য ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই কথার উত্তরে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে, উত্তর দানে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করবে—

প্রথম প্রশ্ন—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে গৌরাঙ্গ হয়েছেন তার প্রমাণ কি? ভাগবতে বলে—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূত যস্তু গোপালনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥ অর্থাৎ—

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে এক পা-ও যেতে পারেন না। তবে সেই কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে গৌরাঙ্গ হলেন কি করে? তবে কি ভাগবৎ বাক্য মিথ্যা?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—রাধারানীর প্রেমঋণ পরিশোধ করা। প্রেমের আবার ঋণ কি? ভজনের ওজনে দুজন সমান না হলে প্রেম হয়না, কম বেশী হলে প্রেম মধুময় হয় না। কৃষ্ণ যদি রাধার প্রেম ঋণে আবদ্ধ তবে মধুর প্রেম বলে কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন—গোচারণ হতে ফেরবার পথে চন্দ্রার দাসী পদ্মাবতী শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রার কুঞ্জে ধরে নিয়ে যায়। এদিকে রাধারানী শূন্য বাসরে নিশি যাপন করে শ্যাম বিরহে বৃন্দার কথায় মান করেন। ভোর বেলা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মান ভাঙতে গিয়ে তাঁর চরণে দাসখৎ দেন—

আমি বাঁধা আছি রাই তব প্রেম ঋণে।
কালো অঙ্গ গৌর হব খালাস সেই দিনে॥

—এই হলো তোমাদের বৈষ্ণব মতে রাধার প্রেমঋণ। এখন কথা হচ্ছে, প্রেম তো অবিনাশী, কোন দিন ধ্বংস হয়না, যেমন—

যদ্ভাব বন্ধনং যূনোঃ বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।
সর্বদা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে॥

(হরি ভক্তি বিলাস)

অর্থাৎ যে ভাববন্ধন অজর অমর অবিনাশী, ধ্বংস হবার নয়—সর্ববিধ ধ্বংসের

কারণ থাকলেও ধ্বংস হয়না, তাই হল প্রেম। তবে, যে প্রেম ধ্বংস হতে পারেনা, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রার ঘরে নিশি যাপন করায় রাধারানীর সেই মধুর প্রেম ধ্বংস হল কি করে যে তিনি কৃষ্ণ বিরহে মান করলেন ?

চতুর্থ প্রশ্ন—ভাগবতকার সকলে বলে থাকেন—

স্বয়ং কৃষ্ণের নাই গোচারণ খেলা।
স্বয়ং রাধিকার নাই বিরহের জ্বালা॥

—স্বয়ং কৃষ্ণের যদি গোচারণ খেলা না থাকে তবে কোন্ কৃষ্ণ নন্দের গোচারণ করত ? তিনি কি নকল না আসল ? আর স্বয়ং রাধার যদি বিরহ না থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণ বিবহে কোন্ রাধা মান করল ? সে কি আসল রাধা, না নকল রাধা ?

পঞ্চম প্রশ্ন—বৃন্দাবনে নিত্য লীলা করে দুইজন।
না জানেন রাধা কৃষ্ণ না জানেন গোপীগণ॥

ব্রহ্ম বৈবর্তে বলে—বৃন্দাবনে দুইজনে নিত্যলীলা করে ; কিন্তু তা রাধাও জানেন না, কৃষ্ণও জানেন না। তবে কোন্ দু'জনে নিত্যলীলা করে, আর কোন দুই জনে জানেনা। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ কয় জোড়া ছিল ?

তারপর আসরের শ্রোতাদের বিশেষ করে কবিরত্ন কয়টিকে উপলক্ষ্য করে নকুলেশ্বর করজোড়ে বললেন—আমি আপনাদের সামনে এই কয়টি প্রশ্ন রেখে গেলাম ; কবি তর্কালঙ্কার রাজেন্দ্র সরকারের কাছে এর মর্মার্থ শুনে নেবেন।

আর একটি বিশেষ প্রার্থনা—আমি আর ঐ রাজেন্দ্র সরকার দু'জনই কবি-সম্রাট হরি আচার্য মহাশয়ের ছাত্র। সেই সম্পর্কে রাজেন্দ্র সরকারকে আমি দাদা বলে থাকি। কারণ তিনি বয়সে আমার চেয়ে জ্যেষ্ঠ, আর কবিত্বেও শ্রেষ্ঠ। দাদা রাজেন্দ্র আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের হাতে শাসন না করে আপনাদের উপরে ভার দিয়ে গেছেন আমাকে জুতা মারার জন্য। আমার অনুরোধ জুতা মারবেন মারুন, আমার কোন আপত্তি নেই ; তবে এই আসরের মধ্যে দাদা রাজেন্দ্রের সামনে আমাকে মারবেন না, বাইরে নিয়ে মারবেন। কারণ, রাজেনদা এই ভাইটিকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। ওঁর সামনে যদি আমাকে জুতাপেটা করেন রাজেনদা তা সহ্য করতে পারবেন না। হয়তো আমাকে রক্ষা করতে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরবেন। তখন আমার পিঠের জুতা হয়তো আমার দাদার পিঠে মাথায় পড়বে—তাই একটু দূরে নিয়ে জুতা মারবেন।

নকুলেশ্বর এই কথা বলামাত্র চতুর্দিকে হাততালি পড়ে গেল। হরিহর

সরকার ও মনোহর সরকার আসরে দাঁড়িয়ে রাজেন্দ্রকে বললেন—কিরে শূয়ার, কার জুতা এখন কার পিঠে পড়লো। এমন মিষ্টি জুতা খেয়েও যদি তোর শিক্ষা না হয় তবে মরলেও হবে না। নে, এখন উঠে নকুলেশ্বরের ঐ কয়টা কথার জবাব দে, শুনে চলে যাই।

রাজেন্দ্র সরকার উঠে ঐ প্রশ্নগুলির এক একটি জবাব দেন; আর তাঁর ঐ মাতুলদ্বয় হরিবর-মনোহর বলেন—না, না, এ জবাব হয়নি; ভাল করে বল। আবার একটি জবাব দেন—অমনি তাঁরা বলে ওঠেন—না না, এ কিছু হয়নি; ভালো জানিস তো বল; নইলে স্বীকার কর আমি উত্তর জানি না।

হরিবর-মনোহর সরকার যদি এভাবে বলেন, তবে আসরের অন্য শ্রোতারা কি বলতে পারে ভেবে দেখুন। কথায় বলে—মানীর মান ভগবান রক্ষা করেন। এইভাবে গোলাবাড়ীর গানে নকুলেশ্বরের একটা রেকর্ড সৃষ্টি হয়ে গেল, সবার মুখেই তাঁর জয় জয়কার। রাজেন্দ্র সরকার নকুলেশ্বরকে জব্দ করতে এসে প্রকারান্তরে এমন উপকার করলেন যে খুলনা, ফরিদপুর, যশোহরের মধ্যে এক ডাকে নকুলেশ্বর পরিচিতি লাভ করে কবিসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন।

ঐ গোলাবাড়ীর গান থেকে সুরু করে নকুলেশ্বর যতদিন পূর্ববঙ্গে ছিলেন, ততদিন খুলনা ফরিদপুর যশোহরের মধ্যে যত বিশিষ্ট আসরে কবিগান হতো, তার একপক্ষে নকুলেশ্বর না হলে গান হতো না। বায়নার পর বায়না, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর উপর প্রসন্ন—মূলে ঐ রাজেন্দ্রই হলো তার উপলক্ষ॥

এরপরে রাজেন্দ্র সরকারের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নকুলেশ্বরের খুব সদ্ভাব হয়েছিল। ঢাকার "ফিরা" শেষ করে খুলনা ফিরায় এলে রাজেন্দ্র সরকারের সঙ্গেই তাঁর চৌদ্দ আনা গান হতো। প্রথম যৌবনের এসব উন্মাদনাকর ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে তাঁরা হাসাহাসি করতেন।

খুলনার চুনখোলা গ্রাম নিবাসী এই বিশিষ্ট কবিয়াল, বড় রাজেন্দ্র বা 'পাগল' নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি হরি আচার্য মহাশয়ের খুব তেজী গোঁড়া ছাত্র ছিলেন। আচার্য কর্তা এঁকে শঙ্করাচার্য বলে ডাকতেন। আচার্য কর্তার পরবর্তী যুগে যেসব সরকারের সঙ্গে নকুলেশ্বরের গান হয়েছে তার মধ্যে এই রাজেন্দ্র সরকারই সর্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। গানের জবাবে এবং গান রচনায় তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন, নকুলেশ্বরের মতে আর কোন সরকারের মধ্যে সে শক্তি ছিল না। অনেক রকম বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর

অধিকার ছিল। যেখানেই রাজেন্দ্র-নকুল জুটির গান হতো সেখানেই কবিগান অত্যন্ত উচ্চস্তরে উন্নীত হতো। পরবর্তী কবির সরকারগণ তাই মুক্তকণ্ঠে বলেন—

"কবি হরিচরণের কাব্যোদ্যানে ফুটেছে দু'টি ফুল
একটি তার রাজেন্দ্র সরকার, আরেকটি নকুল।"

বন্ধুরূপে ভগবান

গোলাবাড়ীর গান শেষ করে নকুলেশ্বর বাগেরহাটে এলেন। কাছারীর ঘাটে নৌকা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক এসে নৌকায় উঠে বললেন—আপনার দল বায়না করবার জন্য তিন দিন ধরে বাগেরহাটে বসে আছি।

নকুলেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় গান?

ভদ্রলোক—খুলনার ভাটিতে দাওকুপী থানায় সাহেবের আবাদ গ্রামে দেবনাথ মোড়লের বাড়ী। তিনি আমার জ্যেঠা মহাশয়; আমার নাম সদানন্দ মোড়ল।

গানের দিন সকালবেলা নৌকা গিয়ে সাহেবের আবাদ পৌছল—নদীর পরপারেই দাওকুপী থানা। দেবনাথ মোড়ল খুব বড় অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ীতে বিশ পঁচিশটি ধানের গোলা। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, খুব হাসিখুসী এবং অমায়িক। নকুলেশ্বরের সঙ্গে যেন তার কোন মাহেন্দ্রক্ষণে দেখা হলো। দেখা মাত্রই তাঁকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করলেন এবং তাঁর বাড়ীতেই দলশুদ্ধ সকলের স্নানাহারের ব্যবস্থা করলেন। মোড়ল মশাই ছিলেন সাহেবের আবাদ গ্রামের মাতব্বর এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। গ্রামের সকলেই তাকে মান্য করে। লোকটি খুব বুদ্ধিমান এবং বিবেচক। লোকের বিপদে আপদে মামলা মোকর্দমায় সব কাজে সাহায্য করে বলে গ্রামবাসী সবাই তার বশীভূত। দাওকুপী থানার বড় দারোগা অমূল্যকুমার ঘোষের সঙ্গেও মোড়ল মশাই'র বন্ধুত্ব। তিনি দারোগা বাবুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ।

গানের বায়না দিয়ে নকুলেশ্বরকে নিয়েছে সত্য, কিন্তু বিপক্ষে ভাল দল বায়না করেনি। পার্শ্ববর্তী তেঁতুলবুনিয়া গ্রামে রসিক ঠাকুর নামে একজন রঙ্গী সরকার ছিলেন, তাঁকে বায়না করেছে। নকুলেশ্বর রসিক ঠাকুরের নাম শুনে মোড়ল মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি বুঝি খুব ভাল সরকার?

মোড়ল মশাই বললেন—না, না, মোটেই ভাল নয়; তার সখের দল। নিজের জমিজমা আছে। ক্ষেতের কাজ করা জনমুনিষ নিয়েই তার দল। বৎসরে দু'চার পালা গান করে। আমার বাড়ীতে গান করার খুব সখ। তাই তাকে বায়না দিয়েছি। গান শুনবো আপনার, সে উপলক্ষ মাত্র।

সাহেবের আবাদে গান—নকুলেশ্বর বনাম রসিক ঠাকুর

রাত দশটায় আসর বসেছে। লোকসংখ্যা খুব বেশী নয়, রসিক ঠাকুরের দল গান শুরু করেছে। কারো সঙ্গে কারো সুর তালের মিল নেই। যার যা ইচ্ছে সে তেমন গায়। দেবনাথ মোড়ল নকুলেশ্বরকে বললেন—শুনলেন তো রসিক ঠাকুরের দলের গান। যেমন ঢাল নেই তলোয়ার নেই বাঞ্ছারাম সর্দার। তবু বেটার সখ যে আমার বাড়ীতে গান গাইবে। আমিও মানুষের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি না, তাই ওকে এনেছি।

নকুলেশ্বরের বাঁধা দল; যন্ত্রসঙ্গীত বাজানমাত্র আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। বাদাবনের দিকে এরকম দল আর আসেনি। দু'তিন আসর গানের পর দেবনাথবাবু বললেন—এখন রসিক ঠাকুর টপ্পা করুক। রসিক ঠাকুর উঠে টপ্পা করলেন—

রাজা হংসধ্বজের পুত্র আমি, নাম ধরি সুরথ।
আমার ভাই সুধন্বা বীর,
ধন্য বীর মান্য পৃথিবীর,
করল তোমায় দেখে যদুবীর, পূর্ণ মনোরথ॥

কেন কাটা মুণ্ডে কৃষ্ণ বলে—
কোন্ বস্তু মুণ্ডে ছিল অধিষ্ঠান,
দুই জনার যুদ্ধের কালে মধ্যস্থ ছিলে ভগবান।

যখন সুধন্বা আর অর্জুনে,
প্রতিজ্ঞা হয় দুইজনে—
তিন বাণে কাটিবে তিন বাণ।
কেন অর্জুনের প্রতিজ্ঞা র'ল—
সুধন্বার কাটা বাণে গেল প্রাণ?

নকুলেশ্বর জবাবে বললেন—

তুমি কবির ভাবে নাম ধরেছ সুরথ সুমতি।
বাঁধলে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের হয়,
ভাবলে না পাছে কিবা হয়,
যার রথে আপনি হয়, কৃষ্ণ সারথী॥
ও তোর ভাই মরেছে তুই মরিবি—
কয়েকদিন ছায়ার জন্য মায়ার টান,
নরনারায়ণ দেখাতে, বাপকে তোর খবর দিয়ে আন।
করে এই প্রতিজ্ঞা ধনঞ্জয়, তিন বাণে করিবে ক্ষয়,
সুধন্বা বাণে কাটবে বাণ ;
হল উভয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা
নির্দোষী আমি র'লেম ভগবান॥

আসরে বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে ফরেস্ট অফিসার, থানার পুলিশ স্টাফ এবং সার্কেল অফিসার উপস্থিত ছিলেন। নকুলেশ্বরের পাঁচালী শুনে সকল শ্রোতা, বিশেষ করে শিক্ষিত অফিসারগণ সকলেই তারিফ করতে লাগলেন। এরকম সুর ছন্দের পাঁচালী তারা পূর্বে আর শোনেননি ; এই প্রথম শুনলেন বলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

দেবনাথ মোড়লের কি আনন্দ! নিজের প্রিয়জনের সুখ্যাতি শুনলে যেমন আনন্দ হয়, তার চেয়েও শতোধিকগুণ আনন্দে নকুলেশ্বরকে বললেন—আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমার শুধু গানের সম্বন্ধ নয়, প্রাণের সম্বন্ধও স্থাপিত হলো। এই ভাটি মুল্লুকে এলে দলসহ আমার বাড়ীতেই থাকবেন।

গানের শেষে থানার দারোগাবাবু দেবনাথ মোড়লকে বললেন—আগামী দিন নকুলবাবুর দলসহ আমার বাসায় নিমন্ত্রণ রইল।

মৃগচর্ম দর্শনে মৃগয়ার সখ

পরদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দারোগাবাবুর বাসায় একটা হরিণের চামড়া দেখে নকুলেশ্বর দেবনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন– এ চামড়া কোথায় পাওয়া যায়?

দেবনাথ—চামড়ার অভাব কি? আমাদের এই নদীর ভাটিতেই তো সুন্দরবন ; বাঘ হরিণের আস্তানা। বন্দুক নিয়ে গেলেই মেরে আনা যায়।

মোড়ল মশাইয়ের দুই ভায়ের দুইটা বন্দুক ছিল। বন্দুকের কথা শুনে নকুলেশ্বরের মনে একটা নূতন কল্পনা উঁকিঝুকি মারতে লাগল। তিনি বললেন—বন্দুক করতে হলে কি করতে হয়?

মোড়ল—কেন, বন্দুক করার সখ আছে নাকি?

নকুল—সখ থাকলেই কি সব সময় পূর্ণ হয়?

মোড়ল—কেন হবে না? এই তো বন্দুকের গোড়াঘাটায় এসে বসেছেন। দারোগাবাবুকে বললেই তো তিনি লাইসেন্স করে দেবেন।

নকুল—তবে আপনি একটু বলুন না; আমার সাহস হচ্ছে না।

দেবনাথ মোড়ল দারোগাবাবুর কাছে গিয়ে বললেন—আপনার বাসায় মৃগচর্ম দেখে তো নকুলবাবুর মৃগয়া করার সখ হয়েছে!

দারোগা—বেশ তো, নিয়ে যান না একদিন সুন্দরবনে। আপনার তো ভাল বন্দুক আছে।

মোড়ল—নকুলবাবুও যে একটি বন্দুক করতে চান। টাকা পয়সা মেয়েদের গয়নাপত্র নিয়ে নদীতে নদীতে চলাফেরা তো বিপজ্জনক। আত্মরক্ষার জন্য আপনার কাছে একটি বন্দুকের লাইসেন্স প্রার্থনা করছেন।

দারোগা—আমার কাছে প্রার্থনা করে লাভ কি? ওনার বাড়ী হলো বরিশাল জেলায়। বন্দুক করতে হলে সেখানে তদ্বির করতে হবে।

মোড়ল—কেন, বরিশালবাসী মানুষ কি আর খুলনাবাসী হতে পারে না? আমি নকুলেশ্বরবাবুকে যদি ঘরবাড়ী জমিজমাসহ একটা হালমোকাম করে দি, তবে তো আর আপনার লাইসেন্স দিতে বাধা নেই?

দারোগা—আরে, তা হলে তো হয়েই গেল। আপনি যত সত্বর পারেন সে ব্যবস্থা করুন। আমি লাইসেন্স বের করে দিচ্ছি।

কথায় বলে, 'যেই কথা সেই কাজ'—দেবনাথ মোড়ল যে বলেছিল আপনার সঙ্গে আমার শুধু গানের সম্বন্ধ নয়, প্রাণের সম্বন্ধ—আজ তিনি হাতে হাতে প্রমাণ দিলেন। তিন দিনের মধ্যে নকুলেশ্বরকে ঘরসহ দেড়বিঘা একটা বাড়ী, চৌদ্দ বিঘা ধানের জমির দানপত্র, খাজনা ও চৌকিদারী ট্যাক্সের রসিদ সব এনে দারোগাবাবুর হাতে দিলেন।

সে সব দেখে দারোগাবাবু বললেন—আপনি যখন আপনার বন্ধুর জন্য এতো করলেন, তখন আমিও কথা দিচ্ছি পনের দিনের মধ্যে বন্দুকের লাইসেন্স বের করে দেব।

ব্রিটিশ আমলে বন্দুক করার ঝামেলাঝক্কি বড় কম ছিল না। গ্রাম্য চৌকিদার থেকে সুরু করে থানা পুলিশ, এস.ডি.ও. সকলে একমত হয়ে রায় দিলে তারপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মর্জি। নকুলেশ্বরের কোন ঝামেলা পোহাতে হলো না। দারোগাবাবু নিজেই তদ্বির করে সব ঠিক করে ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে দেবনাথ মোড়ল ও নকুলেশ্বরকে একদিন খুলনা যেতে সংবাদ দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে খুলনা টাউনে গিয়ে জানা গেল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বন্দুকের লাইসেন্স দিতে রাজী হয়েছেন, তবে শুধু খুলনা জেলার জন্য। একথা শুনে নকুলেশ্বর দারোগাবাবুকে বললেন—আমি তো শুধু খুলনা জেলায় থাকি না; বাংলাদেশের সব জেলায় যেতে হয়। এক জেলার লাইসেন্স নিয়ে কি করবো।

দারোগাবাবু বললেন—সে প্রমাণ না দেখালে ওরা মুখের কথা বিশ্বাস করবে না।

কবির হাতে বন্দুক

হঠাৎ নকুলেশ্বরের মনে পড়ে গেল শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জে এস. ডি. ওর. দেওয়া সার্টিফিকেটের কথা। দলের নৌকা কাছারীর ঘাটেই বাঁধা ছিল। নকুলেশ্বর সার্টিফিকেটখানা এনে দারোগাবাবুর হাতে দিলেন। তিনি তা দেখে বললেন—এমন ব্রহ্মাস্ত্র হাতে থাকতে আপনি চুপ করে বসে আছেন?

দারোগাবাবু সার্টিফিকেটখানা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে দিয়ে বললে—এই দেখুন স্যার! এই ভদ্রলোক বাংলা দেশের সব জেলায় গান করে বেড়ান।

সাহেব আর কোন কথা না বলে 'অল বেঙ্গল লাইসেন্স' মঞ্জুর করে দিলেন। দারোগাবাবু লাইসেন্সখানা দেবনাথ মোড়লের হাতে দিয়ে বললেন—এই নিন আপনার বন্ধুর বন্দুকের লাইসেন্স। আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করলাম; এখন আপনার পালা।

দেবনাথ মোড়ল একটু হেসে বললেন—তা তো বটেই! শুধু কাগজে তো আর হরিণ মারা যাবেনা! এখন এর যন্ত্র জোগাড় করা দরকার।

নকুলেশ্বর বললেন—যা করতে হয় আপনিই করবেন।

দেবনাথ মোড়ল—আচ্ছা আচ্ছা সেজন্য আপনার ভাবতে হবে না। যে

কাজে হাত দিই তার শেষ রক্ষা করাই আমার স্বভাব। আর দেরী করে লাভ কি? চলুন কলকাতা গিয়ে বন্দুক কিনে নিয়ে আসি।

নকুলেশ্বর—আরো দু'চার পালা গান করে টাকা সংগ্রহ করে নিই।

মোড়লমশাই—সব কাজই যদি হয়ে গেল, এখন টাকার ঠেকায় কি বন্দুক কেনা বন্ধ থাকবে? আগামীকাল চলুন কলকাতা যাই। টাকা যা লাগে আমি দেবো।

নকুলেশ্বর—আপনি আমার জন্য আর কত করবেন! জমি কেনা, চাল মেরামত করা, ইত্যাদিতে তো বহু টাকা খরচ করেছেন। আর কত করবেন?

মোড়ল—সেজন্য আপনি ভাবছেন কেন? ও বাড়ী জমি করতে আমার নগদ টাকা লাগে নি। বাবা মায়ের আশীর্বাদে আমার সাত আট শত বিঘা ধানের জমি। তার থেকে সামান্য চৌদ্দ পনের বিঘা জমি দিয়ে যদি আপনার মতো এমন একটা রত্নকে একটু যত্ন করা যায়, সেও তো আমার পরম সৌভাগ্য। দেনা শোধ করার চিন্তা করবেন না। যতদিন দেনা থাকবে, ততদিন আমাকেও স্মরণ থাকবে। দেনা শোধ হলে তো আর মনে থাকবে না। তাই বলি দেনা শোধের চিন্তা ত্যাগ করুন।

পরদিন দুইজনে খুলনা টাউনের উদ্দেশ্যে নৌকা খুললেন। খুলনা কালী বাড়ীর ঘাটে নৌকা রেখে দেবনাথ মোড়লের সঙ্গে নকুলেশ্বর কলিকাতা গেলেন। এর আগে তিনি আর কলিকাতা আসেননি। চারদিন কলিকাতা থেকে দর্শনীয় কিছু কিছু স্থান দেখলেন। শেষে ধর্মতলা ষ্ট্রীটে এক সাহেবের দোকান থেকে চার শত টাকায় একটি "আইংলিস্" বন্দুক ও কয়েক শত গুলি কিনে নিয়ে খুলনার ঘাটে ফিরে এলেন। দেবনাথ মোড়ল বললেন—চলুন, এখন সাহেবের আবাদ; আপনার হরিণ মারার সখ মিটিয়ে দিই।

মোড়লের ভাইপো সদানন্দ মোড়ল বন্দুক দেখে খুব খুশী হয়ে বলল—এখন একবার শিকার করতে চলুন। পরদিনই সকালে দেবনাথ মোড়ল তার নিজের ডিঙ্গি নৌকায় সদানন্দ ও নকুলেশ্বরকে নিয়ে শিকার করতে সুন্দর বনে গেলেন বটে, কিন্তু নকুলেশ্বর বনে ঢুকতে সাহস করলেন না। বিশেষত তখনো তিনি বন্দুক চালাতে শেখেন নি। তাই তিনি সদানন্দকে বন্দুক দিয়ে বললেন—যান, আপনার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে, আমি নৌকায় বসে বনের দৃশ্য দেখি।

দর্শনীয় বস্তুও বটে! সুন্দরবন সত্যিসত্যিই সুন্দরী বন! নিঝুম নিস্তব্ধ।

কোন সাড়া শব্দ নেই। মধ্যে মধ্যে দু'চারটা বন্য পাখী বন মোরগের শব্দ কানে আসে। নকুলেশ্বর নৌকায় বসে নদীর কলকল শব্দের সঙ্গে সেই সব শুনতে লাগলেন।

সদানন্দকে নিয়ে দেবনাথ মোড়ল বেলা দশটায় বনে ঢুকলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোন সাড়া শব্দ নেই। নকুলেশ্বর নানাবিধ চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে বিকেল চারটা নাগাদ একটা মাদী হরিণ মেরে নিয়ে ফিরে এলেন। দেবনাথ মোড়ল বললেন—আজ বোধ হয় এই এলাকায় বাঘ এসেছিল; তাই হরিণ সব পালিয়েছে। বাঘের পায়ের তাজা দাগ দেখলাম। বাঘের কথা শুনে নকুলেশ্বর নৌকায় বসেই ভয়ে জড়সড়।

নকুলেশ্বরের জীবনে এই হলো শিকারের প্রথম অধ্যায়। এরপর বহুবার শিকারে গিয়েছেন, বনে ঢুকেছেন, নিজ হাতে শিকার করেছেন। যতদিন বাংলাদেশে ছিলেন, দক্ষিণ মুল্লুকে গানে গেলেই দু'চার বার হরিণ শিকারে যেতেন।

জ্যৈষ্ঠমাস শেষ হয়ে গেল। নকুলেশ্বর দেবনাথ মোড়লকে বললেন—বন্ধু! এখন তো আর দল রাখা যায়না। দলের মুদ্দৎ শেষ হয়ে গেছে। এদিকে বর্ষাকালও তো এসে গেল। এবার ত আমাকে দেশের দিকে যেতে হয়।

দেবনাথ মোড়ল—আচ্ছা যান! দেশে গিয়ে দল ছুটি দিয়ে আবার কিন্তু বন্দুক নিয়ে আমার এখানে আসবেন। কিছুদিন আমার বাড়ী থেকে আনন্দ দিয়ে যাবেন।

জীবন-তরণী

নকুলেশ্বর দারোগাবাবু ও দেবনাথবাবুকে নমস্কার করে ঝালকাঠি অভিমুখে রওনা হলেন। ঝালকাঠি পৌঁছে সে বৎসরের মতো দল বন্ধ করে বাড়ী গেলেন। কিছুদিন পরে নকুলেশ্বর দেবনাথ মোড়লের এক পত্র পেলেন। তিনি লিখেছেন—

"আপনি যাবার পর আমি আপনার দলের জন্য একখানা নৌকা কেনার মনস্থ করেছি। এখন আপনার ভাড়াটিয়া নৌকায় চলাচল উচিত নয়। বিশেষতঃ বন্দুক নিয়ে ওভাবে খোলা নৌকায় চলা নিরাপদ নয়। বন্দুক চুরিও হতে

পারে। কাজেই আপনার একখানা ভাল বোট-নৌকা দরকার। আমি একখানা ভাল নৌকা পছন্দ করে রেখেছি। পত্রপাঠ আপনি চলে আসুন। আপনি সম্মতি দিলেই কাজ আরম্ভ করব।"

চিঠি পেয়ে নকুলেশ্বরের অসীম আনন্দ। কিছুদিন ধরে তিনিও নিজস্ব নৌকার অভাব অনুভব করছিলেন। তিনি তাঁর মাতাঠাকুরানীকে চিঠি শুনিয়ে বললেন—মা, এই ভদ্রলোকের কথা তোমাকে কি বলবো! আমার সঙ্গে কোন শুভক্ষণে যে দেখা হয়েছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। নিঃস্বার্থভাবে আমার উপকার করবার জন্য যেন ভগবান তাঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বন্দুক পাওয়ার ব্যাপারে সব কথা মাকে জানিয়ে বললেন—আমাকে যাওয়ার জন্য পত্র দিয়েছেন; আমি কালই রওনা হবো।

নকুলেশ্বর আবার সাহেবের আবাদে এলেন। দেবনাথ মোড়ল বললেন—আপনার দলের জন্য আমি একখানা ভাল নৌকা দেখে ঠিক করে রেখেছি। দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা! এই বলে নকুলেশ্বরকে নৌকার কাছে নিয়ে গেলেন। নকুলেশ্বর দেখলেন সত্যিসত্যিই খুব ভাল নৌকা। আঠাশ হাত লম্বা, সাত হাত পাশে, পোণে দুই ইঞ্চি পুরু সেগুন কাঠের তৈরী। গোল-পাতার ছাউনি দেওয়া।

নকুলেশ্বর বললেন—নৌকাখানা সবদিক দিয়েই আমার মনোমত হয়েছে। তবে ছইছাপ্পরটা ভাল নয়।

হাসতে হাসতে দেবনাথ মোড়ল বললেন—বিয়ে করতে গেলে কি সর্বাঙ্গ সাজান বৌ পাওয়া যায়। মেয়েটা ভাল কিনা দেখে নিয়ে নিজের মনোমত করে সাজিয়ে নিতে হয়! ওসব ছই ছাপ্পরের ভাবনা ছেড়ে দিন। সে ভার আমার। এই বলে চৌদ্দশত টাকা দাম ঠিক করে দেবনাথবাবু নৌকা তার ঘাটে নিয়ে গেলেন এবং খুলনা থেকে ভাল মিস্ত্রি ও কাঠ আনিয়ে নিজের ঘাটে বসেই কাজ আরম্ভ করালেন।

নকুলেশ্বর বললেন—তিনটি কামরা করবেন। গলই কামরাটি চার হাত, মাঝেরটি আট হাত ও পেছনের কামরাটি পাঁচ হাত। জানালা হবে এক এক পার্শ্বে তেরটি। পেছনে তিনটি, মাঝে আটটি, গলই কামরায় দু'টি করে মোট জানালা হবে দু'পাশে ছাব্বিশটি। পেছনে শৌচাগার থাকবে।

নকুলেশ্বরের কথামত মিস্ত্রি কাজ আরম্ভ করল। একমাস কাজ করার পর মিস্ত্রি ছাউনীর কথা জিজ্ঞাসা করল। দেবনাথবাবু বললেন—যেমন নৌকা,

তেমন ছই না হলে মানাবে কেন? আগে সেগুন কাঠের তক্তা দিয়ে ছাউনি দিয়ে তার উপর পাতটিন দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। নৌকা তৈরীর কাজ শেষ হলে রং মিস্ত্রি দিয়ে রং করালেন।

এ তো নৌকা নয়, যেন জল পুলিশের পিনিস বোট! নৌকা দেখে নকুলেশ্বর বললেন—কয় হাজার টাকা খরচ করলেন জানিনা!

দেবনাথ—আপনার জেনেও দরকার নেই। মানুষে একটা সৎ কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে থাকে। আমি আর বেশী কি করলাম। আপনার মতো একজন উদীয়মান কবির জন্য এক স্থায়ী আস্তানা গড়ে দিলাম। যাতে চড়ে আপনি দেশে দেশে কবিগান গেয়ে, ধর্ম কথা বলে বেড়াবেন। যতদিন এই নৌকা থাকবে ততদিন আমাকে স্মরণ রাখবেন—এটাই আমার পরম সৌভাগ্য।

নকুলেশ্বর—আমার কবিজীবনে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাকল্পে ভগবান বোধ হয় আপনাকে উপলক্ষ করে পাঠিয়েছেন; নতুবা কার জন্য কে এতটা ত্যাগ স্বীকার করে? আপনার দেওয়া তরণী অবলম্বন করে আমি দুস্তর কবি-সমুদ্রে পাড়ি ধরবো, আমার চলার পথে আপনি থাকবেন একটি অনির্বাণ ধ্রুবতারা।

দেবনাথ মোড়লের দেওয়া এই তরণী অবলম্বন করেই নকুলেশ্বর বাংলাদেশে একাদিক্রমে তেত্রিশ বৎসর কবিগান গেয়ে অসামান্য যশ প্রতিষ্ঠা মান সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করেছেন।

এদিকে আষাঢ় মাসের শেষভাগে দলের ম্যানেজার হরিচরণ নট্ট নকুলেশ্বরের নির্দেশমতো রথযাত্রার দিন আবার দলের পত্তন ও হালখাতা করে রাখলেন। নূতন কেউ নয়, গত বৎসরের দোহারগণই এ বৎসরের দাদন নিলেন।

শ্রাবণ মাসে নকুলেশ্বর দেবনাথবাবুকে বললেন—ঘোড়া তো দিয়েছেন, এখন চাবুকের ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে। উপযুক্ত একজন মাঝি ও তিনজন পাকা দাঁড়ী না হলে তো এ নৌকা চলবেনা। তার ব্যবস্থা করে দিন। মাস ঠিকা তারা মাহিনা পাবে।

দেবনাথ মোড়ল—আমরা নদীর দেশের মানুষ। বড় নদীতে নৌকা চালাবার মাঝির অভাব হবে না। আমি আমার বিশ্বাসী দাঁড়ীমাঝি ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তার নিজের লোকেদের মধ্য থেকে পাকা এবং বিশ্বাসী দাঁড়ি মাঝি ঠিক করে দিলেন। নকুলেশ্বর 'দুর্গা দুর্গা' বলে নৌকায় উঠে দেবনাথবাবুকে বললেন—বন্ধু! আদেশ করুন, এখন নৌকা খুলি।

দেবনাথবাবু বললেন—আদেশ কি। প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। এই নৌকাই যেন আপনার শান্তির নীড়ে পরিণত হয়।

নৌকা নিয়ে ঝালকাঠির ঘাটে পৌঁছলে কবির দলের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। কারণ, কোন কবিয়াল বা কবির দলের এরকম সুসজ্জিত নৌকা নেই। ম্যানেজার হরিচরণ নট্ট নৌকা দেখে অবাক। উৎফুল্ল হয়ে বলল—এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। নৌকার সামনে একটা সাইনবোর্ড লাগানো হলো—"বীণাপাণি কবি পার্টি"

ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসাইয়া

নূতন দল গঠন করে নকুলেশ্বর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট ইত্যাদি জেলায় যত আসরে গান করেছেন গুরু কৃপায় সেই সব জায়গাতেই তাঁর দলের বার্ষিক ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। নূতন বায়নার জন্য চেষ্টা করার দরকার হতো না। সে বৎসর যথাসময়ে পূজার দশ বারো দিন পূর্বে দোহারপত্র নিয়ে তাঁর নূতন পান্‌সী বোটে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। নৌকায় উঠে দলের লোকজনের অপার আনন্দ! তিন কামরা নৌকায় গলই কামরায় দাঁড়িমাঝি, রান্নার ঠাকুর চাকর ও একপাশে নকুলেশ্বরের সাইকেল। মধ্য কামরায় সব গায়কগায়িকা বাদকবৃন্দ প্রত্যেকে কায়েমীভাবে যার যার স্থান বাছাই করে নিল। পিছন কামরা নকুলেশ্বরের স্পেশাল রুম। সুন্দর সাজান। বইয়ের আলমারী, বন্দুকগুলির আলমারী, আলনা ইত্যাদি এমন সুন্দরভাবে সাজান যে দেখলে একটা অফিস কামরা বলে মনে হয়। সব শেষে বাথরুম পায়খানা। মোটকথা ভদ্রভাবে বাস করতে হলে সংসারে যা যা প্রয়োজন নকুলেশ্বরের পান্‌সীতে তার কিছুরই অভাব ছিল না।

উপরন্তু ঢাকার ঘাটে পৌঁছে নকুলেশ্বর ম্যানেজার হরিচরণকে বললেন—বাইন মহাশয়, নৌকা তো মনের মত করে সাজিয়ে নিয়েছি, এখন নৌকার পাহারাদার দরকার। চলুন আমার সঙ্গে। এই বলে নকুলেশ্বর মৌলবীবাজারে গিয়ে সখ করে এক সাহেবের খানসামার নিকট থেকে খুব সুন্দর দু'টা খাস বিলাতী কুকুর দুই শত টাকায় কিনে এনে নৌকার ছাদের উপর তাদের জন্য সুন্দর ঘর করে দিলেন। কুকুর কুকুরীর নাম রাখলেন 'টাইগার' ও 'জীমি'। উপর নীচে তাদের অবাধ গতি। দলের সবাই তাদের ভালবাসত। তাদের বিক্রমে অপরিচিত কোন লোক নৌকার সিঁড়িতেও পা দিতে পারত না।

নকুলেশ্বরের এই সব স্টাইল বা জাঁকজমক যারা স্বচক্ষে না দেখেছে, তাদের কাছে সব গল্পকথা মনে হবে। সত্যিই তো একজন সামান্য কবিয়ালের পক্ষে এরকম জীবনযাত্রা কিছুটা অচিন্ত্যনীয় বই কি! কবি জীবনে নকুলেশ্বর যে আনন্দে, যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তেত্রিশ বৎসর পূর্ব বঙ্গে কাটিয়ে এসেছেন, বাংলাদেশের খুব কম কবিয়ালেরই সে সৌভাগ্য হয়েছে। যেখানে তাঁর নৌকা যেত না, সেখানে তিনি বায়না নিতেন না। বিশেষ অনুরোধে পড়লে সাইকেল নিয়ে যেতেন। অন্যান্য কবির সরকারদের মতো দুই-দশ মাইল হেঁটে গিয়ে গান করতেন না। সব সময় তিনি নৌকায় থাকতেন। নৌকায় তাঁর স্নানাহার, বিরাম বিশ্রাম সব। একমাত্র গানের আসরের সময়টুকু ছাড়া নৌকাই তাঁর ঘরবাড়ী, নৌকাই ছিল তাঁর জীবনসর্বস্ব। এমন কি প্রতি বছর গানের মরশুম সমাপনান্তে দল বন্ধ হয়ে বর্ষাকালে দুই এক মাস বাড়ী থাকা কালেও বাড়ীর ঘাটে কালীজিরা নদীর বুকে নৌকা বেধে ঐ নৌকাতেই বাস করতেন। বৃষ্টির ছাট, টিনের ছইয়ে টুং টাং শব্দ, জলের উপর টুপটাপ জলতরঙ্গ, দাঁড় ফেলবার ছপাছপ আওয়াজ, শাস্ত্রাধ্যায়ণ বা সঙ্গীত রচনা দুটোরই অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতো।

বন্দুক চালনা খুব ভাল অভ্যাস করেছিলেন তিনি। পদ্মা-মেঘনা ইত্যাদি বড় বড় নদীর চরে অসংখ্য পাখি পড়ত। দলের লোকজনের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে পাখি শিকার করতেন। বন্দুক চালনায় ক্রমে ক্রমে হাত এমনিই পোক্ত হয়েছিল যে শতকরা নব্বুইটি গুলিই সফল হতো।

তাঁর ঐ ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে নদীনালার সাতনরী হার গলায় পরা পূর্ববঙ্গের আটটি প্রধান জেলার নদনদী খাল বিলে জলচরের মতো চরিয়ে বেড়িয়েছেন। আর কবিগান ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর অজস্র সঙ্গীত রচনা করেছেন। বাউল, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, শাক্তগীতি, দেহতত্ত্ব, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আধুনিক ভাবসমৃদ্ধ অসংখ্য গানের মধ্যে দু'চারটি নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হলো।

(১)

ও মন, জানিস কি তোর দেহ ঘরে
কোন্ মানুষ খেলে।
ওরে সে মানুষের পরশে তোর—
দেহ চলে জলে স্থলে॥

সে মানুষ তোর রয় সহস্রারে ;
দম লাগায়ে বসেছে তোর
ইঞ্জিনের ঘরে।
জপিলে সে অজপারে,
অধর মানুষ ধরা পড়ে,—
ও মন একুশ হাজার ছয় শ' বারে
দমের ঘরে দম লাগালে ॥

মূল মানুষের সন্ধানে যাবি,
সেই মানুষের কাছে আছে—
কল ঘরের চাবি।
সে মানুষের খবর লবি
নাভি মূলে সহস্রারে ;
অধম নকুল বলে মানুষ মিলে—
হিংসা নিন্দা কৈতব গেলে

(২)

হারে, কোন্ ছাঁচে বানাইছেন গুরু—
আজব দেহঘর।
এ ঘর হেলতে পারে দুলতে পারে—
চলতে পারে নিরন্তর ॥
না জানি সে কেমন কারিগর,
ঘরের মাঝে বানায়েছে—
আট কুঠরী ঘর।
এক হাজার আটান্ন দুয়ার
গড়ায়েছে ঘরের ভিতর ;
ঘরে শ্বাসে শ্বাসে যায় আর আসে—
ঘরের মালিক মূল সদাগর ॥

ঘরের মাঝে অষ্ট সরোবর,
কি বিশুদ্ধ অষ্ট পদ্ম তাহার ভিতর।

মধু পানে হয়ে বিভোর
চেতন হারায় মন-মধুকর ;
ভবে কে এমন সন্ধানী আছে—
বলে দিবে ঘরের খবর ॥
ঘরের মালিক বড়ই সচঞ্চল,
এই দেখি আর এই নাই যেমন—
পদ্মপত্রের জল।
ঘরখানা করে টলমল
কখন ওঠে বৈশাখী ঝড় ;
অধম নকুল বলে ঘর ভাঙিবে—
কণ্ঠে যখন উঠবে ঘড়্‌ঘড়্ ॥

(৩)

আমায় বল দেখি পাষাণের বেটি।
ভবে মা ভাল না বাবা ভাল—
কোন্‌টা মেকী কোন্‌টা খাঁটি ॥
বাবা আমার বদ্ধ পাগল, নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গী জুটি।
তারা ভাঙ খাওয়ায়ে মাতাল ক'রে,—
বাবার তালুক নিল লুটি ॥
নিজে মা তুই উলঙ্গিনী, নর করে ঢাকা কটি ;
বল না কোন্ জননী গলে পরে—
নিজের ছেলের মুণ্ড কাটি।
মা পাগল যাঁর বাবা পাগল, কে ধরবে তার ছেলের ত্রুটি ;
বুঝি হয়তো কবে লেগে যাবে—
মায়ে পুতে লাঠালাঠি ;
নকুল বলে মা মা বলে, এ জীবন তো হল মাটি—
জীবন অন্তকালে বক্ষস্থলে—
পাই যেন তোর চরণ দুটি ॥

(৪)

তোমার পূজা করব বলে মনে ছিল সাধ।
পূজার ঘরে দেবাসুরে, লেগেছে বিবাদ ॥

ছয়টা অসুর কি দুর্দান্ত,
এতো সাধের পূজার ভাণ্ড,
সব করেছে লণ্ডভণ্ড, সাধে সাধলো বাদ।
পূজার ঘরে দেবাসুরে লেগেছে বিবাদ ॥
দেবতা তুমি ঘুমিয়ে আছ গভীর অন্ধকারে।
এতো সাধের পূজার মালা দিব আমি কারে ॥
তোমার এ ঘুম কে ছাড়াবে,
অসুরগুলো কে তাড়াবে,
পূজার মন্ত্র কে পড়াবে, ঘটলো পরমাদ।
পূজার ঘরে দেবাসুরে লেগেছে বিবাদ ॥
তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান ধারণা সব হয়েছে ভুল।
অযতনে বাসি হয়ে গেল পূজার ফুল ॥
জাগো প্রভু একবার জাগো,
আর ঘুমায়ে থেকো না গো,
তোমার পূজায় তুমি লাগো, ভেঙ্গে অবসাদ।
পূজার ঘরে দেবাসুরে লেগেছে বিবাদ ॥
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব করে ভাঙলো পূজার ঘর।
আমি তোমার দীন পূজারী হয়ে আছি পর ॥
অসুরের দৌরাত্ম্য হর,
তোমার মালা তুমি পর,
নিজগুণে ক্ষমা কর, আমার অপরাধ।
পূজার ঘরে দেবাসুরে লেগেছে বিবাদ ॥

(৫)

আমায় বলরে পাপিয়া
কোন্ সুদূরে আছে, আমার পরাণ পিয়া।
সুখ বসন্তের আগমনে,
মন্দ সান্ধ্য সমীরণে,
পিউ পিউ পিউ তানে, কাঁদালি হিয়া।
আমায় বলরে পাপিয়া ॥

পাব বলে সে পিয়ারে,
নিশি জাগি অভিসারে,
কোথা গেলে বলগো তারে, পাব খুঁজিয়া।
আমায় বলরে পাপিয়া॥

(৬)

আজি, বরষা দিয়েছে দেখা।
থামিয়ে গিয়েছে কোকিল কাকলী—
ভেক রাগে প'ল ঢাকা॥
ঝর ঝর ঝরে বরিষার বারি,
কুলায় ভিজিছে শুক পিক শারী,
মনোসুখে গাহে মিলনের সারি,
নদী চরে চখি-চখা
বরষা দিয়েছে দেখা॥
নদীনালা আর পুকুর পগার
থৈ থৈ করে জল,
শান্তি নেমেছে ধরণীর বুকে
ভিজে গেছে তরুতল।
কূলে কূলে ভরা অকূল সরসী,
মনোসুখে ডাকে সারস সারসী,
গাগরী ভরিয়ে নাগরী ষোড়শী,
জল নিতে আসে একা।
বরষা দিয়েছে দেখা॥

(৭)

হারে ও চাচা জী—
বলো আমরা ক্যামনে চইমু হাল।
মোদের গোহালে নাই হালের গরু—
লাঙ্গলে নাই ফাল॥
রোদ বৃষ্টিতে ভিজা পুইড়া,
হালের মাঠে থাকি পইড়া রে—
মোদের পানে কেউ চায়না ফিরা
কি পোড়া কপাল॥

দিন রাইত খাটনী খাইটা
সোনা ফলাই ক্ষেতে
কর্তারা খায় ঘৃত মাখন
আমরা পাইনা খেতে।
দিনান্তেও পাইনা মোরা,
পান্তাভাতে মরিচ পোড়া রে—
ভাঙ্গা কপাল লয়না জোড়া—
দুঃখে কাটাই কাল॥
দেহের রক্ত শুইষা নিল—
পোকে জোঁকে খাইয়া
বাকী মাংস খাব্‌লে খায় সব
মহাজনে পাইয়া।
ভুইগা মরি কালা জ্বরে—
পইড়া থাকি ভাঙ্গা ঘরে রে—
দমকা ঝড়ে গেল উড়ে
কুঁড়ে ঘরের চাল॥

গানের ভক্তদের নিষ্ঠা বিশ্বাস ভালবাসা

ঢাকার 'ফিরা'য় সেই নগর কসবা কুন্ডীবাড়ী দুর্গাপূজার বার্ষিক গান থেকে শুরু করে মাঘমাসে ঝালো কৈবর্তদের "পালনীর" গানের বার্ষিক গানগুলি শেষ করে খুলনা জেলার বার্ষিক গান করতে প্রথমেই বাগেরহাটে গিয়ে নৌকা বাঁধতেন। ঢাকা সদরঘাটের মতো খুলনা জেলায়ও এই বাগেরহাট ছিল নকুলেশ্বরের বাঁধা ঘাট। দূরদূরান্তের কবি-উৎসাহী ব্যক্তিরা এখানে নকুলেশ্বরকে বায়না করতে আসতেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী যখন মানুষের প্রতি সুপ্রসন্ন হয় তখন তার যশ প্রতিষ্ঠা মান সম্মান অর্থ কিভাবে কোথা থেকে আসে তা বোঝা দুষ্কর। এখন নকুলেশ্বরের সুদিনের জোয়ার দুকূল প্লাবিত করে চলেছে। বায়নার পর বায়না আসছে। বিশ্রামের অবকাশ নেই। বার্ষিক বা বারোয়ারী বায়না ছাড়াও স্বপ্নের বায়না, মানসিকের বায়না কত কি। স্বপ্নের বায়না হলো—কোন গ্রামে হয়তো বারোয়ারী কালীপূজা হয়ে গেছে। অন্য দুই দল কবি এনে

কবিগানও দিয়েছে। হঠাৎ ঐ গ্রামে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করল। গ্রামের মোড়লকে নাকি মা কালী স্বপ্নে বললেন—তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করে যা-তা কবিগান এনে শুনিয়েছ, তোমাদের বংশ রাখবো না। ভাল চাও তো নকুলের দল এনে তার গান শোনাও।

স্বপ্ন দেখে মোড়ল মশাই গ্রামের সকলকে তার এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানালেন। সকলে পরামর্শ করে আবার পূজার আয়োজন করে নকুলেশ্বরকে বায়না করলেন। গানের পরে নাকি সে গ্রামের মহামারী বন্ধ হলো অর্থাৎ মা তাঁর অভিশপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

আবার কোন অপুত্রক হয়তো স্বপ্ন দেখলেন, মা বলেছেন—

ধন ঐশ্বর্য যা পেয়েছ সকলি অসার।
পুত্র বিনে বন্ধ থাকে সপ্ত স্বর্গদ্বার ॥

—তোর যদি পরিণামে স্বর্গে যাওয়ার সাধ থাকে. জাঁকজমকে আমার পূজা দিয়ে নকুলেশ্বরকে এনে কবিগান দে। গান অন্তে মানত কর—হে কবি! তোমার গানে মা সন্তুষ্ট হয়ে আমার বংশে আমার ঘরে যেন একটি সুপুত্র দান করেন—এই আশীর্বাদ কর, আমি তোমাকে বার্ষিক করে দেব। এভাবে স্বপ্নাদেশে নকুলেশ্বরকে নিয়ে গান ও মায়ের পূজা দিয়ে অনেকে নাকি পুত্রলাভ করেছেন। অনেক স্থানের মহামারী বারণ হয়েছে। পরের বৎসর আবার গানের অনুষ্ঠান করে আসরে পুরস্কার দিতেন—সোনা রূপার মেডেল, সোনার আংটি, ঘড়ি, পিতল কাঁসার হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি।

বাগেরহাট এলাকায় গান শেষ করে তাঁর পানসী বোট যখন বাদাম টেনে সাহেবের আবাদ দাওকুপীর পথে চলত, নদীর দুই কূলের পুরুষ নারী, ছেলে বুড়ো সবাই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নকুলেশ্বরকে দেখতে চাইত। তাদের অনুরোধে নকুলেশ্বর ছাদের উপরে উঠে আসতেন। যে ইজিচেয়ারে বসে তিনি সান্ধ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতেন, সঙ্গীত রচনা করতেন তাতে বসে সকলকে দর্শন দিতেন, হাত তুলে নমস্কার জানাতেন।

খুলনার দক্ষিণ অংশে বড় বড় ধনী চাষীর সংখ্যাই বেশী ছিল। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ—এমন গৃহস্থের সংখ্যা ছিল অনেক। নকুলেশ্বরের পানসী দেখলে অনেকে ডেকে বলতেন—সরকার মহাশয়, আমার ঘাট দিয়ে না খেয়ে যাবেন এ কেমন কথা! ম্যানেজার হয়তো জবাব দিত—এখন তো আমাদের সময় নেই ভাই। সে ভদ্রলোকেরা বলত—অপেক্ষা

করার সময় না থাকে, অন্ততঃ চালডালটা নিয়ে যান। এইভাবে কত লোকে যে নকুলেশ্বরকে আপ্যায়িত করত তার সীমা নেই। তাঁদের তৃপ্তি উজ্জ্বল মুখ এখনো নকুলেশ্বরের চোখে অম্লান।

দেবনাথ মোড়লের ঘাটে গেলে তো নকুলেশ্বরের আদর যত্নের সীমাই থাকত না। আনন্দ উৎসব খাওয়া দাওয়া শিকারে যাওয়া—সঙ্গে সঙ্গে গানবাজনা। চৈত্র বৈশাখ মাসেই বৈঠাঘাটা, দাওকূপী, আশাশুনী থানা এলাকায় বারোয়ারী কালীপূজার গানের হিড়িক। সাতক্ষীরা পর্যন্ত নকুলেশ্বরের একচেটিয়া পশার। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন গান হতো না। কাজেই গানেরও অভাব নেই, আর গানের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দরবনে হরিণ শিকারের আনন্দ উপভোগেও কোন অসুবিধা ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে

তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব দানা বেঁধে উঠেছে। স্থানে স্থানে স্বরাজ অফিস খুলেছে, কংগ্রেস কর্মীদের সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নকুলেশ্বর দু'চারটি সভায় গিয়ে দেখলেন—লোক সমাবেশ খুবই কম; সভা তেমন ভাল জমে না। ইংরেজ শাসনপ্রীতি অথবা পুলিশের ধরপাকড় অত্যাচারের ভীতি যে কারণেই হোক সভায় লোকজন বেশী হতো না। কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারগণ ফাঁকা মাঠে গোল দিচ্ছে—তোমরা বিলাতী জিনিষ বর্জন কর, জন্মভূমি ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর, হিন্দু মুসলমান এক হও, আমরা ভাই ভাই। জাতিভেদ শুচিস্পর্শ দেশের শত্রু ইত্যাদি নানা কথা বলে গলা ফাটাচ্ছে। দু'এক শত লোক ছাড়া সভায় শোনবার মতো লোক নেই। 'বন্দেমাতরম্' বলে সভার কাজ আরম্ভ হচ্ছে, আশাহত হয়ে আবার বন্দেমাতরম্ বলে সভা ভেঙ্গে দিচ্ছে। দু'তিনটি সভার এই অবস্থা দেখে নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবলেন—এরা দেশ সেবার জন্য এত আয়োজন, এত পরিশ্রম করে সভায় ভাল লোক জমাতে পারছেন না, আর আমার গানের আসরে তো দশ বিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। দু'তিন দিনের দূর দূরান্তের লোকজন চাদরে চিড়া গুড় বেঁধে গান শুনতে আসেন। 'আমি যদি এসব মহতী আসরে গানের ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটা দেশের কথা বলি তাতে ক্ষতি কি! আমার গানের কাজও হবে, আর একটু দেশের কাজও হবে।

প্রথম স্বদেশী বক্তৃতা—খুলনা তিলডাঙ্গা কাছারী

এই চিন্তা করে করে নকুলেশ্বরের কাঁধে একটা স্বদেশী-ভূত চেপে বসল। পরের গান তিলডাঙ্গা কাছারীতে। নকুলেশ্বর তিলডাঙ্গার ঘাটে পান্সী বেঁধে দেখলেন আসরে বহু লোকের সমাবেশ হয়েছে। তিনি স্থির করলেন আজ এ আসরেই দেশের জন্য দু'চার কথা বলে দেখব। সে আসরে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল গীতা। বিপক্ষে ছিলেন চালনার ছোট হরিবর। তিনি কল্পনায় অর্জুন নাম নিয়ে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন—

আমি কল্পনাতে অর্জুন, তুমি সখা শ্যামরায়।
তুমি আমার এই রথের গতি,
সুপথে নিবে শ্রীপতি,
তাই ভাবিয়ে সারথী, করেছি তোমায়॥
অদ্য কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে, সসৈন্যে সেজে এলো দুর্যোধন;
দুই পক্ষের সৈন্য দেখে, আজ আমার কেঁদে উঠল মন।
আমার পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণ,
আত্ম বন্ধু ভ্রাতৃগণ,
এই যুদ্ধে করল আগমন;
তুচ্ছ রাজ্যের তরে, কেন মোরে—
এই যুদ্ধে প্রেরণা দাও নারায়ণ॥

নকুলেশ্বর এই টপ্পার জবাবে বললেন—

বললে, তুচ্ছ রাজ্যের জন্য কেন যুদ্ধ করতে কও।
জানি পাণ্ডু রাজার এই রাজ্য,
ভোগদখল তোমাদের কার্য,
থাকিতে শৌর্য বীর্য, যুদ্ধকে ভয় পাও?
শুনি জননী আর জন্মভূমি, তা হতে স্বর্গ বেশী বড় না;
পিতৃ রাজ্য সুমহান, তুচ্ছ জ্ঞান করতে পার না।
তোমার পিতৃরাজ্য করে ছল,
যারা করে ভোগদখল,
আত্মীয় মনে করো না।
তোমার জন্মভূমি উদ্ধারার্থে—
দিতেছি যুদ্ধ করতে প্রেরণা॥

তারপর পাঁচালীতে বললেন—তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্ম যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম। যুদ্ধস্থলে দুর্বলতা কাপুরুষের লক্ষণ। দুর্যোধন আততায়ী—সে তোমার পিতৃরাজ্য ছলেবলে দখল করে বসেছে, তোমাদের বনবাসে দিয়েছে। যেমন বণিক বেশে ইংরেজ এসে আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতাকে গ্রাস করে বন্দিনী করে রেখেছে। প্রায় দীর্ঘ দু'শত বৎসর যাবত দুর্যোধন-বেশী ইংরাজ সর্বস্ব হরণ করে আমাদের ভিখারী সাজিয়েছে। এসো আজ ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান আমরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমাদের পরমশত্রু ইংরেজরূপী দুর্যোধনকে ধ্বংস করে আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতাকে উদ্ধার করি। এরাজ্য আমাদের। কংগ্রেসরূপী পাণ্ডুরাজাই হলো এ ভারতের প্রকৃত মালিক। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্ররূপী ইংরেজ নয়। ছলে বলে কৌশলে অর্থাৎ প্রলোভনরূপী পাশার চালে ঠকিয়ে আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতাকে বন্দিনী করে রেখেছে দুর্যোধনবেশী ইংরেজ। আমার দেশবাসী ভাইসব বন্ধুগণ! এসো, আজ আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে প্রাণ উৎসর্গ করেও ভারতমাতার বন্ধন মুক্ত করি এবং কংগ্রেস শাসনরূপ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করি।

এ সম্পর্কে তাঁর রচিত অনেক গানের মধ্যে নমুনা-স্বরূপ দু'একটি উদ্ধৃত করা হলো—

(১)

এবার জাগো ভারতবাসী।
হয়ে সামর্থহীন পরের অধীন—
আর কতদিন থাকবে বসি॥
মোদের দেশ মোদের মাটি,
ইংরাজে বান্ধে ঘাটি,
আমরা তার গোলাম খাটি, হয়ে মহাসুখী;
মোদের ত্রিশ কোটি সন্তানের মাতা—
থাকবে পরের দাসী॥
আমরা কোন লাজে আর থাকব বেঁচে
এর চেয়ে কি মরণ বেশী॥
মা মোদের বন্দীদশায়-
কাঁদিছে নীরব ভাষায়।

সেই মায়ের মুক্তির আশায়, সবে দাঁড়াও আসি ;
ওরা যেমন কুকুর তেমন মুগুর, মারতে হবে কষি।
যাবে গুঁতার ডরে ভারত ছেড়ে—
মায়ের মুখে ফুটবে হাসি ॥
সাজিয়ে বণিক বেশে,
ইংরেজ ঢুকিয়ে দেশে,
মোদের সুখ শান্তি নাশে, হয়ে সর্বগ্রাসী ;
আমরা কর্মদোষে নিজের দেশে আছি পরবাসী।
সবে রুখে দাঁড়াও ইংরেজ তাড়াও—
ভয় করো না জেল কি ফাঁসী ॥

(২)

ভারত মাতার করতে পূজা, মনে বাঞ্ছা জাগে।
কোথায় পাব সে উপচার, পূজায় যা যা লাগে ॥
মায়ের পূজা করতে সিদ্ধি,
স্বদেশ প্রীতি আত্মশুদ্ধি,
জাতিয়তা বিচার বুদ্ধি—
দূর করে দাও আগে ॥
জৈন বৌদ্ধ পার্শী পাদ্রী হিন্দু মুসলমান,
ভারত মাতার ছেলে মোরা এক জাতি একপ্রাণ ॥
সবাই হাতে হাতে ধর,
মঙ্গল ঘটে বারি-ভর,
মিলন মন্ত্রে পূজা কর
প্রেম অনুরাগে ॥
ঐক্য সখ্য মহাবাক্য পূজায় কর পাঠ,
সঙ্ঘ বলে ভেঙ্গে ফেল বিদ্বেষের কপাট।
নিয়ে সরল ন্যায় নিষ্ঠা,
কর মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা,
ছুঁতিস্পর্শ বিষম বিষটা —
আর যেন না জাগে।

মায়ের কাছে ছেলের কোন জাতি বিচার নাই,
সেই মায়েরি ছেলে মোরা সকলে ভাই ভাই।
দেশাত্মবোধ খড়্গ তুলি,
সাম্প্রদায়িক পশুগুলি,
মায়ের পূজায় দিব বলি—
মহামিলন যাগে।
কোথায় পাব সে উপচার, পূজায় যা যা লাগে॥

এভাবে নকুলেশ্বর আসরে আসরে টপ্পা-পাঁচালী আরম্ভ করেই ভারত মাতার উদ্ধারের জন্য, জাতির দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের জন্য, শাস্ত্র আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও দেশের কথা বলতেন, যেমন—

গরুড় পাখী মায়ের দাসীত্ব মোচনের জন্য স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের বজ্রকেও উপেক্ষা করে মরণংকে তুচ্ছ করে সুধার ভাণ্ড এনে বিমাতা কদ্রুকে দেয় এবং তার গর্ভধারিণী মাতা বিনতার মোচন দাসীত্ব করে।

সামান্য একটা বনের পাখী যদি মায়ের দাসীত্ব মোচনের জন্য মরণ তুচ্ছ করতে পারে, আমরা মানুষ হয়ে ত্রিশ কোটি সন্তানের মাতা ভারতজননীর মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে পারব না? ইন্দ্রের বজ্র হতে কি ইংরেজের বন্দুকের গুলি বেশী ভয়ঙ্কর? এসো ভাই সব! আমরা হিন্দু মুসলমান একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ভারতমাতার দাসীত্ব মোচন করি। কোন আসরে হয়তো ছোট ছেলেদের নীতি শিক্ষামূলক পুস্তকে বকলস্ বাঁধা পোষা কুকুর ও বনের বাঘের গল্পটি বলতেন—একটা বনের পশু যদি বলতে পারে—আমি স্বাধীনভাবে থেকে না খেয়ে মরি, সেও ভাল, তবু তোমার মতো পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী থেকে রাজ-ভোগ খেতে চাইনা।—বনের পশু বাঘ, তার যদি এতখানি স্বাধীনতা-স্পৃহা থাকে, আর আমরা মানুষ হয়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের পোষা কুকুর হয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে রাজভোগ খাব! ধিক্ আমাদের মনুষ্যত্বে, শত ধিক্ আমাদের জীবনে—এসো, আমরা পশু হতেও জঘন্য জীবন যাপন না করে পরাধীনতার দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলি।

মোদের শীল মোদের নোড়া,
মোদের ভাংবে দাঁতের গোড়া॥

—এ আমরা সহ্য করব না। বিদেশী কুকুরকে মুগুর মেরে তাড়িয়ে জন্মভূমি ভারতমাতার বন্ধন মুক্ত করি।

নকুলেশ্বরের এসব বক্তৃতা শুনে স্বরাজ অফিসের ভলান্টিয়ারগণ তাঁর পিছু নিল। তাদের পক্ষে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। তারা দেখলেন যে কংগ্রেস কর্মীদের সভাসমিতিতে যে পরিমাণ লোক সমবেত হয়, নকুলেশ্বরের গানের আসরে তার চেয়ে শত সহস্রগুণ শ্রোতা বেশী হয়। কাজেই যেখানেই নকুলেশ্বরের বায়না হতো, সেখানেই পাঁচ দশ জন ভলান্টিয়ার গিয়ে আসরে বসতেন এবং নকুলেশ্বরকে "স্বদেশী গান, স্বদেশী গান" বলে উস্কিয়ে দিতেন।

নকুলেশ্বরও ঐ সব স্বদেশী কথা বলতে বলতে যেন একটা নেশার বশীভূত হয়ে পড়লেন। 'গৌরাঙ্গ লীলার' আলোচনা হলে গৌরাঙ্গের জীব উদ্ধার, জীবের জন্য ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর তুলনা করতেন, দধিচীর ত্যাগের সঙ্গে দেশবন্ধুর সর্বস্ব ত্যাগের তুলনা দিতেন, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন সংগ্রামের তুলনা করতেন, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে জওহরলালের চরিত্র, মহম্মদ আলী, সৈকত আলীর আত্মত্যাগের সঙ্গে যেভাবে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারকগণ এজিদের অনেক নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করেও আরববাসীদের সত্যধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সে প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন।

রাজরোষে কবিগান—নকুলেশ্বরের উপর নিষেধাজ্ঞা

এভাবে দিনের পর দিন যেতে লাগল। এসব কথা কি আর বেশী দিন গোপন থাকে? ব্রিটিশ সরকারের পদলেহী কুকুরের দল গিয়ে এসব কথা সরকারী কর্তৃপক্ষের কানে তুলে দিল। নকুলেশ্বরের নামে "এরেস্ট ওয়ারেণ্ট" জারী হলো।

কিন্তু নকুলেশ্বরকে ধরা একটু মুস্কিল হয়ে পড়ল। কারণ তিনি ত কোন এক থানায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন না। প্রায় প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর তাঁকে গানের জন্য স্থান পরিবর্তন করতে হতো। ফলে তিনি এ থানা ও থানায় গান করে বেড়ান—গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ট্র্যান্সফার করতে করতে অনেকদিন কেটে যায়; তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনা।

একবার খুলনা ফকিরহাট থানা এলাকায় নকুলেশ্বর পর পর অনেকগুলি গানের বায়না পেলেন। দোহাজারী, ফকিরহাট, মূলঘর, হোচলা, উত্তরপাড়া, ছোট বাহিরদিয়া, বড় বাহিরদিয়া, ব্রাহ্মণ রাংদিয়া, মৌভোগ, নওপাড়া, পীলজংসাধের গাছতলা ইত্যাদি গ্রামে পনের বিশ পালা গান এক ফকিরহাট থানাতেই পড়ল। জ্যৈষ্ঠ মাস প্রায় শেষ। উত্তরপাড়া গান করতে গেলেন। কংগ্রেস

কর্মীরাও গিয়ে আসরে বসেছে। নকুলেশ্বর অন্যদিনের মতো স্বদেশী ও ইংরেজ-বিরোধী কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার আসরের মধ্যে গিয়ে এক টুকরো কাগজ দেখিয়ে বললেন—এই দেখুন আপনার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। আপনি রাজদ্রোহী, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো।

নকুলেশ্বর নির্ভয়ে বললেন—আমার গানের মেয়াদ বেলা বারোটা পর্যন্ত। আপনারা ততক্ষণ অপেক্ষা করুন; আমার চুক্তি পালন করতে দিন।

বেলা বারোটায় গান শেষ হলো। নকুলেশ্বর পুলিশ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ্যারেস্ট কি আমি একা, না দলশুদ্ধ ?

পুলিস—না, আপনি একা।

নকুলেশ্বর ম্যানেজার হরিচরণকে বললেন—আপনি বিদায়ের টাকা নিয়ে দলসহ নৌকায় যান। আমি না আসা পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন।

নকুলেশ্বর পুলিশের সঙ্গে ফকিরহাট থানায় গেলেন। থানার বড় দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো কবি; কাব্য আলোচনা করবেন, ধর্মকথা বলবেন—তার মধ্যে আবার এই রাজনীতির ঘোড়া রোগে ধরলো কেন ?

নকুলেশ্বর—রাজ্য শুদ্ধ লোক আজ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে কৃত-সঙ্কল্প। পরাধীন দেশে জন্ম গ্রহণ করেছি। স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করতে কি প্রাণ চায়না ?

দারোগা—এর পরিণাম যে কারাদণ্ড তা তো জানেন ?

নকুলেশ্বর—হ্যাঁ, জানি বৈ কি! ভাগ্যে যদি রাজদণ্ড থাকে, খণ্ডন করার উপায় নেই।

দারোগা আর কিছু বললেন না। পরের দিন নকুলেশ্বরকে খুলনা কোর্টে চালান দিলেন। নকুলেশ্বর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—আমি যদি এখন কারারুদ্ধ হই, তবে দলের দোহারপত্রদের কি উপায় হবে ? সারা বৎসরের হিসাবপত্র বাকী, তাদের দেনা পাওনা মিটিয়ে দিয়ে দল বন্ধ করতে হবে। এতগুলি পরিবার চরম অসুবিধায় পড়বে। তাই তিনি বন্দী হওয়া সমীচীন মনে করলেন না।

পরদিন কোর্টে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি রাজদ্রোহী কাজ করেছেন ?

নকুল—দেশের কথা বলা রাজদ্রোহ হলে, তাই করেছি।

হাকিম—আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করেন ?

নকুল—হ্যাঁ, প্রচলিত আইন মতে তো অপরাধ করেছি।

হাকিম—ভবিষ্যতে আর কখনো রাজনীতিতে যোগ দেবেন না, স্বীকার করুন।

নকুল—আমি স্বীকার করছি কোন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করবো না।

হাকিম—যান, আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তবে পাঁচ বৎসরের জন্য আপনার কবিগান নিষিদ্ধ করা হলো। আপনি পাঁচ বৎসর কবিগান করতে পারবেন না।

অর্থাৎ ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত নকুলেশ্বরের কবির বোলে কুলুপ এঁটে দিল।

নকুলেশ্বর ফকিরহাটে চলে এলেন। নৌকায় এসে দলের সকলকে এ খবর দিলেন। শুনে সবাই দুঃখিত ও মর্মাহত হলো। নকুলেশ্বর হরিচরণ নট্টকে বললেন—আরো চার পাঁচ পালা গানের বায়না আছে। আপনি গিয়ে বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।

হরিচরণ সকল জায়গায় গানের উদ্যোক্তাদের কাছে এই খবর দিয়ে বায়না ফেরৎ দিয়ে এলো। পান্সী খুলে দিল ঝালকাঠির পথে। ঝালকাঠি পৌছে দলের লোকজনের হিসাবপত্র মিটিয়ে দল বন্ধ করে দিলেন।

কবি ছেড়ে কীর্তন অপেরায়

সকলে চলে গেলে নকুলেশ্বর হরিচরণ নট্টকে বললেন—বাইন মহাশয়, আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন। এখন আমি কি করবো? পাঁচ বৎসরের মতো কবিগান বন্ধ করে আমি কি নিয়ে থাকবো?

হরিচরণ—কি করতে চান?

নকুলেশ্বর একটু চিন্তা করে বললেন—আমি গান বাজনা বন্ধ করে বেঁচে থাকতে পারবো না। কবিগানের উপর নিষেধাজ্ঞা, অন্য গানের উপর তো নয়। আমি একটা কীর্তন-যাত্রার দল করতে চাই। আপনি কি বলেন?

হরিচরণ সে তো খুব ভাল কথা। আপনি কীর্তন-যাত্রার দল করলে বায়নার অভাব হবে না। আপনার নামের জোরেই আপনার গুণগ্রাহী আসরগুলি থেকে বায়না পাবেন।

নকুল—আপনি দলের ছেলেপিলে জোগাড় করে দিতে পারবেন তো?

হরিচরণ—সে জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা জাতে নট্ট, আমাদের এ জাতের মধ্যে সবাই সঙ্গীতজ্ঞ। এখন যাত্রার দলগুলোও বন্ধ। ঐ সব যাত্রার দলে আমাদের নট্ট বংশের অনেক ভাল ভাল ছেলে আছে। আটটি সুদর্শন ও সুকণ্ঠ ছেলে, এবং কর্ণেট, ক্ল্যারিওনেট বাদক ভাল দেখে আনলেই চলবে। আমাদের হারমোনিয়ম বেহালা ও সানাইদার তো আছেই। তবে একটি বৈঠকী ঢোল, তবলা-বাঁয়া কিনতে হবে। ভাল পোষাকপত্র না হলে যাত্রাগান চলবেনা। তারপর একটা রিহার্সাল খরচ আছে। সব দোহারপত্র ঠিক করে পান্‌সীতে এনে তুলতে হবে।

নকুল—খরচ লাগে লাগুক ; মহাজনের ঘরে টাকার অভাব হবে না। তবে পালা'র বই তো চাই।

হরিচরণ—আপনি নিজের মন মতো করে তিন চারখানা পালা'র বই লিখে দিতে পারবেন না ?

নকুলেশ্বর—গুরু কৃপা থাকলে নিশ্চয়ই পারবো। আপনি দল সংগ্রহে নামুন ; আমি নৌকায় বসে পালার বই লেখা শুরু করি।

কীর্তন সম্বন্ধে নকুলেশ্বরের আগে থেকেই একটু অভিজ্ঞতা ছিল। কারণ, কবির আসরে কীর্তন সুরে পাঁচালী বলার জন্য কিছু কিছু মহাজনের পদাবলী উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। সেজন্য হরি আচার্য মহাশয়ের দেওয়া চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকমল ইত্যাদি মহাজনদের পদাবলী গ্রন্থ নকুলেশ্বরের প্রায় মুখস্থ বলা চলে। কাজেই কীর্তন-যাত্রার বই লিখতে তাঁর বেশী অসুবিধা হলো না। প্রথমেই লিখলেন 'নৌকা বিলাস' বা যমুনা মিলন। এদিকে হরিচরণের চেষ্টায় আটটি সুন্দর সুন্দর ছেলে সংগৃহীত হয়ে গেল। যাত্রার দলে তারা প্রত্যেকেই 'একানো' কাজ করতো। তাদের পেয়ে নকুলেশ্বর খুব আশ্বস্ত হলেন। নৌকা-বিলাস পালাটি হরিচরণের হাতে দিয়ে বললেন—এই নিন, এটাই প্রথম রিহার্সেল দিতে আরম্ভ করুন।

রিহার্সেল আরম্ভ হলো। কর্ণেটবাদক রাজেশ্বর নন্দী নিজেই ভাল সুর মাস্টার। ক্রমান্বয়ে নকুলেশ্বর নিমাই সন্ন্যাস, মান, যবন হরিদাস—এই চারখানা বই লিখে নিলেন। এই কয়খানা তালিম দিতে দিতে তিনি আরো চারখানা বই লিখে ফেললেন। সেগুলি হলো—পাষণ্ড দলন, রাই-উন্মাদিনী, কলঙ্ক ভঞ্জন, সত্যভামার পতিদান ব্রত। তাঁর হাতে লেখা সে সব বই এখনো তাঁর কাছে আছে, মুদ্রিত হয়নি।

যাক সে কথা। দলের জন্ম ভাল পোষাকপত্র কেনা হলো; প্রোগ্রাম ছাপান হলো: বীণাপাণি কীর্তন অপেরা, প্রোঃ-কবি নকুলেশ্বর সরকার। পূর্ণ রিহার্সেল হলো চারখানা বই—নৌকাবিলাস, মান, নিমাই সন্ন্যাস ও পাষণ্ড দলন। নকুলেশ্বর সব পরিচিত কবির আসরের কর্তৃপক্ষের কাছে হাণ্ডবিল সহ পত্রযোগে বিস্তারিত জানিয়ে বায়না প্রার্থনা করলেন এবং সব জায়গাতেই তাঁর কীর্তনের বায়না ঠিক হয়ে গেল। আরম্ভ হলো নকুলেশ্বরের কীর্তন-যাত্রার অভিযান।

প্রথম প্রথম কিছুদিন নকুলেশ্বর আসরে কোন কাজ করতেন না। শুধু বই প্রম্‌টিং করে দিতেন। কিন্তু শ্রোতাদের আগ্রহে নকুলেশ্বর কাজে না নেমে পারলেন না। সকলেই গান শুনে বললেন—চমৎকার দল হয়েছে; কিন্তু আপনার মুখের দু'চারটা কথা এই সঙ্গে থাকলে সোনায় সোহাগা হতো।

নকুলেশ্বর তখন 'বিবেক'-এর ভূমিকা নিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেক পালার মধ্যে স্থান বুঝে তিন চারটি গান এবং সে সঙ্গে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী বক্তৃতার মতো বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। সে সব পালা'র দু'একটি নমুনা দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করা গেল।

(নৌকা বিলাস)

রাই বলছেন—সখী! কালার সনে প্রেম করে, আমার কুল গেলগো,
কালার প্রেমে কুল গেল গো—
কলঙ্কিনী নাম হল গো—

তখন বিবেকের গান—

তোরা কুলের গৌরব ছাড়।
কুল ভেবে কুলজা কুলে ভাবিস না গো আর॥
কুল গৌরবে থাকে যারা তারা করে ভুল,
কৃষ্ণ কুলে কুল মিশালে রয়না জাতিকুল।
তোদের কুল থাকিতে পাবিনে রাই—
অকুলের কাণ্ডার॥

কৃষ্ণ ভাব-সাগরে ছুটলো প্রেম পিরিতির বান,
কুলের আলি বান্ধিলে রাই মানবে না সে টান।
তোরা কুল ত্যজিলে হবি রাধে অকূল সিন্ধুপার ॥

(পাষণ্ড দলন)

(জগা মাধা নগর কোটাল হবার জন্য চাঁদ কাজীর হাতে দুইশত টাকা উৎকোচ প্রদান করলে, কাজী বলল—বাহ্‌বা বাহ্‌বা ! বহুৎ আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা ! এখন তোমাদের যো খুসী তাই কর, কুচ্ পরোয়া নেই)

(বিবেক) মোদের দেশ গেল এই দোষে।
হলো বিচারপতি ঘুষের গোলাম—
আইন আদালত চলবে কিসে ॥
যার উপর বিচারের ভার,
তার যদি এই ব্যবহার ;
কে বিচার করবে বা কার,
কে থাকবে কার বশে।
প্রবল লোকের অত্যাচারে, দুর্বল মরবে ত্রাসে।
শুধু অঙ্গে দিয়ে আইনের ছাপা—
চোর সেজেছে সাধুর বেশে ॥

(অন্যস্থানে)

নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ উপলক্ষে জগা মাধাকে নিমন্ত্রণ করলে জগা মাধা বললেন—আমরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ—সে বৈদিকের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাব কেন ? তাতে কি আমাদের জাত থাকবে ?—

(বিবেক) মিছে ঘরে বসে ভাবিস তোরা হয়েছিস্ কুলীন।
এমন কত কুলীন এলো গেলো, হয়ে গেল লীন ॥
গলায় বেঁধে মদের হাঁড়ি,
পড়ে থাকিস বেশ্যাবাড়ী,
তবু তোরা কুলীন ভারী
কু-তে হয়ে লীন।

ভাত জোটে না ঘরে বসে,
কুলীন কোলাও দেশ বিদেশে,
এই সকল কুলীনের দোষে—
এদেশ পরাধীন ॥

কুল শূন্য জঘন্য যারা,
উন্নত হয়েছে তারা,
দু'দিল বান্দা কলমা চোরা,
তোরা বুদ্ধিহীন।
খাঁটি কুলীন হবি যদি
ঘুচবে তোদের কুলের ব্যাধি
মিলনমন্ত্র মহৌষধি—
পাবি রে সে দিন।

(সমাজ পতি ব্রাহ্মণ নরহরি)—ঘোর কলি— ঘোর কলি—
শঙ্কর—কেন, হলো কি, হলো কি ; দাদাঠাকুর ?

নরহরি—হবে আর কি ! এই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই ছোঁড়াটা গয়া হতে ফিরে এসে, নবদ্বীপে একটা নূতন জগন্নাথ ক্ষেত্র তৈরী করেছে। হাড়ি, মুচি, চণ্ডাল এমন কি মুসলমান পর্যন্ত দলে ঢুকিয়েছে। এখন তাদের নিয়ে আহার বিহার নর্তন কীর্তন আরম্ভ করেছে। এতে কি আর ব্রাহ্মণের জাত থাকবে ?

(বিবেক) তোরা সূতার বলে বামুন বলে, গর্ব কেন করিস আর।
গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞানীর, ব্রহ্মত্বে নাই অধিকার।

১। তাসার সূতা দিয়ে গলে,
অনেকেই ব্রাহ্মণ বলে,
ব্রহ্মতত্ব জানতে চাইলে,
দোহাই দেয় তার বাপদাদার
যেমন মামায় করে চৌকিদারী।
ফৌজদারীর ভয় নাই আমার ॥

২। মগ ফিরিঙ্গি যবন খৃষ্ট,
কারে তোরা কও নিকৃষ্ট,
কর্মগুণে সব উৎকৃষ্ট,

দৃষ্টান্ত রয়েছে তার।
চাতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টং
গুণে কর্মে জাত বিচার ॥

৩। হরিনামে থাকলে রুচি
অশুচিও হয় রে শুচি
তার সাক্ষী রুহিদাস মুচি
দেবে করে নমস্কার।
কয়জন বামুন আছে তেমন
কেবা বামুন কে চামার ॥

৪। ক্ষিপ্রমতি বিপ্রবর্গ,
বেদের সঙ্গে নাই সংসর্গ,
জ্ঞান নাই অনুস্বর বিসর্গ,
তবু করিস অহঙ্কার।
ওসব জাতিয়তা কুসংসর্গ
ছুঁৎমার্গ কর পরিহার ॥

এর এক একটা গানের সঙ্গে জাতিয়তা, ছুতিস্পর্শ, সমাজ নীতি, ধর্ম নীতি বেদ কি ব্রাহ্মণ কি ইত্যাদি বহু বিষয় বক্তৃতা দিতে হয়েছে।

নকুলেশ্বরের এই 'পাষণ্ড দলন' পালাটি একটি সামাজিক নাটক বললেও অত্যুক্তি হয় না। জগার মুখে যেসব ভাষ্য দেওয়া হয়েছে, সে সব সমাজ সংস্কারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(মাধার গান—মদ্য-স্তুতি)

ধন্য ধন্য কলির জীবের পুণ্য বল।
ও সেই পতিত উদ্ধারিণী সুরা, এসেছেন এই ধরাতল।
সত্য যুগে সত্যবতী রূপে মান্য পায়,
ত্রেতা যুগে দুর্গা রূপে রামের পূজা খায়।
আবার দ্বাপরে ব্রজে, কাত্যায়নী রূপ সেজে,
ও সে যশোদাকে দান করেছে,
কাত্যায়নী ব্রতের ফল।
কলির কলুষ বিনাশিতে এসে ভূতলে,
সুরারূপে চুপে চুপে ঢুকল বোতলে,

স্বীয় ভক্তে তারিতে, রয়েছে আবগারীতে
যদি মন থাকে সুরার হাঁড়িতে,
ইন্দ্র চন্দ্র করতল।
আদা মরিচ বুটভাজা এই মদের চাটুনী,
সুরা দেবীর সঙ্গিনী, ডাকিনী যোগিনী ;
এলো সেই আশুতোষে,
মিশে মোরগের জুসে
ও সেই সুরলোকের সুরা এসে—
এবার হল শুঁড়ীর জল ॥

(বিবেক) ভুল বুঝেছিস মাধব। মদ্য কাকে বলে শোন—

(গান)

শক্তি মন্ত্র গুড় লয়ে, আসক্তি মশলা দিয়ে
গুরুবাক্য বাখর মেখে তাতে।
মন করে নিত্য খাঁটি, তৈরী করে জ্ঞানের ভাটি
মদ বানাও ত্রি-ভক্তি জলেতে ॥
বিষয় কাষ্ঠ সাজাইয়ে, দশ ইন্দ্রিয় তৃণ দিয়ে
অনুরাগের আগুন জ্বেলে তায়।
তন্ত্র শাস্ত্র নল দিয়ে, চিন্ময় শক্তির ভাণ্ডে গিয়ে
ভাগ্য বলে যদি মদ চুয়ায় ॥
বিবেকের বোতল ভরি, শ্রদ্ধাপাত্রে যত্ন করি,
শাক্ত ভক্তে যদি করে পান।
হেন মদ্য সুধারসে, দেহের ত্রিতাপ নাশে
অনায়াসে জন্মে ব্রহ্ম জ্ঞান ॥
ঘুচিবে অনিত্য স্বার্থ, মন হবে মদোন্মত্ত
পরমার্থ বস্তু প্রাপ্ত হবে।
মন মাতাল তোর মাতাল হবে, মদ মাতালে মাতাল কবে
শক্তি রূপ আরোপে মিলিবে ॥

(হরিদাস পালায় কাজীর বিচার)

কাজী—ওরে বেটা ভণ্ড! তুই মুসলমানের ছেলে; রোজা করবি, নামাজ

পড়বি, আল্লাহ তাল্লার নাম নিবি—তা না করে এই কাফেরদের দলে মিশে 'হরে কেষ্ট' বলে চিল্লাচ্ছিস কেন ?

(বিবেকের গান)

রোজা কর নামাজ পড়, ঠিক রেখ ধর্মের ইমান।
হিন্দুর পূজা শেখের রোজা, বিচার করলে এক সমান॥
একই ব্রহ্ম সর্বব্যাপী নামে মাত্র ব্যবধান।
কেতাব কোরান বাইবেল পুরাণ,
সকল এক ধর্মের সোপান।
মগে ভজে ফরাতারা যিশু ভজে খৃষ্টীয়ান
মুসলমানে বলে আল্লা, হিন্দু বলে ভগবান।
সাম ঋক্ যজু আর অথর্ব, হিন্দুর চারি বেদ প্রধান।
তৌরিত জব্বুর ইঞ্জিল ফোরকান,
মুসলিমের এই চার কোরাণ।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, হিন্দু চতুর্বর্গ চান,
তৈয়ব, সাহাদাত, তৌহিদ, তমজিত
চার কলেমায় মুসলমান॥
আল্লা হরি কৃষ্ট খৃষ্ট সবকে করো সম জ্ঞান,
তার বাজু অনন্ত বালা এক সোনাতে নিরমাণ॥
জাতিয়তা ছুতি স্পর্শ না করলে পর অবসান,
নকুল বলে কোন কালে, হবেনা দেশের কল্যাণ॥

(মান)

(বিবেকের গান)

এই টুকুই পিরীতের মজা।
পিরীতি ভুজঙ্গে দংশিলে অঙ্গে, সে বিষের নাহি আর ওঝা॥
পুইনের আগুন কর্দ্দমে ঢাকা
ভিতরে অনল জ্বলে বাহিরে নাই দেখা,
পিরীতি দহন, নাহি যায় সহন
বাহিরে নাহি যায় বুঝা।
সুবর্ণকারে পোড়ায়ে সুবর্ণ
ঘুচায়ে বিবর্ণ বাড়ায় সু-বর্ণ,

পিরীতি হাপরে প্রেমিক পোড়ে
জড় দেহ করে লয় তাজা ॥
প্রথম মিলনে বিচ্ছেদের অগ্রে
সুখে সু-নিদ্রা হয় সুচীর অগ্রে,
পিরীতি ভাঙ্গিলে যেন ছাগে আর ব্যাঘ্রে,
তপ্ত তৈলে বেগুন ভাজা ॥

পুনরায় কবির দলে

নকুলেশ্বরের 'কীর্তন যাত্রা' বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কীর্তন যাত্রার গান করে নকুলেশ্বর অর্থ প্রতিপত্তি প্রচুর লাভ করেছেন, কিন্তু আত্মপ্রসাদ চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করতে পারেন নি। কবির আসরে তিনি ছিলেন স্বাধীন সম্রাট। নিজের ব্যক্তিত্ব ও মান-মর্যাদা নিয়ে চলতেন। কিন্তু এই কীর্তন গানে তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিলনা বললেই চলে। কারণ, একটা পালার দশটা চরিত্র দশ জনকে ভাগ করে দিয়ে তাদের উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হয়। ভাল মন্দ যশ পসার সবই তাদের হাতে। নকুলেশ্বরের নিজের হাতে কিছু নেই। সম্পূর্ণ পরের উপর নির্ভরশীল। সামান্য ছোট একটা ছেলের কাছেও ঠেকা। যে ছেলেটা কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করে, কোন কারণে সে ছেলেটা যদি আসরে যেতে না চায় তবে গানটাই বন্ধ। নূতন একটা ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে নেওয়া সময় সাপেক্ষ। দাড়ী গোঁফওলা কোন ব্যক্তিকে কৃষ্ণ সাজালে চলবেনা। এ তো কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নয়, ব্রজলীলার আট বৎসরের কৃষ্ণ চাই। নকুলেশ্বরের দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হবেনা। এর চাইতে পরাধীন আর বলে কাকে? যাঁর জিহ্বাগ্রে সরস্বতী অনর্গল বাক্য জুগিয়ে যেতেন, তিনি নিজে বোবা থেকে অন্যের মুখে কথা জোগাচ্ছেন। তাতে অর্থ আসে ঠিকই, কিন্তু মনের তৃপ্তি নেই শান্তি নেই।

এসব ভেবে নকুলেশ্বর আবার কবির দল গঠন করা মনস্থ করলেন। সুযোগও এসে গেল। খুলনা জেলায় আশাশুনী থানায় কীর্তন গাইতে গিয়ে চার পাঁচটি কবিগানের বায়না পেলেন। নকুলেশ্বর দেখলেন তাঁর কবিগানের উপর পাঁচ বৎসরের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কবি গাওয়ায় আইনত কোন বাধা নেই। নকুলেশ্বর কাল বিলম্ব না করে কীর্তনের দল ভেঙ্গে দিলেন। তার পোষাকপত্র বাক্স ডেস্ক সব বিক্রি করে দিয়ে পুনর্মূষিক ভব।

জেলায় জেলায় কবিগান—বরিশাল

নকুলেশ্বরের কবিগানের উপর ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ার পূর্বে এবং পরে দেশত্যাগ পর্যন্ত তিনি সারা পূর্ববঙ্গে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন জেলার কবিয়ালদের সঙ্গে কত শত সহস্র পালাগান যে গেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। পূর্ববঙ্গের আটটি জেলার এমন কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম নেই যেখানে কবিগান অনুষ্ঠিত হয়নি। এমন বনেদী বাড়ী কমই আছে যে বাড়ীতে কবির আসর বসেনি। কারো বাড়ীতে কবির ঢোলে বাড়ি পড়া মর্যাদার ব্যাপার বলে গণ্য হতো। সে সব গ্রাম বা উদ্যোক্তাদের বেশীরভাগ এখন স্মৃতির অন্তরালে। তবু এখনো যে সব আসরের কথা স্মরণ আছে এবং যে সব কবিয়ালের সঙ্গে তাঁর গান হয়েছে তার কিছু কিছু অবশ্যই উল্লেখ্য।

প্রথমেই তাঁর জন্মভূমি বরিশাল জেলার কথাই বলি। পূর্ববঙ্গের কবিগানের বৃহত্তম আখড়া ঝালকাঠি ছাড়াও সারা বরিশাল জেলায় কবিগানের কদর ছিল। বরিশালের যে সব সরকারের সঙ্গে নকুলেশ্বরের উল্লেখযোগ্য গান হয়েছে তার মধ্যে শরৎ বৈরাগী, উমেশ শীল, চন্দ্রকান্ত দাস, গুরু কুঞ্জ দত্ত, গাভার ষষ্ঠী করাতী, শ্রীহরিনাথ সরকার প্রভৃতি সরকারদের নাম উল্লেখযোগ্য। কালীপূজায় বরিশাল জেলায় উত্তর সাহাবাজপুর দুই আনির জমিদার কবি-রসজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ী কম পক্ষে পাঁচ ছ' বৎসর গান করেছেন। একবার চন্দ্রকান্ত দাস তাঁকে বিপক্ষে রেখে টপ্পা করেছিল—

চন্দ্রকান্ত দাস বনাম নকুলেশ্বর

অদ্য কল্পনাতে নামটি আমি ধরি সুতপা।
আমি সদা তোমার গুণ গাই
নাম নিয়ে ভ্রমিয়ে বেড়াই,
আমায় নিজগুণে ব্যাস গোসাঁই, করেছেন কৃপা॥
এই যে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী—
তারা আর মন্দোদরী এই পাঁচ জন;
কন্যা বলে ভারতে কি জন্যে করেছ লিখন।
আরো পুণ্যশ্লোক পথিবীর,
নলরাজা আর যুধিষ্ঠির,
বৈদেহী আর জনার্দন;

একা যুধিষ্ঠিরে সশরীরে কি জন্ত
স্বর্গে করে আরোহন।

জবাবে নকুলেশ্বর বলেছিলেন—

বললে, পঞ্চ কন্যার নাম কেন ভারতে লিখিলে ?
প্রাতে সাধুবৈষ্ণব অধরে,
পাঁচ কন্যার নাম যদি করে,
ঐসব কন্যার দোষ যাবে দূরে ; স্মরণের ফলে ॥
আবার চারজন পুণ্যশ্লোকের মাঝে—
যুধিষ্ঠির একা কেন স্বর্গ পায় ?
উদ্ধারিতে নহুষে, যুধিষ্ঠির স্বর্গবাসে যায়।
শাপ দিল ভৃগু মুনি,
নহুষ হল সর্পযোনী,
নরকে পড়ে কাল কাটায়।
তাইতে স্বর্গে নিয়ে যুধিষ্ঠিরে,
শ্রীকৃষ্ণ নরকের কূলে পাঠায় ॥

বরিশাল জেলায় আরও কয়েকটি বিশিষ্ট কবির আসরের মধ্যে এখনো স্মরণে আছে,—

কুঞ্জপট্টি কানাই সরকারের বাড়ী, শ্যামের হাট, লতা কাউরিয়া (বরদা মিত্রের বাড়ী), রহমতপুর (মাঝবাড়ী), ধুলিয়া নবাব কাছারী, ভবানীপুর কাছারী, চল্লিশ কাউনিয়া, ন্যায়মতী, চামটা, আয়লা, ফুলঝুরি, আউল্মা, বাঁশবুনিয়া, পাড়ের হাট, হুলার হাট, চইলস্থা, ওজন কাটি, রায়ের কাটি, বনগ্রাম, পীরোজপুর, কুমারখালি বাজার, কুমীর মারা, সংসাবাজ, বগা ইত্যাদি। গাভার ষষ্ঠী করাতীর সঙ্গে একপালা গানে ষষ্ঠী করাতী টপ্পা করেছিল—

ষষ্ঠী করাতি বনাম নকুলেশ্বর

আমি কল্পনাতে দেব ঋষি ভ্রমি চরাচর।
শুনে লোকের মুখে গুণগ্রাম,
তোমারে দেখিতে এলাম,
রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি তোমার নাম, কলিঙ্গের ঈশ্বর ॥

তুমি কালীভক্ত মহা শাক্ত—
দিনরাত্র পূজ কালিকার চরণ ॥
মেষ মহিষ ছাগের রক্ত—
এ পূজার প্রধান উপকরণ ॥
অদ্য তুষ্ট করতে মা কালী,
দিয়ে এক নরবলি, ভৃত্যেরা করতেছে নর্তন।
ও সেই কাটা মুণ্ড বক্ষে নিয়ে—
মহারাজ তুমি কাঁদ কি কারণ ॥

উক্ত টপ্পার নকুলেশ্বর নিম্নরূপ জবাব করলেন—

আমি শক্তি ভক্ত ধৃষ্টবুদ্ধি, মদন মোর পুত্র।
পরম কৃষ্ণভক্ত চন্দ্রহাস,
করিতে তার জীবন বিনাশ,
পাঠাইলেম জল্লাদের পাশ, দিয়ে এক পত্র ॥
ও সেই চন্দ্রহাসে ভালবেসে—
সেই পত্র নিয়ে মোর পুত্র মদন।
জল্লাদের হাতে দিল, করিল তার মুণ্ড ছেদন ॥
আমার মুক্তকেশী মা শক্তি,
পুত্রকে দিল মুক্তি,
তাতে মোর মনে নাই বেদন।
পুত্র পরে এলো আগে গেল—
সেই দুঃখে আমি করতেছি রোদন ॥

নোয়াখালী জেলায় কবিগান

নোয়াখালী জেলায় দালাল বাজারে যদুবাবুর বাড়ীতে শিক্ষানবিশী অবস্থায় কবির আসরে নকুলেশ্বরের প্রথম আবির্ভাব। তারপর নিজ দল নিয়ে আরো তিন চার বৎসর দুর্গাপূজায় সে বাড়ীতে গান করেছেন। তাছাড়া নোয়াখালীতে আর যে সব বিশিষ্ট কবির আসর ছিল তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—

নোয়াখালী সদর, চৌমুহনী, লক্ষ্মীপুর (দোলযাত্রায়), রায়পুর (ঝুলনে), লক্ষিপুর, লাউতলী, নরোত্তমপুর কালীবাড়ী, বীজবাগ মজুমদার বাড়ী, রাজাপুর, দুর্গাপুর, বসুরহাট, চাপরাশীর হাট, রাজারামপুর ভূঁইয়া বাড়ী,

বাওয়াপুর, রাজগঞ্জ, কৃষ্ণরামপুর, বাবুপুর সিন্দুর কাইত-কালীর হাট, বাবুপুর ক্ষীনার (ক্ষীরোদ দে) বাড়ী, তেঁতইয়া বাবুপুর, করিমপুর, রহিমপুর, আবীর পাড়া, ভোলাবাদশা, জিরতলী দাসের হাট, জিরতলী বারুই হাট, সেবার হাট, দুর্গাপুর, পার্বতী নগর, ভবানীগঞ্জ, হাজীর পাড়া, চন্দ্রগঞ্জ, দেওপাড়া, সোমপাড়া, চণ্ডীপুর যদুবাবুর আশ্রম, ঘোষকামতা, সোনাইমুড়ী, খিলপাড়া, দশঘরিয়া, কাশিমপুর, রামগঞ্জ ইত্যাদি।

এসব গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষে ছিলেন ঝালকাঠির বড় মনমোহিনীর দলের শ্রীহরিনাথ সরকার। স্থানীয় সরকারদের মধ্যে আচার্য কর্তার শেষ জীবনের শিষ্য রমেশ আচার্য, কাশীনাথ নট্ট, পণ্ডিত অক্ষয় আচার্যই প্রধান।

রমেশ আচার্য বনাম নকুলেশ্বর

রমেশ আচার্যের সঙ্গে বাবুপুরে গানে তাঁর দল নোয়াখালীর অন্যতম রসজ্ঞ কবিগান রচক ভগবতী ভূঁইয়ার নিম্নোক্ত ভবানী গানটি গেয়েছিল—

১। করলে অনন্ত ভাবের আবির্ভাব ভবার্ণবে ভবানী।
মাগো, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা—আকাশ আর পাতাল,
ধর্মতীর্থ সাধু মাতাল, পাহাড় নদী গবাদি প্রাণী॥

২। মাগো অঙ্গারে দিয়েছ হীরক,
ঝিনুকে মুক্তা কর্দমে কমল—
চন্দ্র কলঙ্কে দুর্বল—মা মাগো
তুমি সাপের মাথে দিয়েছ মণি, মুখেতে দিয়েছ গরল।
ইক্ষুতে দিয়েছ মিষ্ট, তিক্তময় কুচিলা কাষ্ঠ,
পাহাড়ে জলের কষ্ট, গাছের আগায় নারিকেলেতে জল॥

৩। বৃহৎ বটগাছে গোটা দিলি আধ তোলা ওজন,
চিকন লতায় করলি সৃজন—
লাউ কুমড়া আধ মণের আন্দাজ।
মনুষ্য পশু-পক্ষী আর কীটপতঙ্গ
বৃক্ষলতায় দেখাতেছ করতেছে কি কাজ॥

৪। সার্কাসের বাঘ পায়ে লোটে,
হাতীতে মানুষ লয় পিঠে,

আবার 'হরেকৃষ্ণ' বলে অনেক পক্ষী ;
আমরা মানব হয়ে সিঁদ কাটি আর—
ঘুষ খেয়ে দিচ্ছি মিথ্যা সাক্ষী।
গুটি পোকায় রেশম তৈয়ার,
সতী ধর্ম কাকের আহার,
মানবেতে বেশ্যা অপার—
(দেখে) লজ্জাবতী গাছের হয় লাজ ॥

৫। মাগো ফুল নাই যাহার পাতার বাগার,
কাঁটা গাছে দিলি গোলাপ ফুল।
কারো সিঁথি আলফেট কাটা, কারো বাবড়ী ছাঁটা,
কারো নেড়া মাথায় দাও নাই চুল ॥
কৃপণকে করলে জমিদার, অতিথি এলে খবরদার,
পুঁটি মাছ কিনলে দেড় পয়সার, বলে বেশী হল মূল।
কারো রাজত্ব পদ অতুল সম্পদ, রোগ দিয়েছ পিত্তশূল ॥

৬। কারো স্বর্ণথালে জোগাও অন্ন,
কেহ দুইদিনের হয় অনাহার।
বড় লাটের বেতন তিরিশ হাজার, মেমের দর্প তার।
হাইল্যা চাষার স্ত্রীর বড়াই—
আপ্ খোরাক মাস তিন টাকা রোজগার ॥

৭। কারো ছপ্পর খাটে রূপার জাজিম,
শীতল পাটি লেপ তোষক পাশ্বায় ;
ঝিলমিল মশারী খাটায়—মা মাগো
তবু চাকরকে কয় রামধনারে—
পাও টিপে দে, আজ ঘুম যাওয়া দায়।
জেলখানাতে কাঠের ওপর,
ছালার বিছান মশার কামড়,
জেল দারোগা মারে চাপড়,
তবু কয়েদী সুখে নিদ্রা যায় ॥

৮। দীন ভগবতী কয় আমার দিন তো দুঃখে গেল কেটে,
চরম পরম তত্ত্ব রইলেম ভুলে, ম'লেম ভূতের বেগার খেটে ॥

নকুলেশ্বরের দলও রীতি মাফিক ডাক-বন্দনা গেয়ে নিম্নোক্ত সমাজ-মালসী (ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মধ্যে অনাচার লক্ষ্য করে) গানটি গাইল—

১। ব্রহ্মময়ী! তোর এই ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড দেখে হয়েছি বিস্ময়।
এখন সত্যবাদীর অপৌরুষ, মিথ্যাবাদীর সুপৌরুষ,
হল পাপের যশ, আর পুণ্যের পরাজয়॥

২। মা গো, কালস্য কুটিলা গতি, উচ্চলোকের অবনতি,
তুচ্ছ লোকের উচ্চ বুকের পাটা।
মানীর মানে প'ল ভাটা—মা গো
এখন তুলসীপত্র ঘৃণার পাত্র, চা পত্র হল পবিত্র,
বেশ্যাবাড়ী অন্ন ক্ষেত্র, থাকতে শ্রীক্ষেত্রে যায় কেটা॥

৩। এখন বিদ্যাবন্তের বিদ্যার গৌরব গেল ছারেখারে,
যারা সরস্বতীর ধার না ধারে—তারাও করে বাবুগিরি।
মূর্খের ছেলে তর্কালঙ্কার, কুতর্ক অঙ্গের অলঙ্কার—
এ সঙ্‌ কার শঙ্করী॥

৪। হিন্দুদের নাই হিন্দু ধর্ম, এখন মিথ্যা বলা সাধুর কর্ম,
বৈষ্ণব ধর্ম গেল অধঃপাতে;
তারা ডুমনী গায়, আর ঠুমনী বাজায়, ঢেমনী মজাতে।
কৌপ্‌নী পন্থা হল বন্ধ; লাবড়া শুক্তা না-পছন্দ,
একটু মাছ মাংসের না হলে গন্ধ—
আনন্দ নাই আখড়া বাড়ী।
মোহন্ত সাক্ষাৎ কৃতান্ত ধর্ম অন্তকারী॥

৫। কত সুপবিত্র দ্বিজের পুত্র, নাই তিলক কুশ পবিত্র,
গুটি সুতার যজ্ঞসূত্র গলে, দিল মন্ত্র তন্ত্র ছেড়ে—মাগো
ছিল সাম্‌ ঋক্‌ যজু আর অথর্ব, বেদ নিয়ে ব্রাহ্মণের গর্ব,
সর্ব গর্ব করল করল খর্ব, ঐসব অর্বাচীন বর্বরে॥

৬। আগে স্পর্শ করলে মদের পাত্র, ব্রাহ্মণ হতো অপবিত্র,
লাগতো তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা—
এখন মদের মট্‌কী তারা—মাগো,
মদ্য তাদের প্রিয় খাদ্য, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বন্ধ,
ধ্যানধারণা পিতৃশ্রাদ্ধ, শুদ্ধ হয় না মদ্য ছাড়া।

৭। নিষ্কামী বৈষ্ণবের ধর্ম নাই মা কলিকালে।
এমন নির্মল ধর্মে দাগ লাগাল—
কিশোরী ভজনের দলে॥
বৈষ্ণবের নাই কৌপ্‌নী কাছা,
সামনে দোলে লম্বা কোঁচা,
ভোগের নামে অন্ন বেচা—ব্যবসা চলে।
কোন আখড়া ভরা কাঁকড়ার চাড়া—
লাব্‌ড়া গেল রসাতলে॥

ডাক-মালসীর পর উভয়পক্ষের সখী সংবাদ গান ও জবাব হয়ে গেলে রমেশ আচার্য টপ্পা করলেন—

তুমি কল্পনাতে বৈয়াসকী, আমি পরীক্ষিৎ।
আমি ব্রহ্মশাপে কষ্ট পাই,
বেশী দিন পরমায়ু নাই,
তাইতে তোমার কাছে শুনতে চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥
নাকি পবিত্র ভাগবত ধর্ম—
একমাত্র দ্বাদশ জনের অধিকার;
ধর্মসাক্ষী দ্বাদশ জন নামকরণ কর দেখি তার।
শুনি পবিত্র ব্রজ বধূর, ভাবে হলে ভরপূর,
প্রেমাঙ্কুর জন্মে নয় প্রকার;
উহার কোন্ প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে—
শ্রীকৃষ্ণ হরণ করেন পরদার?

নকুলেশ্বর উক্ত টপ্পার জবাবে বলেছিলেন—

ছিল ধর্ম সাক্ষী কোন দ্বাদশ জন শোন পরিচয়।
জানি সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বাত,—
চন্দ্র, সন্ধ্যা আর দিবা রাত;
জল, পৃথী, যম সাক্ষাৎ, ধর্ম সাক্ষী রয়॥
স্বয়ং স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু
কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, শুক;
জনক, ভীষ্ম, বলি, যম—
জেনেছেন ভাগবতী কৌতুক।

নিষ্কাম সমুৎকণ্ঠা প্রেমের দায়, কৃষ্ণপ্রাণা গোপীকায়,
হয়েছেন সংসারে বিমুখ।
তাইতে তাদের নিয়া শ্যামকালীয়া—
সাধিলেন পরকীয়া প্রেমের সুখ॥

শ্রীহরিনাথ সরকার বনাম নকুলেশ্বর

নোয়াখালী জেলার দুর্গাপুরে কবিগান উপলক্ষে শ্রীহরিনাথ সরকার নকুলেশ্বরের প্রতি প্রশ্ন করেন—

অদ্য আমি অধর, তুমি আমার গৌরাঙ্গ ঠাকুর।
তুমি কোন্ গুরুর উপদেশে,
ক্ষুর দিয়ে সেই চাঁচর কেশে,
সেজে এসেছ কাঙ্গাল বেশে, শ্রীধাম শান্তিপুর॥
কেন সংসারেতে মন বসেনা—
ত্যাগ করে এলে নিজের ঘরবাড়ী,
হিয়ার ধন বিষ্ণুপ্রিয়া—
কেন তার বুকে দাও ছুরি।
ভবে কে আছে এমন কঠিন,
কোমল অঙ্গে ডোর কৌপীন,
দিয়ে আজ সাজায় ভিখারী।
তুমি কার যুক্তিতে এই কলিতে—
সাজিলে দণ্ড কমণ্ডুল ধারী ?

নকুলেশ্বর উক্ত টপ্পার নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছিলেন—

শুনলেম শ্রীঅধরের অধরে অদ্য বাক্য সুমধুর।
আমি পেয়ে গুরুর উপদেশ,
মুড়ালাম মাথার চাঁচর কেশ,
সেজে এলাম কাঙ্গাল বেশ, শান্তির শান্তিপুর।
আমি ত্যজলেম নারী, ত্যজলেম বাড়ী—
হব সদাচারী ব্রজবাসী ;
শুন অধর মনে কয় অধরচাঁদ ভালবাসি।

আমি গিয়েছিলেম কাটোয়ায়,
ধরিলেম ভারতীর পায়,
মন হল দেশের বিদ্বেষী।
তাইতে ডোর কৌপীন পরায়ে মোরে—
ভারতী সাজায়েছে সন্ন্যাসী॥

ত্রিপুরা জেলায় কবিগান

ত্রিপুরা জেলার কাবরত্ন পাইকপাড়ার জয়চন্দ্র মজুমদার, কবিসিন্ধু জগবন্ধু দত্তকে নকুলেশ্বর দেখেন নি। তবে তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে বিভিন্ন আসরে গান হয়েছে।

ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার কবিগানের আসরগুলির মধ্যে নিম্নবর্ণিত কয়েকটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—হরিণা, চালতাতলী, মুরাগনগর লাকসাম

চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, সোনাপুর, কাঞ্চনপুর, বৈচাতলী, লাউতলী, বলাখাল, বাসারা, দেবীপুর, রামমোহন, কটতলা, গালিমপুর করের বাড়ী, কাসুরদি, কান্দারহাট, মতলব, বোয়ালিয়া, চাকরগাও, মইচ্ছাখাল, মইচাইল, গঙ্গাপ্রসাদ, ঠেডাইল্যা, বাঁশকাইত, সুরানন্দী, কৃষ্ণপুর, দিশাবন, রাজাপাড়া, গিলাতলী, সোমরাইল, রানাসুয়া, পয়াত, লাড্ডুচোর, রাজাপুর, তোঁতাভূমি, শশিদল, মইনপুর, কাইমপুর, পাঁচগাছিয়া জমিদারবাড়ী, মেহার ইত্যাদি।

শচীন্দ্র শীল বনাম নকুলেশ্বর

মেহারে এক পালা গানে ত্রিপুরা জেলার সকদী গ্রাম নিবাসী কবি চৈতন্য শীলের ছেলে শচীন্দ্র শীল নকুলেশ্বরের বিরুদ্ধে টপ্পা করেছিলেন—

জীবে কর্ম করে তুমি কর্মের ফল দেও সকলে।
ভক্তের পায়ের ধূলা মাথায় লও,
ভাই'র কাছে ভগ্নী বিয়ে দেও,
বলাই ভাইকে দাদা কও, কোন্ কর্মের ফলে ?
বল, বামন রূপে বলি ভূপে
কোন্ কর্মের ফলে দেও পাতালে স্থান;
কোন্ কর্মের ফলে মেরেছ বালী রাজায় চোরা বাণ॥
বল, কোন্ কর্মের ফলে ঠাকুর,
পাষাণ হল গয়াসুর,
অজামিল পেল পরিত্রাণ।

করে, সপ্ত জন্ম-সাধন কর্ম—
কোন্ কর্মের ফলে হয় খোজা আয়ান ?

জবাব নকুলেশ্বর বললেন—

হলো কোন্ পাপেতে আয়ান খোজা— অর্থ বোঝো নাই।
আয়ান বহুদিন কৃষ্ণ খোঁজা,
ঘুচল কামকামনার বোঝা,
ও সে খোজা নয় ভক্তের রাজা—দয়া করলো রাই ॥
গয়াসুর পাষাণ হয়েছে, করিয়ে আমার বরের অপমান,
ইন্দ্রে করি শাপমুক্ত, বালীরে মেরে চোরা বাণ।
আমার নাইকো ভগ্নী, নাইকো ভাই,
সাধন ভেদে মন জোগাই,
ভক্তাধীন আমি ভগবান।
হয়ে পাতাল পুরে দ্বারের দ্বারী—
বলিরে অক্ষয় স্বর্গ করি দান ॥

ঢাকা জেলায় কবিগান

ঢাকা জেলায় আচার্য কর্তা বাদে আর যে সব খ্যাতনামা সরকারদের সঙ্গে নকুলেশ্বরের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্র দাস, মদন শীল, অম্বিকা পাটুনী, জ্ঞানেন্দ্র পাটুনী, পূর্ণ সরকার, রেবতী ঠাকুর, শ্রীতারিণী সরকারের নাম উল্লেখ্য। ঢাকার প্রখ্যাত কবিগানের আসরের মধ্যে সামান্য কয়েকটা উল্লেখ করা হলো—

বারুদি, সদাশিবদি, নরসিংহদি, বোয়াইল্যা, সাকৃতা, খোলামুড়া, বাগুইর, পাইনা, পশ্চিমদি, রুইতপুর, কলাতিয়া, কোনাখোলা, মুগুরীখোলা, বেতকাটা, রোয়াইল, শিমুলিয়া, বোতলা, গাঙ্গুটিয়া, গণকপাড়া, কাঁকরাইল, বৌলাদি, কালিয়াকুর, বরমি, তারাগঞ্জ, কাপাইস্যা, জামালপুর, চরসিন্ধু, সাধারচর, মেড়াতলি, বাবুরহাট, মাধবদি, বাইল্যাপাড়া, সোনার গাঁ, পানাম ইত্যাদি।

মদন শীল বনাম নকুলেশ্বর

সাধারচরে একপালা গান উপলক্ষে নকুলেশ্বর মদন শীলকে প্রশ্ন করেন—

আমি চিদানন্দ পরিব্রাজক কাব্যভূমিকায়।
তুমি হলে অদ্বৈত আচার্য,

ন্যায় অন্যায় তোমার বিচার্য,
হরিনাম প্রেমের কি মাধুর্য, খুলে কও আমায় ॥
ব্রজে রাজা নন্দ ভোগে অন্ধ,
গোবিন্দ জন্ম নিল তার ঘরে ;
সেই কৃষ্ণ গউর হয়ে, কেন সে ত্যাগ ধর্ম ধরে।
ত্যজে গৃহধর্ম পরিজন,
করলে হরি নাম কীর্তন,
কি লাভ হয় বলো আমারে।
গৌর কর্ম ত্যজে জড় সেজে—
কি জন্য ভেক নিয়ে ভিক্ষা করে ?

মদন শীল উক্ত টপ্পার জবাবে বলেছিলেন—

তুমি ভ্রমে অন্ধ চিদানন্দ এলে নবদ্বীপ।
দেখে কলির জীব অচৈতন্য,
চৈতন্য করিবার জন্য,
নিয়ে এসেছেন শ্রীচৈতন্য, হরিনাম প্রদীপ ॥
বললে নামের গুণে জনগণের—
লভ্যাংশ হল কেমন ;
ধ্রুব প্রহ্লাদ অজামিল—
আছে সেই নামের নিদর্শন।
লাভালাভ গোবিন্দ পায়, দিয়ে চায় ভক্ত প্রেমধন ॥
ছিল ভাগ্যবান রাজা নন্দ,
নাম্ প্রেমে হয়ে অন্ধ,
পুত্র পায় চিদানন্দ ধন।
শ্যামকে জড় দেখে মূঢ় যারা—
ভক্তেরা দেখে সত্য সনাতন ॥

ময়মনসিংহ জেলার কবিগান

ময়মনসিংহ জেলার কবিগানের ঐতিহ্য ও খ্যাতি দীর্ঘ দিনের। রাজা মহারাজার জেলা ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারীগণ কবিগানের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু নকুলেশ্বরের কবি-জীবনের প্রারম্ভ থেকে সে জেলার কবিগানে

ভাটা সুরু হয়েছে। ধলা, বালীপালা, লাইট্যামারী, মসুয়া, কিশোরগঞ্জ কোর্ট, হোসেনপুর জগৎকিশোর মহারাজের কাছারী, মুক্তাগাছা রাজবাড়ী, সরিষাবাড়ী, কুষ্টিয়া, সেনবাড়ী, রামামৃতগঞ্জ, বাজিতপুর, কটিয়াদি, মঠখোলা, নেত্রকোনা, আঠারবাড়ী, গৌরীপুর, সুসঙ্গ, সুগুন্দিয়া, চন্দনকান্দী ইত্যাদি বহুস্থানে নকুলেশ্বর গান গেয়েছেন। ময়মনসিংহের মাত্র দু'জন সরকারে সঙ্গে তাঁর গান হয়েছে। তাঁরা হলেন হরিহর আচার্য ও কৈলাস শীল। মুক্তাগাছা রাজবাড়ীতে হরিহর আচার্যকে বিপক্ষ করে নকুলেশ্বর টপ্পা করেছিলেন—

মুক্তাগাছা রাজবাড়ীতে হরিহর আচার্য বনাম নকুলেশ্বর

আমি অন্ধের নারী নাম গান্ধারী—তুমি শ্যাম কানাই।
আমি শত পুত্রের ছিলেম মা,—
সুখের আর ছিল না সীমা,
এখন আমায় ডাকবে মা,—এমন লক্ষ্য নাই॥
শুনি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে, দুই পক্ষ গেল যুদ্ধ করিতে,
কুরু আর পাণ্ডবের রণ, বিবরণ এলেম জানিতে।
হল কুরুপাণ্ডব দুই পক্ষ, তুমি শ্যাম কমলাক্ষ,
ছিলে সেই অর্জুনের রথে।
আমার শত পুত্র যুদ্ধে মৈল—
কও শুনি কোন্ পাপে কার চক্রেতে॥

টপ্পার লহর শেষ করে নকুলেশ্বর ভাটিয়ালী সুরে একখানা মন-শিক্ষা গান গাইলেন—

আমি অসময়ে ধরেছি পাড়ি,—
অকূল দরিয়ায় রে—
পার করে দাও ভবপারের নাইয়া।
আমার আতঙ্কে কাঁপিছে অঙ্গ—
তরঙ্গ দেখিয়া রে॥
একে আমার এই জীর্ণ তরী,
তার উপরে পাপের ভরা ভরেছি ভারি,
বাইন চুয়াইয়া উঠে বারি, নোনা জলে বাইয়া—
আমি কেমন করে ধরব পাড়ি—
ভাঙ্গা তরী লইয়া রে॥

বাজে কাজে দিন গত করি,
সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে ধরেছি পাড়ি,
ছয় বেটা আনাড়ী দাঁড়ী—দিল দাঁড় ছাড়িয়া—
এখন হাল ছেড়ে বেহাল হয়েছি—
নদীর পানে চাইয়া রে ॥

বৈঠাখানা ঘুণে ধরেছে,—
ভাঙ্গা মাস্তুল ছেঁড়া বাদাম খসে পড়েছে,
পারের বন্ধু আর কে আছে, এসো পারের নাইয়া—
নইলে নকুলে অকূলে কূলে,
কে দিবে কূলাইয়া রে ॥

তারপর ডাক-ছড়ায় বললেন—

আমি অন্ধ রাজার নারী, নামটি আমার হয় গান্ধারী
পুত্রশোকে নেত্রবারি, বহে অবিরাম।
শতপুত্রের ছিলেম মাতা, আমার মত সুখী কোথা,
তুমি কৃষ্ণ জগৎত্রাতা, লহ মোর প্রণাম ॥
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে, আত্ম বন্ধু নিয়ে সনে,
গেল আমার পুত্রগণে, করবে বলে রণ।
জ্ঞাতি বন্ধু দেখে রণে, দুঃখ হয় অর্জুনের মনে,
ডেকে বলে তোমার স্থানে, ওহে নারায়ণ ॥
আত্মবন্ধু গুরু বংশ, এই যুদ্ধে করিয়ে ধ্বংস,
কেন মহাপাপের অংশ, করিব গ্রহণ।
বধিতে আত্মীয়ের প্রাণ, পারব না হে ভগবান,
এ বলিয়ে ধনুর্বাণ, দিল বিসর্জন ॥
তুমি নাকি বললে তারে, তুমি মারতে পার কারে,
আমি সব রেখেছি মেরে, আগে দেখে লও।
আমি করে সন্ধান, বধেছি কৌরবের প্রাণ,
মড়ার উপর মেরে বাণ, নিমিত্ত তুমি হও ॥
এই যদি হয় তোমার বাক্য, বল কৃষ্ণ কমলাক্ষ,
তোমার নাইকো পক্ষাপক্ষ, নিরপেক্ষ অগতির গতি।

কোন্ কর্মের উপলক্ষে, কোন্ ধর্ম করিতে রক্ষে,
থাকিয়ে পাণ্ডবের পক্ষে, কাষ্ঠ রথে হয়েছ সারথী ॥
শত পুত্র যুদ্ধে গেল, কোন্ পাপে কার চক্রে ম'ল,
পাণ্ডবেরা বেঁচে র'ল, কোন্ পুণ্যের দায় ।
তোমার অনুমতি বিনা, পাণ্ডবেরা কাজ করেনা,
তোমার চক্র ছিল কিনা, বল শ্যামরায় ॥
মহা মহারথীগণে, ছিল আমার পুত্রের সনে,
কেমন করে মরে প্রাণে, পুত্র দুর্যোধন ।
দারুণ পুত্র শোকানলে, দিবানিশি মরি জ্বলে,
কে দিল মোর বুকে জ্বেলে, শোকের হুতাশন ॥
তুমি শ্যাম বিশ্ব-নিয়ন্তা সর্ব লোকে কয় ।
তোমার ইচ্ছায় হয়ে থাকে জয় পরাজয় ॥
পাণ্ডবের জয়, কৌরবের ক্ষয়, কোন্ বিধানে হল ।
শ্রীহরি "হরিহর সরকার" সত্য করে বল ॥
এই পর্যন্ত বলে আমার বক্তব্য শেষ করি,
মুসলমানে বলুন আল্লা হিন্দু বলুন হরি ॥

নকুলেশ্বরের টপ্পা-পাঁচালী শেষ হলে হরিহর আচার্য এসে জবাবে বললেন—

তুমি কল্পনায় গান্ধারী, আমি কৃষ্ণ রসময় ।
তোমার মরেছে শতপুত্র,
সেই শোকে ঝরিছে নেত্র,
দুর্যোধনের চরিত্র, জানো সমুদয় ॥
ও সে কপট পাশায় দান ধরিয়ে—
ধর্মকে লজ্জা দেয় সভায় আনি ।
দ্রৌপদীর বসন টানে—করিতে সতীর মান হানি ॥
সতী, তোমার মুখের বাক্য রয়,
যথাধর্ম তথা জয়,—নির্দোষী শ্যাম চিন্তামণি ।
তোমার কুরু বংশ ধ্বংসের নেতা—
একমাত্র তোমার দাদা শকুনি ॥

টপ্পার জবাব অন্তে ছড়া-পাঁচালীতে বললেন—

তুমি কল্পনায় গান্ধারী সতী, আমি শ্যাম অগতির গতি,
ভক্তে স্তুতি করে আমায় পায়।
পুত্র শোকে হয়ে অন্ধ, গোবিন্দেরে বলো মন্দ,
আমি জীবের মন্দকারী নয়॥

তোমার পুত্র দুর্যোধন, সে ছিল অতি দুর্জন,
দূত-রূপে আমি ভগবান।
গিয়ে বললেম তার ঠাঁই, পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা চাই,
সে আমারে করলো অপমান॥

'আমায়' ভক্তে বান্ধে ভক্তি ডোরে, বাঁধা থাকি ভক্তের ঘরে,
চিরদিন ভক্তের জোগাই মন।
আমায় বাঁধতে তাড়াতাড়ি, নিয়ে এলো পাটের দড়ি,
তোমার পুত্র মূর্খ দুর্যোধন॥

ধর্মরাজা যুধিষ্ঠিরে, পাশার পণে জব্দ করে,
দ্রৌপদীরে করে অপমান।
চুলে ধরে সভায় এনে, দুঃশাসনে বসন টানে,
লেংটা করতে সভা বিস্ময়মান।
কাল শকুনী সর্বনাশা, খেলাইয়ে কপট পাশা,
পাণ্ডবেরে পাঠাইল বন।
ধর্মদ্বেষী কর্ম করে, কুরু বংশ প্রাণে মরে,
নির্দোষী আমি নারায়ণ॥

তোমার বাক্য সত্য হয়, ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয়,
নিজ মুখে বলেছ ভারতী।
অধার্মিক আজ ধ্বংস হ'ল, ধর্মপক্ষে চিকনকাল,
অর্জুন রথে হয়েছি সারথী॥

যে জন যেমন কর্ম করে তেমনি পাবে ফল,
জীবের কর্মফল দাতা আমি নীলকমল।
মন্দমতি অন্ধরাজা চলে পুত্রের চালে,
কিং জিতং কিং জিতং বলে পাশা খেলার কালে।

রাজ্য লোভে পাপের কার্যে ধৃতরাষ্ট্র ব্রতী,
সেই পাপে আজ কেউ র'লনা বংশে দিতে বাতি।
কেঁদনা গান্ধারী সতী মোছ চোখের জল,
মনে রেখ এ তোমাদের কৃতকর্মের ফল।
যা হবার তা হয়ে গেছে শান্ত করো মন,
মায়া মোহে বদ্ধ হয়ে করো না রোদন।
কায়াপ্রাণে নঃ সম্বন্ধ মনে কর তাই,
দীন বন্ধু হরি বিনে পারের বন্ধু নাই।

দ্বিতীয় আসরে গিয়ে নকুলেশ্বর হরিহর আচার্যের জবাবে বললেন—

বললে, ধর্মদ্বেষী কর্মের পাপে কুরু বংশ নাশ।
তুমি গীতায় বলেছ মর্ম,
যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম,
তবে কোন্‌টা হলো পাপ কর্ম, করো তাই প্রকাশ॥
আমার বংশ যায় শকুনীর চক্রে—
নির্দোষী তুমি নাকি নারায়ণ।
গদা যুদ্ধে ভীমেরে উরু দেখালে কি কারণ?
মিথ্যা কথায় করে ভান,
দ্রোণাচার্যের বধো প্রাণ,
ভীষ্মের বাণ করিলে হরণ;
আবার জয়দ্রথ বধের দিনে—
চক্রেতে সূর্য করলে আচ্ছাদন।
তবে কেন বল আজ নির্দোষী তুমি নারায়ণ॥

ধর্মদ্বেষী কর্ম করে কুরুবংশ প্রাণে মরে
কেমন করে করিব বিশ্বাস।
ধর্ম কি আর অধর্ম কি আমার কাছে বলো দেখি
শুনে লব ধর্মের ইতিহাস॥
ধর্মাধর্ম তোমার সৃষ্টি একটা তিক্ত একটা মিষ্টি
দুইটা কেন্ করিলে সৃজন।

একটা আঁধার একটা আলো   কোন্‌টা মন্দ কোন্‌টা ভাল
কেমন করে করব নিরুপণ ॥
আঁধার যদি না থাকিত   পূর্ণ চাঁদ কি মান্য পেত
পাপ না থাকলে পুণ্যের মান্য নাই।
অধর্ম না থাকলে পরে   ধর্মের আদর কেউ না করে
কোন্‌টা মন্দ কও শুনি কানাই ॥
দূতেরে বধিবার তরে   পাটের দড়ি নিল করে
তাইতে দুঃখ পেলে শ্যামরায়।
ভাইয়ের শালা তুমি হরি   বিয়াই বলে ঠাট্টা করি
দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চায় ॥
অক্ষ ক্রীড়া রাজার ধর্ম   দুর্যোধন তাই জেনে মর্ম
যুধিষ্ঠিরকে দিলে নিমন্ত্রণ।
খেলতে গেলে পণ ধরে   কেউবা জিতে কেউবা হারে
অধর্ম তায় বলো কি কারণ ॥
দ্রৌপদীর হয় পঞ্চপতি   লোকে তারে কয় অসতী
তাই শুনে রাজা দুর্যোধন।
ধরে আনে সভাস্থানে   কাপড় টানে দুঃশাসনে
সেই কলঙ্ক করিতে মোচন ॥
তুমি যেমন গোকুলেতে   রাধার কলঙ্ক ঘুচাতে
ছিদ্র কুম্ভে আনাইলে জল।
তেমনি আমার দুর্যোধনে   সতীর কলঙ্ক মোচনে
কাপড় টানার করিল কৌশল ॥
শকুনি চক্রান্ত করে   নাকি আমার বংশ মারে
নির্দোষী তুমি নারায়ণ।
বধিতে পাণ্ডবের প্রাণ   ভীষ্ম রাখে পঞ্চবাণ
তুমি কেন করিলে হরণ ॥
তুমি হয়ে বিশ্বত্রাতা   যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা
শিক্ষা কেন দিলে ভগবান।
অশ্বথামা হত ইতি   বলে এই মিথ্যা ভারতী
বধিলে সেই দ্রোণগুরুর প্রাণ ॥

কর্ণ যেদিন যায় সমরে ইঙ্গিত দিলে বসুধারে
রথ চক্র করতে আকর্ষণ !
নিরস্ত্রকে অস্ত্র মারতে অর্জুনেরে গাণ্ডীব ধরতে
তুমি যুক্তি দিলে কি কারণ ॥
দুর্যোধন আর বৃকোদরে যেদিন গদা যুদ্ধ করে
তুমি তথা গিয়ে অকস্মাৎ ।
নিজ উরুতে চাপড় মেরে ইসারা দিলে ভীমেরে
উরুর পরে করো গদাঘাত ॥
তোমার কথায় শ্যামত্রিভঙ্গ দুর্যোধনের উরুভঙ্গ
দুঃখে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়,
কুরু বংশ ধ্বংসের গোড়া তুমি কৃষ্ণ মনোচোরা
তার প্রতিফল দিতেছি তোমায় ॥
পুত্র শোকের আগুন জেলে দিলে আমার বক্ষস্থলে
শত পুত্র করিয়ে নিধন ।
এমনি তোমার যদুবংশ সমূলে হইবে ধ্বংস
অভিশাপ দিলেম নারায়ণ ॥

আর তোমারে বেশী কথা বলে কি ফল হবে,
পাষাণ ক্ষেত্রে বীজ বুনিলে সুফল ফলে কবে ।
একূল ভাঙ ওকূল গড়—এই তোমার বিধান,
আমার বংশ মেরে রাখলে বোনাই ভক্তের মান ।
ধর্ম-স্থাপন কর্ম নাকি করো শ্যাম ত্রিভঙ্গ ।
তুলসীর সতীত্ব নষ্ট কোন ধর্মের অঙ্গ ।
মামার ভোগে ভাগ বসালে শ্যাম কালশশী ।
কোন্ ধর্মের দায় তোমার মামায় থাকে উপবাসী ।
তোমার পুত্র নরকাসুর তাহারে বধিয়া,
ষোল হাজার পুত্র বধূ তুমি করিলে বিয়া ।
ধর্মস্থাপন কর্মে তোমার আমি সুখী নই,
তোমার পদে প্রণাম করে আমি বিদায় হই ।

শ্রীহট্টে কবিগান

শ্রীহট্ট জিলার মাত্র একজন কবিয়ালের সঙ্গে নকুলেশ্বরের গান হয়। তাঁর নাম সুবল ভট্ট। শ্রীহট্ট জিলার কবির আসরের মধ্যে কয়েকটি হলো—মাটিকাটা মাধবপুর, করিমগঞ্জ টাউন, বালাগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, দিরাই, চুনারীঘাট, হবিগঞ্জ, সাট্রাজুড়ি, মৌলবী বাজার, শ্রীহট্ট টাউন, তোপখানা, শ্রীমঙ্গল ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহিরাগত কবিয়ালদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে।

হবিগঞ্জে সুবল ভট্ট বনাম নকুলেশ্বর

হবিগঞ্জে এক পালা গানে সুবল সরকার নিম্নোক্ত টপ্পা করেন—

আমি নদীয়ায় বসতি করি কাশী মিশ্র নাম।
তুমি সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণ,
করতেছ হরি সংকীর্তন,
আমি লোকমুখে করে শ্রবণ, দর্শনে এলাম॥
তোমার 'নাম' বড় না 'প্রসাদ' বড়—
এই কথা শুনতে মনের অভিলাষ;
ক্ষেত্রধামে কি কারণ, হরিনাম করো বারোমাস।
তোমার অদোষদরশী নাম,
লোকের মুখে শুনিলাম,
আমিও তাই করলেম বিশ্বাস।
অদ্য কীর্তনে দেখিনা কেন—
তোমার সেই প্রিয় ভক্ত হরিদাস?

জবাবে নকুলেশ্বর বললেন—

'হরিনাম' বড় না 'প্রসাদ' বড় শোন পরিচয়।
আগে ব্রাহ্মণে রেঁধে ওদন,
'নাম' নিয়ে করে নিবেদন,
হরিনামে না করলে শোধন, প্রসাদ কিসে হয়?
জানি ভক্ত দিলে ক্ষুদের অন্ন—
ভগবান পরমাত্ম জ্ঞানে খায়,
জেনে শুনে হরিদাস, ভিক্ষার চাল কি জন্য বদলায়।

যদি দোষ করে আমার কাছে,
সে দোষের ক্ষমা আছে,
সেবাবাদ খণ্ডন করা দায়।
তাইতে ত্যাগ করেছি হরিদাসে—
তাইতো সে প্রয়াগে প্রাণ দিতে যায়॥

ফরিদপুরে কবিগান

ফরিদপুর নিবাসী যে সব কবিয়ালের সঙ্গে নকুলেশ্বর কাব্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে ওলপুরের হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার প্রধান। এঁরা খুব সু-বক্তা ও সুরসিক ছিলেন। ঐ জেলার নিজড়ার ছোট রজনী, বড় রজনী, মহিম বিশ্বাস, ঘাগরের শশী সরকার, গোহালার শ্রীনারায়ণ বালা (সরকার), ভৈরবনগরের শ্রীনিশিকান্ত সরকার প্রভৃতির সঙ্গেও গান হয়েছে। বাইট্‌কামারীর অম্বিকা সরকারও খুব বড় শাস্ত্রজ্ঞ সরকার ছিলেন। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতকে তিনি নাকি বাইশ পর্ব করে নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীতে অতিরিক্ত শাস্ত্রীয় মারপ্যাঁচ ও কচ্‌কচি লক্ষ্য করে আচার্য কর্তা একবার কটাক্ষ করে ফুকার করেছিলেন—

কবিয়াল ঠকাবার তরে,
খট্ট পুরাণ শাস্ত্র পড়ে,
এসব গান রচনা করে, বাইট্‌কামারীর অম্বিকা॥

ফরিদপুর জেলার বিশিষ্ট কবির আসরের মধ্যে অল্প কয়েকটি হলো—গঙ্গানগর, উপসী ভট্টাচার্যের বাড়ী, রুদ্রকর, দামুটিয়া, বোয়ালমারী, চিতলমারী, মাদারীপুর (রটন্তীপূজা উপলক্ষে) মস্তাপুর, থাটারা, লোপনগঞ্জ, দামোদরদি, বাটিকামারী, পৈলানপট্টি, মহারাজপুর, কোটালীপাড়া, সোনাটিয়া, নিশানাথ-খোলা, উপইসা, শিকিরবাজার, পীরের পাড়, গোহালা, ঘাগর, ভৈরবনগর প্রভৃতি।

গোপালগঞ্জে হরিবর সরকার বনাম নকুলেশ্বর

একবার গোপালগঞ্জে একপালা গানে বিপক্ষ কবি হরিবর সরকারের প্রতি নকুলেশ্বর টপ্পা করেছিলেন—

আমি বিধির পুত্র বৈধাত্র, আজ তুমি নারায়ণ।
তুমি মন-রূপেতে ভগবান,
জীব দেহে থাক বর্তমান,
তবে কেউ পাপী কেউ পুণ্যবান্, হলো কি কারণ?

তুমি বিশ্বপিতা জগৎত্রাতা—
পাপপুণ্য ধর্ম আর অধর্মের বাপ ;
ধার্মিকের কেন এত মান—
অধার্ম্মিক ভোগে অনুতাপ।
হলো কুরুক্ষেত্রে মহারণ,
কৌরবের হলো মরণ,
তোমার কি ছিল কিছু পাপ ?
নইলে যদুবংশ ধ্বংস হতে—
গান্ধারী কেন দিল অভিশাপ ?

জবাবে হরিবর সরকার মহাশয় বলেছিলেন—

আমি মন-রূপে জীব দেহে থাকি, বোকা লোকে কয়।
এই যে মন বুদ্ধি আর অহঙ্কার,
আট প্রকার বিভূতি আমার,
মন হয় একটু অংশ তার, পরব্রহ্ম নয়।
আমি পাপ-পুত্রকে ধ্বংস করি—
ধ্বংস নয় বংশকে করি শাসন ;
গিয়ে পাপের বিপক্ষে, বাপের এই ধর্ম সংস্থাপন।
করে মাতৃবাক্যের অপমান,
কুরু বংশের গেল প্রাণ,
হয়েছে কলি নির্যাতন।
আমার যদুবংশ উদ্ধারার্থে—
সতীর শাপ বর বলে করি গ্রহণ॥

যশোহরে কবিগান

যশোহরের ঝিকরগাছা, কালীয়া সেনহাটি, নড়াইল, জয়পুর, মল্লিকপুর, শোলমারী প্রভৃতি বিখ্যাত কবির আসরে নকুলেশ্বর অনেক গান গেয়েছেন। জয়পুরের কবি রসরাজ ৺তারকচন্দ্র সরকারের নাম নকুলেশ্বর শুনেছেন ; কিন্তু তাঁকে চোখে দেখেন নি। তিনি কালীসিদ্ধা মহাসাধক ছিলেন। এবং শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। যশোহরের ডুমনী নিবাসী সু-কণ্ঠ সরকার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ অধিকারী তিন চার বৎসর নকুলেশ্বরের সঙ্গে জোটে গান করেন।

বিজয় সরকার আসরে ভাটিয়ালী সুরে ধুয়া দিলে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর রচিত ভাটিয়ালী গান আজো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ঝিকরগাছায় গান উপলক্ষে শ্রীবিজয় সরকার নিম্নোক্ত টপ্পা উত্থাপন করেছিনে—

ঝিকরগাছায় বিজয় সরকার বনাম নকুলেশ্বর

আমি পিপ্পলিয়া হরিদাস, আজ নগরে বেড়াই।
এলো জীব তরাতে গৌরাঙ্গ,
নিয়ে হরিনাম প্রসঙ্গ,
তুমি বৈষ্ণবের অন্তরঙ্গ, প্রেমদাতা নিতাই।
হঠাৎ ভেক ভাঙ্গিয়ে বিয়ে করে—
কি বুঝে ত্যাগ ছেড়ে সংসারে যাও;
জন্মায়ে ছ'টি পুত্র—কোন্ সূত্রে পূর্ণ কুম্ভ হও।
শুনি হরিনাম শুনলে পরে
কাল কৃতান্তে ভয় করে,
তুমি সেই হরিনাম বিলাও।
তোমার সেই হরিনাম থাকতে মুখে—
কি জন্য মাধার কাঁধার বাড়ি খাও?

উত্তরে নকুলেশ্বর বলেছিলেন—

তুমি কল্পনায় হরিদাস সাধু, আমি হই নিতাই।
আমি শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে,
নাম প্রচার করিবার আশে,
আজ এসে মাধার পাশে, কাঁধার বাড়ি খাই॥
কেন নাম থাকিতে মাথা ফাটে—
আমি কি মার ঠেকাতে এ গান গাই;
মার খেয়েও নাম দিয়ে—
বৈষ্ণবের ত্যাগ ধর্ম দেখাই॥
আমি গৌরাঙ্গের আদেশ নিয়ে,
ভেক ভেঙ্গে করে বিয়ে,
গার্হস্থ্য ধর্মের পথ শিখাই—;
আমায় লোকে বলে পূর্ণ কুম্ভ—
পূর্ণ না শূন্য, আমার জানা নাই॥

খুলনা জেলায় কবিগান

খুলনার বিধু সরকার, মথুর সরকারও কবিগানে খুব বশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু নকুলেশ্বরের কবিজীবন আরম্ভের পূর্বেই তাঁরা কবির আসর থেকে বিদায় নিয়েছেন। খুলনা যশোহর ফরিদপুরে চুনখোলার রাজেন্দ্র সরকারের সঙ্গেই তাঁর গান হতো শতকরা আশী পঁচাশি ভাগ। তা ছাড়া, চালনার প্রিয়নাথ সরকার, বুড়িড'ঙ্গার ছোট হরিবর, তেঁতুলবুনিয়ার রসিক সরকার প্রভৃতির সঙ্গে দু'চার পালা গান হয়েছে। ব্যাপক হারে যে কয়টি জেলায় কবিগান অনুষ্ঠিত হতো, তন্মধ্যে খুলনা অন্যতম। তার বিশিষ্ট কবির আসরের সংখ্যা অগুণতি। তবু কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল—

বাগেরহাট টাউন, কারাপাড়া, পীলজং, মঘিয়া, টাউন নওপাড়া, রাজনগর কাছারী, বলভদ্রপুর, পানবাড়িয়া, সাতবাড়িয়া, দৈবজ্ঞকাটি, বাড়েখালী, তিলডাঙ্গা কাছারী, সাচিয়াদহ, পিঠাভোগ, ডহর, মৌভোগ, বুড়িরডাঙ্গা, পানখালী, চুনকুরী, সাহেবের আবাদ, চাঁপাতলা, সাধের গাছতলা, কুদীর গাছতলা, বড় বাহিরদিয়া, ছোট বাহিরদিয়া, উত্তরপাড়া, ফকির হাট, হোচলা, মূলবর, আলাইপুর, খুলনা টাউন, ব্রাহ্মণ রাংদিয়া, দোহাজারী, হরিপুর, বিষ্ণুপুর, চন্দ্রেরদ্বীপ, বধনিয়া-গাঁতি, ফকির হাট, ফুলতলা, দৌলতপুর কলেজ—ইত্যাদি ইত্যাদি। ৺সতীশচন্দ্র মিত্র যখন দৌলতপুর কলেজের প্রিন্সিপাল, তখন রাজেন্দ্র সরকারের সঙ্গে একবার গান উপলক্ষে কলেজের পক্ষ থেকে সোনার মেডেলে খোদাই করে নকুলেশ্বরকে "কবিগুণাকর" আখ্যায় ভূষিত করেছিল।

আঁধার আসিছে ঘিরিয়া

গানের পর গান চলছে। গান গেয়ে সঙ্গীত রচনা করে বছরের পর বছর যাচ্ছে। প্রাচীন 'সরকার'গণ একে একে গান থেকে, বা এ জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। নূতন নূতন সরকার শূন্যস্থান পূরণ করছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ তার অশুভ ছায়া ফেলে গেছে। ভারত ছাড় আন্দোলনের জোয়ারেও ভাটা লেগেছে। বাংলাদেশের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নির্ঝঞ্ঝাট নিরুপদ্রব প্রশান্তি কেটে অনটন অস্থিরতা অসহিষ্ণুতার ভাব প্রকট। বনেদী বর্ধিষ্ণু বাঙ্গালী পরিবারে ভাঙন ও পড়তি অবস্থা সুস্পষ্ট। সুতরাং বিশিষ্ট বাড়ী বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কবির আসরের সংখ্যা কমে বারো-ইয়ারী উদ্যোগে কবিগান অনুষ্ঠানের প্রবণতাই বেশী।

বিশ্বযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত বৃদ্ধ ব্রিটিশ সিংহ ইতিমধ্যে ভারতবাসী হিন্দু-

মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ছোরা-লাঠির রাজনীতিতে ভাল ভাবেই দীক্ষা দিয়েছে। রাজ-নীতিতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন প্রভৃতি পরস্পরের প্রতি 'রণং দেহি' মূর্তিতে আবির্ভূত। যুক্তি-তর্কের অবসান ঘটে "লড়কে লেঙ্গে"র প্রাধান্য। তারই পরিণতি প্রথমে কলিকাতা, পরে নোয়াখালী এবং ক্রমান্বয়ে সারা উত্তর ভারতে পৈশাচিক নরমেধ যজ্ঞ। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শান্তির নীড় পূর্ববঙ্গের গ্রাম জীবনে নেমে এলো সন্দেহ অবিশ্বাস হিংসা লোভ ও কামুকতার নগ্ন মূর্তি। এসব প্রসঙ্গ নিয়ে নকুলেশ্বর অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য, পরবর্তীকালে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাঁর দু'খানা বৃহৎ গানের খাতা চুরি যাওয়ায় ইতিহাসের সাক্ষী সে সব সঙ্গীতের উদ্ধার করা গেলনা। তবু নমুনাস্বরূপ আর একজন কবিয়াল শ্রীনারায়ণচন্দ্র বালা (দে সরকার)'র রচিত মালসী সংগীতের আংশিক উদ্ধৃতিই তখনকার অস্থির অশান্তিময় অবস্থার সাক্ষ্য দেবে—

সাম্প্রদায়িক হানাহানি—

দেশের মুক্তির এই সন্ধিক্ষণে, হিন্দু আর মুসলমানে,
আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব দেখতে পাই।
এমন সুসময় অসহযোগ, দেশের পক্ষে কি দুর্যোগ,
বুঝি এই ব্যাধির ঔষধি আর নাই॥

গত সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে, রাজধানী কলকাতার বক্ষে.
হয়েছে যে অভিনয়—
রবে ইতিহাসে এ কলঙ্ক হইয়া অক্ষয়।
কত নরনারীর রক্ত স্রোতে, ধ্বংস যজ্ঞ পথে পথে,
এদের সাথে তুলনাতে, পশু বুঝি পশু নয়॥

মুসলীম লীগের যত পাণ্ডা, নাকি জুটায়ে সব ষণ্ডাগুণ্ডা,
কলিকাতার বুকে দিল ছেড়ে;
লাগল ষোল-ই আগষ্ট প্রথম দাঙ্গা, দ্বিপ্রহরের পরে।
ছিন্নভিন্না পুলিশ পাহারা, শান্তি রক্ষা করবে কারা,
হয়ে কতলোক সর্বস্বহারা. এখন ভাসে চোখের জলে।
আবার যে আগুন লেগেছে ঢাকা,
সে আগুনের ভীষণ শিখা, দেখা যায় ত্রিপুরা চট্টগ্রাম।

হলো নোয়াখালী খালি প্রায়,
লাগলো বিহার উড়িষ্যায়,
লাগে লাগে প্রায় শ্রীহট্ট আসাম ॥
আমরা সাম্রাজ্যবাদীর কৌশলে,
পড়েছি শিকারীর জালে, অন্ধ হিন্দু মুসলমান,
এবার ঠিক যেন ভাই দেশের ঘাড়ে চেপেছে শয়তান।
হবে লাভবান বিদেশী ধূর্তে,
শেষ হবে দেশ মরতে মারতে,
স্বাধীন স্থানের পরিবর্তে—
হবে শ্মশানস্থান আর কবরস্থান ॥

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি—

রণরঙ্গিনী কি রঙ্গ দেখালি সংসারে।
মাগো ১৯৩৯ এর পয়লা সেপ্টেম্বর,
লাগল কাল সমর ইউরোপ জুড়ে ॥
দিলি হিটলারকে প্রেরণা আগে, পোল্যাণ্ডের সীমান্ত ভাগে,
ঘিরিল জার্মানী দল—দেখে পোল্যাণ্ডকে দুর্বল,
শেষে ইংরেজ আর ফরাসী মিলে,
যোগ দিল পোল্যাণ্ডের দলে,
অন্তরীক্ষে জলে স্থলে—মাগো জ্বালালি সমরানল ॥
দিয়ে মানবতায় জলাঞ্জলি
যুদ্ধে জার্মানী জাপান ইটালী, বুলগেরিয়া তুরস্ক রাশিয়া,
হল নরশক্তি রণাসক্ত, রক্তে ধরা অভিষিক্ত,
প্রকম্পিত ইউরোপ এসিয়া।
লুব্ধ পররাজ্য গ্রাসে, উদ্যত বিশ্ববিনাশে,
আমরা ভারতবাসী মরি ত্রাশে,
বল দে মা দুর্বলের পক্ষে।
শান্তিময়ী তোর চরণে করি শান্তি ভিক্ষে ॥

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

১৯৪৭ সালের বর্ষাকাল। দল বন্ধ করে নকুলেশ্বর বাড়ীর ঘাটে আছেন। ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে। দেশ স্বাধীন হবে। সকলের মনে আনন্দের জোয়ার। কিন্তু চতুর ইংরেজ তার ভেদ নীতি প্রয়োগ করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে

চিরস্থায়ী বিবাদ জিইয়ে রাখার অভিপ্রায়ে সোনার ভারত সোনার বাংলাকে খণ্ডিত করে, ভারত পাকিস্তান নামে দুই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। তার ফলে অবিভক্ত বাংলার মুকুটমণি পূর্ব বঙ্গ, তার নাম পরিচয় হারিয়ে অনভ্যস্ত অপরিচিত পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তরিত।

এই সংবাদ ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালী, ঢাকা ও কলিকাতায় নরহত্যা নারী নির্যাতনে অতঙ্কিত অবস্থাপন্ন বড় বড় হিন্দু পরিবার, বনেদী গৃহস্থ, ব্যবসায়ী মহাজন প্রভৃতি সমাজের নেতারা তাদের আস্তানা গুটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিতে শুরু করেছে। জনৈক কবিয়াল ভবানী গানে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন—

কেন যোগনিদ্রাতে র'লি তারা,
জন্ম জরা দুঃখ হরা, ভবদারা ভাগ্যজননী।
হলো সোনার ভারত খণ্ডিত,
সুখের দিন হল গত,
ভুগি সতত, দুঃখ আর গ্লানি॥

কিন্তু সবে তো কলির সন্ধ্যা ; দুঃখ আর গ্লানির কেবলমাত্র ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিয়েছে। আর এক কবির কণ্ঠে ফুটে উঠল অসহায় হাহাকার—

দেশের মানুষ ছিল যারা—
দেশ ছাড়িয়ে চইলে যায়—
মোদের কি হবে উপায়।

মিলন-গীতি

অবস্থাপন্ন হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যময় কবি-কেন্দ্রগুলি পরাজিত সৈনিকদের দুর্গের মতো একে একে ধ্বসে পড়তে লাগল। নকুলেশ্বর ভাবলেন—দেশত্যাগ করবো কেন? মুসলমান নবাবদের আমলে কি হিন্দু-মুসলমান একসাথে বাস করেনি? তাহলে দেশবাসী ও প্রতিবেশী ভিন্নধর্মী সংখ্যা গুরুদের শাসনেই বা কেন থাকতে পারব না। এই ভেবে নকুলেশ্বর হিন্দু মুসলমানের মিলন-গীতি রচনা করে আসরে আসরে গাইতে লাগলেন—

ভাইরে হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানে,
মিলে হিন্দু মুসলমানে,
রাষ্ট্র কর শ্রেষ্ঠ স্বর্গধাম।
শুনি আদম জন্মায় আদমী সব, মনু জন্মালেন মানব,
একই বিভব, এক বস্তুর দুই নাম॥

১। যদি আদম করেন আদমী পয়দা,
মনুর সৃষ্টি মনুষ্য পুত্র ; মূলে এক বৃক্ষের পত্র,
জল পানি এক, নাম বিভেদ মাত্র।
অভিন্ন নারীস্বরূপা, যেই হাওয়া সেই শতরূপা,
নামাজ রোজা-ধ্যান অজপা,
একই স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ॥

২। তবু কেহ বলে এই পাকিস্তান—
রাষ্ট্র শুধু ইসলামী প্রজার—
বড় আনন্দের বাজারে ;
এ রাজ্যে নাই হিন্দুর অধিকার।
এই সিদ্ধান্ত করে যারা, পাকিস্তানের শত্রু তারা,
এক জাতিতে রাষ্ট্র গড়া,
কোন্ যুগে হয়েছে কোন্ রাজার ॥

৩। শুনি প্রাচীন যুগের ইতিহাসে, যত স্বাধীন দেশে—
জাতিধর্ম নির্বিশেষে, সমদৃষ্টি সবার প্রতি।
জাতিয়তা ফেলে দূরে, সবে মিলে মিলন সুরে,
গাও মিলনের গীতি ॥

৪। কামার কুমার মালো ছুতার,
হাড়ি, ডোম, ভুঁই মালী, চামার,
ধোপা নাপিত তেলী মালী আদি—
এইসব নবশ্রেণী হিন্দুর মাঝে,
রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের কাজে,
এদের আদর করবে নিরবধি।
এসব হিন্দু করলে ত্যাজ্য, রাষ্ট্রের অভাব অনিবার্য,
রক্ষা করতে হলে রাজ্য, কার্যে লাগে ছত্রিশ জাতি।
বিশ্বপ্রেমে সবাই মজো—খোঁজ পর প্রীতি ॥

৫। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে—
হিন্দু ছিল তার সভার ভূষণ,
করতেন গুণীর সংতন,
হিন্দুকে দেয় সমুচ্চ আসন।

বীরবলের কাব্যরসে, সভাসদ্ রাখিলেন পাশে,
মানসিংহ পায় অনায়াসে,
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসন ॥

৬। যখন মীরকাসিম রাজত্ব পেল—
হিন্দু প্রতাপ ছিল পার্শ্বচর,
করে নবাবের আদর ;
ব্রিটিশ রণে ত্যজে কলেবর।
সম্রাটকে দেখে সন্ত্রস্ত, ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অস্ত্র,
শিখায়ে সেই জ্যোতিষ শাস্ত্র,
গুরু হলেন সেই চন্দ্রশেখর ॥

(অন্তরা) ভাইরে কিসের হিন্দুস্থান, কিসের পাকিস্তান;
মহাপ্রস্থানের তো বাধা নাই।
"মরলে" কেউ যাব শ্মশানে, কেউ বা গোরস্থানে,
শেষের দিনে একই স্থানে ঠাঁই ॥
আল্লা হরি নিয়ে মস্ত লাঠালাঠি ;
ভাইয়ে হয়ে শত্রু ভাইয়ের মাথা কাটি;
হিন্দুর দেহে যে সব জল, বায়ু, তেজ, মাটি ;
মুসলিমের আব, আতস, খাগ, আর বাই।
হিন্দুর বেদে বলে সোহং ব্রহ্মবাদ,
কোরাণ বলে 'কোলহু আল্লাহু আহাদ'
অজ নিত্য ব্রহ্ম 'আল্লাহুসামাদ'—
বেদ কোরাণ অভিন্ন দেখ ভাই ॥

৭। আমরা হিন্দু মুসলেম ঐক্য হলে,
দেশের দুঃখ যাবে চলে ;
সবে মিলে কর সেই চেষ্টা।
আমরা মিলে আর্যে অনার্যে,
জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প কার্য্যে
কর্‌ব রাজ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা ॥

৮। শুনি গৌড়ের বাদশা হোসেন শাহ
যখন পেল গৌড়ের সিংহাসন
করতেন হিন্দুদের যতন ; জহুরী সে চিনে লয় রতন।
নিজে ছিলেন তত্ত্বপ্রত্ন, করেছিলেন গুণীর যত্ন
হোসেন শাহের সভারত্ন, উজীর ছিলেন রূপ আর সনাতন।

৯। ছাড় ধর্ম নিয়ে দলাদলি—কোরাণে কয় আল্লা হয় আদিম,
বেদে ব্রহ্ম হয় অসীম ; পুরাণে সে জড় মাছ কাছিম
বেদ কোরাণে নাইকো অমিল,
যেই হরি ; সেই দোবাহানা জীল ;
'আলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল'
হিন্দুর রাম আর মুসলিমের রহিম ॥

(মিল) কায়দে আজম জিন্না মোদের পাকিস্থানের স্রষ্টা ;
নকুল বলে সমান নিষ্ঠা রাখো সবে তাহার প্রতি ॥

এ রকম আরও কত শত গান—

রোজা কর নামাজ পড়ো
ঠিক রেখ ধর্মের ইমান।
হিন্দু-পূজা শেখের রোজা
বিচার করলে এক সমান।
মুসলমানে বলে আল্লা, হিন্দু বলে ভগবান।
জল আর পানি একই বস্তু নামে মাত্র ব্যবধান্ ॥
হিন্দুর যেমন সত্য ধর্ম, জীবনের প্রধান সোপান।
মোজাম্মেল, মোফাজ্জেল ন'মে মুসলিমের দু'টি ইমান ॥
হিন্দুদের ব্রত উপবাস, মুসলিমের রোজা রম্জান।
হিন্দু করে নাম সংকীর্তন, মুসলমানে দেয় আজান ॥
হিন্দু যেমন চতুর্বেদী—করে চারি বেদের গান।
তৌরিত, জব্বুর, ইঞ্জিল, ফোরকান মুসলমানের চার কোরাণ ॥
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ হিন্দুর চারি লক্ষ্যস্থান।
তৈয়ব, সাহাদাত, তৌহিত, তম্জিত—
চার কলেমায় মুসলমান ॥

একই বর্ণের রক্তধারা দুই দেহে প্রবহমান।
নকুল বলে দ্বন্দ্ব ভুলে—গাও সবে মিলনের গান ॥

পাকিস্তানে শেষ গান ঃ নকুলেশ্বর বনাম তারিণী সরকার

নকুলেশ্বরের এ জাতীয় গান ও আলোচনায় সাধারণ হিন্দু মুসলমানের মনে আশা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল। এদিকে মুসলমানদের পীর, ফকির, মোল্লা, মৌলবী-মৌলানারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মুসলমানদের ধর্মকথা শোনাবার অছিলায় হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। তারা অশিক্ষিত ধর্ম-ভীরু মুসলমানদের বললেন—

গান শোনা তোমাদের গুণাহ্ অর্থাৎ পাপ। হিন্দুর পৌত্তলিক মতবাদের সঙ্গে আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই—এ হলো হজরত মহম্মদের কোরাণের বাণী ইত্যাদি নানাবিধ প্ররোচনামূলক প্রচারে মুসলমানদের মন বিষিয়ে তুলবার চেষ্টা করতেন।

নকুলেশ্বরের গান শোনবার জন্য মুসলমানদের একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা মৌলবী-মৌলানাদের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে গানের আসরে যেতে পারতেন না। হিন্দুরাও আগের মত প্রত্যেক উৎসবে গান দিতে সাহস করতেন না। সঙ্গীতপ্রিয় মুসলমানরা গোপনে পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে হিন্দু বাড়ীতে গানের আসর করে নকুলেশ্বরের গান দিতে আরম্ভ করলেন। নিজেরা চাদর মুড়ি দিয়ে, লুঙ্গি ঢাকা দিয়ে গান শুনতেন।

কুমিল্লা জেলার গৌরীপুর বাজারে ঐ রকম একটা গানের ব্যবস্থা করে মুসলমান দোকানদারগণ নকুলেশ্বরকে বায়না দিলেন। হিন্দু দোকানদাররা বললেন—ভাইসব, তোমাদের কথামত গানের আসর করব; শেষে যদি কোন দাঙ্গা হাঙ্গামায় পড়ি ?

মুসলমানরা সকলে বললেন—আমরা থাকতে আপনাদের কোন ভয় নেই। নকুলেশ্বরের বিপক্ষে হরি আচার্যের আর এক ছাত্র ঢাকা নিবাসী শ্রীতারিণী সরকারকে বায়না করা হলো।

এদিকে এই গানের সংবাদ পেয়ে স্থানীয় মৌলবী-মৌলানারা থানায় গিয়ে জানালেন এখানে কবিগান হলে ভীষণ একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে, আপনারা এ গান বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন।

থানার পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে গান গাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

কবিয়ালরা সে সংবাদ জানেন না। যথাসময়ে দুই দল গৌরীপুর বাজার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত।

স্থানীয় হিন্দু মুসলমানরা হুকুম দিলেন, গান আরম্ভ করুন। নকুলেশ্বর দল নিয়ে আসরে গিয়ে ঢোলে 'বাড়ি' দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে বাধা দিল—গান বন্ধ করুন।

নকুল—কেন ?

পুলিশ—এখানে যে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে জানেন না ?

নকুল—কৈ না। আমরা কিছু জানিনা।

পুলিশ—এখন তো জানলেন—গান বন্ধ করে মানে মানে নৌকায় যান। আইন অমান্য করবেন না।

নকুল—গান না করলেও তো আইন অমান্য করা হবে। আমরা গান করবো স্বীকার করে পাকা এগ্রিমেণ্ট দিয়ে বায়না গ্রহণ করেছি, গান না করলে আদালতে সোপর্দ হবো যে! আমার অনুরোধ, আপনারা আমার গানের আসরে শ্রোতা হয়ে বসুন, আমরা কি গান করি শুনুন—গানের পরে যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

পুলিশ—গানের পরে দলসহ থানায় যেতে হবে।

নকুল—হঁ্যা হঁ্যা, নিশ্চয়ই যাব। বসুন; আমরা গান আরম্ভ করি। এই বলে নকুলেশ্বর তারিণী সরকারকে বললেন—ভাইটি তারিণি! এখানে যে পরিস্থিতি তাতে মালসী, সখী সংবাদ, লহর-কবি ওসব গান বাদ দিয়ে তুমি টপ্পা-পাঁচালী আরম্ভ কর।

তারিণী সরকার টপ্পা করলেন—

আমি তত্ত্বান্বেষী নরেন দত্ত, তুমি রামকৃষ্ণ।
খাঁটি ঈশ্বর আছে কোন্‌খানে,
জানিতে বাসনা মনে,
তাইতে এলেম তোমার নাম শুনে, হয়ে সতৃষ্ণ॥
কেন মাটির মাকে পূজা কর—
ঈশ্বরের স্বরূপ হয় কি নিরমাণ।
সর্বধর্ম সমন্বয় কিসে হয় বল মতিমান॥
শুনি মগে কয় ফরাতারা;
গড্ বলে ইংরেজেরা,
আল্লা কয় যত মুসলমান।

কেন ইস্‌লামী সঙ্গীত বিরোধী—
হিন্দুরা বেদে করে সামগান ?

তারিণী সরকার পাঁচালীতে বললেন—আমি খাঁটি ঈশ্বরতত্ত্ব জানবার জন্য অনেকের কাছে গিয়েছি। আমি নরেন দত্ত—লোকের মুখে তোমার নাম শুনে দক্ষিণেশ্বরে এসেছি। তুমি ঈশ্বরদর্শী রামকৃষ্ণ পরমহংস। ঈশ্বর যদি নিরাকার নির্বিশেষ—তবে তুমি এক সাকার মাটির প্রতিমা পূজা কর কেন ?' শঙ্করাচার্য বলেছেন—

মনসো কল্পিতা মূর্তির্নৃনাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তদা॥

অর্থাৎ যদি মন-কল্পিত মূর্তিই মনুষ্যের মোক্ষ দিতে পারে, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যেও মানুষ রাজা হতো।

মৃচ্ছিলা ধাতুদার্বাদি মূতাবীশ্বরবুদ্ধয়।
ক্লিংশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনামোক্ষ ন যান্তিতে॥

অর্থাৎ মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তিতে যাহারা আরাধনা করেন, তারা কষ্টই করে কিন্তু মোক্ষ পায় না। আর তুমি নাকি সর্বধর্ম সমন্বয় করতে এসেছ। সমন্বয় কিসে হলো ? মগে ফরাতারা বলে, ইংরেজে গড্ বলে, হিন্দুরা হরি বলে, মুসলমানে আল্লা বলে। পথ ও মত আলাদা কেন ?

মুসলমানে জন্মান্তর মানে না—আর হিন্দুরা বলে "জাতস্যহি ধ্রুবং মৃত্যু" অর্থাৎ জন্মিলেই মরতে হবে "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" মরলেই আবার জন্ম ; সমন্বয় কোথায় ?

হিন্দুর বেদে বলে অহিংসা পরম ধর্ম আর মুসলমানে বলে হিংসায় অর্থাৎ খোদার প্রীতে কোরবাণী দাও।

ইস্‌লামী ধর্মাবলম্বীগণ সঙ্গীত বিরোধী—অর্থাৎ গান শুনলে তাদের গুণাহ্ অর্থাৎ পাপ হয়। আর হিন্দুরা বেদের সামগান করে সাধনা করেন—"গানং পরোতর নহি"—গানের চাইতে শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই। সমন্বয় কোথায় ?

বেদের সঙ্গে কোরাণের ঐক্য হয়না কেন ? তবে তুমি সর্বধর্ম সমন্বয় করলে কি ?—তারিণী সরকার এই বলে পাঁচালী শেষ করলেন।

নকুলেশ্বর জবাব দিতে উঠে বললেন—

তুমি তত্ত্বান্বেষী নরেন দত্ত দক্ষিণেশ্বরে।
লোকে পরমহংস আমায় কয়,
প্রকৃত হংস আমি নয়,
যারা নীর হতে ক্ষীর বেছে লয় হংস কয় তারে॥
আসে মাটির মাঝে খাঁটি সত্ত্বা
বেদ মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলে প্রাণ।
বিগ্রহ সাক্ষী গোপাল—
শ্রীক্ষেত্রে সাক্ষ্য করে দান॥
"তোমার" আল্লা, হরি, যিশু, গড্,
এক ঈশ্বরের চিত্রপট, শুধু ঐ নামের ব্যবধান।
"জানি" মুসলমানে সঙ্গীত মানে—
যে গানে ডাক-নামাজে দেয় আজান॥

নকুলেশ্বর টপ্পা শেষ করে পাঁচালীতে বললেন—তুমি নরেন দত্ত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছেলে, ঈশ্বর খুঁজতে কি লোকের কাছে যেতে হয়? ঈশ্বর তোমার ভিতরে। বহিরিন্দ্রিয় বন্ধ করে অন্তরিন্দ্রিয়ে দর্শন কর। এ হলো, হ্যারিকেন জ্বেলে পরের ঘরে তামাক খাবার আগুন খুঁজতে যাওয়ার মতো। আগুন যে তার হাতের হ্যারিকেনে, তা যেমন দেখে না; তেমনি তুমিও আত্মতত্ব না খুঁজে পথে পথে খুঁজে ঈশ্বর পাবে না।

তারপর তুমি ঈশ্বরকে নিরাকার বলছ; ঈশ্বর নিরাকার নয়, সংসারে যত সাকার সবই সেই ঈশ্বরের আকার—"একমেবা বহুস্যাম", আমি এক আছি—বহু হবো। আত্মৈব ইদম্ অগ্র আসীৎ একমেব—

কিন্তু সেই একমেব অদ্বিতীয় পুরুষ একাকী রমিত হলেন না; তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করলেন—আমার জায়া হউক যথা—

স বৈ নৈব বেদে তস্মাৎ একাকী নঃ রমতে।
স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ স অকাময়ত জায়ামে স্যাৎ॥ (শ্রুতি)

তার দেহে পুরুষ-প্রকৃতি একীভূত ছিল; এখন তিনি আপনাকে দ্বিধা-বিভক্ত করে পতি ও পত্নী হলেন। যথা—

স এতবান আস
যথাস্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিম্বক্তৌ—

স ইমমেব আত্মানং দ্বিধা অপাতয়ৎ ততঃ।
পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাম্॥

অর্থাৎ সেই পুরুষ একাই পতি ও পত্নী হলেন। পতি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, আর পত্নী পরমাপ্রকৃতি রাধারানী।

মুনি ঋষির ভাষায়—মনু ও শতরূপা
আর মুসলমানের ভাষায়—আদম ও হাওয়া

শুরু হল সৃষ্টি প্রকরণ—নিরাকার সাকারে এলেন। দৃশ্যমান এই বিশ্ব মাঝে যা কিছু আছে সবই সেই ব্রহ্মের সাকার। তাই উপনিষদ বলে—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

নকুলেশ্বর গোলাবাড়ীর আসরে রাজেন্দ্র সরকারের প্রশ্নের জবাবে—সাকার নিরাকার সম্বন্ধে যে সব প্রমাণ দিয়েছিলেন এখানেও সেই সব প্রমাণ দিলেন।

তারপর জড় বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে বললেন—নিরাকার ইথার সাগর; সেই ইথার সাগরে ইচ্ছা শক্তিরূপ অসংখ্য বুদবুদ ভেসে উঠল। ঐ বুদবুদ্গুলিকে ইলেক্ট্রন অর্থাৎ তড়িতাণু বলে। এই তড়িতাণু আবার দুই প্রকার—পুং ও স্ত্রীজাতীয়। পুংজাতীয় তড়িতাণু পজিটিভ্। এর অন্য নাম প্রোটন। আর স্ত্রীজাতীয় তড়িতাণু নেগেটিভ্। এর অন্য নাম ইয়ন্। এই প্রোটন ও ইয়ন—নেগেটিভ্ পজিটিভ্ স্ত্রীপুরুষ একত্র হয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তামা, রাং, দস্তা, পারদ ইত্যাদি নব্বুইটি মূল পদার্থের সৃষ্টি হয়। এইগুলির নাম 'এলিমেণ্টস্'। তারপর এই সব এলিমেণ্টগুলি তাপজাড়িত হয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ কেমিকেল কম্বিনেশনের দ্বারা অসংখ্য যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। এই হল জড় বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ।

কাজেই সাকার ভিন্ন নিরাকার কে উপলব্ধি করা যায়না। "সুর" বস্তুটি নিরাকার, কিন্তু কোন সাকার যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া তাকে ধরা যায় না। যেমন সূর্যের মধ্যে আগুন আছে; যে আগুন বিশ্বকে দগ্ধ করতে পারে। কিন্তু খালি হাতে সে আগুনের উপলব্ধি হয় না। একখানি আতশী কাচ হাতে নিয়ে যদি সূর্যের দিকে ফিরিয়ে ধরা যায়—এবং সূর্যের তাপ যদি ঐ কাচের উপরে পড়ে, আর কাচের সেই ফোকাস্টা যদি কোন দাহ্য বস্তুর উপর পতিত হয়, তখনই আগুন জ্বলে ওঠে।

সূর্যের আগুন ধরতে হলে যেমন আতশী কাচের আশ্রয় নিতে হয়, তেমনি

নিরাকার সূর্যের কৃপা-রশ্মি লাভ করতে হলেও ঐ সাকার বিগ্রহরূপী আতশী কাচের আশ্রয় নিতে হয়।

সাকার ভিন্ন নিরাকারের উপাসনা হয় না। সসীম জীবে অসীমের উপলব্ধি করতে পারেনা বন্দুকের গুলি 'সই' (নিশানা) করতে হইলে যেমন অদূরে একটা নির্দিষ্ট চিহ্ন রেখে গুলি ছোঁড়ে—আগে এধারে ওধারে পড়তে পড়তে যখন ঐ চিহ্নের উপরে লক্ষ্য স্থির হয় তখন সে উড়ন্ত পাখীর গায়েও গুলি লাগাতে সক্ষম হয়। তেমনি সাকার বিগ্রহের উপর মনের একনিষ্ঠতা স্থির করলে পরমেশ্বরের স্বরূপানন্দ লাভ করা যায়।

মুসলমান ভাইরা যেমন নামাজের সম্মুখে মসজিদ্ ঘরের মধ্যে, একটা সিঁড়ির মত স্থান নির্দিষ্ট করে 'সেজদা' দেয়—খৃষ্টানেরা গীর্জা ঘরে যেমন একটা ক্রুশ চিহ্ন স্থাপন করে—তাকে লক্ষ্য করে উপাসনা করে—তেমনি হিন্দুরাও মনের একাগ্রতা স্থির করবার জন্য দেব দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা করেন।

যুগ-যুগান্ত নিরাকার সাধক ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাধনা করেও "অবাঙ্‌মানসো-গোচর" যে ভগবান তাঁকে ধরতে পারবেন না। সে জন্য মহামুনি বেদব্যাস সাধকগণের হিতের জন্য ব্রহ্মরূপের কল্পনা করেছেন যথা—

চিন্ময়স্য দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য শরীরিণঃ ।।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মনাং রূপ কল্পতে ॥ (ব্যাস বাক্য)

অর্থাৎ 'যিনি চিন্ময়' অদ্বিতীয়, কলঙ্কবিহীন ও অশরীর, এমন বস্তুকে সাধকে উপলব্ধি করতে পারবেনা, সেইজন্য আমি সাধকের হিতের জন্য পরব্রহ্মের রূপ নামাদি কল্পনা করলাম।'

সসীম জীবের অসীম জ্ঞান আসেনা। যেমন—ঠাকুরমশাই দেবীর মণ্ডপে বসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে চণ্ডীপাঠ করে যজমানদের বুঝান—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

অর্থাৎ যে দেবী সর্বভূতে সর্বস্থানে মাতৃরূপে বিরাজমানা আমরা নমস্তস্যৈ বলে তিনবার নমস্কার করে, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপের তাপ নিবারণ করি।

মন্ত্রোচ্চারণের মাঝে হঠাৎ যদি পুরুত ঠাকুরের প্রস্রাব পায় তাড়াতাড়ি তিনি চণ্ডীমণ্ডপ হতে বের হয়ে বাইরে গিয়ে প্রস্রাব করে আসেন। মন্দিরের মধ্যে প্রস্রাব করা যায়না—এটা যে মায়ের মন্দির এখানে যে "মা" আছেন।

কিন্তু চণ্ডী পড়ার সময় "যা দেবী মণ্ডবে স্থিতং" না বলে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" বলেছেন। "মা" যদি সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকেন, তবে ঠাকুর-মশাইয়ের প্রস্রাবের জায়গাটায় কি মা নেই ? আছেন, কিন্তু সসীম জীব বলে তার অসীম উপলব্ধি হয়না। এখন বুঝলে তো নরেন ! সাকার পূজা কেন করি।

এখন ধর্ম সমম্বয় সম্বন্ধে তোমাকে দু'চার কথা বলছি। তুমি বললে যে মুসলমানের উপাস্য আল্লা, হিন্দুর উপাস্য হরি, মগের ফরাতারা, খৃষ্টানের গড্; ইত্যাদি এক এক জাতির যদি আলাদা আলাদা উপাস্য হয়, তবে ধর্ম সমম্বয় হলো কেমন করে ? তার উত্তরে বলছি—

যেমন শ্যামবাবু উকিল—তার বন্ধুরা ডাকে শ্যামা, বাবা ডাকেন শ্যামচরণ, মা ডাকেন শ্যামু, গিন্নি বলে স্বামী, ছেলে ডাকে বাবা, আর এজলাসে গেলে—মক্কেলরা ডাকেন উকিল বাবু। এই শ্যামা, শ্যামাচরণ, শামু, স্বামী, বাবা, আর উকিলবাবু কি আলাদা ব্যক্তি ? ঐ এক শ্যামবাবুরই নাম। নামের প্রভেদ আছে বলে বস্তুর প্রভেদ হয়না। যেমন একই পুকুরের জল—কেউ বলে পানি, কেউ বলে অপ্; কেউ বলে ওয়াটার—তাই বলে কি বস্তুশক্তির পরিবর্তন হয় ? তেমনি এক ঈশ্বরের অনন্ত নাম আছে বলে ঈশ্বর অনন্ত নয়; এক ও অদ্বিতীয়।

তুমি বললে, মুসলমান সঙ্গীত বিরোধী; গান শুনলে তাদের গুণাহ হয়। এ তোমার ভুল ধারণা। সংসারে যত সঙ্গীত, যত গান, যত রাগ রাগিণী—তার অনেকাংশের স্রষ্টাই হল মুসলমান "তানসেন"। গান বলে কাকে ? শুধু তা-না-না-না সুর ভাঁজলে গান হয়না। কোন পদের সঙ্গে সুর যোজনা, করে তান ধরলেই হয় গান। মুসলমান যদি 'সঙ্গীত বিরোধী তবে তারা 'ডাক নামাজ' অর্থাৎ আজান দেওয়ার সময় কয়েকটি পদ যোজনা করে মধুর স্বরে তান ধরে কেন—

যথা—১। আল্লা হো আকবর—৪ বার

২। আস্‌হাদো আল্লা মোহাম্মদার রাছুলোল্লাহু—২ বার

৩। আস্‌হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহু—২ বার

৪। হাইয়া আলাচ্ছালাত—২ বার

৫। হাইয়া আলাল্ ফালাহো—২ বার

৬। আল্লাহো আকবর—লা এলাহা—২ বার

এই খোদাতাল্লার নামের কালামগুলি যোজনা করে যে উদাস রাগিণীতে তান ধরে—এর চাইতে শ্রেষ্ঠ গান জগতে আর কি আছে !

সে গানের মধ্যে খোদাতালার নাম নেই ভগবানের নাম নেই তার নাম কুসঙ্গীত। সে সঙ্গীত শ্রবণে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই পাপ হয়, গুণাহ হয়।

তারপর তুমি বললে, মুসলমানের হিংস ধর্ম, হিন্দুর অহিংস ধর্ম।

হিংসায় কোনদিন ধর্ম হয় না। হিংসা হিংসাই থাকে। খোদাতালা মুসলমানকে কোরবানী দিতে বলেছেন। বলেছিলেন—তোমরা কোরবানী দিয়ে আমাকে তুষ্ট কর, আমি তোমাকে অমূল্য সম্পদ দান করব। কি দেব?

(কওসোর ছুরা)

ইন্না আতায়না কাল কওছার—
ফাসাল্লে লে রা ব্বেকাওয়ান্ হার
ইন্নাছা নিয়াকা হুয়াল আবতার।

তোমাকে "কওসার" নামক একটি কূপ দান করব। যে কূপের পানি স্পর্শ করলে মহা দোজোকী ব্যক্তিও অনায়াসে বেহেস্তে যাবে। সে কোরবানী কেমন?

খোদাতাল্লা ইব্রাহিম খলিল উল্লাকে পরীক্ষার জন্য কোরবানী দিতে বলেছিলেন। তিনি অনেক দুম্বা ও ছাগ কোরবানী করলেন। খোদা বাণী দিলেন—আমি তোমার ওসব কোরবানী কবুল করি না। তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় বস্তু কোরবানী দিতে হবে। ইব্রাহিম খলিল তখন তার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্র ইস্মাইলকে কোরবানী করতে মনস্থ করলেন। স্বর্গীয় ফেরেস্তা এসে সাত পাল্লা কাপড় দিয়ে খলিলের চক্ষু বেঁধে হাতে ছুরি দিয়ে বললেন—এই নাও খোদার কালাম পড়ে পুত্র ইস্মাইলকে কোরবানী করো।

ইব্রাহিম খলিল—"বিস্মিল্লাহে আলি এল আজিম"—বলে ছেলের গলায় ছুরি দিয়ে কোরবানী করে চাদর ঢাকা দিয়ে রাখলেন। স্বর্গীয় ফেরেস্তা বললেন—আমি তোমার চোখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি, তুমি খোদার নাম নিয়ে চাদর ফেলে দেখ কি কোরবানী দিলে। এই বলে খলিলের চোখের বাঁধন খুলে দিলেন।

খলিল উল্লা তখন—"আল্হামদো লিল্লাহেরাব্বিল" বলে চাদর ফেলে দেখে—একটা দুম্বা কোরবানী হয়ে পড়ে আছে; আর তার প্রাণাধিক পুত্র ইস্মাইল অদূরে "আল্লাহো আকবর" বলে নৃত্য করছে। স্বর্গীয় ফেরেস্তা বললেন—খোদা তোমার কোরবানী কবুল করেছেন। খোদার প্রীত্যর্থে কোরবানী দিয়ে খোদার কালাম পড়ে আবার তাকে বাঁচিয়ে দেবে,—তবেই হবে কোরবানী।

হিন্দুরাও অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, নরমেধ যজ্ঞ করে, ঘোড়া, গরু, ও মানুষ কেটে আবার যজ্ঞের ফলে বাঁচিয়ে দিতেন।

বধ করে বাঁচাইতে যদি পার প্রাণী।
সেই হল শ্রেষ্ঠ বলি, সেই তো কোরবানী॥

এটা বেদের বাণী আর কোরাণেরও বাণী। তারপর বললেন—মুসলমানে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেনা—হিন্দুরা জন্মান্তর মানে। তার কারণ হল—মুসলমানের ধর্মের নাম হল ইস্‌লাম ধর্ম। ইস্‌লাম শব্দের অর্থ হল আত্ম-সমর্পণ, খোদার নামে যারা আত্ম সমর্পণ করেন তাদের পুনর্জন্ম হয়না, সেই জন্য মুসলমানে জন্মান্তর স্বীকার করেন না। যে হিন্দুদের ভাগবত গীতায় ভগবান বলেছেন—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ. অর্থাৎ জন্মিলেই মরতে হবে, আবার মরলেই জন্ম হবে—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার গীতায় বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনো'র্জুন।
মামুপেত্যতু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৮ অঃ ১৬ শ্লোক)

অর্থাৎ হে অর্জুন! পৃথিবী হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল লোকই পুনরাবর্তনশীল। হে কৌন্তেয়, কিন্তু আমাতে আত্মসমর্পণপূর্বক আমাকে লাভ করলে তার আর পুনর্জন্ম হয়না।

এখন বুঝে দেখ. মুসলমান ভাইয়েরা জন্মান্তর স্বীকার করেননা শুধু তাই নয়, আত্ম সমর্পণকারী হিন্দুরাও জন্মান্তর স্বীকার করেন না।

তুমি বলেছ, হিন্দুর বেদে ও মুসলমানের কোরাণে কোন সামঞ্জস্য নেই। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেদ ও কোরাণে একই বাণী। তবে আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ সেজে বসে আছি বলে সে বাণী চোখে দেখিনা। সেই জন্যই আমরা হিন্দু-মুসলমান পথভ্রষ্ট।

আমাদের এই পথ ভ্রষ্ট করেছেন কারা জানো? যত সব বড় বড় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আর মুসলমানদের মোল্লা মৌলবীরা। ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদের প্রতি আদেশ দিলেন—

স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ॥
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥

(মহাভারত : শান্তি পর্ব)

অর্থাৎ মহাভারতে শান্তি পর্বে আছে—স্ত্রীলোক, শূদ্র জাতি এবং নিন্দিত দ্বিজগণের বেদ পঠনে, শ্রবণে, ও যজ্ঞাদি শ্রেয়স্কর কর্মে অধিকার নেই। সেই সকল লোকের উদ্ধারের জন্য মহামুনি বেদব্যাস কৃপা করে এই মহাভারত তৈরী করেন। ঐ সব নীচ বর্ণের লোকে বেদ পাঠ করলে কি হয়? মনুসংহিতায় অত্রির আদেশ—

বধ্যোঃরাজ্ঞা সবৈশূদ্রো জপহোমপরায়ণ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চৈবজলম্॥

অর্থাৎ—যে শূদ্র বেদপাঠ, জপ ও হোমে নিরত থাকিবে রাজা তাকে বধ করবেন, কেননা জল যেমন অগ্নিকে বিনাশ করে, তেমনি ঐ শূদ্রও রাষ্ট্রকে বিনাশ করে। গৌতম সূত্রে বলে—

অথহাস্য বেদ মুপশৃন্বং তত্র পূজতুভ্যাং—
শ্রোত্র প্রতি পুরণম্ উদাহরণে
জিহ্বাচ্ছেদো, ধারণে শরীর ভেদঃ॥

অর্থাৎ—শূদ্র যদি ইচ্ছাপূর্বক বেদ পাঠ করে, তবে তার জিহ্বা ছেদন করবে; যদি কর্ণে শ্রবণ করে তবে সীসা ও গালা দ্বারা তার কর্ণ ছিদ্র চিরদিনের মত বন্ধ করে দিতে হবে; যদি বেদ বাণী চক্ষে দেখে তবে চোখ তুলে ফেলতে হবে; আর বেদ যদি স্মৃতিতে ধারণ করে, তবে তার শরীর দুই ভাগে কেটে ফেলবে। কত বড় কঠিন শাসন!

এই ব্যবস্থা অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র শম্বুক নামক এক বেদপাঠী শূদ্রের মাথা কেটে ফেলেছিলেন। স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণের ঐ সব অনুশাসনের ভয়ে কোন হিন্দু বেদ পাঠ করেনি। কাজেই বেদে কি লেখা আছে জানেন না।

আর মুসলমান ভাইদের মৌলানা মৌলবীরা হুকুম দিলেন—হে ইস্লাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানগণ! তোমরা কোরাণের ছুরা পাঠ করে নামাজ পড়বে, কি ঐ ছুরার অর্থবাদ চিন্তা করলেই তোমাদের দোজোখে যেতে হবে। সাবধান ছুরার অর্থ করতে যাবেনা। সেই আদেশের ফলে মুসলমানগণ কোরাণের ছুরার অর্থ জানেন না! তাই ঐ সব স্বার্থপর প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনায় প্রতারিত হয়ে হিন্দু মুসলমান আমরা সবাই চোখ থাকতে অন্ধ সেজে বসে আছি।

চোখ খুলে চেয়ে দেখো—বেদে কোরাণে কোন প্রভেদ নেই। বেদে বলে—

ইদংবা অগ্রেণৈব কিঞ্চিদাসীদ্
স দেবঃ সৌম্যঃদেবাগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্—
স বা এষ মহানজ আত্মা—
'জড় মর' মৃত'ভয়ম্—

অর্থাৎ—পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে অন্য কিছু ছিলনা—একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ সেই এক অদ্বৈত ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন—তিনি অজর অমর অর্থাৎ মরেন না, কাউকে মারেননা, নিজে জন্ম ধরেন না, কাউকে জন্মান না, তিনি একমাত্র উপাস্য, তার কোন অংশী নাই বলে তিনি অদ্বৈত।

আবার মুসলমান ভাইসব! আপনাদের কোরাণ শরীফেও ঐ একই কথা বলেছেন। আপনারা একটু—"কুলহু আল্লা" ছুরাটার অর্থ করে দেখুন—

কোলহু আল্লাহু আহাদ—
আল্লাহু সামাদ্ঃ
লাম ইয়ালিদ্, অলাম ইউলাত
অলাম ইয়াকুল্লাহু, কোফওয়ান আহাদ।

খোদাতাল্লা হজরত মহাম্মদকে আদেশ করলেন—"কোলহু"—বলো; কি বলব? "আল্লাহু আহাদ্"—আল্লাতালা এক, না-সরিকালা; "আল্লাহু সামাদ" অর্থাৎ অজ নিত্য; জন্মরহিত, "লাম এলিদ" এলিদ অর্থে সন্তান—তিনি কোন সন্তান জন্মাননা, "অলাম ইউলাদ" কারো দ্বারা জন্মিতও হন না, "অলাম ইয়াকুল্লাহু" একমাত্র খোদা ছাড়া "কোফওয়ান আহাদ" অর্থাৎ আর কোন উপাস্য নেই।

এখন দেখুন তো, বেদ কোরাণে কেমন সামঞ্জস্য? অতএব—

ছাড়ো ধর্ম নিয়ে দলাদলি,
কোরাণে কয় আল্লা হয় আদিম,
বেদে ব্রহ্ম হয় অসীম,
পুরাণে সে জড় মাছ কাছিম।
বেদ কোরাণে নাইকো অমিল,
যেই হরি সেই ছোবাহানা জিল,
আলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল,
হিন্দুর রাম আর মুসলিমের রহিম॥

নকুলেশ্বর পূর্বে রচিত "সাম্যবাদ গানের" এই ফুকারটি বলে গান শেষ করলেন।

কবির আসর থেকে পুলিশের হেফাজতে

আসর ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুলিশগণ নকুলেশ্বরকে বললেন—এখন একবার থানায় চলুন, বড় দারোগা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসবেন। নকুলেশ্বর তাদের সঙ্গে থানায় গেলেন। নকুলেশ্বরকে নিয়ে থানায় যাওয়ামাত্র বড়ো দারোগা পুলিশদের লক্ষ্য করে বললেন—তোমরা গেলে গান বন্ধ করতে, বন্ধ করলেনা কেন? ওখানে যদি একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতো? তাহলে আমি সেই মৌলানা সাহেবকে কি জবাব দিতাম?

সমস্বরে পুলিশরা বলে উঠল—বন্ধ করতে পারলাম না হুজুর! এতো গান নয়, "ওয়াজ" (বন্দনা) করা। যে মৌলানারা আপনার কাছে নালিশ করেছে সে সব মৌলানাদের মুখে এ জীবনেও কোন দিন এমন "ওয়াজ" (বন্দনা) শুনি নাই। এ গান বন্ধ না করে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করলে, আমাদের পাকিস্তানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠবে, পাকিস্তানের উন্নতি হবে। ইনিই সেই প্রচারক—এই বলে নকুলেশ্বরকে দেখিয়ে দিলেন।

দারোগা সাহেব নকুলেশ্বরকে ডেকে কাছে বসিয়ে বললেন—ওদের মুখে যা শুনলাম তাতে আপনার উপরে খুব সন্তুষ্ট হলাম। আপনি একটা কাজ করুন না কেন?

নকুলেশ্বর বললেন—কি কাজ!

দারোগা—আপনি আমাদের পাকিস্তানের প্রচার বিভাগে কাজ করুন না কেন? উপযুক্ত মাইনে পাবেন, সম্মান পাবেন।

নকুল—তাতো যেন পাব, কিন্তু যারা এসব হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতি পছন্দ করে না, তারা যদি আমার অনিষ্ট করে?

দারোগা—সে জন্য আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনার সঙ্গে বডিগার্ড থাকবে, আপনার সঙ্গে রিভলভার থাকবে। ভয় কিসের!

নকুল—আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি।

এই বলে নকুলেশ্বর দারোগা সাহেবকে সেলাম করে চলে এলেন। এখন

আর তার গানে কোন বাধা নিষেধ নেই। গৌরীপুরের কাছাকাছি কিছু দিন এই ভাবে গান চলতে থাকল।

নৌকা থামা, বাদাম নামা—সোনা বন্ধু সোনা মিঞা

১৯৫০-এর আরম্ভ। হঠাৎ সংবাদ এলো যে নোয়াখালীর 'রায়টের' চেয়েও খুব বড় 'রায়ট' আরম্ভ হয়েছে বরিশালে। স্থানীয় গুণ্ডাদের সঙ্গে বিহারী মুসলমানরা যোগ দিয়ে হিন্দু-ধ্বংস অভিযান শুরু করেছে। সংবাদ শুনে নকুলেশ্বর বড় বিচলিত হয়ে পড়লেন। দল বন্ধ করে দেশে যাওয়ার মনস্থ করলেন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁকে নিষেধ করতে লাগলেন—আপনি এসময় বরিশাল রওনা হবেন না, পথে আপনার বিপদ হতে পারে। শুনেছি ষণ্ডা গুণ্ডার দল এক অরাজকতা আরম্ভ করেছে—নদীপথে বেপারী মহাজন যার নৌকা পায়, খুন জখম করে সব লুটপাট করে নিয়ে যায়।

নকুলেশ্বর বললেন—দেশের আত্মীয়-পরিজন যারা আছে তাদেরই যদি মেরে ফেলে তবে আমি বেঁচে থেকে লাভ কি! আমার যেতেই হবে। গৌরীপুর বাজারে সোনা মিঞা নামে একজন বড় কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে নকুলেশ্বরের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি বললেন—একান্তই যদি যেতে হয়, তবে হিন্দু পরিচয় দেবেন না—পথে ঘাটে মুসলমান পরিচয় দেবেন। এই বলে তিনি দলের সব পুরুষদের একটা করে লুঙ্গী ও একটা করে সাদা টুপী এবং মেয়েদের তিন জনের জন্য তিনটা বোরখা দিয়ে বললেন—বন্ধুর এই দান গ্রহণ করুন। খোদার কি মরজি; জানিনা আর দেখা হবে কিনা। খোদার কাছে মোনাজাত করি যেন আপনাদের মঙ্গলে রাখেন—এই বলে সাশ্রু নয়নে নকুলেশ্বরকে বিদায় দিলেন।

বরিশাল অভিমুখে নৌকা চলল—মাঝি মাল্লাসহ সকলের ঐ মুসলমানী পোষাক। বাদাম দিয়ে নৌকা ছুটেছে, সবার প্রাণে আতঙ্ক; কি হয় কি হয়! নৌকার মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই।

নকুলেশ্বরের দলে তখন গায়িকা ছিল চারজন—মানদা, হিরণবালা, কিরণবালা ও শরৎবালা। এরা সবাই বোরখা পরে নিয়েছিল। পুরুষদের মধ্যে দলের ধরতা দোহার ছিল—আচার্যকর্তার দলের সেই সুবল ও বিহারী। তাদের বাড়ী ছিল কুমিল্লায়। দল বরিশাল আসার পথে তারা বাড়ী চলে গেল। নৌকায় রইলেন নকুলেশ্বর স্বয়ং, ঢুলি হরিচরণ, হারমোনিবাদক

অশ্বিনী শীল, আর তিন জন মাঝি—তাদের নাম শিশু মণ্ডল, বাহেরালী ওরফে কালাচাঁদ এবং নকুলেশ্বরের বাড়ীর পাশের ইঞ্চি হাওলাদার—সে বারোমাস নৌকা-রক্ষক হিসেবে নৌকায় থাকত।

মোট এই নয়টি প্রাণী প্রাণ হাতে করে বরিশাল অভিমুখে মেঘনার বুক চিরে অগ্রসর হলো। মাঝি মাল্লা সহ সকলের ঐ মুসলমানী পোষাক। বাদাম দিয়ে নৌকা ছুটেছে। আশে পাশে অন্য নৌকা দেখলেই বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে। নৌকা পাশ কেটে গেলে একটু স্বস্তি। নৌকার মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই। যে নকুলেশ্বরের পান্‌সী নৌকা সর্বদা গানবাজনার শব্দে থাকত আনন্দ কোলাহলে মুখরিত, সেই নোকা আজ নিস্প্রাণ নিস্পন্দ। নৌকা থেকে তাঁর বিজয় কেতন "বীণাপাণি কবি পার্টি" নামাঙ্কিত বোর্ড সরিয়ে "সার্কেল অফিসার" নামাঙ্কিত ভূয়া বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হোল।

বারো আনা পথ কেটে গেল। কোন বিপদের চিহ্ন নেই। প্রায় বরিশাল জেলার কাছাকাছি ফরিদপুর বরিশালের বর্ডারে নৌকা এসেছে। বেলা ১০টা। এমন সময় দেখা গেল, পনের বিশ খানা ডিঙ্গি ছিপ্ নৌকা—এক এক নৌকায় বিশ পঁচিশ জন করে লোক—ল্যাজা, সড়্কী, রামদাও ইত্যাদি হাতে নিয়ে নকুলেশ্বরের নৌকা ঘিরে ফেলে হাঁক্ দিচ্ছে—নৌকা থামা বাদাম নামা—ইত্যাদি কোলাহল।

নকুলেশ্বর মাঝিদের বললেন—সাহস করে তোরাও একটু জোরে জোরে বল—কেন রে, নৌকা থামাব কেন রে? এটা সার্কেল অফিসারের নৌকা। বরিশাল কোর্টে যেতে হবে, এখন সময় নাই। মাঝিরা এবং দলের লুঙ্গীপরা পুরুষ কয়জন একত্র হয়ে ঐ কথা বলে খুব জোরে জোরে উত্তর দিচ্ছে।

গুণ্ডারা বলে—কেমন সারকেল্ অফিসার আমরা দেখব। ভাগ্য ভালো ছিল, নৌকাগুলি ত্রিশ চল্লিশ হাত তফাতে ছিল।

নকুলেশ্বর ভাবলেন—ওরা যদি নৌকার পার্শ্বে এসে নৌকায় উঠে পড়ে তখন তো আর করণীয় কিছু থাক্‌বেনা; আগেই বাধা দেওয়া দরকার। এই ভেবে নকুলেশ্বর একটা ভালো জামা গায় দিয়ে গুলীর বাক্স ও বন্দুক নিয়ে লাফ দিয়ে ছাদের উপরে উঠে সেই ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন, এবং বন্দুকে গুলী ভরে বললেন—আয়, সারকেল্ অফিসার দেখবিতো আয় শালারা! মগের মুল্লুক পেয়েছিস্? এই বলে দুম্ দাম্ করে ২।৩ টা ফাঁকা আওয়াজ করামাত্র—পাখীর চকে ঢিল পড়ার মতো ওরা সব ছুট্ ছাট্ চারদিকে পালিয়ে গেল। নকুলেশ্বর

ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে খালের মধ্যে ঢুকে বললেন—যাও, ফাঁড়া কেটে গেছে।

খালের মধ্য দিয়ে যত অগ্রসর হচ্ছেন ততই রায়টের বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ছে। হিন্দুর গ্রাম বলতে কোন চিহ্ন নেই। শুধু ভস্মের স্তূপ। এমন ভাবে আগুনে পুড়িয়েছে যে তাল নারিকেল গাছের মাথা পর্যন্ত পুড়ে গেছে।

খালের দুই ধারে ঝাড় জঙ্গলে খালের জলে অসংখ্য মরা মানুষ ভেসে যাচ্ছে। এইসব দৃশ্য দেখে নকুলেশ্বরের চোখে জল এলো—হায় ভগবান! একি প্রলয় দৃশ্য দেখালে? দু'তিন মাস আগে এই খাল দিয়ে যখন ঢাকা, ত্রিপুরা যাচ্ছিলেন তখন প্রত্যেকটা বাড়ী ধনে জনে শিশুর কলকোলাহলে পূর্ণ; আজ সব বাড়ীতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা!

নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবছেন—আমাদের গ্রামেও কেউ বোধ হয় বেঁচে নেই। কালিজিরা নদীতে পড়ে বাড়ীর দিকে যত এগুচ্ছেন ততই যেন তাঁর হাত পা অবশ হয়ে আসছে। এই নদীর পাড়েই তাঁর বাড়ী! নদীর ঘাট হতে রসি দুই তফাত।

গৃহ না শ্মশান—কলকাতায় আশ্রয়ের সন্ধানে

বাড়ীর ঘাটে গিয়ে নকুলেশ্বর মাঝিদের বললেন—নৌকা ঘাটে ভিড়িও না; মাঝ গাঙ্গে নোঙ্গর কর। নকুলেশ্বরের নৌকা দেখে গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর মুসলমান নদীর কূলে এসে ডাকলেন—সরকার মহাশয়, মাঝ গাঙ্গে নৌকা বাঁধলেন কেন? কিনারে আসুন। আপনার কোন ভয় নেই। আমাদের এখানে 'রায়ট' হয়েছে বটে, কিন্তু কাটাকাটি হয় নাই। আসুন—নেমে বাড়ী যান।

নকুলেশ্বর বললেন—বাড়ী যাব—বাড়ী কি আছে?

মাতব্বররা বললেন—আছে আছে; গ্রামের অন্যান্য বাড়ী ঘর পুড়ে দিয়েছে। আপনার জারিগানের 'বয়াতি' শিষ্যেরা আপনার ঘরে আগুন দিতে দেয় নাই, যান বাড়ী যান। নকুলেশ্বর ঘাটে নৌকা এনে ছুটে বাড়ী গেলেন। গিয়ে দেখেন বাড়ীতো নয় যেন শ্মশান। ঘরখানা মাত্র সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে চাল বেড়া ছাড়া আর কিছুই নেই; এমন কি ঘর কুড়ানো ঝাঁটা গাছাটা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। অন্যান্য কোন বাড়ীতে ঘরের চিহ্নও নেই—সব পুড়ে ছাই

করে গিয়েছে। নকুলেশ্বরের স্ত্রী-পুত্র পরিজন সব কেউ বনজঙ্গলে, কেউ মুসলমান বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে কোন প্রকারে বেঁচে আছে।

নকুলেশ্বর বাড়ী এসেছে সংবাদ পেয়ে সকলে এসে জড়ো হয়ে কান্নাকাটি সুরু করে দিল। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। ওদিকে গ্রামের মাতব্বর মুসলমানরাও এসে নানারকম সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারা বললেন—পশুর দলেরা যা করেছে, খুব অন্যায় করেছে। আপনি গ্রামের সকলকে বলুন, কেউ যেন সরকারী ক্যাম্পে না যায়। আমরা লুটের মাল ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করব।

প্রকাশ্যে নকুলেশ্বর বললেন—আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করুন। কিন্তু মনে মনে বললেন—কি বিশ্বাসঘাতকতা, কি অকৃতজ্ঞতা! এদের অসাধ্য কর্ম কি আছে? যাদের পূজা-পার্বণ আনন্দ উৎসবে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছি, বাবার শ্রাদ্ধে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি, আমার বাড়ীর দরজায় রান্না করে তারা খেয়ে গেছে। আজ তাদেরই এই কাজ? আর ওদের কথায় বিশ্বাস করব না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বললেন না।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা মাতব্বর মিঞারা এসে বসতেন। আর সামান্য কিছু লুট করা মাল—ভাঙ্গা পিঁড়ি, টুটা থালা এনে ফেরৎ দিতেন। ইস্‌লামী রাষ্ট্রে "জিম্মি"র অবস্থা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল।

দু'চার দিন এভাবে চলার পর নকুলেশ্বর মাঝিমাল্লা ছাড়া আর সকলকে বিদায় দিলেন। কারো কাছে কিছু না বলে একদিন কলকাতা রওনা হলেন। কিন্তু সে কি এক অস্বস্তিকর অবস্থা! স্টীমারে ট্রেনে সূঁচ ফোটাবার জায়গা নেই। লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়ের জন্য একবস্ত্রে ছুটেছে। জনস্রোতের ঢেউ যেন পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। প্রাণ-ভয়ে ভীত মানুষের চেহারা কি ভীষণ হতে পারে—তিনি সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলেন। আর তাদের মধ্যেই দেখলেন তাঁর কবিগানের পরমভক্ত—মণ্ডল-বিশ্বাস-হাওলাদার-দে-দত্ত-দাস-ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্র-মজুমদার-সিংহ-পাল-ভট্ট-সাহা-বণিক - কুণ্ডু - মুখার্জী - ব্যানার্জী-চক্রবর্তী-ভট্টাচার্য-নাথ-শীল ধুপী-গুপ্ত-সেন-রায়-চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিধারী পূর্ববঙ্গের কবিরসিক শ্রোতাদের ধনমান-জীবনহারা অসহায় মলিন মুখ। সাত পুরুষের সোনার ভিটা ছেড়ে অনিশ্চিত অন্ধকারে তাদের পদক্ষেপ।

নকুলেশ্বর ও নারায়ণের সাক্ষাৎ—'কবি'র পুনর্বাসন পরিকল্পনা

নকুলেশ্বর অতিকষ্টে শিয়ালদহ এসে পৌঁছলেন। প্ল্যাটফরম্ হতে বের হওয়ামাত্র দেখা হলো ফরিদপুরের গোহালা নিবাসী শ্রীনারায়ণচন্দ্র বালা কবির সরকারের সঙ্গে। তিনিও সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়ের জন্য এসেছেন। নকুলেশ্বরকে পেয়ে নারায়ণবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক সুখ দুঃখের কথা হলো। নারায়ণ সরকার বললেন—দাদা, আপনিও যখন পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, তখন আর চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি কি স্থির করেছেন? সরকারী ক্যাম্পে ভর্তি হবেন?

নকুলেশ্বর—ভাইটি নারায়ণ, তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন আর ক্যাম্পে গিয়ে বসে বসে সরকারী অর্থের অপচয় করে লাভ কি? খোঁজ খবর করে যদি কয়েকজন বাস্তুহারা গায়ক-গায়িকা সংগ্রহ করা যায়, তবে আমাদের গুরু-দত্ত যে পুঁজি আছে তার সদ্ব্যবহার করে কোন প্রকারে বেঁচে থাকার চেষ্টাই আমার ইচ্ছা। তোমার তো অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে। ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লার বড় বড় ধনী মহাজন এবং সমৃদ্ধিশালী লোক পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে এসে স্থান করে নিয়েছে। আমাদের আগমনবার্তা যদি তারা জানেন, তবে এদেশেও আমাদের গান চলতে পারে।

নারায়ণ সরকার পরম উৎসাহিত হয়ে বললেন—আপনাকে যদি পাই তবে আমাদের গানের অভাব হবে না। আমি আজই চেষ্টায় নামবো। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ঐসব দোহারপত্র খোঁজ করা এবং বায়না সংগ্রহ করার ভার আমি নিলাম।

নকুলেশ্বর দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটে ঝালকাঠির এক পরিচিত বন্ধুর বাসায় উঠলেন। তাঁর সঙ্গে আছে দলের পরিচালিকা কিরণবালা।

এদিকে দু'তিন দিন পর নারায়ণ সরকার হাসিমুখে এসে বললেন—দাদা, আমি পনের ষোল পালা গানের আলাপ নিয়ে এসেছি। এসব মহাজন ব্যবসায়ীদের গান। প্রত্যেক মার্কেটে মার্কেটে আসর হবে। আপনার নাম শুনলে আরো অনেকেই গান দেবে। আমাদের বায়নার অভাব হবে না। আপনি দেশে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসুন। আমি বায়নার সন্ধানে থাকলাম।

ঝড়ে বাসাভাঙ্গা পাখীর মতো এই 'রায়টে' অনেক গায়ক-গায়িকা বিভিন্নস্থানে সরকারী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। নারায়ণ সরকার খোঁজ করে বেশ কয়েকজন জানাশোনা গায়ক-গায়িকা সংগ্রহ করলেন। শরৎবালা, বকুলবালা, মানদা ওরফে ভুতি; আর নকুলেশ্বরের দলে আছে দু'জন—হিরণবালা ও কিরণবালা।

এই পাঁচজন গায়িকা এবং হরনাথ শীল, রাম নট্ট, অনন্ত নট্ট, শরৎ নট্ট, নিকুঞ্জ নট্ট—এই পাঁচজন ভাল গায়ক এবং ঢুলী বসন্ত নট্ট, হারমোনিয়াম বাদক নেপাল নন্দীকে পাওয়া গেল। নকুলেশ্বর ১৯নং চন্দ্র সুর লেনে একটা ঘরভাড়া করে বরিশাল চলে গেলেন।

সোনার বাংলা তোমায় শেষ নমস্কার –

ছোট ভাই রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করতে চাও, এদেশে তো কবিগানের আসর ভেঙ্গে গেল। এমন কোন কাজও শিখিনি যে তার দ্বারা বাকী জীবন কাটাব। আমি তো কলকাতায় কিছু বায়নার ব্যবস্থা করে এসেছি। দু'এক দিনের মধ্যেই আমাকে কলকাতা যেতে হবে।

রোহিণীবাবু বললেন—আমি বাপ-মায়ের ভিটা ছেড়ে যাব না। মরি বাঁচি এখানেই থাকবো। আপনার যদি যেতে হয় যান—তবে এদেশের অবস্থা চিরদিন এ রকম থাকবেনা। ভাল হবে। তখন আবার ফিরে আসতে পারবেন। আমিও যদি আপনার সঙ্গে যাই; তবে বাড়ীঘর জমিজমা কিছু থাকবেনা। সব হাতছাড়া হয়ে যাবে। তখন আবার দেশে আসবার ইচ্ছে হলেও পারবেন না।

নকুলেশ্বর আর কিছু না বলে বন্দুকটি নিয়ে বরিশাল গেলেন। লাইসেন্স-সহ ত্রিশ বৎসরের সাথী বন্দুকটি কোতোয়ালী থানায় জমা দিয়ে বাড়ী এসে কলকাতা যাবার আযোজন করলেন। আর সাহেবের আবাদে সেই পরমবন্ধু দেবনাথ মোড়লের কাছে একখানা চিঠি লিখলেন—

"বন্ধু! আমার দেশের অবস্থা হয়তো লোকমুখে সবই শুনেছেন। ভবিষ্যতে আরও কি হবে তার ঠিক নেই। অতএব আমি এদেশের মায়া ত্যাগ করে পরিজন সহ কলকাতায় চলিলাম। আপনার দেওয়া আমার সেই জীবন-তরণীখানি আবার আপনার ঘাটেই ফেরৎ পাঠালাম। যদি কোনদিন ফিরে আসি তখন আবার প্রয়োজন হবে। যদি না আসি, আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন। জীবনে আর দেখা হবে কিনা ভগবান জানেন! আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—"

এই পত্রখানা মাঝিদের হাতে দিয়ে বললেন—যাও ভাই সব, নৌকা নিয়ে সাহেবের আবাদে গিয়ে—এই পত্র ও নৌকা দেবনাথ বাবুর কাছে পৌছিয়ে দিও। এই বলে নৌকার উদ্দেশ্যে শেষ নমস্কার করে তাঁর সখের জীবন তরণীকে শেষ বিদায় দিলেন। ছয় ঋতু বারোমাস তেত্রিশ বছর যার কোল ছাড়া

হননি, আস্তে আস্তে তা নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর স্থলের আশ্রয় জলের আশ্রয় দুই-ই গেল।

পাকিস্তানের দানা পানি শেষ

পরের দিন সামান্য কিছু ব্যবহারের জিনিষ ও হারমোনিয়মটি নিয়ে কলকাতা চলে এলেন। সঙ্গে অন্যান্য যে সব সর্বহারা যাত্রী দল এসেছিল, সবাই বনগ্রাম এসে সরকারী ক্যাম্পে ভর্তি হলেন। বাংলা ১৩৫০-এর মন্বন্তর আর ইংরেজী, ১৯৫০-এর দেশান্তর বাঙ্গালী জাতির কাপুরুষতা ও পৈশাচিকতার অমর সাক্ষী হয়ে র'ল।

নকুলেশ্বর বনগ্রাম না নেমে শিয়ালদহ এসে নামলেন। তার মনের উদ্দেশ্য এই—আমি যখন পনের বিশ পালা গানের বায়না পেয়েছি, আশা করি গান গাইতে আরম্ভ করলে বায়নার অভাব হবে না। নিজের ক্ষমতায় যদি কোন প্রকারে চলতে পারি তবে আর সরকারের গলগ্রহ হ'য়ে থাকব না। মানুষের চিরদিন তো সমান থাকে না, সেজন্য দুঃখ করে লাভ কি। দেখি ভাগ্যে আরও কি আছে!

এই ভেবে নকুলেশ্বর স্বজনসহ এসে সিমলা চন্দ্র সুর লেনের সেই ভাড়া-করা ঘরে উঠলেন। মুক্ত বিহঙ্গ যেন লোহার খাঁচায় আবদ্ধ হলো। তখন তাঁর অন্তরের অবস্থা এক অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন কেউ জানে না—তিনি স্মরণ করলেন সেই কবিতাটি—"ভাঙ্গাগড়া নিয়ে বিধাতার খেলা..."

পশ্চিমবঙ্গে গান—প্রথম দক্ষিণা

কলকাতায় এসে তাঁর এক পরিচিত বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বরানগরে এক কনট্রাকটরের সঙ্গে কাজ করতেন। কনট্রাকটর বাবুর মা পূর্ববঙ্গের মেয়ে—কবিগানের খুব ভক্ত ছিলেন। বন্ধু সুরেন সেনের কাছে নকুলেশ্বরের নাম শুনে তাঁর মুখে একটু পাঁচালী শুনতে চান। নকুলেশ্বর দু'তিন জন লোক নিয়ে একদিন ঘণ্টাখানেক "পাণ্ডব বনবাসের" উপর ঘণ্টাখানেক পাঁচালী শুটিয়ে আসেন। গান শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর ভদ্রমহিলা নকুলেশ্বরের হাতে ষাটটি টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন—বাবা তোমার গুণের মূল্য দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আমি ব্রাহ্মণ; আশীর্বাদ স্বরূপ এই সামান্য টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করছি—পূর্ববঙ্গের মতো এই পশ্চিমবঙ্গেও স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হও।

ইতিমধ্যে নারায়ণ সরকার কলকাতার মার্কেটে মার্কেটে পূর্ববঙ্গের বড় বড় মহাজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক বায়না সংগ্রহ করলেন। চন্দ্র সুর লেনের বাসায় গদীঘর করে, হ্যাণ্ড বিল, এগ্রিমেন্ট খাতা ছাপিয়ে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং পূর্বোক্ত গায়ক গায়িকাদের নিয়ে দল গঠন হলো। নারায়ণ সরকারকে বিপক্ষ করে দুই দল করে গান শুরু হলো। ভাড়াবাড়ীতে পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা কবিগানের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হলো। কলকাতা থেকে বিতাড়িত-কবিগান আবার কলকাতার বুকে বাসা বাঁধল।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম গান—বৈঠকখানা মার্কেটে

প্রথম বায়না হলো শিয়ালদহ বৈঠকখানা মার্কেটে। মণিমোহন দে নামে এক ফার্নিচার ব্যবসায়ী বায়না করলেন। পশ্চিমবঙ্গে আবার ঢোল কাঁসি বেজে উঠল—নকুলেশ্বর ও নারায়ণ সরকারের হাতে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের কবিগানের প্রতিষ্ঠা হলো। নকুলেশ্বর গাইলেন—

গেল বঙ্গভঙ্গের প্রথম দৃশ্য,
স্বার্থপরের যে উদ্দেশ্য,
হয়েছে সে রহস্য প্রচার॥
দেশের কাঙ্গালী বাঙ্গালী যত জুটে এস সব,
বাঙ্গালীর সে লুপ্ত গৌরব,
সুপ্ত সিংহ জাগাতে আবার॥
আগে স্বাধীনতা লাভের তরে—
বঙ্গবাসী অকাতরে, তুচ্ছ করে নিজের প্রাণ,
করে আত্ম বলিদান
তারা কেউবা অনশনে ম'ল, কেউবা কারাবন্দী হ'ল,
ফাঁসীকাষ্ঠে গেয়ে গেল, কেহ জীবনের জয়গান॥
প্রথম স্বরাজ নিতে নিশান হাতে—
এই বাঙ্গালী হয়ে অগ্রণী, তেজে কাঁপায় মেদিনী;
বলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি।
নষ্ট করতে ব্রিটিশ শাসন, সত্যাগ্রহ আর অনশন,
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন,—সে বাঙ্গালীর অমর কাহিনী॥
এখন বাঙ্গালীর সে শৌর্য্য বীর্য লুপ্ত হলো কিসে—
সবে ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্র বেশে, নির্বাণ অগ্নি আবার জ্বালো।
বাস্তহারা হলেম বলে, কাজ কি ভেসে নয়ন জলে,
বাহুবলে জ্বালাও কর্মের আলো॥

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবরুদ্ধ কান্না রূপ পেয়েছে কবির এই কয়টি ছত্রে—

মোদের সোনার বাংলা জংলা হলো—
কোন্ বিধাতার কোন্ বিধানে।
তাইতে হিন্দু মুসলিম হয়েছি ভাগ
শয়তানের ডাক শুনে কানে॥
স্বাধীন হয়ে শাস্তি কত, কাঙ্গালী বাঙ্গালী যত,
সোনার বাংলা পরিণত, হল শ্মশানে॥
পাকিস্তানে নির্যাতিত, পূর্ববঙ্গের হিন্দু যত,
হিন্দুস্থানে সমাগত, পড়িয়ে বিষম নিদানে॥
স্বাধীনতার ফলে বুঝি, বাঙ্গালী আজ রিফিউজী,
হারায়ে সর্বস্ব পুঁজি, রয় অনশনে॥
শরণার্থী করতে পোষণ, নাম করিয়ে পুনর্বাসন,
চিরতরে দেয় নির্বাসন, দণ্ডক বন আর আন্দামানে॥

উক্ত আসরে শ্রীনারায়ণ সরকার নকুলেশ্বরের বিপক্ষে টপ্পা করলেন—

আমি কল্পনায় সনাতন হয়ে দিলেম পরিচয়।
আমার জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল শ্রীরূপ,
শিষ্য হয় দেখে বিশ্বরূপ,
আমি হতে পারি নাই সে রূপ—দেও হে পদাশ্রয়॥
বল আমি কে, আমাকে কেন—
সংসারে জারিতেছে তাপত্রয়;
কোথা হতে এসেছি, কোথা যাব—বল দয়াময়।
আবার হরণ করতে ধরার ভার,
যুগে যুগে অবতার, কৃষ্ণ হয় নন্দেরি তনয়।
ইহার কেবা আসল কেবা নকল,
কাহারে সাধিলে যাবে ভব ভয়?

নকুলেশ্বর জবাব করলেন—

তুমি কল্পনাতে নাম ধরেছ গোসাঁই সনাতন।
ভেবে সংসারে সব অনিত্য—
জানতে চাও প্রেমভক্তি তত্ত্ব,
পাবে দেহ হলে নিত্য, সত্য সনাতন॥

বললে, আমি কে, আমাকে কেন—
সংসারে জারিতেছে তাপত্রয় ?
সাধ্য বিনে বদ্ধ জীব এ সংসার দেখে মায়ানয় ।
যিনি হরণ করেন ধরার ভার, যুগে যুগে অবতার,
সে কৃষ্ণ আসল কৃষ্ণ নয় ।
যদি মর্ম বুঝে কর্ম করে,
শেষকালে যেতে হয় না যমালয় ॥

তারপর থেকে কলিকাতায় এমন কোন মার্কেট নেই, যেখানে তাঁরা কবিগান না গেয়েছেন। ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও কবিগানের সুর-বিস্তার ঘটতে লাগল। বিহারের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জামসেদপুর, দুমকা ইত্যাদি স্থানেও তাঁরা গান গেয়েছেন। সে সময় নকুলেশ্বর ও নারায়ণ সরকার ভিন্ন অন্য কোন কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে আসেন নি। বরিশালের শ্রীহরিনাথ সরকার এলেও তাঁর কোন নিজস্ব দল ছিল না। তাই নারায়ণ সরকারকে নিয়েই গান চলতে লাগল। এদেশেও কবিগানের বহু গুণগ্রাহী জুটলেন। সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন (এম.এ.পি.এইচ.ডি) যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আনন্দবাজার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার ও শ্রীপরিমল চন্দ্র—প্রত্যেকেই পূর্ববঙ্গের কবিগানের বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে উঠে ছিলেন এবং প্রচারে আন্তরিক সাহায্য করেছেন

পূর্ববঙ্গের মতো কোন বাঁধা ধরা আসর অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে তেমন গড়ে উঠেনি। এখানে কবিগান দেওয়া একটা খেয়াল খুসীর ব্যাপার। পূর্ববঙ্গে কবিগান ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বিভিন্ন পূজা উপলক্ষে কবিগানের ব্যবস্থা না করলে পূজার অঙ্গহানি হতো বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল। শত শত স্থায়ী কবির আসর গড়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে সে রীতি চালু আছে। যেমন—

১। দুর্গাপূজায়—লিলুয়া ভট্টনগর কলোনীতে রমেশ মজুমদারের বাড়ী।
২। লক্ষ্মীপূজায়—গুপ্তিপাড়া ঢাকা কলোনী।
৩। কালীপূজায়—বাটানগর-নিউল্যাণ্ড।
৪। জগদ্ধাত্রী ও কালীপূজায়—বেলঘরিয়া দেশপ্রিয়নগর বাজার।
৫। কালীপূজায়—পলতা শান্তিনগর কলোনী।

৬। রাসে—বেলঘরিয়া নিমতা, বৃন্দাবন কর্মকারের বাড়ী।

৭। নবদ্বীপ তাঁতী বাজার—ইত্যাদি স্থানগুলি বর্তমানে বাৎসরিক কবিগানের অন্যতম কেন্দ্র।

বাটানগরে কবিগান—নারায়ণ সরকার বনাম নকুলেশ্বর

বাটানগর শিল্প নগরী পূর্ববঙ্গের সকল জেলার লোকে পরিপূর্ণ। পূর্ববঙ্গাগত বাঙ্গালীদের এমন একত্র সমাবেশ অন্যত্র বিরলদৃষ্ট। এখানে ১৯৫১ সাল থেকেই কবিগান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কারণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গে অনেকের বাড়ীতে বা গ্রামে দেশভাগের আগে নিয়মিত কবিগান অনুষ্ঠিত হতো। ফলে বাটানগর কবি-রসিক শ্রোতায় পূর্ণ। প্রথম বৎসরের গানও নকুলেশ্বর ও নারায়ণ সরকারকে নিয়েই সূত্রপাত। সেবার নারায়ণ সরকার 'সারদা দেবীর' ভূমিকা নিয়ে নকুলেশ্বরকে 'রামকৃষ্ণ' কল্পনা করে টপ্পা করেছিলেন—

আমি কল্পনায় সারদা সতী তোমার প্রত্যাশী।
তুমি রামকৃষ্ণ পরমহংস, ভেদ জ্ঞান করেছ ধ্বংস,
নাকি ব্রহ্মতত্ত্বের সারাংশ, পেয়েছ আসি॥
আমায় বিয়ে করে এনে ঘরে—
পালিয়ে এলে দক্ষিণেশ্বরে,
আমার এ যৌবনের ভার, সমর্পণ করেছ কারে॥
যারা কামিনী কাঞ্চন না চায়,
বিয়ে করে কি আশায়,
নারীকে বঞ্চনা করে।
যারা ভোগের মাঝে ত্যাগী সাজে
তারা কি পায়না পরম ঈশ্বরে?

টপ্পার জবাবে নকুলেশ্বর গাইলেন—

আমার প্রেমদা সারদা এলে দক্ষিণেশ্বরে।
লোকে পরমহংস আমায় কয়,
প্রকৃত 'হংস' আমি নয়,
যারা নীর থেকে ক্ষীর বেছে লয়, হংস কয় তারে॥
আমি ত্যাগ করিয়ে কামিনী কাঞ্চন—
কি জন্য এলেম দক্ষিণেশ্বরে;

ত্যাগ অর্থে আত্ম সংযম—
এই নিয়ম শিখাই সবারে।
জীবের ত্যাগে শান্তি ভোগে দুখ,
পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চসুখ, সমর্পণ করে ঈশ্বরে।
যদি কামিনী কাঞ্চনকে ত্যজে—
সহজে পায় সে অবিনশ্বরে॥

বিচিত্র পথে—মাটির কাছাকাছি

নকুলেশ্বর নিজের চিরানুচরিত নিয়মানুসারে গান করতে লাগলেন। পূর্ববঙ্গে যে হিন্দু মুসলমানের একতার জন্য নকুলেশ্বর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন—যে মুসলমানের দ্বারা তিনি সর্বস্বান্ত, পশ্চিমবঙ্গে এসে আবার সেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। এ লড়াই কোন লাঠিসোটা নিয়ে নয়—শুধু তাঁর কবিগানের মাধ্যমে। যেমন—

মোদের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
কেহ নাই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট
এক মায়ের ছেলে সবাই,
মোদের ছোট বড় নাই।
এই ভারতের অধিবাসী,
কুলী মজুর ক্ষেতের চাষী
হরিজন আর আদিবাসী
সকলি আমাদের ভাই॥

আবার লিখলেন—

যখন রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ, সবার লক্ষ্য হবে এক সমান।
আমরা এক জাতি এক প্রাণ,
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টান।
সব জাতি একত্রে মিলে,
ভাই'এ ধর ভাই'-এর গলে,
ত্রিবর্ণ পতাকা তলে, সবে মিলে কর আত্মদান॥

লোকে কথায় বলে যে—"স্বভাব যাদৃষী যস্য নঃ জায়তে, কদাচন।" নকুলেশ্বরের অবস্থাও তাই। পশ্চিমবঙ্গে এসে দেখলেন স্বাধীনতালাভের পরে ভারতে শিক্ষার প্রসার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষিত যুবকদের চাকুরী প্রবণতাও

ততই বাড়ছে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নকুলেশ্বর তখন কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে শিক্ষিত যুবকদের মনে প্রেরণা জাগাবার জন্য লিখলেন—

এ দেশে এসেছে ভাই নবজাগরণ।
গড়তে হবে মোদের স্বাধীন জীবন ॥

ভুলে গিয়ে ঘৃণালাজ
সাজিয়ে কর্মীর সাজ
করিব দেশের কাজ
সকলে মিলিয়া।
মূর্খ কি বিদ্বান চাষী
সবে হয়ে পাশাপাশি
মনের কালিমা রাশি
ফেলিব ক্ষলিয়া ॥

পাশ করে এম-এ বি-এ
সরকারী অফিসে গিয়ে
কার্য কি কেরানী হ'য়ে
ছোট করে মন।
গণ্ডিবদ্ধ বিদ্যা নিয়ে
খোলা পল্লীর মাঠে গিয়ে
কর না বিলায়ে দিয়ে
পল্লী-উন্নয়ন ॥

ভারতে ফলাতে সোনা
কৃষি শিল্প গবেষণা
উন্নয়ণ পরিকল্পনা
তোমরা জান ভালো।
চাষীর মাঝে অল্প অল্প ;
বলে আর্য যুগের গল্প ;
শিক্ষা দিয়ে কুটীর শিল্প,
জ্বালাও জ্ঞানের আলো ॥

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি,
অন্নগত জীবের প্রাণী,
অন্ন বিনে জ্ঞান বিজ্ঞানী, সবাই জ্যান্তে মড়া।
সেই অন্ন উৎপাদন করতে,
আগে হবে পল্লী গড়তে,
চাষীর সনে লাঙ্গল ধরতে, ভয় করব না মোরা ॥
জনক রাজা চাষী ছিলেন,
যজ্ঞভূমি চাষ করিলেন,
জনকের লাঙ্গলের ফালে, সীতার জন্ম হয়।
নন্দরাজা চাষী ছিল,
কৃষি গো রক্ষা করিল,
চাষীর ঘরে জন্ম নিল, কৃষ্ণ দয়াময় ॥
চাষী কভু নয়কো ঘৃণ্য,
দেশ বাঁচে এই চাষীর জন্য,
দশের মুখের গ্রাসের অন্ন, যোগায় চাষী দল।
চাষীর ডাকে দিয়ে সাড়া,
শিক্ষিত বেকার যারা—
ভারতে ফলাও গে তারা, সোনালী ফসল ॥
আধুনিক সব যন্ত্রপাতি,
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি,
সমবায় কৃষি সমিতি, করে সংগঠন।
বৈজ্ঞানিক সব চাষের প্রথা,
শিক্ষা দিয়ে যথা তথা,
খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা, করগে অর্জন ॥
জ্ঞান বিজ্ঞানী যত ব্যক্তি,
জ্ঞানীর জ্ঞান আর কবির উক্তি,
সকল শক্তির অভিব্যক্তি, যে পল্লী অঞ্চলে।
সেই পল্লীতে কুঠি বাঁধি,
চাষীর সনে মিশে কাঁদি,
নকুল বলে তবে যদি, স্বাধীন জীবন মিলে ॥

গণতন্ত্রী রাষ্ট্রকে বিপন্ন করবার জন্য তখন ধনিক বণিক মজুতদার এবং চোরাকারবারীরা জনগণের মনে একটা হতাশার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল, নকুলেশ্বর তাদের বিরুদ্ধে জনগণের উদ্দেশ্যে লিখলেন—

স্বাধীন তো নয়রে গাছের ফল।
ঝাঁকি দিলে তলায় পড়ে—
নয় এত সরল॥
স্বাধীন নয় মুড়ির মোয়া,
চাহিলে যায় না পাওয়া,
প্রাপ্য ধন কেড়ে লওয়া, বুকে রাখ বল॥
ভিক্ষাতে ফল না পাবি,
জনগন ঐক্য হবি,
জানাতে ন্যায্য দাবী, বুক ফুলিয়ে চল॥
এ রাষ্ট্র গণতন্ত্র,
সাম্যবাদ মহামন্ত্র,
ধনিকের ধনতন্ত্র, করো রসাতল॥
ভারতের জন স্বার্থে,
দুর্নীতি দমনার্থে,
যদি হয় প্রাণে মরতে, তবু রও অটল॥
যত সব মজুতদারে,
দেশের মাল মজুত করে,
বেচতেছে চোরা দরে, মানুষমারা কল॥
মজুত মাল এনে লুটে;
সবে নেও সমান বেঁটে,
নকুল বলে এসো জুটে, দেশের তরুণ দল॥

শহরমুখী জনতাকে পল্লীমুখী করতে নকুলেশ্বর গাইলেন—

ভাইরে, জাগা'তে হইলে দেশ।
ছেড়ে দলাদলি, করো কোলাকুলি,
ভুলে গিয়ে হিংসা দ্বেষ॥
উচ্চ শিক্ষা পেয়ে দেশ গিয়েছি ভুলি—
বাপকে কই না বাবা 'ও মাই ফাদার' বলি,

মাকে বলি 'মাদার' লইনা পদধূলি ;
হীনতা দীনতা শেষ ॥
যে পল্লী অঞ্চলে জন্ম ধরিলাম,
যাইনা পল্লী বাসে ব'লে গণ্ডগ্রাম,
গাইনা পল্লীগীতি, লইনা চাষীর নাম,
সুশিক্ষা পেয়েছি বেশ।
শহীদ ক্ষুদিরাম চিত্তরঞ্জন দাস,
অরবিন্দ আদি নেতাজী সুভাষ,
যে সিন্ধুতে এসব ইন্দু পরকাশ,
সে পল্লীর মলিন বেশ।
যত পারিজাত ভারত ভুবনে,
সবে জন্মেছিল পল্লীর নন্দনে,
নকুল বলে সাম্য মৈত্রীর বন্ধনে।
বিভেদ ভুলিবে দেশ ॥

যে কংগ্রেসের জন্য পাঁচ বৎসর নকুলেশ্বর তাঁর জীবিকা কবিগান নিষিদ্ধ করার শাস্তি ভোগ করেছেন, সেই কংগ্রেস শাসনের নানা দোষক্রটি নিয়েও তিনি অনেক মালসীগান রচনা করেছেন—

(১) নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ,
স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ
পরামর্শ ছিল বহুকাল।
দেখি স্বাধীনতা লাভের পরে,
মহাত্মার মাহাত্ম্য ছেড়ে,
ঢুকল কংগ্রেসের ভিতরে,
দুরন্ত ভেজাল ॥

(২) এবার কঠোর হস্তে করতে হবে দুর্নীতি দমন।
যত মজুতদার চোরাকারবারী
দেশের কাল শমন ॥
দেশের যত মজুতদারে, দেশের মাল সব মজুত করে,
বেচতেছে তাই চোরা দরে, দরিদ্রের মরণ।
তাদের গুদাম খুঁজে বাহির কর দেশের জনগণ ॥

(৩) যত কৃপণ ধনী সুদখোরের দল,
দরিদ্রেরে চুরির কৌশল তারাই শিখায়।
যদি ধনীরা দেয় অন্নসত্র দরিদ্র ভাণ্ডার—
পেটের দায়ে কি আর চুরি করতে যায়॥
হলে চুরি মামলায় অপরাধী,
যে করে দণ্ডবিধি, তিনি অর্বাচীন ;
লোকের অভাবে হয় স্বভাব নষ্ট, ঘটে বুদ্ধিহীন।
অভাবের জ্বালা কেমন, না বুঝে দণ্ড এমন,
হাকিম হুকুম জারির আগে যেমন—
না খেয়ে দেখেন দুই চার দিন॥

কংগ্রেস শাসনের ভুলত্রুটি যেমন নকুলেশ্বরের তীব্র কাব্যাঘাত খেয়েছে, বামপন্থী রাজনীতির কোন্দলকেও তিনি রেহাই দেন নি—

যারা গদী পাওয়ার দু'দিন পরে
নিজেদের দলের ভিতরে, বাধ'ল নটখটি ;
তারা দেখায় পরের ত্রুটি।
আগে না ঘুচায়ে আত্মদ্বন্দ্ব
করতে চায় দুর্নীতি বন্ধ,
ডালের সঙ্গে নেই সম্বন্ধ,
কেবল সন্তারের ফুটফুটি॥

নিশি সরকারের সঙ্গে জোট

নকুলেশ্বর ও নারায়ণ সরকার কয়েক বছর জোটে গান করলেন। কবিগান আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গে শিকড় ও শাখা বিস্তার করতে লাগল। ইতিমধ্যে ফরিদপুর জেলার ভৈরবনগর নিবাসী শ্রীনিশিকান্ত সরকার পশ্চিমবঙ্গে এসে পলতা স্টেশনের কাছে শান্তিনগর কলোনীতে উঠেছেন। নিশিকান্ত ৺মনোহর সরকারের ছাত্র ; সু-বক্তা, বিশুদ্ধ বাংলায় বক্তৃতা করেন। ফরিদপুর যশোহর খুলনায় তিনি সুপরিচিত ছিলেন। নারায়ণ সরকারের পর নকুলেশ্বর নিশি সরকারের সঙ্গেও জোটে গান গাইতে লাগলেন। নূতন নূতন উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠছে। তাতে গানের সংখ্যাও চাহিদা বাড়ছে। পূর্ববঙ্গের মতো এখানেও দল বেশ চলতে লাগল।

শান্তিনগরে নিশি সরকার বনাম নকুলেশ্বর

শান্তিনগরে প্রতি বৎসর কালীপূজার পরবর্তী রবিবারে কবিগান হয়। ঐখানে এক পালা গানে নিশিবাবু নকুলেশ্বরের বিপক্ষে টপ্পা করলেন—

আমি কল্পনাতে তোতাপুরী, তুমি রামকৃষ্ণ।
একটা মাটির প্রতিমা গড়ে,
মা বলে কেন কও তারে,
সেই তত্ত্ব জানবার তরে, হলেম সতৃষ্ণ॥

তোমার বাবার বুকে চরণ দিয়ে—
তোমার ঐ ল্যাংটা মা দাঁড়ায়ে রয়;
সন্তানের মুণ্ড কেটে, মুণ্ডমালা পরেছে গলায়।

ভবে অসংখ্য সাধক হেরি,
আল্লা যিশু গড্ হরি,
বিভিন্ন ভাবের সাধনায়।
তবে সত্য বলো কিসে হলো—
তোমার সেই সর্বধর্ম সমন্বয়॥

নকুলেশ্বর জবাবে বললেন—
তোতাপুরীর কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়।

এই যে বিশ্বের এই পরিপাটি,
আজ বাদে কাল স'বি মাটি,
মাটির মাঝে এই 'মা'-টি, খাঁটি মাত্র রয়॥

অন্ধ শিবানীরে বক্ষে নিয়ে,
শবরূপে শিব সাধে শিবার চরণ;
পাষণ্ডের মুণ্ড কেটে, মা করেন নৃমুণ্ড ধারণ॥

আর, এক ঈশ্বরের চিত্রপট,
আল্লা হরি যিশু গড্,
নামান্তর সাধকের কারণ।
যেমন, জল পানি আর অপ্ ওয়াটার—
এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ॥

অমূল্য সরকারের সঙ্গে জোট

একাদিক্রমে পনের ষোল বৎসর গান করার পর, একদিন নিশি সরকার নকুলেশ্বরকে বললেন—সরকার মশাই, আমি তো একটা সমস্যায় পড়েছি। যশোহরের সেই শ্রীবিজয় সরকার অল্পদিন হয় পশ্চিমবঙ্গে এসে শ্যামনগরে বাড়ী করেছেন। পূর্ববঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গেই জোটে ছিলাম। তিনি আমাকে ধরেছেন তাঁর সঙ্গে জোট করবার জন্য। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি তাঁর সঙ্গে জোটে গান করব। আপনি এখন অন্য কাউকে নিয়ে গান করুন।

নিশি সরকার চলে গেলেন। ইতিমধ্যে শ্রীনারায়ণ সরকার গান থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। শ্রীহরিনাথ সরকারও গান ছেড়ে দিয়েছেন। এখন নকুলেশ্বর পড়লেন মুস্কিলে। বিপক্ষে দল নেই। কথায় বলে "নিরুপায়ের উপায় ভগবান।" হঠাৎ একদিন নকুলেশ্বরের বাসায় এক নূতন আগন্তুকের আবির্ভাব হলো। তিনি এসে 'দাদু' বলে নকুলেশ্বরকে নমস্কার করলেন।

নকুলেশ্বর বললেন—কে তুমি? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

আগন্তুক—আমার নাম শ্রীঅমূল্যরতন সরকার। ঢাকা মানিকগঞ্জে বাড়ী ছিল। এদেশে এসে আমি বেথুয়াডহরীতে আছি।

নকুলেশ্বর—তুমি কি কর?

অমূল্য—আমার একটি কবিগানের দল আছে; আমি কবিগান করি।

নকুলেশ্বর—তুমি কার শিষ্য?

অমূল্য—আপনি তো ঢাকার পূর্ণ সরকারের সঙ্গে অনেক গান করেছেন। তাঁর ছাত্র শ্রীউপেন্দ্র সরকার। আমি তাঁর ছাত্র। তাইতো আপনাকে 'দাদু' বলে সম্বোধন করলাম। আমি আমার গুরুদেবের মুখে আপনার নাম যশ শুনেছি। আপনাকে চোখে দেখিনি। পশ্চিমবঙ্গে এসে শুনলাম আপনি এই দেশে গান করছেন। যুগান্তর কাগজ থেকে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে একটু আশ্রয় দিন। আমি নূতন এসেছি, আমাকে কেউ চিনে না জানে না। আপনি যদি আমাকে বিপক্ষে রাখেন, তাহলে আমি একটু পরিচিত হতে পারি।

নকুলেশ্বর বললেন—ভাইটি, এ কিন্তু পূর্ববঙ্গ নয়। এখানে খোঁজখবর করে বায়না সংগ্রহ করতে হবে। বাড়ী বসে বায়না পাওয়ার সম্মান দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে গেছে।

অমূল্য—আমি সহরে বায়না ধরতে পারব না। তবে মুর্শিদাবাদ নদীয়ার

মধ্যে আমাদের ঢাকা ময়মনসিংহের অনেক সমৃদ্ধ পরিবার জমিজমা কিনে বাড়ীঘর করে মহাসুখে আছেন। আপনি যদি গ্রামাঞ্চলে যেতে রাজী থাকেন, তবে আমি গ্রামে-গঞ্জে অনেক বায়না ধরতে পারব।

নকুলেশ্বর তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে সেই অমূল্য সরকারকেই জোটে রেখে গান গাইতে লাগলেন। অমূল্য সরকার যত বায়না সংগ্রহ করেন সবই প্রায় পল্লীগ্রামে। যাতায়াতের একটু অসুবিধা হলেও গানের উদ্যোক্তাদের ব্যবহার ও আদর যত্নে সন্তুষ্ট হয়ে নকুলেশ্বর অবাধে গ্রামে-গঞ্জে যেতে আরম্ভ করলেন।

গাংনাপুরে অমূল্য বনাম নকুলেশ্বর

গাংনাপুরে এক পালা গানে অমূল্য সরকার নকুলেশ্বরের বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন—

আমি কল্পনায় জগদানন্দ তুমি গৌরাঙ্গ।
তুমি সার্বভৌমের বাক্যেতে,
মহতের সঙ্গ করিতে,
এসে গোদাবরী তীরেতে, দেখালে রঙ্গ॥
তুমি করবেনা বিষয়ীর সঙ্গ—
গৌরাঙ্গ এই তোমার ধর্মের বিধান,
রাজা রামানন্দ রায়, এ ধরায় বিষয়ীর প্রধান।
তিনি সোনার পাল্‌কী চড়িয়ে,
বাদ্যবাদন করিয়ে,
আনন্দে করতে এলেন স্নান।
তুমি বিষয়ীরে বক্ষে ধরে—
কি বুঝে প্রেমালিঙ্গন করলে দান?

জবাবে নকুলেশ্বর জানালেন—

আমি দেখি না বিষয়ীর বদন—এই ধারণা ভুল।
শুধু ভোগ ঐশ্বর্য বিষয় নয়।
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়,
জীবের সেই বিষয়ই বিষময়, সর্বনাশের মূল॥
এলো দোলায় চড়ে রামানন্দ—
আনন্দে রাধাকৃষ্ণ গুণগায়।

বর্ণচোরা আম যেমন—
বাহিরে চেনা বড় দায় ॥
ও তার বাহিরে বিষয়ীর ভান,
অন্তরে প্রেমের তুফান,
নয়নে প্রেমিক চেনা যায়।
থাকলে সোনার ঘটি মাটির তলে—
কোন দিন জং ধরে কি সোনার গায় ॥

নবদ্বীপে কবিগান—হরিনাথ বনাম নকুলেশ্বর

পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের অন্যতম স্থায়ী আসর নবদ্বীপ তাঁতির বাজারে গানে শ্রীহরিনাথ সরকার ও নকুলেশ্বরের মধ্যে নিম্নোক্ত টপ্পা কাটাকাটি হয়—

প্রশ্ন : হরিনাথ—আমি শ্রীধামের সেই শ্রীদাম রাখাল, হয়েছি শ্রীহীন।
হল সেই দেখা আর এই দেখা, বহু দিন হতে নাই দেখা,
ভাইরে হয়েছিল শেষ দেখা, লুকোলুকির দিন ॥
তোরে পূর্বের ভাবে যায়না চিনা, বাঁকা দুই নয়ন দেখে চিনতে পাই,
আমায় ফেলে কি দোষে, বিদেশে এলি গুণের ভাই ॥
সাজলি কার ভাবেতে দীনহীন, অঙ্গে পরলি ডোর কৌপীন,
কেন তোর কালরূপটি নাই ?
আবার বিষ্ণুপ্রিয়া ত্যাগ করিয়ে, কি জন্যে সন্ন্যাসী হলি নিমাই ?

জবাব : নকুল—ও তুই শ্রীধামের সে শ্রীদাম রাখাল, আমার গুণের ভাই।
যেদিন লুকোলুকি খেলিতে, লুকালি গিরি গুহাতে,
ভাইরে সেদিন হতে তোর সাথে আর ত দেখা নাই ॥
আমার পূর্বের সে রূপ নাইরে সখা, অন্তরে লুকালেম কাল অঙ্গ,
রাধার ভাবে নদীয়ায় উঠালেম প্রেমের তরঙ্গ।
সাজলেম রাধার ভাবে দীনহীন, অঙ্গে পরলেম ডোর কৌপীন,
করেতে নিলেম করঙ্গ।
করতে ঋণ পরিশোধ জীবের উদ্ধার, কলিতে নাম ধরেছি গৌরাঙ্গ ॥

পুনঃ প্রশ্ন—করবি ঋণ পরিশোধ জীবের উদ্ধার ভাইরে পীতবাস।
যদি থাকতি সে বৃন্দাবনে, ধরতেম রাধার চরণে,
তবে তোরে কি এই প্রেম ঋণে, দিত না খালাস ॥

এমন কি ধন কর্জ করেছিলি, কি দেনায় ঠেকাল বিধুমুখী,
কত আসল কত সুদ, কত শোধ কত তার বাকি!
ছিলি সখা আর সখীর দেনা, সে দেনাও দিলি না,
সকলকে দিয়েছিস ফাঁকি।
পরলি রাধার দেনায় ছেড়া তেনা—
কানাইরে মায়ের দেনার করলি কি ?

প্রতি-জবাব—দেনার সুদ কত আর আসল কত শুনতে অভিলাষ।
রাধার নিহেতু প্রেমদার ধারা, দ্বাপরে হয় নাই শোধ করা,
তাতে চক্রবৃদ্ধি সুদ ধরা, করি নাই নিকাশ।

ছিল শান্ত ভাবে মুনিগণে, তাদেরে মুক্তি দানে দেই প্রবোধ—
বলব কিরে শ্রীদাম ভাই, এখন নাই পূর্বের সে আমোদ।
ব্রজের সখাগণ আর সখিগণ, সঙ্গে এলো সর্বজন,
রেখেছি তাদের অনুরোধ।
গেল সখার দেনা সখির দেন', দুধ খেয়ে মায়ের দেনা করেছি শোধ॥

নকুলেশ্বর প্রথমে বর্ধমানে বসতবাটী কিনেছিলেন। কিন্তু বর্ধমান পূর্ববঙ্গাগত বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা থেকে দূরে বলে সেখান থেকে গান গাওয়া বা বায়না পাওয়া কষ্টকর। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে কলকাতায় বাসা করতে হয়। কয়েক বছর পর তিনি বর্ধমানের বাড়ী বিক্রি করে চাকদহে খোসবাস মহল্লায় বাড়ী করেন। চাকদহে এসে দেখলেন বাড়ী বসেই বেশ বায়না পাওয়া যায়।

নেতাজী নগরে মনোরঞ্জন বনাম নকুলেশ্বর

ক্রমান্বয়ে আরো দু'তিনটি কবির দল পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছে। ফরিদপুর জেলার জিকাবাড়ী গ্রামের শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পূর্ববঙ্গে থাকাকালে নকুলেশ্বরের দলে ডাক-সরকার ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে একটি কবির দল করে যাদবপুর বিদ্যাসাগর কলোনীতে আছেন। তাঁর সঙ্গেও নকুলেশ্বরের অনেক জায়গায় গান হয়েছে। যাদবপুর নেতাজীনগর কলোনীতে একবার একপালা গানে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নকুলেশ্বরের বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন—

অন্ত আমি যুদ্ধ তুমি শান্তি কবির কল্পনায়।
তুমি থাক শান্তিনগরে,
অনাবিল শান্তির আগারে—
আমি থাকি সৈন্য শিবিরে, রক্ত লালসায় ॥
যদি শান্তি-প্রিয় পান্থের পদে
অকস্মাৎ অশান্তির কাঁটা বসে,
করতে তারে শান্তি দান কি বিধান,
কও আমার পাশে।
শুনি শৃঙ্গার বীর হাস্য করুণ,
দশ প্রকার রসের দরুণ,
ভগবান জগতে আসে।
ইহার কোন্ রসেরে শ্রেষ্ঠ মানি—
কও শুনি শান্তির জন্ম কোন্ রসে ?

"শান্তি"র পক্ষ নিয়ে নকুলেশ্বর জবাবে বললেন—

অন্ত শান্তি আমি, যুদ্ধ তুমি, আমার প্রিয়জন।
মানুষ শান্তিতে চায় করতে বাস,
যারা সেই শান্তি করে নাশ,
সেই সব দুষ্টেরে করতে বিনাশ, যুদ্ধের প্রয়োজন ॥
যেমন, পায়ের কাঁটা তুলতে হলে—
চলে না অন্য এক কাঁটা ভিন্ন ;
শুনেছি নিদানে কয়—বিষে হয় বিষক্রিয়া শূন্য।
যত সাধুরা চায় শান্তিরস, বীর রসে যোদ্ধা বশ,
হাস্যরস সখাদের জন্য।
কিন্তু দুষ্ট দমন করতে হলে—
সেখানে রৌদ্ররসের প্রাধান্য ॥

দমদমে সুরেন সরকার বনাম নকুলেশ্বর

নকুলেশ্বরের আর এক জন ছাত্র ফরিদপুরের কান্দীগ্রামের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনিও একটি কবিগানের দল করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। তার সঙ্গেও নকুলেশ্বরের মাঝে মধ্যে গান হয়। একবার দমদমে গান উপলক্ষে তিনি নকুলেশ্বরের বিরুদ্ধে টপ্পা করে—

আমি কল্পনায় ভরদ্বাজ মুনি, তুমি দ্বৈপায়ন।
তুমি নির্ণয় করে বেদের ব্যাস,
উপাধি পেলে বেদব্যাস,
কিন্তু একটি তোমার বদভ্যাস, করি দরশন।
আমার গুরু বাল্মীকি মুনি—
স্বহস্তে রামায়ণ লিখে গেছে,
মহাপাপী নারকীর মহাপাপ, রাম নামে ঘোচে॥
তুমি ভুলে রামায়ণের মত, লিখিয়ে মহাভারত,
কেন দাও জীবগণের কাছে।
বলো, রামায়ণের চেয়ে তোমার—
ভারতে এমন কি বেশী আছে ?

'বেদব্যাস'র জবানীতে নকুলেশ্বর জবাব দিলেন—

নাকি তুমি হও বাল্মীকির শিষ্য মুনি ভরদ্বাজ।
তোমার গুরু বাল্মীকি,
রামায়ণ গিয়েছেন লিখি,
তাতে, যা কিছু ছিল বাকী, আমি লিখলেম আজ
রামের পিতৃভক্তি ভ্রাতৃ স্নেহ—
সংসারী লোকের যাহা ন্যায় নিষ্ঠা ;
রামচরিত্রে বাল্মীকি, দেখাতে করেছেন চেষ্টা।
আমার সৎ চিৎ আর আনন্দময়,
কর্ম জ্ঞান ভক্তির আলয়,
কৃষ্ণ হয় ভারতের স্রষ্টা।
স্বীয় শৌর্যে বীর্যে গুণে কার্যে
করেছেন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা।
মহাভারতের কৃষ্ণ স্বয়ং গীতার উপদেষ্টা॥

বেলঘরিয়া দেশপ্রিয় নগরে রসিক বনাম নকুলেশ্বর

তিন চার বৎসর হয় শ্রীবিজয় সরকারের একজন ছাত্র শ্রীরসিকলাল সরকার নামে একজন কবি যশোহর থেকে এসে দল গঠন করে অল্প দিনের মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। নকুলেশ্বরের সঙ্গেও তিনি অনেক পালা গান

করেছেন। বেলঘরিয়া দেশপ্রিয় নগর বাজারে একবার গানে রসিক সরকার নিয়োক্ত টপ্পা করেন—

আমি কল্পনায় মৈত্রেয় মুনি, তুমি বেদব্যাস।
ছিল বেদে ব্রহ্ম নিরাকার,
পুরাণে লিখিয়ে সাকার,
জীবের কি করেছ উপকার, করো তাই প্রকাশ॥
জানি ইন্দ্র চন্দ্র মরুতাদি—
করে যার উদ্দেশেতে নমস্কার;
রূপ নামাদি কল্পনা, কোন জ্ঞানে করো আবিষ্কার?
বেদের ব্রহ্ম অনন্ত অসীম
তারে করলে মাছ কাছিম—অসংখ্য রূপের অবতার
করে বহু নিষ্ঠ সাধকের মত—
করেছ নরকের পথ পরিষ্কার॥

জবাবে নকুলেশ্বর সাকার-বাদ সমর্থন করে বললেন—

আমি নিরাকারকে সাকার করি তাইতে অপরাধ!
ব্রহ্ম অবাঙ্‌মানসো গোচর,
অন্ধ জীব পায়না তার খবর,
তাইতে এনে কল্পনার ভিতর, দেখাই মূর্তিবাদ॥
এনে সীমার মাঝে অসীমেরে—
দেখালেম মূর্তি পূজার প্রাধান্য;
রূপ নামাদি কল্পনা, সাধকের সাধনার জন্য।
যারা জন্মিয়ে হিন্দুর ঘরে,
ব্যাসকে তর্পণ না করে, মূর্তিবাদ করে অমান্য।
ওসে হোক না কেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ,—
তবু সে ম্লেচ্ছ হতেও জঘন্য॥

এখনও ওপারে

বাংলাদেশ—চাঁদপুর নিবাসী শ্রীকালশশী চক্রবর্তী নামে একজন কবিয়াল দ্বিতাগোত্তর পূর্ববঙ্গে ৺রমেশ আচার্য, ৺শচীন্দ্র শীল, শ্রীরাইচরণ সরকার ও

শ্রীতারিণী সরকারের সঙ্গে গান গেয়ে পূর্ববঙ্গের পূর্বভাগে কবিগানের ক্ষীণতম ধারাটি বজায় রেখেছেন। ঢাকা বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীতারিণী সরকারের বিরুদ্ধে তিনি টপ্পা করেছিলেন—

আমি শিব শক্তির চরণ বন্দি নিন্দিত নন্দী।
আমার নাই ভক্তি জ্ঞান সুশিক্ষা,
শ্রীশক্তির মন্ত্রে লই দীক্ষা,
পেতে শ্রীগুরুর চরণ ভিক্ষা, অপেক্ষায় কান্দি॥
কেন যোগেশ্বর শিব যোগাহত—
রক্ষিত বক্ষে চরণ কালী মা'র;
এ কালী মা'র উপমা অবশ্য, বিশ্বে নাইতো আর।
হয়ে বিপরীত রতাতুর, ঊর্ধ্বরেতা চন্দ্রচূড়,
কত দূর কও মধুর আধার।
সেদিন মৃত কি অমৃত ছিলে, কও খুলে
যাক চলে মোর—সব আঁধার॥

কবিগানের ঢাল তরোয়াল—মুখর অতীত

'সরকার' (কবিয়াল), দোহার (ধরতা) ও বাদকবৃন্দ নিয়েই পূর্ণাঙ্গ কবিগান ও কবির দল। কবিগানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় দোহার ও বাদকদের দান অসামান্য। ওরা কবিগানের ঢাল-তলোয়ার বিশেষ। ওদের বাদ দিয়ে 'সরকার' নিধিরাম। যে কোন বিশেষ দল বা কবি'র কৃতিত্বের অনেকখানি অংশীদার ওরা। পূর্ববঙ্গে অসংখ্য দোহার ও ঢুলী কবিগানের আসর জমিয়ে রেখেছিল।

নকুলেশ্বর তাঁর কবি-জীবনে অনেক গায়ক-গায়িকা দেখেছেন, তাদের গান শুনেছেন। খ্যাতনামা গায়ক-গায়িকাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি ঢাকার হরি আচার্য মহাশয়ের দলের নামই প্রথমে বলেন। তাঁর দলে তরঙ্গিণী, কুমুদিনী, ছোট গিরিবালা প্রভৃতি গায়িকা থাকলেও তারা তেমন সুগায়িকা ছিল না। পুরুষদের মধ্যে সুবল, বিহারী, গোবিন্দ সাহা ও রাধাচরণ অতুলনীয়। এদের মতো সুধাকণ্ঠ গায়ক কবিতে আর ছিল না বললেই চলে। কবিগানের সংস্কারকালে আচার্য কর্তা আদরমণি, বালক মদন প্রভৃতিকে লয়ে তান-লয়-সুসঙ্গত সঙ্গীতের প্রবর্তন করেছিলেন। ঢোলের বিকট ধ্বনির বদলে তা থেকে তবলার মধুর ধ্বনি নির্গত হলো। আদরমণি বা বালক মদনের পেছনে গোবিন্দের

সুমধুর কণ্ঠ ও বেহালা যোগে ডাক মালসী ভোর, বসন্ত, সখী-সংবাদ ও গোষ্ঠ গানে পূর্ববঙ্গের আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। বসন্তকালের ভোর রাতে ঝিরঝিরে দক্ষিণা বাতাসে যখন ভেসে আসতো—

সুখ বসন্তে ফুলের আসর, সাজাইতেম ফুলের বাসর,
শয়ন করতে কিশোর কিশোরী,
ফুল-শয্যায় ফুলের মশারী।
ফুল ব্যজনী করে ক'রে, ব্যজন করে ধীরে ধীরে,
ঝরে ঝরে উড়ে উড়ে, অঙ্গ পড়তো ফুলের পাঁপড়ী।
একে পুরী বৃন্দারণ্য তাইতে বসন্ত—
সে সব ভুলে প্রাণকান্ত, কি সুখেতে মজেছ।
এ বসন্ত সুখের কালে, সুখময় বৃন্দাবন ফেলে, কি সুখে আছ॥

সে সুর ঘুমের মানুষকে বিছানা থেকে টেনে তুলে আনতো। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ শ্রোতৃবৃন্দ এসে আসর ভরে তুলতো। আর অশ্লীলতা পাপকে কবিগানের ত্রিসীমানা থেকে দূরীভূত করে দিল।

ঝালকাঠির সব দলেই মেয়ে দোহার বেশী। তার মধ্যে বড় মনোমোহিনী সত্যভামা, ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালী, কালা যামিনী, কুমারপট্টির রাধি, মানদা ওরফে ভূতি, শরৎবালা, প্রিয়বালা ওরফে বোচা, সরলা, হিরণবালা প্রভৃতি এক একটি রত্ন। তবে সবার সেরা বড় মনোমোহিনী; তার মধুক্ষরা কণ্ঠ এককালে পূর্ববঙ্গে কবিগানের আসরকে মাতোয়ারা করে তুলতো।

গানের দলে গায়ক-গায়িকাগণ বেশীর ভাগই বছর বছর দল অদল-বদল করতো। নকুলেশ্বর দোহারপত্রের বেশী পরিবর্তন তেমন পছন্দ করতেন না। কারণ পুরাণো গায়ক-গায়িকারা যেমন কবিয়ালের সুর তাল ও ছন্দের সঙ্গে পরিচিত থাকে, নতুনরা তেমন নয়। সুতরাং মাঝে মাঝে বেমাপা টানে ছন্দ পতনের সম্ভাবনা ঘটে। তাঁর নূতন দলে প্রথম দিকে গায়িকা ছিল শেখ সরলা, রাধি ও প্রিয়বালা। অনেক দিন পর তাদের পরিবর্তন করে শরৎবালা, মানদা, হিরণবালা ও কিরণবালাকে দলভুক্ত করেন। এরাই শেষ পর্যন্ত সঙ্গের সাথী ছিল। এখন একমাত্র হিরণবালা ও কিরণবালা ছাড়া আর পুরানো-গায়িকা কেউ বেঁচে নেই। একে একে সবাই পরপারে পাড়ি দিয়েছে।

ঢোল বাজনায় কবিগানের ঢুলীদের কৃতিত্ব অসাধারণ। তার মধ্যে বরিশাল জেলার ঢুলীদের প্রসিদ্ধি সর্ববাদীসম্মত। মাচরং এর যজ্ঞেশ্বর ঢুলী, বনমালী

ঢুলী, বৈকুণ্ঠ ঢুলী এবং সম্প্রতি পরলোকগত ক্ষীরোদ নট্ট নামকরা ঢুলী ছিলেন। কিন্তু তারা কবি'র ঢোল বাজাতে পারতেন না। কবি'র ঢুলীদের মধ্যে রজনী নট্ট, হরিচরণ নট্ট, বসন্ত নট্ট, গুঁজা অশ্বিনী নট্ট প্রভৃতিকে দিগ্বিজয়ী বলা যায়।

একদিনের এক ঘটনার কথা নকুলেশ্বরের মুখে শুনেছি। তিনি তখন কুঞ্জ দত্তের দলের ডাক-সরকার অর্থাৎ শিক্ষানবিশ। গানের বায়না হয়েছে ঢাকা জেলায় সোনার গাঁ পানাম জমিদার বাড়ী। বিপক্ষে উমেশ শীলের দল। সে দলে ঢুলী হরিচরণ নট্ট, আর কুঞ্জবাবুর দলের ঢুলী রজনী নট্ট। এই রজনীর ছাত্রই ঐ হরিচরণ, বসন্ত ও অশ্বিনী। উমেশ সরকারের দল আসরে গিয়ে গান আরম্ভ করেছে। তখনকার নিয়ম ছিল, গানের শেষ ডাইনা গাইবার সময় ঢুলী উঠে মহড়া বাজাত অর্থাৎ ঢোলের কসরৎ শোনাত। গানের শেষে হরিচরণ ঢুলী উঠে ঢোলে তাল বোলের বেশ কসরৎ দেখিয়ে বাহ্‌বা নিয়ে চলে গেল।

কুঞ্জবাবুর দল আসরে গিয়ে গান শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা বলল—ঢুলী মশাই, আপনিও একটু কসরৎ শোনান।

আগেই বলেছি যে রজনী ঢুলী, হরিচরণ বসন্ত ও অশ্বিনী'র গুরু। তার সঙ্গে দলে আছে বেহালাদার রোহিণী ঘটক, হারমোনিয়ামওয়ালা গোপাল চ্যাটার্জী, সানাইদার অমরী নট্ট ও কাশীয়ালা কৈলাস নট্ট। এরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও সমজদার। রজনী নট্ট ঢোলে সুর বাঁধল। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে সুর বাঁধে বৈঠকী ঢোলে; নট্টের ঢোলে আবার সুর বাঁধে কি? এ প্রশ্নের উত্তর, রজনী নট্টের ঢোল বাজনা যারা শুনেছে তারাই দিতে পারবে। ঢোলের কড়া টেনে টেনে এমন করতো যে টোকা দিলে হারমোনিয়ামের পর্দার মতো সুর বের হতো।

যা হোক রজনী নট্ট উঠে বাজনা শুরু করেছে। সঙ্গে সানাই, বেহালা, হারমোনিয়াম বাজছে। আসরে একটা অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনা উঠেছে। হঠাৎ জমিদারবাবু আসন ছেড়ে উঠে বললেন—রজনী, ঢোল বন্ধ কর। তুমি আর কি ঢোল বাজাবে? বনমালী বৈকুণ্ঠের ঢোল কত শুনেছি। সময় নষ্ট না করে কবিগান গাও। যা করতে এসেছ তাই কর।

ঐ রকম একটা জমকালো আসরের মধ্যে হঠাৎ বাধা দেওয়ায় যেন বজ্র-পতনের মতো অবস্থা হলো। রজনী নট্ট খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ঢোলটা ছেড়ে দিয়ে বলল—এসব বাজনা বুঝতে হলে সমজদার লোক চাই, বালু বনে মুক্তা ছড়াকে

লাভ কি? যাদের তাল জ্ঞান সুর জ্ঞান নাই, তারা এর আদর করবে কেন? সাধে কি বলে—উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দেশে রজকের কি প্রয়োজন—এই বলে রজনী নট্ট ঢোল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল।

রজনীর এসব কথা শুনে জমিদারবাবু রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন—কি বল্লে? তোমার বাজনা বোঝবার মতো সমজদার লোক নেই? আচ্ছা দেখা যাক, আজ আর কবিগান হবেনা—সারা রাত ঢোল বাজনা হবে। দেখি তুমি কতখানি তালের পুঁজি নিয়ে এসেছ!

কুঞ্জবাবু দৌড়ে জমিদারবাবুর কাছে গিয়ে বললেন—বাবু, গানটা বন্ধ করবেন না। ও ভুল করেছে; ওকে ক্ষমা করুন।

কিন্তু জমিদারবাবু জিদ ছাড়লেন না—না, কবিগান কাল হবে। আজ শুধু ওর ঢোল শুনব। দেখি ও কত বড় ঢুলী!

রজনী নট্ট কুঞ্জবাবুকে বলল—আপনি এসেছেন কেন? ঘরে যান, আজ ওঁকে ঢোলই শোনাব। জমিদারবাবুকে লক্ষ্য করে বলল—বলুন, কি তাল বাজাব?

জমিদারবাবু ফরমাশ করলেন—ষোল মাত্রা কাওয়ালী বাজাও, শেষ তালে তেহাই ধরে, সম-এ নিয়ে রাখতে হবে। বলা মাত্র রজনী ঢুলী ষোল-মাত্রা কাওয়ালী ধরে ঘণ্টা খানেক বাজিয়ে শেষ তালে তেহাই ধরে সম-এ নিয়ে রাখল।

বাবু আবার ফরমাশ করলেন—বারোমাত্রা একতালা বাজাও; প্রথম তালে তেহাই ধরে প্রথম তালে রাখবে। রজনী তাও বাজাল। বাবু অসংখ্য ফরমাশ করছেন, আর বলামাত্র রজনী হুকুম তালিম করে যাচ্ছে। এভাবে রাত প্রভাত হয়ে গেল। ভোর বেলা জমিদারবাবু আসরে এসে রজনী ঢুলীর হাত ধরে বললেন—ভাই রজনী, আমি না বুঝে তোমাকে বাধা দিয়ে খুব অন্যায় করেছি। এখন বুঝলাম সত্যিই—তুমি বড় ঢুলী।—এই বলে বাবুর গায়ের দামী গরদের চাদরখানা রজনীর গলায় জড়িয়ে দিলেন।

রজনী ও তার তিন শিষ্য হরিচরণ, বসন্ত ও অশ্বিনী ছাড়াও অনেক ছোট খাট দ্বিতীয় শ্রেণীর ঢুলী ছিল। যেমন, সাহেবগঞ্জের আনন্দ, মাচরং এর গোপাল নট্ট, বেহুরীর বসন্ত নট্ট, পাগল অশ্বিনী নট্ট, স্বরূপকাটির হেমন্ত প্রভৃতি। তারাও আজ বেঁচে থাকলে এক একটি রত্ন বলে গণ্য হতো। কবির দলে এখন ঢুলী নেই বললেই চলে। কবির প্রকৃত ঢুলীরা ঢোল থেকে তবলার বোল বের করতেন, গায়ক গায়িকাদের সুরের মূর্চ্ছনায় শ্রোতারা অশ্রু বিসর্জন

করতেন। এখনকার মতো ঢোলে সশব্দ চাটি মারা বা "কবির দলের ধরতাঃ দোহার বেমাপা দেয় টান" এসব সেকালের কবির দলে ছিলনা।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব বঙ্গীয় পদ্ধতিতে সাত জন কবি সদলে গান গাইছেন—নিশি, বিজয়, মনোরঞ্জন, অমূল্য, রসিক, সুরেন সরকার এবং নকুলেশ্বর স্বয়ং। নকুলেশ্বর এখনো এঁদের সকলের সঙ্গেই গান গেয়ে থাকেন।

শেষ নমস্কার

কিন্তু এ গান তো গান নয়। এ শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি। কবিগানের প্রাণ হলো মালসী, গোষ্ঠ, ভোর ও সখী-সংবাদ। ভাষার চাকচিক্য, ভাবের গাম্ভীর্য, চিন্তার বৈচিত্র্য, উপস্থিত বুদ্ধির চাতুর্য—এক কথায় কবির কাব্যগুণের মাপকাঠি এসব সঙ্গীত আর রচিত হচ্ছেনা। শ্রোতারাও সে সব গান শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গানের প্রারম্ভেই তারা "টপ্পা টপ্পা" বলে চিৎকার দিতে থাকে। কবিগানের অবস্থা রিফিউজী কলোনীর অনাহার ক্লিষ্ট, হৃতস্বাস্থ্য বাসিন্দাদের মতো। এর ক্ষয়িষ্ণু দেহে পুনরায় যৌবনরস সঞ্চারের জন্য উপযুক্ত চ্যবনপ্রাশের ব্যবস্থা হবে কি? অফুরন্ত জল, উর্বরা মাটিতে সুরসিক চাষীর হাতে এক কালে সোনার ফসল ফলেছে। এদেশের মাপা জলে, বালি মাটিতে লাভালাভে অতি হিসেবী চাষীর হাতে নবান্নের সে সৌরভ কই! পূর্ববঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও সঙ্গীতের একচ্ছত্র সম্রাট কবিগান পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় সিনেমা থিয়েটার রেডিও টেলিভিষন-এর বৈদ্যুতিক ঝলকানির মাঝে প্রাচীন ও দরিদ্র গৃহের মাটির প্রদীপের মতো নিবু নিবু। দুই বঙ্গ মিলে কবিগান এখন দশ বারটি দলে পর্যবসিত। নূতন ও প্রতিভাশালী 'সরকার'-এর দেখা নেই। নকুলেশ্বরের চোখের সামনেই পূর্ববঙ্গের অপূর্ব সম্পদ দ্রুত লুপ্তির পথে। কৈশোরে যে সুরের আহ্বানে ঘর ছেড়েছিলেন, আজ সে সুর নিজেই দূর দুরান্তরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভগবানের কি দুর্বোধ্যলীলা!

মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারত ভূমে—
কালক্রমে কত লীলা হয়।
মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গস্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল,
হল অপূর্ব এক লীলার অভিনয়॥ (৺হরি আচার্য)

এ অমঙ্গল থেকে কোন সুমঙ্গলের আবির্ভাব হবে কিনা ভবিতব্যই জানে। জীবন সায়াহ্নে নকুলেশ্বর সেই লীলাময়কে আহ্বান করছেন—

জীবনের শেষে, খেয়াঘাটে এসে,
কাতরে তোমার স্মরি—
এসো হে দয়াল হরি।

আজীবন বীণাপাণির পদতলে কাব্য পুষ্পাঞ্জলি দানের পরেও নকুলেশ্বরের আক্ষেপ—

এ জীবনে গাইলেম কতো গান।
গান হলোনা গানের মতো—
শুধুই গানের ভান॥
কতো দেশে গান গেয়েছি
কতো বাহ্‌বা পেয়েছি
জীবন ভরে কুড়ায়েছি,—আত্ম অভিমান।
জীবনে গাইলেম কতো গান॥
গানং পরোত্তর নহি—
গানে প্রাণ গলে,
সামগানে বেদের সাধনা
বৈদিকে বলে।
আমার গানে হয় না সাধন,
সার হলো অরণ্যে রোদন,
আত্মসুখের স্বার্থের বাঁধন, হয় না অবসান।
জীবনে গাইলেম কতো গান॥
যাঁরে গান শোনাবো বলে—সেধেছিলাম সুর,
সে কভু আসেনা কাছে—আছে বহুদূর।
কোন সুদূরে সভা পাতে,
কোন অজানা নীরব রাতে,
যাবো তারে গান শোনাতে, আসিলে আহ্বান।
এ জীবনে গাইলেম কতো গান॥

—:*:—